মন্মথ রায়

নাট্য গ্রন্থাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

পূর্ণাঙ্গ

(চতুর্থ পর্ব)

॥ মনমথন প্রকাশন ॥

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা—৭০০০০৬

Anthology of one act Plays by Manmatha Ray

॥ মনমথন ॥
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

নবগ্রন্থ কুটির
৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

আনন্দ পাবলিশার্স
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
এবং
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ জগদ্ধাত্রীপূজা, ১৩৬৫

প্রচ্ছদপট ঃ বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক ঃ শ্রীমুদ্রণ
১নং খাসমহল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

এই গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর অভাবনীয় পারিবারিক ভাগ্য বিপর্যয়ে সন্দিহান ছিলাম আরব্ধ প্রকাশন আর সম্পূর্ণ হবে কিনা। কিন্তু পাঠকবন্ধুদের প্রীতি অর্জন করায় এবং আত্মার-আত্মীয় পরম স্নেহভাজন সুব্রত ঘোষের এবং আমার পরম প্রিয় পৌত্র শ্রীমান অমিত রায়ের অকুণ্ঠ সাহায্যে, যা ছিল অসম্ভব তা আজ সম্ভব হলো। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে ছাপার কিছু ভুল ত্রুটির জন্য পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। রোগজর্জর ৮৮ বৎসর বয়স্ক আমি এই নাট্যগ্রন্থাবলীতে পরিকল্পিত আরো দুই খণ্ড যোগ করার চেষ্টা ছাড়িনি।

নিবেদন

ইতি

মন্মথ রায়

সূচীপত্র

ওঁ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বোদাম্ভম্বুজ ভাস্করম্ ।
নমামি যুগকর্তাং আর্তনাথং বীরেশ্বরম্ ॥

মহা উদ্বোধন

(স্বামী বিবেকানন্দের আদ্য জীবনী-নাট্য)

মন্মথ রায়

"নরেন্দ্র··· যেন সহস্রদল কমল···এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ
পঞ্চম খণ্ড
নবম অধ্যায়॥

প্রবেশানুক্রমিক
—ঃ চরিত্রলিপি ঃ—

১। বিশ্বনাথদত্ত—নরেন্দ্রের পিতা
২। ভুবনেশ্বরী—নরেন্দ্রের মাতা
৩। নরেন্দ্রনাথ
৪। প্রিয়নাথ—নরেন্দ্রের বন্ধু
৫। সুরেন্দ্র নাথ মিত্র—প্রতিবেশী।
৬। শ্রীরামকৃষ্ণ
৭। প্রথম ভক্ত—শ্রীরামকৃষ্ণেরভক্ত
৮। দ্বিতীয়ভক্ত—শ্রীরামকৃষ্ণেরভক্ত
৯। প্রথম বন্ধু—নরেন্দ্রের বন্ধু
১০। দ্বিতীয় বন্ধু—নরেন্দ্রের বন্ধু
১১। মৌলভী সাহেব—বিশ্বনাথ বাবুর এক মুসলমান মক্কেল
১২। মহিম—এক দুঃস্থ মাতাল
১৩। রমেন—নরেন্দ্রের এক দুশ্চরিত্র বন্ধু
১৪। ভবনাথ—নরেন্দ্রের বন্ধু
১৫। মাষ্টার—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)
১৬। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল দত্ত—বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ
১৭। শশী—শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য
১৮। ডাঃ সরকার—(ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার)
রাখাল, মণি প্রভৃতি ভক্তগণ

মহা উদ্বোধন

[বিবেকানন্দ আত্মলীলা নাটক]

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[১৮৮১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাস। নরেন্দ্রের মাতামহীর গৃহস্থিত কক্ষ। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী এবং পিতা বিশ্বনাথ দত্ত নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তখন বাসায় নাই। বিশ্বনাথ নরেন্দ্রের পুঁথি পুস্তকগুলি দেখিতেছেন। ভুবনেশ্বরী এই অগোছাল কক্ষটিকে গুছাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় রত।]

বিশ্বনাথ দত্ত ॥ যা দেখছি, তোমার ছেলে বিদ্যাদিগ্‌গজ না হয়ে যায় না।

ভুবনেশ্বরী ॥ পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত হবে না তো কি হবে ?

বিশ্বনাথ ॥ তুমিই তো বলতে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম। শিব না গড়ে একটা বানর গড়ে পাঠিয়েছেন।

ভুবনেশ্বরী ॥ ছেলেবেলায় মহা দুর্দান্ত ছিল, তাই বলতাম। কিন্তু [সগর্বে] এখন ?

বিশ্বনাথ ॥ হুঁ। কিন্তু এতটা ভালো হবে তা' বুঝিনি। পরীক্ষা তো দিচ্ছে এফ. এ., কিন্তু যে সব বই পড়ে দেখছি সে সব বই বি. এ., এম. এ-র ক্লাশেই বোধ হয় পড়া হয়! ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম, বেনের নাস্তিকতা, স্পাইনোজার 'অদ্বৈত-চিদ্বস্তুবাদ,' ডার-উইনের 'অভিব্যক্তিবাদ' কোঁতে ও স্পেন্সারের 'অজ্ঞেয়বাদ' আর আদর্শ সমাজের অভিব্যক্তি।.........কিছু বুঝলে ?

ভুবনেশ্বরী ॥ আমাদের বুঝবার দরকার নেই। আমি যেটা বুঝছি সেটা তুমি বুঝবে কি ?

বিশ্বনাথ ॥ কী বুঝছো ?

ভুবনেশ্বরী ॥ বাড়িতে অত লোক, সব সময়ই একটা হৈ-হৈ লেগেই থাকে, পড়াশুনোর অসুবিধে হয়, তাই চলে এল দিদিমার এই বাড়িতে। নির্জনে থেকে কলেজের পড়া পড়বে ব'লে। কিন্তু এত মোটা মোটা সব বই রাতদিন পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে না তো ?

বিশ্বনাথ ॥ হুঁ। [একখানা বই হাতে নিয়ে] 'স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন এবং কার্যপ্রণালী'—এ সব দেখছি মেডিক্যাল বই! আবার এখানে দেখছি কাণ্ট, ফিকটে, হেগেল, শোপেনহয়র। জার্মান দার্শনিকরা সব রয়েছেন। শুধু নেই দেখছি আমার দেওয়া হাফেজের সেই কবিতাবলী, আর সেই বাইবেলখানা, যেটা ওর হাতে দিয়ে আমি বলেছিলাম, ধর্ম কর্ম যদি কিছু থাকে তা' এরই ভেতরে আছে।

ভুবনেশ্বরী ॥ ও সব খিস্টানি, মুসলমানী বই নেই সে ভালোই। শিবপুজো করে ওকে পেয়েছিলাম। ও আমার সেই শিব। আর সেই শিবের মতোই অগোছাল দেখছি। দেখেছ ঘরখানার ছিরি? মা বললেন, এ ঘরে নাকী বাড়ির আর কাউকে ঢুকতে দেয় না। তাই গুছিয়েও কেউ দিতে পারে না। মা বলছিলেন, লক্ষণ ভালো নয়।

[তক্তপোষের নীচে হইতে একটি আসন ও কোশাকুশি বাহির করিলেন।]

এই দেখ, মা যা বলেছেন মিথ্যে নয়। জপ, তপ, পুজো এ সবও চলছে। এ কি রকম পড়াশোনা বুঝি না বাপু! না, না তুমি আর দেরি কোরো না, যেমন ক'রে পারো বিয়ের যে সম্বন্ধটা এসেছে, সেখানেই ওর বিয়েটা শীগ্‌গীর দিয়ে ফেলো। নইলে এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখা যাবে না, বেরিয়ে যাবে তোমারই বাবার মতন সন্ন্যাসী হয়ে।

বিশ্বনাথ ॥ বিয়ে দিতেই তো চাই। তোমার ছেলের মত করো!

ভুবনেশ্বরী ॥ ও তো ছেলেমানুষ, ওর আবার মত কী? তুমি একটু জোর করে বললেই হয়।

বিশ্বনাথ ॥ ছেলেমানুষ? ছেলেমানুষের ঘরে এই সব বই, যার নাম উচ্চারণ ক'রতে আমার দাঁত ভেঙ্গে যাচ্ছে!

ভুবনেশ্বরী ॥ কিন্তু আবার এ সবও তো দেখছি। ঐ হুঁকো-কল্কে, ঐ ডুগি তবলা, ঐ তানপুরো—না, না ছেলেটা আমার একেবারে কাঠখোট্টা হয়নি এখনও, রসকষ এখনো আছে। এইটুকু থাকতে থাকতে জোর করে ওকে বলো। বিয়ে ওকে করতেই হবে।

বিশ্বনাথ ॥ কাকে বলবো? এই তো এ বাড়িতে ঘণ্টাখানেক বসে আছি, পেলুম কই? [ঘড়ি দেখিয়া] আর তো আমি বসতে পারছি না। আমার মক্কেল আসবে; আসবে কি, এসে গেছে! যাবে ত চল।

ভুবনেশ্বরী ॥ কিন্তু—

বিশ্বনাথ ॥ তোমার মাকে বলে যাও, নরেন যেন আজই একবার বাড়ি গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। এসো।

[বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ কক্ষে প্রবেশ করিল ।]

নরেন্দ্রনাথ ॥ মা ! বাবা ! [নরেন্দ্র প্রণাম করিল । প্রিয়নাথ উভয়কে নমস্কার করিল ।] আমার বন্ধু প্রিয়নাথ !

ভুবনেশ্বরী ॥ কোথায় ছিলি বাবা ? আমরা সেই কতক্ষণ এসে বসে আছি ।

নরেন্দ্র ॥ ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে একটা ঘরোয়া মীটিং ছিল । এস—বসবে এস ।

বিশ্বনাথ ॥ নারে বিলে, বসবার আর সময় নেই । আমার মক্কেল এসে বসে আছে । আজ হোক, কাল হোক, তুই একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস । তোর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে ।

ভুবনেশ্বরী ॥ তুই আবার এখন ব্রাহ্মসমাজে যাচ্ছিস ? তবে যে বলেছিলি আর যাবিনে ?

নরেন্দ্র ॥ যাব কি যাব না সেই আলোচনাই করছিলাম আমরা । পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর ইহকাল সর্বস্বতা যখন দেশকে আচ্ছন্ন ক'রছিল, তখন রাজা রামমোহন রায়, দেশকে রক্ষা করতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ ব্রাহ্মসমাজ । কাজও তাতে বেশ কিছু হয়েছিল । দেশের মতিগতি দেশের ধর্মেই ফিরছিল । কিন্তু সেখানেও এখন এমন দলাদলি শুরু হোলো যে, ঘেন্না ধরেছিল আমারও ।

ভুবনেশ্বরী ॥ তবে আবার যাচ্ছিস কেন ?

নরেন্দ্র ॥ কি জানি মা ? ব্রাহ্মসমাজের মতটা এখনও আমার ভালো লাগে । ওখান থেকে ডাক এলে আমি যেন কেন 'না' বলতে পারি না । নিরাকার স্বগুণ ব্রহ্ম—

বিশ্বনাথ ॥ তোর নিরাকার স্বগুণ ব্রহ্ম আমাকে আর ধ'রে রাখতে পারছেন না । আমাকে যেতেই হচ্ছে । [ভুবনেশ্বরীকে] তুমি যাবে তো, এস ।

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হচ্ছে । সব কাজ ফেলে এসেছি । তুই কিন্তু একবার আসবি, অনেক কথা আছে । [প্রিয়নাথকে] আসি বাবা, তোমরা বোসো ।

নরেন্দ্র ॥ মা যাচ্ছ যাও কিন্তু তোমার মাকে বলে যেও তো রাত-বিরেতে তিনি আমার জানলা দিয়ে উঁকি মারেন না যেন ।

ভুবনেশ্বরী ॥ [হাসিয়া] রাত জেগে তুই কী সব করিস, তাই দেখতে আসেন ।

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ তাতো আসেন, কিন্তু আমার মনে হয়, জানালায় বুঝি এসে দাঁড়িয়েছেন কোন পেত্নীটেত্নী ।

[বিশ্বনাথের উচ্চহাস্য ও ভুবনেশ্বরীর সহিত প্রস্থান।]

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ যে কথা তোমাকে বলছিলাম। কিছুদিন থেকে দেখছি রাতে ঘুমুলেই অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখি। কখনও দেখি খুব বড়োলোক হয়েছি। অতুল ঐশ্বর্য,অগণিত দাসদাসী, অশেষ মান-সম্ভ্রম। শুধু বড় নই, সবার বড়। আবার তারপরেই স্বপ্ন দেখি, আমি যেন সর্বস্ব ত্যাগ করে, শুধু মাত্র কৌপীন সম্বল করে শাক-পাতা যা পাচ্ছি খাচ্ছি। গাছের তলায় শুয়ে আছি ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে মুনি ঋষিদের জীবন-যাপন করছি। কিন্তু এই শেষের স্বপ্নটি ভাল লাগে আমার। এমন কেন হয় বলতে পারো ?

প্রিয় ॥ Coming events cast their shadows before. সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়ে যাবে না তো ? খুব ধ্যান ধারণাও তো ক'রছো ? ব্রাহ্মসমাজে ?

নরেন্দ্র ॥ কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঐ প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় মনে আমি তৃপ্তি পাই না ভাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তিনি যা বললেন, শুনে তো আমি অবাক।

প্রিয়নাথ কী ?

নরেন্দ্র ॥ বললেন, তোমার মধ্যে যোগীর চিহ্ন আছে। তুমি ধ্যান কোরো শান্তিও পাবে, সত্য লাভও করবে।

প্রিয় ॥ ও সেই থেকেই বুঝি শুরু হয়েছে এই কঠোর ব্রহ্মচর্য ?

নরেন্দ্র ॥ মিথ্যে বলনি। মহর্ষির কথা ফেলবার নয়। নিরামিষ খাই, ভূমিশয্যায় শুয়্যায় শুই, সাদা ধুতি আর চাদর পরি। রাত জেগে ধ্যান-ধারণাও করি। তবু তো আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটছে না। শান্তি পাচ্ছি না ! কেবলই মনে প্রশ্ন জাগছে—.

"কস্মিন ভগবন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ?" পেতাম যদি এমন একজন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, যিনি জগৎ কারণ সেই ভূমাকে জেনেছেন, জ্ঞান পিপাসা যার মিটেছে—যাতে আমার পিপাসাও মিটিয়ে দিতে পারে। এমন কি কেউ আছেন ? কলেজে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়তে পড়তে হেস্টিসাহেব একদিন বলেছিলেন, এ জন্য যে তন্ময়তা চাই তা' তিনি মাত্র একজনের মধ্যেই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর নাম শুনলে তুমি হাসবে।

প্রিয় ॥ কে ?

নরেন্দ্র ॥ দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ি আছে।

প্রিয় ॥ হ্যাঁ আছে।

নরেন্দ্র ॥ তিনি সেই কালীমন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ।

প্রিয় ॥ বলো কী ?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। আরো আশ্চর্য শুনেছি তিনি ছিলেন বড় এক গেঁয়ো লোক।

প্রিয় ॥ বলো কী হেস্টি সাহেব তাঁর কথা বলেছেন?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। তাঁর কথাই বলেছেন। তাঁর কথা আর একজনের মুখেও শুনেছি।

প্রিয় ॥ কে? কার মুখে?

নরেন্দ্র ॥ তিনি আমাদের বাড়ির ডাক্তার, আমাদেরই আত্মীয়, নাম রামচন্দ্র দত্ত। তিনি ঐ পূজারী ব্রাহ্মণকে দেখেছেন। সে ব্রাহ্মণের নাম, ঠাকুর রামকৃষ্ণ। লোকটি না কি অদ্ভুত!

প্রিয় ॥ তোমার বিশ্বাস হয়?

নরেন্দ্র ॥ না দেখে, প্রমাণ না পেয়ে আমি কিছুই বিশ্বাস করি না।

[দরজায় মৃদু করাঘাত।]

নেপথ্যে ॥ বিলে আছিস?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন।

[সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবেশ।]

[উভয়ের নমস্কার ও প্রতিনমস্কার।]

সুরেন্দ্র ॥ বিলে! তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

নরেন্দ্র ॥ বলুন না। এ আমারই বন্ধু প্রিয়নাথ। [প্রিয়নাথকে] আর ইনি আমাদের এই সিমলের সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সুরেন্দ্র ॥ তোমার হাতে এখন কোন কাজ আছে?

নরেন্দ্র ॥ আপনি অমন বিব্রত হচ্ছেন কেন? কি করতে হবে বলুন না?

সুরেন্দ্র ॥ দক্ষিণেশ্বর থেকে আমার বাড়িতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন। গান শুনতে বড় ভালোবাসেন। কিন্তু আশে পাশে গায়ক কাউকে পাচ্ছি না। তোমার কথা মনে হ'ল। একবার যাবে আমার সঙ্গে, ঠাকুরকে গান শোনাতে?

নরেন্দ্র ॥ ঠাকুর রামকৃষ্ণ? এসেছেন আপনার বাড়িতে!

সুরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। তোমার তানপুরাটা নিয়ে আসবে?

নরেন্দ্র ॥ প্রিয়?

সুরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ হেস্টি সাহেব!

সুরেন্দ্র ॥ না, না হেস্টি সাহেব নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

নরেন্দ্র ॥ চলুন, চলুন। হেস্টি সাহেবের কাছেও তাঁর কথা শুনেছি। আজ আমার কী সৌভাগ্য!

[তানপুরাটি লইতে গেলেন। পটক্ষেপ হইল।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[কয়েক সপ্তাহ পর। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুইজন ভক্তের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ কই তোমাদের সুরেন মিত্তির তো এখনও এলো না ?

প্রথম ভক্ত ॥ আসবেন বলেই তো বললেন।

রামকৃষ্ণ ॥ সে ছেলেটিকে সঙ্গে আনছে তো ?

দ্বিতীয় ভক্ত ॥ কোন্ ছেলেটি ?

রামকৃষ্ণ ॥ কেন গো, তোমরা জানো না ? ক' হপ্তা আগে সুরেন মিত্তির আমাকে তার সিমলের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গান গাইবার জন্যে ধরে এনেছিল ঐ ছেলেটিকে। নাম শুনেছিলাম নরেন্দ্র। তা, নরেন্দ্রই বটে।

প্রঃ ভক্ত ॥ হ্যাঁ জানি। সিমলের বড় এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। যেমন দেখতে, তেমনি স্বাস্থ্য। গুণও অনেক।

দ্বিতীয় ভক্ত ॥ হ্যাঁ খুব নাম হয়েছে ছেলেটির। জেনারেল এসেম্বলী কলেজ থেকে এবার এফ, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। প্রিন্সিপাল হেস্টি সাহেব নাকি বলেছেন বিলেত—জার্মানীতেও এমন চৌকস ছাত্র বড় একটা দেখা যায় না। যেমন পড়াশুনায়, তেমনি খেলাধুলোয়, তেমনি গান-বাজনায়।

রামকৃষ্ণ ॥ সুরেনের বাড়িতে সেদিন ওকে দেখেই আমি চিনেছি। নিত্য-সিদ্ধের থাক। আসবার সময় ওর হাত দু' খানি ধরে আমি বলে এসেছিলাম, আমার এই দক্ষিণেশ্বরে এস। 'আসবো' বলেছিল কিন্তু কয়েক হপ্তা হয়ে গেল এল না দেখে সুরেনকে খবর দিয়েছি, তুমি ওকে নিয়ে এস। ওকে দেখবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। নিত্যসিদ্ধের থাক্ যে গো।

প্রঃ ভক্ত ॥ মিত্তির মশাই ওকে নিয়েই আজ আসছেন।

দ্বিঃ ভক্ত ॥ নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ কী, ঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ ॥ জন্ম থেকেই সিদ্ধ। সংসার ওদের বাঁধতে পারে না।

প্রঃ ভক্ত ॥ কিন্তু আমরা তো সংসারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমাদের কি হবে ?

রামকৃষ্ণ ॥ কর্ম করো। কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলো না।

প্রঃ ভক্ত ॥ কিন্তু এও বড় কঠিন। উপায় কী ?

রামকৃষ্ণ ॥ উপায় আছে গো। অভ্যাস যোগ। ওদেশে ছুতোরদের

মেয়েরা দেখেছি, তারা একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ঢেঁকি পড়বার ভয় আছে হাতে ; আবার ছেলেকে মাই দিচ্ছে ; আবার খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা কইছে ; বলছে—তোমার যা পাওনা আছে দিয়ে যেও।

"নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু সর্বদা উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে।

"তবে এটুকু হবার জন্য একটু সাধন চাই। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ভক্তিলাভ করে কর্ম করা যায়। শুধু কাঁঠাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগবে—হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আর আঠা লাগবে না।"... গাড়ির শব্দ পাচ্ছি না ?

প্রঃ ভক্ত ॥ তবে বোধহয় মিত্তির মশাই নরেনকে নিয়ে এলেন।

রামকৃষ্ণ ॥ যারা সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকতে পারে, তারা বীর ভক্ত। মাথায় বিশ মণ বোঝা তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। এরই নাম বীর ভক্ত।

দ্বিঃ ভক্ত ॥ বড় কঠিন।

রামকৃষ্ণ ॥ কঠিন হলেও ভগবানের কৃপায় কি না হয়। অসম্ভব ও সম্ভব হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সেকি একটু একটু করে আসবে ? একেবারে ঘর আলোকিত হবে।... ঐ এসে গেছ গো, এসে গেছে।

[সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত নরেন্দ্রনাথ ও তাহার দুইজন বন্ধু পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ [নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া] শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই। মাথার চুল দেখছি এলোমেলো, বেশভূষাও তাই। সবই যেন কেমন আলগা। চোখের ভেতর দিয়ে মনটাকেও দেখতে পাচ্ছি। মনের অনেকটা ভেতরের দিকে কে যেন জোর করে টেনে রেখেছে। সত্ত্ব গুণীর আধার গো সত্ত্ব গুণীর আধার। মেঝেতে মাদুর পাতা আছে। বোসো।

নরেনের প্রথম বন্ধু ॥ আমরা বরং একটু ঘুরে টুরে দেখি।

দ্বিতীয় বন্ধু ॥ হ্যাঁ। জায়গাটা বেশ। গঙ্গার ধারে, চমৎকার চড়ুই-ভাতি হয়। [নরেন্দ্রকে] তুই আসবি, না বসবি ?

নরেন ॥ আমি বসি।

প্রঃ বন্ধু ॥ বোস্ আমরা সব ঘুরে দেখে আসি।

[বন্ধুদ্বয়ের প্রস্থান।]

রামকৃষ্ণ ॥ [সুরেনের প্রতি] ধরে নিয়ে এলে বুঝি ?

সুরেন্দ্র ॥ আজ্ঞে না। ও আসবে আসবেই ক'রছিল। এফ. এ. পরীক্ষা দিতে হল কিনা, তাই এই হপ্তাকয়েক দেরি হয়েছে।

নরেন্দ্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ সেদিন সুরেনের বাড়িতে তোমার সেই ভজন গান আমার বড় ভালো লেগেছিল গো! আজ একটা বাংলা গান গাওনা গো।

নরেন্দ্র ॥ বাংলা গান দু'চারটি মাত্র শিখেছি ব্রাহ্মসমাজে। আজ্ঞে আপনি যখন বলছেন গাইছি।

[নরেন্দ্রের গান]

'মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।'

রামকৃষ্ণ ॥ ওগো, ওগো। তোমরা সব একটু বাইরে যাও না। আমি এর সঙ্গে একটু কথা-বার্তা কইবো।

সুরেন্দ্র ॥ আমরা মন্দিরে যাচ্চি।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মাকে প্রণাম করে এস।

রামকৃষ্ণ ॥ [নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পরম স্নেহে] এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে আছি, তা ভাবতে নেই?

নরেন্দ্র ॥ আমার পথ চেয়ে আছেন, আপনি?

[ভক্তদ্বয় এবং সুরেন্দ্রনাথ কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ রে। বিষয়ী লোকের বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝ'লসে যাচ্ছে। প্রাণের কথা কাউকে বলতে না পেরে আমার পেট ফুলে গেছে।

নরেন্দ্র ॥ এসব আপনি কাকে বলছেন? আমি কে জানেন? আমি কোন সাধু সন্ন্যাসী নই, বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি।

রামকৃষ্ণ ॥ [হঠাৎ হাত জোড় ক'রে] না, না আমি জানি তুমি কে? তুমি সপ্তর্ষির এক ঋষি, নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি দূর করতে আবার শরীর ধরেছ।

নরেন্দ্র ॥ আপনি কী উন্মাদ ?

রামকৃষ্ণ ॥ না, না আমি উন্মাদ নই। তুমি বোসো। আমি তোমাকে ভোগ দিচ্ছি।

[ঠাকুর সরিয়া গিয়া একটি থালাতে মাখন মিছরী ও কিছু সন্দেশ আনিয়া নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া দিতে গেলেন।]

খাও। খাও। না-না আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি।

নরেন্দ্র ॥ না, না আমাকে খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গে ভাগ করে খাচ্ছি।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরা খাবে এখন, তুমি খাও।

[ঠাকুর নরেন্দ্রকে দুইটি সন্দেশ খাওয়াইয়া দিলেন। নরেন্দ্রের পূর্বোক্ত দুই বন্ধুর প্রবেশ এবং মন্দির হইতে ভক্তদ্বয় সহ সুরেন্দ্রনাথেরও প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ এস গো, তোমরাও এস। ভোগের প্রসাদ নাও।

[ঠাকুর মহানন্দে সেই প্রসাদ সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন।]

প্রঃ বন্ধু ॥ তা' এ সন্দেশ দেখছি বেশ। কোলকাতাকে হার মানায়।

দ্বিঃ বন্ধু ॥ এ সন্দেশ কোথায় তৈরী হয় ঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ ॥ তা দিয়ে তোমার কী দরকার বাপু! তবে শোন। এক বাগানে দু'জন লোক বেড়াতে গেছে, তার ভেতরে যার বিষয় বুদ্ধি বেশী সে বাগানে ঢুকেই কটা আমগাছ, কোন গাছে কত আম হয়েছে, বাগানটির কত দাম হতে পারে এইরকম বিচার করতে লাগল। আর একজন মালিকের সঙ্গে ভাব করে, গাছতলায় বসে একটি করে আম পাড়তে লাগল আর খেতে লাগল। বল দেখি কে বুদ্ধিমান? আম খাও পেট ভরবে। কেবল পাতাগুণে কিম্বা হিসাব কিতাব করে লাভ কী ?

প্রঃ ভক্ত ॥ তা যা বলেছেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিকই বলেছি। যাঁরা জ্ঞানাভিমানী, তারা শাস্ত্র আর তর্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

দ্বিঃ ভক্ত ॥ কিন্তু সত্যটা কী, সেটা তো জানতে হবে! ধর্ম নিয়ে কত তর্ক—তার মীমাংসা কে করেছে ?

প্রঃ ভক্ত ॥ কেউ বলছে ব্রহ্ম বড়, কেউ বলছে শক্তি বড়।

দ্বিঃ ভক্ত ॥ আবার সবাই বলছে, আমার ধর্ম্মই বড়।

রামকৃষ্ণ ॥ তা' যদি বল বাপু, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ;—অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ;

আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না ; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

নরেন্দ্র ॥ বাঃ সুন্দর !

রামকৃষ্ণ ॥ "যেমন জল, 'water' 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট ; এক ঘাটে মুসলমানেরা 'জল' খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'water'। তিনিই এক ; কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ কেউ বলছে 'আল্লা' ; 'God' কেউ বলছে 'ব্রহ্ম' কেউ 'কালী' ; কেউ বলছে 'রাম' ; হরি, যীশু দুর্গা"। ঈশ্বর এক। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর কাছে যেতে 'যত মত, তত পথ'।

নরেন্দ্র ॥ বাঃ সুন্দর ! 'যত মত, তত পথ'।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, যত মত, তত পথ। সব পথই নিয়ে যাবে সেই ঈশ্বরেরই কাছে।

দ্বিঃ ভক্ত ॥ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কথা কি জানেন ঠাকুর, ঈশ্বরে বিশ্বাসই যে নেই আমাদের !

নরেন্দ্র ॥ [রামকৃষ্ণকে] ঈশ্বরকে কি আপনি দেখেছেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ কেন দেখবো না ? যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা কইছি, তেমনি ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়—কিন্তু কে তা চাইছে ? লোকে স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্যে কত কান্নাকাটি করে ঈশ্বরকে পেলাম না বলে কেউ কাঁদে কী ? যে কাঁদে, যে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তাকে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন।

প্রঃ ভক্ত ॥ আমি যদি বলি ঈশ্বর নেই ?

রামকৃষ্ণ ॥ রাত্রে আকাশে কত তারা দেখ। সূর্য উঠলে দেখতে পাও না বলে কি বলবে দিনের বেলায় আকাশে তারা নেই ?

নরেন্দ্র ॥ কেউ যদি আপনাকে উন্মাদও বলে, বলুক। কিন্তু এমন বিশ্বাস বড় একটা দেখা যায় না। আজ আমরা আসি।

প্রঃ ভক্ত ॥ হ্যাঁ আমরাও আজ উঠছি।

রামকৃষ্ণ ॥ [নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া] আর একদিন তুই আমার এখানে আসবি, শীগ্‌গীর আসবি, একা আসবি।

নরেন্দ্র ॥ আসবো।

[সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিল। নরেন্দ্রও প্রণাম করিলেন। তাঁহার বন্ধুদ্বয় নমস্কার করিল। ঠাকুর ব্যতীত সকলে বাহির হইয়া গেল।]

রামকৃষ্ণ ॥ [ভাবাবিষ্টের মতো] ওরে আয় আয়, তোদের না দেখে আমার আর প্রাণ বাঁচে না রে। "ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস আয়, তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়।"

[পর্দা]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানা। বিশ্বনাথ দত্ত এবং তাঁহার এক মুসলমান মক্কেল বন্ধু মৌলভী সাহেব কথোপকথনে রত।]

বিশ্বনাথ ॥ হাফিজ আর সাদি এই দুই কবির কবিতা আমাকে এককালে আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু মৌলভী সাহেব এবার আর একটি নতুন কবির পরিচয় পাচ্ছি যার কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে, আমি তো সেই অনুবাদ পড়েই মুগ্ধ হয়ে গেছি।

মৌলভী ॥ আপনি ওমর খৈয়ামের কথা বলছেন।

বিশ্বনাথ ॥ জানেন দেখছি।

মৌলভী ॥ আমাদের লখনউ শহরেও আজকাল ছেলে ছোকরারা ওমর খৈয়ামের ঐ ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে খুব মাতামাতি করছে। আমি কিন্তু মূল ফার্সীটাই পড়েছি।

বিশ্বনাথ ॥ এত বড় ব্যবসা চালিয়েও কবিতা পড়বার সময় পান আপনি?

মৌলভী ॥ ব্যবসার চেয়ে মামলা-মোকদ্দমাতেই সময় নেয় বেশি। আপনি আমার য়্যাটর্নী। আপনি যদি ওমর খৈয়াম পড়বার সময় পান, এ মক্কেলই বা কেন পাবে না? কিন্তু ওমর খৈয়ামের কবিতা মনটাকে বড় উদাস করে দেয়।

বিশ্বনাথ ॥ যা' বলেছেন।

'সদ্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রিদিন,
মরণ পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে-মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই
মূর্খ-তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায়
কোথাও নাই।'

[অন্দর হইতে নরেন্দ্রের প্রবেশ]

বিশ্বনাথ ॥ এই যে বিলে। ইনি আমার মক্কেল আর বন্ধু—লাখ্‌নৌর সেই মৌলভী সাহেব।

মৌলভী ॥ নরেন তুমি এত বড় হয়ে গেছো! বাঃ! বড় চমৎকার হয়েছ তুমি দেখতে। বাপজানের কাছে তোমার কথা খুব শুনেছিলাম। এবার না কি বি, এ, দিচ্ছ? ছোটবেলায় এই বৈঠকখানায় আমাকে দেখেছ, মনে পড়ছে? আমার কাছে কত গল্প শুনতে তুমি।

নরেন্দ্র ॥ মনে পড়ছে। বিশেষ করে আর একটা কথা মনে পড়ছে.

মৌলভী ॥ কি?

নরেন্দ্র ॥ আপনার হুঁকো টেনেছিলাম আমি।

মৌলভী ॥ সে কি?

নরেন্দ্র ॥ ছোটবেলায় এই বৈঠকখানায় দেখতাম, নানা জাতের মক্কেলদের জন্য নানান রকম হুঁকো। হুকোদানীতে লেখা থাকতো এটা ব্রাহ্মণের, এটা কায়স্থের, ওটা মুসলমানের।

মৌলভী ॥ হ্যাঁ থাকতো।

বিশ্বনাথ ॥ এখনও আছে।

নরেন্দ্র ॥ কিন্তু তখন আমার মনে হ'ত এটা কেন? সবাই তো একই মানুষ কিন্তু হুঁকোগুলো আলাদা কেন? এ জাতভেদের মানে কী? এটা না মানলেই বা কি হয়? মুসলমানের হুঁকোয় তামাক খেলে কি পাপ হবে আমার? আমি কি মরে যাবো? আমার কি ব্যারাম হবে? তাই আপনি একদিন যে হুঁকোটায় তামাক খেয়েছিলেন, সেই হুঁকোটা আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে তামাক খেয়ে দেখছিলাম।

বিশ্বনাথ ॥ [হাসিয়া] এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে পড়লাম।

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। আমার সব কথা শুনে তুমি আমাকে বকনি বাবা, একটু হেসে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলে।

মৌলভী ॥ তাই নাকি? তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিকই বলেছেন Child is the father of man তোমার বাবার কাছে শুনেছিলাম তুমি জাত টাত মানো না। মানুষটাই তোমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। শুনে বড় খুশী হলাম নরেন। দোয়া করি বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর। আচ্ছা দত্ত সাহেব আজ সাহেব, আজ তবে উঠি। ওমর খৈয়ামে ডুবে না থেকে আমার মামলাটা একটু মন দিয়ে দেখবেন। আমি আজই লাখনউ চলে যাচ্ছি। আপনার চিঠি পেলেই আবার আসব। আদাব! আদাব!

[মৌলভীর প্রস্থান]

বিশ্বনাথ ॥ তা' বিলে! তুমি এখন কোন রাজ্যে আছ? জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য? কিন্তু জানো, কবি ওমর খৈয়ামের মতে—

"এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর,
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।"

[অন্দর হইতে ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ]

ভুবেনেশ্বরী ॥ ঐ সব তত্ত্ব কথা নিয়ে তুমি আর ওর মাথা খারাপ কোরো না। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করছিল, এখন শুনছি তিনি নিজেই ওর ঘরে এসে ওকে সাধন ভজন শেখাচ্ছেন।

নরেন্দ্র ॥ বুঝেছি, দিদিমা লাগিয়েছেন।

ভুবনেশ্বরী ॥ মিথ্যে তো নয়! কিন্তু এর পরিণামটা কী?

নরেন্দ্র ॥ পরিণামটা কি, সেইটাই পরীক্ষা করে দেখছি মা। একদিন কি হয়েছিল, জানো? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখি ঠাকুর একা আবিষ্টের মতো বসে আছেন। আমাকে দেখেই বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। হঠাৎ ডান পা দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল ঘর-বাড়ি দেওয়াল সব ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি চীৎকার করে উঠলাম, ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে বাপ মা আছেন। অদ্ভুত সেই পাগল, আমার চীৎকার শুনে খল্-খল্ করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাতখানা আমার বুকের 'পরে রেখে বললেন, তবে এখন থাক। সময় হোক, তখন হবে।'

ভুবনেশ্বরী ॥ তুই আর ওই ঠাকুরের কাছে যেতে পারবিনে, বিলে।

নরেন্দ্র ॥ সেদিন আমারও তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল ইনি হিপ্নোটিস্ট। সম্মোহন বিদ্যায় আমাকে অভিভূত করছিলেন। কিন্তু অনেক বিচার, অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি হিপ্নোটিস্ট তিনি নন। হিপ্নোটিস্টই যদি হতেন তাঁর কাছে কেশব সেন যেতেন না, বিজয় গোস্বামী যেতেন না। আমার মনে হয় মা, পরম তত্ত্ব তিনি জানেন। একে একে সেইসব তত্ত্বই তিনি উদ্ঘাটন করছেন আমার সামনে।

বিশ্বনাথ ॥ যাই হোক বিলে, আমি স্বাধীন চিন্তায় কোনো বাধা দেব না। জীবনের এক চরম পরীক্ষার মধ্যেও যখন বাপ মার কথা তুমি ভুলতে পারনি, এতেই আমরা খুশী, এতেই আমরা নিশ্চিন্ত, বিলে। হ্যাঁ, বাপ-মায়ের এই সংসারটাকেও দেখতে হবে তোমাকেই। তুমিই আমাদের বড় ছেলে। এটর্নী

নিমাই বোসের কাছে এটর্নীর ব্যবসাটা তোমাকে ভালো ক'রে শিখতে হবে। এই বি. এ. পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই।

নরেন্দ্র ॥ সে চেষ্টা আমি ছাড়িনি, বাবা।

ভুবনেশ্বরী ॥ চললি যে!

নরেন্দ্র ॥ যাই—পড়তে যাই।

ভুবনেশ্বরী ॥ যাবি এখন। আমার সেই কথাটার জবাব দিয়ে যা।

নরেন্দ্র ॥ দশ হাজার টাকা পণ নিয়ে আমার সেই বিয়ের কথা তো? আচ্ছা চল, তোমাকে আবার সব বুঝিয়ে বলছি।

[নরেন্দ্রের প্রস্থান ও একটি দুঃস্থ মাতালের প্রবেশ]

মাতাল ॥ এই যে দত্ত সাহেব, আসবো?

বিশ্বনাথ ॥ আরে এস এস মহিমবাবু ওমর খৈয়াম পড়ি আর তোমার কথা ভাবি।

মহিম ॥ খৈ আবার কেন বাবা? ও বুঝেছি, নাই কাজ ত খৈ ভাজ। তা বেশ, তা বেশ।

বিশ্বনাথ ॥ আরে খৈ নয়, ওমর খৈয়াম—একজন ফার্সী কবি। মদ মাতাল নিয়ে ভারী সুন্দর কবিতা লিখেছেন। স্থির হয়ে বসে শোনো একটা—

"তুমিই প্রভু পথটিতে মোর গর্ত-বোঝাই রাখলে পাপ,
ক'রলে সেটি সুরায় পিছল—তুমিই প্রভু করবে মাপ;
আপন হাতেই খুলবে না কোন্ ভাগ্য-সুতোর পাকটা ঘোর,
পতনটা সেই পাপের ফলে—ব'লবে কি গো দেবতা মোর ॥

মহিম ॥ তা' দেবতা, দুদিন সপরিবারে হরিমটর করছি—

বিশ্বনাথ ॥ চুপ! এই নাও। [ড্রয়ার হইতে দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন]

মহিম ॥ বড় ছেলেটা অকালে মরে গেল; আমার চাকরি নেই, তাই তোমাকে জ্বালাতন করি। তা দেবতা এই দুঃস্থ মাতালকে তুমি পুষছো বলেই মদে ও আমার হরিমটর চলছে; আর পাঁচটা টাকা পেলে উপোসের পারণটা করতাম।

বিশ্বনাথ ॥ [আর পাঁচটি টাকা দিয়া] চুপ! চুপ! পালাও।

মহিম ॥ তোমার মতন এমন ধার্মিক আমি দেখিনি, ভাই। আমার ধর্ম রক্ষা করলে তুমি, আমার ধর্ম রক্ষা করলে।

[মহিমের প্রস্থান]

[নরেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ]

নরেন্দ্র ॥ বাবা, আবার তুমি ঐ মাতালটাকে সাহায্য ক'রলে।

বিশ্বনাথ ॥ ও, তুই বুঝি দেখলি ?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ দেখলাম। দুঃস্থ দরিদ্রের তুমি বহু সাহায্য করে থাকো ; সে সব দান অপাত্রে যায় না। তোমার এই দান-ধ্যান দেখে আমার গর্বই হয়। কিন্তু এমন একটা মাতালকে কেন যে তুমি সাহায্য কর—?

বিশ্বনাথ ॥ তোমারই মতো ওরও একটা জোয়ান ছেলে ছিল, কিন্তু অকালে মারা গেছে ছেলেটি। তোর উপর আমার কত আশা-ভরসা—কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটি মারা যাওয়ায় তার জীবনটাই হয়ে গেছে অন্ধকার। মানুষের জীবন যে কত দুঃখময়, তুই তা এখন কী বুঝবি ? যখন বুঝবি, তখন দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তি পেতে যারা নেশা ভাং করে, তাদেরও তুই দয়ার চোখে দেখতে পারবি।··যাক্ শোন—

নরেন্দ্র ॥ বলো।

বিশ্বনাথ ॥ এবার তোর জন্মদিনটা আমি খুব ঘটা করে করব, ভাবছি। সেদিন তোকে যে শালটা আমি দেব, সেই শালটা লাখনউ থেকে কিনে এনেছি। আমার বন্ধু ঐ মৌলভী সাহেবকে দাম দিয়েছিলাম, উনি নিয়ে এসেছেন। দেখ দেখি এটা পছন্দ হয় কিনা ?

[টেবিলের উপর শালটি একটি কাগজের বাক্সে ছিল, বাক্স হইতে শালটি বাহির করিয়া উহা নরেন্দ্রকে দেখাইলেন। ভুবনেশ্বরী আড়ালেই ছিলেন, তিনি এবার আগাইয়া আসিলেন।]

বিশ্বনাথ ॥ [ভুবনেশ্বরীকে] এই যে তুমিও এসেছ। দেখ' তো শালটা কেমন হ'ল ? বিলের জন্মদিনে ওকে দেব।

ভুবনেশ্বরী ॥ বাঃ চমৎকার ! কী রে ? তোর পছন্দ হয়েছে ?

নরেন্দ্র ॥ তা আর হবে না ? কিন্তু দামটা কত ?

বিশ্বনাথ ॥ হাজার টাকা।

নরেন্দ্র ॥ হা-জা-র টাকা।

বিশ্বনাথ ॥ হ্যাঁ, হাজার টাকা। অনেকদিন থেকেই আমার সখ ছিল এমনি একটা শাল তোকে দিই।

নরেন্দ্র ॥ কী অপব্যয় ! এ সব কি করছো তুমি ? এ ভাবে খরচ করলে, আমাদের জন্যে আর কি রেখে যাবে, বাবা ?

বিশ্বনাথ ॥ কি রেখে যাবো ? বলছি। ঐ আরশিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়া দেখি। যা, দাঁড়া।

[নরেন্দ্র আরশির সামনে গিয়া দাঁড়াইল ।]

বিশ্বনাথ ॥ কী দেখছিস ?

নরেন্দ্র ॥ আমাকে ।

বিশ্বনাথ ॥ হুঁ । যা দেখছিস ঐটিই রেখে যাব ।

[নরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন । মাথা নীচু করিলেন ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ উনি ঠিকই বলেছেন বাপ । সাতরাজার ধন মাণিক আমার ।

[ভুবনেশ্বরী নরেন্দ্রনাথকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইলেন ।]

॥ বিরাম ॥

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[তৃতীয় দৃশ্যোক্ত বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানা । সকালবেলা । নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু প্রিয় কথোপকথনে রত ।]

নরেন্দ্র ॥ বিনা মেঘে বজ্রপাত বলে একটা কথা আছে । বাবার এই হঠাৎ মৃত্যুও তাই ।

প্রিয় ॥ আমি ছিলাম কাশীতে । জ্যেঠিমার চিঠিতে সেখানে খবর পেলাম । কী হয়েছিল ?

নরেন্দ্র ॥ শরীরটা কিছুদিন খারাপ যাচ্ছিল । কেমন একটা অবসন্নতা বোধ ক'রতেন । কিন্তু তেমন বাড়াবাড়ি একটা কিছু বুঝিনি । বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বরাহনগরে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে গেছি গান-বাজনা করে খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত অনেক হয়ে গেল, বন্ধুদের সঙ্গে একভাবে শুয়ে আলাপ আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় দুটো বেজে গেল—এমন সময়ে আমাদের হেম গিয়ে সেখানে উপস্থিত । খবর দিলে রাত দশটায় বাবা হৃদরোগে মারা গেছেন । তখনই ছুটে চলে এলাম ক'লকাতায় । এসে দেখি, মা আর ভাইরা বাবার মৃতদেহ ঘিরে—

[চোখে জল আসিয়া গেল ; আর বলিতে পারিলেন না ।]

প্রিয় ॥ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতই বটে । কেন যে এমন অকালে তাঁকে ঈশ্বর সরিয়ে নিলেন ? মানে খুঁজে পাই না । তুমি যে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেছ, তাও বোধহয় জেনে যেতে পারেন নি ?

নরেন্দ্র ॥ না।

প্রিয় ॥ যাক্। সংসারের দায়-দায়িত্ব যখন তোমার ঘাড়ে পড়ল, তখন তুমি গ্রাজুয়েট হয়েছ—এটা অনেকটা ভরসার কথা। আর তোমার বাবা তো দেদার টাকা রোজগার করে গেছেন, রেখেও গেছেন আশা করি বেশ কিছু।

নরেন্দ্র ॥ না মোটেই না। বাবার ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়। রোজগার করতেন যথেষ্ট, কিন্তু দান ধ্যান ও ছিল তাঁর একমাত্র জীবনাদর্শ। ফল যা হবার তা-ই হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যাচ্ছে সঞ্চয় তো কিছু নেই, বরং রয়েছে প্রচুর দেনা। পারলৌকিক কাজ কোনোমতে করা গেছে বটে কিন্তু সংসার এখন অচল।

প্রিয় ॥ বলছো কী?

নরেন্দ্র ॥ যা' বলছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মৃতাশৌচের সময় থেকেই কর্মের চেষ্টায় ঘুরতে হয়েছে আমাকে অনাহারে, খালি পায়ে, চাকরির দরখাস্ত হাতে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই বি. এ. পাশ লোকটির কোনো চাকরি জোটেনি।

প্রিয় ॥ শুনে অবাক হচ্ছি।

নরেন্দ্র ॥ শুধু তাই নয়। আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে জ্ঞাতিরা—যাঁরা আমার বাবার সাহায্যেই অবস্থার উন্নতি করেছেন, তাঁরাই এখন উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে এই বসত বাটী থেকে উচ্ছেদ ক'রতে। শুরু হয়ে গেছে মামলা। খাবার খরচই যেখানে জোটে না, মামলার খরচ সেখানে কি করে জোটাই বল দেখি?

প্রিয় ॥ তাই তো! এর নাম সংসার।

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। ঠাকুর বলেন, সংসারে সংও আছে, সারও আছে। কিন্তু আমি এখন দেখছি সংসারে সং মাত্রই সার। এই কয়েকমাস আগেও বাবা এই চেয়ারে বসে, এই টেবিলে উপর রাখা হাজার টাকা দামের একটা শাল আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এটা তোর জন্মদিনের উপহার। আর আজ হাজারটি পয়সা নেই আমার চাল-ডাল কিনতে।

প্রিয় ॥ কেমন স্বপ্নের মতো সব মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে তো তোমাকে চলবে না। চল আজ ব্রাহ্মসমাজে চল।

নরেন্দ্র ॥ কেন! সেখানে গিয়ে আমাকে গান গাইতে হবে, "বহিছে কৃপা ঘন ব্রহ্ম নিঃশ্বাস পবনে?" দেখ প্রিয়, ক্ষুধার তাড়নায় যাঁদের আপন জনকে অভাব কষ্ট পেতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাঁদের সহ্য করতে হয় না, টানা পাখার হাওয়া খেতে খেতে তাঁদের কাছে কৃপাঘন ব্রহ্ম নিঃশ্বাসের ঐ কল্পনা বেশ মধুর লাগে, আমারও একদিন লাগতো। কিন্তু কঠোর সত্যের সামনে এখন ওটা ব্যঙ্গ মনে হচ্ছে, ব্যঙ্গ।

প্রিয় ॥ হুঁ।

নরেন্দ্র ॥ আমাকে আবার এখুনি বেরুতে হবে কাজের ধান্দায়।

প্রিয় ॥ হ্যাঁ আমিও উঠছি। বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তোমাকে সাহায্য করছে না?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, গান বাজনা করে তাদের আনন্দ দেবার জন্য অনেকে টানা-টানি করে। দু'একদিন বাগান বাড়ীতেও নিয়ে গেছে। কিন্তু আমার যে কি ক'রে চলছে, কিংবা চলছে কিনা—এ কথা তারাও কেউ নিজের থেকে জিজ্ঞেস করেনি, কাজেই আমিও তাদের বলিনি। তবে হ্যাঁ, দু' একজন বন্ধু বান্ধব ভারী বিচিত্র। আমার মতো হঠাৎ এমনি অসহায় অবস্থায় পড়ে পরিবার প্রতি-পালনের জন্যে বাধ্য হয়ে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। আমার অবস্থা বুঝে তারা কিন্তু এগিয়ে এসেছে আমার কাছে—দলে টানতে। ঐ যে আমার এক বন্ধু আসছে। এসো, এসো—।

প্রিয় ॥ আচ্ছা, আমি তবে উঠি।

নরেন্দ্র ॥ এস এস রমেন।

[প্রিয় যাইবার জন্য উঠিল, রমেন আসিয়া দাঁড়াইল। পরস্পর পরস্পরকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল।]

প্রিয় ॥ [রমেনকে] আপনাকে কোথায় দেখেছি?

রমেন ॥ যদি দিনে দেখে থাকেন, তবে এই পাড়াতেই দেখেছেন, কারণ আমি এই সামনের বাড়িতে থাকি। আর যদি রাতে দেখে থাকেন তবে সে পাড়ার নাম আর বলবেন না। আমার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ লজ্জা পাবে।

প্রিয় ॥ ও। আচ্ছা। [প্রস্থান]

রমেন ॥ কী—সে চাকরিটা হোলো?

নরেন ॥ না। 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'।

রমেন ॥ অথচ তুমি বলেছিলে, যিনি চাকরি দেবেন, তোমার বাবা তাঁকে অনেকবার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

নরেন ॥ হ্যাঁ, মা, তাই বলেছেন। কিন্তু দেখলাম তিনি স্বীকারই করলেন না সেটা।

রমেন ॥ বোধহয় এমন ভাবও দেখালেন যে, তোমার বাবাকে তাঁর চিনতেই কষ্ট হল, কেমন?

নরেন ॥ মিথ্যে বলনি রমেন। লোকচরিত্রে তোমার বেশ অভিজ্ঞতা আছে দেখছি।

রমেন ॥ আমিও যে ভাই এরই মধ্যে সাত ঘাটের অনেক জল খেয়েছি। ঠেকে শিখেছি, ঠকে শিখেছি। কিন্তু তাতে একটা লাভ হয়েছে বিলে—

নরেন ॥ কী ?

রমেন ॥ লোককে এখন ঠকাতে পারছি, আর তাতে দু' পয়সা বেশ হ'চ্ছে।

নরেন ॥ অধর্মের পথে ?

রমেন ॥ হ্যাঁ, ধর্মের পথ আর কী ক'রে বলি ? বাংলা ভাষায় চুরি জোচ্চুরি তবে হ্যাঁ, ভদ্রভাবে।

নরেন ॥ পারবো না।

রমেন ॥ হ্যাঁ, তুমি তো আবার ব্রাহ্মসমাজের লোক।

নরেন ॥ সেখানেও আর আমি যাচ্ছি না।

রমেন ॥ ও, তবে এখন দক্ষিণেশ্বরে সেই পূজারী বামুনটির কাছে যাতায়াত করছো ?

নরেন ॥ তাই বা আর কই পারছি ? বিধবা মা আর অনাথ ভাই-বোনদের উপোসী রেখে ঈশ্বর, পরমাত্মা আর পরকাল নিয়ে চর্চা করবার সময় নেই

রমেন ॥ তবে এখন তুমি করছ কী ?

নরেন ॥ এই ১৮৮৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বাবা গত হয়েছেন। মৃতাশৌচের সময় থেকে চাকরির চেষ্টা এখনও চলছে—অশৌচের সময় পায়ে জুতো দেবার নিয়ম ছিল না, আর আজ পায়ে জুতো নেই কারণ জুতোই নেই।

রমেন ॥ বসতবাটি নিয়ে জ্ঞাতিরা যে মামলা করেছে, সেটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে শুনেছিলাম।

নরেন ॥ তাদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে নিষ্পত্তি করবার লোক আমি নই। মামলা চলছে আর চলবেও। শুধু এইজন্যই আমি আইন কলেজে ভর্তি হয়েছি।

রমেন ॥ মামলা মানেই টাকা, সেই টাকাই বা তোমার আসবে কোত্থেকে ?

নরেন ॥ ভাবছি মুটেগিরি করব।

রমেন ॥ তাতে ভাই কাজ পাবে না। তোমার ঐ রাজপুত্রের মতো চেহারাই কাল হবে। তুমি মুখে এ কথা হলফ করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না !

নরেন ॥ রমেন····রমেন ·· তুমি ব'লতে পারো ভাই, এখন আমি কী করতে পারি ?

রমেন ॥ এক নিমেষে তুমি তোমার এই দুঃখ দৈন্য দূর করতে পারো।

নরেন ॥ কী করে ? চুরি-জোচ্চুরি আমি ক'রতে পারবো না।

রমেন ॥ দরকার নেই।

নরেন ॥ তবে কী ক'রে ? চাকরি ক'রে ? চাকরি আমি পাচ্ছি না। কে দিচ্ছে আমাকে চাকরি ?

রমেন ॥ না, চাকরিও করতে হবে না তোমাকে।

নরেন ॥ তবে কী আমার মুখ দেখে লোকে টাকা দেবে ?

রমেন ॥ হ্যাঁ, তাই দেবে, দিতে চাইছে।

নরেন ॥ তার মানে ?

রমেন ॥ সেই নলিনী।

নরেন ॥ নলিনী ? তোমার সেই নষ্ট মেয়ে মানুষটি ?

রমেন ॥ আমি তাকে নষ্ট করেছি বটে, কিন্তু তার মন পাইনি আজও।

নরেন ॥ তাই সে এখন নষ্ট করতে চাইছে আমাকে।

রমেন ॥ নষ্ট না উদ্ধার করতে চাইছে সে তোমাকে। তার অনেক টাকা। কিছু না, শুধু রাতটা কাটাবে তুমি তার ঘরে। তাতে শুধু তাকে পাবে না, তার অগাধ টাকা-পয়সাও পাবে।

নরেন্দ্র ॥ আশ্চর্য এই দুনিয়া !

রমেন। সেটা মিথ্যে নয়। আমার বাড়িতে তোমাকে একটি দিন মাত্র দেখে তোমার জন্যে সে এমন ক্ষেপে গেল—চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না। আজ তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে না পারলে, সে যদি বিষ খায় আমি অবাক হব না, বিলে।

নরেন্দ্র ॥ তবে তাকে বিষ খেতেই বোলো।

রমেন ॥ য়্যাঁ ?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। কারণ, আমি তো আর বিষ খেতে পারবো না, রমেন ?

রমেন ॥ ও !

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ।

রমেন ॥ তবে আর আমার কাছে তোমার ও দুঃখের কাঁদুনি গেয়ো না। কোনদিন।

[রাগতভাবে প্রস্থান। অন্দর হইতে ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ বিলে।

নরেন্দ্র ॥ মা, তুমি ? সব শুনেছ না কি ?

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ। ওই বাড়ির রমেন না ?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। শুনেছ ওর কথা ?

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ, আসতে আসতে শুনলাম, তোমার দুঃখের কাঁদুনি ও আর শুনতে চায় না।

নরেন্দ্র ॥ এইটুকু শুনেছ ?

ভুবনেশ্বরী ॥ ঐটুকুই কী কম, বাবা ? এত লাঞ্ছনাও কপালে ছিল ? কিন্তু তোর সব বন্ধু তো এমন নয়, বিলে ?

নরেন্দ্র ॥ সব, সব।

ভুবনেশ্বরী ॥ না, সব নয়। এই চিঠিটা দেখ।

নরেন্দ্র ॥ কে লিখেছে ?

ভুবনেশ্বরী ॥ তোরই কোনো বন্ধু। কিন্তু নাম জানায়নি। তুই এমন বিপদে পড়েছিস জানতে পেরে চিঠিতে ভরে পাঠিয়েছে দশ টাকার দুখানি নোট।

নরেন্দ্র ॥ কিন্তু তোমাকে কেন ?

ভুবনেশ্বরী ॥ চিঠিটা পড়ে দেখ !

নরেন্দ্র ॥ "বিলেকে পাঠাইলে সে অপমানিত বোধ করিতে পারে বলিয়া আপনাকে"—অপমানিত নই মা, অপমানিত নই, আমি সম্মানিত, এখনও আমার একজন বন্ধু আছে এ জেনে···

[ভাবাবেগে আর কথা বলিতে পারিলেন না।]

ভুবনেশ্বরী ॥ এইবার তবে এ টাকাটা দিয়ে তোর একজোড়া জুতো কিনে নে বাবা।

নরেন্দ্র ॥ না, মা ও কথা বোলো না। কে এই অজ্ঞাত বন্ধু আমি জানি না, হাতের লেখাও চেনা মনে হলো না কিন্তু সে পরম বন্ধু। নিজেকে প্রকাশ করেনি বলেই সে আরও মহৎ। তাঁর দান আমি পায়ে রাখতে পারলুম না মা, আমি মাথায় রাখছি। এ টাকা নিয়ে চাল ডাল যা দরকার তা কিনতে পাঠাও। আমার ঐ ভাই বোনগুলি দু'দিন দুমুঠো খেয়ে বাঁচুক।

[ভুবনেশ্বরী নোট দুইখানি হাতে লইলেন।]

ভুবনেশ্বরী ॥ না বাবা আমরা না খেয়ে থাকবো, সেও ভালো কিন্তু ছোট-খাটো দেনা আর রাখব না। বিশেষ ঐ মুদীর দেনা। তার দেনা শোধ করে যদি দু'এক টাকা বাঁচে, চাল-ডাল কেনা হবে কিনা, ভেবে দেখবো। না খাওয়া সহ্য হয়, কিন্তু অপমান সহ্য হয় না।

[ভুবনেশ্বরী অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

নরেন্দ্র ॥ এখনও কি ব'লতে হবে, ঈশ্বর তুমি যদি থাকো তবে তুমি কি বধির ? তুমি যদি দাও তবে লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পেয়ে মরে কেন ? শিবের সংসারে কোথা থেকে আসে এত অশিব ?

[বন্ধু ভবনাথের প্রবেশ।]

ভবনাথ ॥ এ সব কী বলছো, নরেন ?

নরেন্দ্র ॥ ও! দক্ষিণেশ্বরের সেই ঠাকুর শেষে তোমাকেই বুঝি পাঠিয়েছেন, ভবনাথ, দেখতে—আমার কতটা অধঃপতন হয়েছে? না?

ভবনাথ ॥ হ্যাঁ, তাই পাঠিয়েছেন। কিন্তু অধঃপতন কতটা হয়েছে তা দেখতে নয়—তুমি তাকে ভুলে গেছ কেন, তাই জানতে।

নরেন্দ্র ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। দক্ষিণেশ্বরে নাকি রব উঠছে আমি নাস্তিক হয়েছি?

ভবনাথ ॥ হ্যাঁ।

নরেন্দ্র ॥ দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মিশে আমি নাকি মদ্যপান করছি, বেশ্যালয়ে পর্যন্ত যাচ্ছি।

ভবনাথ ॥ হ্যাঁ, এ কথাও ঠাকুরের কানে গেছে বটে।

নরেন্দ্র ॥ বেশ হয়েছে। এই অভাব-অনটনের সংসারে নিজের দুরবস্থার কথা ভুলে থাকবার জন্যে যদি কেউ মদ্যপান করে, বেশ্যালয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ সুখী হয় তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই-তুমি জেনে রাখো ভবনাথ।

ভবনাথ ॥ আপত্তি নেই সে না হয় জানলাম, কিন্তু তুমি নিজে এসব পাপাচার করেছ কি বন্ধু?

নরেন্দ্র ॥ ঐ পাপাচার করে যদি সত্যি সত্যি সুখী হতে পারি আমি, এটা যেদিন নিশ্চিত মনে করব, সেদিন আমিও ঐ পাপাচার করব—কারও ভয়ে পিছিয়ে থাকব না, ভবনাথ।

ভবনাথ ॥ সন্দেহটা যখন এখনও আছে, আমি নিঃসন্দেহ যে, পাপাচার তুমি এখনও করোনি, নরেন।

নরেন্দ্র ॥ আমার উপর এ বিশ্বাস তোমার আছে, ভবনাথ?

ভবনাথ ॥ আছে।

নরেন্দ্র ॥ তোমার আছে, তোমার ঠাকুরের নেই। আর সেই বলে তিনি তোমাকে গুপ্তচর ক'রে পাঠিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে।

ভবনাথ ॥ এ কথা কখনও মনে কোরো না, নরেন। ঠাকুরের কাছে আভাসে ইঙ্গিতে যারা এ সব কথা বলতে গেছে, ঠাকুর তাদের কি বলেছেন, সেটা তুমি জানো না বলেই এ ভুল তুমি করছো, নরেন।

নরেন্দ্র ॥ কী বলেছেন তাদের, ঠাকুর?

ভবনাথ ॥ বলেছেন, "চুপ কর শালারা, মা বলেছেন, নরেন কখনও এ রূপ হ'তে পারে না, আর কখনও এ সব কথা বললে তোদের মুখ দেখব না আমি।"

নরেন্দ্র ॥ বলেছেন? ঠাকুর এই কথা বলেছেন?

ভবনাথ ॥ হ্যাঁ, ঠাকুর এই কথা বলেছেন। নরেন! নরেন! তিনি

তোমার অদর্শনে উন্মাদ হতে চলেছেন। তুমি আর দেরি কোরো না ভাই, চলে এস তাঁর কাছে। ও ' হাতে আছে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা, তোমার সমস্ত সংশয় তিনি দূর করতে পারবেন। আর দূর ক'রতে পারবেন একা তিনি—আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

নরেন্দ্র ॥ একদিন তা' মনে হতো বটে! কিন্তু আজ 'অন্নচিন্তা চমৎকারা।' তুমি যাও ভবনাথ, আমার মাথার ঠিক নেই। আমার কথার ঠিক নেই।

ঠাকুরকে গিয়ে বোলো, তাঁর নরেন, নরেনই আছে—এখনও আছে। কিন্তু আর ক'দিন তা' থাকবে আমি জানি না।

ভবনাথ ॥ হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে যেতে পারছি না নরেন—

নরেন্দ্র ॥ কী?

ভবনাথ ॥ সোনা না পুড়লে খাঁটি হয় না, ধূপ না পুড়লে গন্ধ দেয় না, দীপ না জ্বললে আলো হয় না।

[প্রস্থান]

[ভুবনেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ মুদীর দেনা শোধ হয়েছে, বিলে! আর চাল-ডালও যা পেলাম, তাতে এ বেলা পেট ভরে সবাই খেতে পারবে, বাবা।...তা যাক্ ওবেলার কথা ওবেলা ভাবা যাবে। তুই একবার ভেতরে আসবি?

নরেন্দ্র ॥ কেন মা?

ভুবনেশ্বরী ॥ তোকে আমার একটা কথা বলার ছিল, বিলে!

নরেন্দ্র ॥ এখানেই বল না, মা?

ভুবনেশ্বরী ॥ তোর বাবার শেষ ইচ্ছেটা কি তুই রাখবিনে, বিলে?

নরেন্দ্র ॥ কী মা?

ভুবনেশ্বরী ॥ তোর সেই বিয়েটা। দশহাজার টাকা পণ নিয়ে এখনও সাধাসাধি করছে।

নরেন্দ্র ॥ য়্যাঁ? এখনও করছে?

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ বাবা, এখনও করছে। এই তো ঘটক ঠাকুর অন্দরে এসে বসে আছে। তোকে বিলেত পাঠিয়ে কী সব পড়িয়ে আনবার খরচ দিতেও রাজী?

নরেন্দ্র ॥ বলো কী?

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ, বাবা। এখন তুই রাজী হ'লে তোর বাবার শেষ ইচ্ছাটাও পূর্ণ হয়, সংসারের অভাব-অনটনও ঘোচে।

নরেন্দ্র ॥ স্ত্রীর বশ হতে হ'বে আমাকে ? জেনে রাখো মা, তোমার সে ছেলে এ নরেন্দ্র নয়।

ভুবনেশ্বরী ॥ কেন বাবা, সংসার ধর্ম করতে কি দোষ আছে ? কে না করেছে ? বুদ্ধদেব করেননি ? চৈতন্যদেব করেন নি ? তোমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ করেন নি ?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তাঁরা বিয়ে করেছেন এ কথাও যেমন ঠিক, আবার সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করেছেন এ কথাও তেমনি ঠিক। আমি দু' নৌকোয় পা দিতে পারবো না, মা। আমি চলি, য়্যাটর্নীর কাছে যেতে হবে। দেরি হয়ে গেছে।

ভুবনেশ্বরী ॥ এই অবেলায় যাবি ? ভাত চড়িয়ে দিয়েছি। কতদিন পর আজ পেট ভরে চাট্টি খাবি ; এই আশা নিয়ে যে আমি বসে আছি, বাবা ?

নরেন্দ্র ॥ য়্যাঁ ? না মা, আমার নেমন্তন্ন আছে।

[একটি ফাইল লইয়া নরেন্দ্রের প্রস্থান]

ভুবনেশ্বরী ॥ নেমন্তন্ন আছে ? নেমন্তন্ন আছে ? এ কেমন নেমন্তন্ন, আর কোথায় আছে—সে জানেন ঈশ্বর আর জানি আমি।

[পর্দা]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠ। রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন।]

নরেন্দ্র ॥ একদিকে সংসারের এই চরম অভাব-অনটন আর একদিকে ঈশ্বর আছেন কি নেই, এই নিয়ে সংশয়। আমার ভয় হতে লাগল বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো।

রামকৃষ্ণ ॥ কিন্তু তুই একদিন বলেছিলি বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবি।

নরেন্দ্র ॥ বিপদে না পড়ে সে কথা বলেছিলাম।

রামকৃষ্ণ ॥ (হাসিয়া) বিপদে পড়ে বুঝি সব গুলিয়ে গেল।

নরেন্দ্র ॥ গুলিয়ে যেত। যদি না থেকে থেকে আপনার কথা মনে হত। একদিনের কথা বলছি। গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এসেছে। আগের মতোই কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমস্ত দিন উপোস গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছি কিন্তু শরীরটাকে যেন আর টানতে পারছিলাম না।

রামকৃষ্ণ ॥ টানতে যখন পারছিলি না, তখন কেন টানছিলি ? পথের ধারে রকও তো ছিল—বসে পড়লি না কেন ?

নরেন্দ্র ॥ কী আশ্চর্য ! আমি একটা রকেই বসে পড়েছিলাম। আমি যেন তখন ঠিক একটা জড় পদার্থ।

রামকৃষ্ণ ॥ কিন্তু তোর মনটাতো আর জড় নয় ? কি ভাবছিলি তখন ?

নরেন্দ্র ॥ মনের যত চিন্তা, মনের যত প্রশ্ন সব যেন ছবির মতো আমার চোখের সামনে আসছিল। কি এক দৈবশক্তি প্রভাবে একে একে যেন সব এক হয়ে যেতে লাগল।

রামকৃষ্ণ ॥ বলিস কী রে ? শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বর কেনই বা এত দুঃখ দেন, এসব প্রশ্নের তুই উত্তর পেলি ?

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ মনে হল আমি উত্তর পেলাম। শুধু তাই নয়, মনে পেলাম বল, বুকে পেলাম শান্তি।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে আর কী রে ? রাত তো তবে ভোর হয়ে গেল ?

নরেন্দ্র ॥ কী আশ্চর্য ! সত্যিই তখন তাকিয়ে দেখি রাত ভোর হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ তারপর ?

নরেন্দ্র ॥ একটা নতুন ভাব এলো মনে। সংসারের টান কেন যেন কমে গেল। কেবলই মনে হতে লাগলো, আর দশজনের মতো ঘর সংসার করার জন্য, ভোগ-সুখে থাকার জন্য আমার জন্ম হয়নি। মনে পড়ল, আমার পিতা-মহের কথা। তাঁরই মতো সংসার ত্যাগ করবার জন্য আমিও হলাম প্রস্তুত। এমন সময় খবর পেলাম, ঠাকুর আপনি আসছেন কোলকাতায়। ভাবলাম, ভালোই হল গুরু-দর্শনকরেই ত্যাগ করবো সংসার।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। কোলকাতায় তুই দেখাও করলি কিন্তু সে কথা তো তুই আমাকে মুখ ফুটে বলতে পারলি না ?

নরেন্দ্র ॥ বলতে দিলেন কই আপনি ? বলে বসলেন, 'তোকে আজ আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতেই হবে।' আমি এসেওছি। কিন্তু ঠাকুর, এইবার আমাকে আশীর্বাদ কোরে বিদায় দাও।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে ! ওরে !—

'কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমারে হারাই, হা-রাই !

....জানি আমি, তুই মা'র কাজের জন্য এসেছিস।

পরে কখনোই থাকতে পারবিনে তুই। কিন্তু আমি যদ্দিন আছি, তদ্দিন আমার জন্যে থাক্।

নরেন্দ্র ॥ আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক্।

রামকৃষ্ণ ॥ বাঁচালি। তুই আমাকে বাঁচালি।

নরেন্দ্র ॥ তবে মশাই, যাতে আমার মা ভাইবোনদের দুটি খাওয়ার একটু উপায় হয়, সে সম্বন্ধে আপনার মাকে অনুরোধ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন ? মা'কে মানিস নে সেইজন্যেই তোর এত কষ্ট !

[নরেন্দ্রনাথ নতমস্তকে কি ভাবিতে লাগিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ কী ভাবছিস ? মূর্তি পূজায় অবিশ্বাস)

নরেন্দ্র ॥ সে দিন আর নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ কিন্তু বিনা প্রমাণে বিশ্বাস, তাই বা কি করে হয় ? তাই না ? আচ্ছা আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাতে কালী ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে, তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।

নরেন্দ্র ॥ বিশ্বাস থাক আর নাই থাক, আপনি বলছেন, আমি যাচ্ছি।

[নরেন্দ্র ঠাকুর ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ [আকুলভাবে গাহিতে লাগিলেন]

আর ভুলালে ভুলবো না মা,
(দেখেছি তোমার রাঙা চরণ)
ভয়ে হেলবো দুলবো না মা ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উল্‌বো না মা,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন জ্বালবো না মা ॥
আশা বায়ুগ্রস্ত হ'য়ে মনের কথা খুলবো না মা,
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলবো না মা।
রামপ্রসাদ ব'লে দুঃখ পেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলবো না মা ॥

[কথামৃত ॥ ৩য় ভাগ ॥ ৫ম পরিচ্ছেদ ॥ পৃষ্ঠা ১১৮]

[গীত শেষে নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ কীরে ! কী হোল ?

নরেন্দ্র ॥ মাকে দেখে এলাম ! কী আশ্চর্য, ঠাকুর !

রামকৃষ্ণ ॥ কী আশ্চর্য ?

নরেন্দ্র ॥ সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী। সত্য সত্যই মা প্রাণময়ী। অনন্ত প্রেমময়ী, অনন্ত সৌন্দর্যময়ী। ভক্তিতে, প্রেমে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বিহ্বল হয়ে মাকে বার বার প্রণাম করে বললাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।' শান্তিতে আমার প্রাণ ভরে গেছে ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ [হাসিয়া সাংসারিক অভাব দূরে করবার জন্যে মার কাছে প্রার্থনা করলিনে।

[নরেন্দ্র উদভ্রান্তের মতো পুনরায় চলিয়া গেল।]

নরেন্দ্র ॥ [চমকিত হইয়া] য়্যাঁ ? তাই তো ? একেবারে ভুলে গেছি। তাইতো—এখন কি করি ?

রামকৃষ্ণ ॥ যা-যা ফের যা। গিয়ে ওই কথা জানিয়ে আয়।

রামকৃষ্ণ ॥ [হাত জোড় করিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।]

'মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
তায় পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে,
সুখ দুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ সাগর উথলে ॥

[কথামৃত ॥ ২য় ভাগ ॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ৬৩ পৃঃ]

[গীত শেষে নরেন্দ্রনাথের পুনঃপ্রবেশ]

রামকৃষ্ণ ॥ [হাসিতে হাসিতে] কীরে এবার বলেছিস তো ?

নরেন্দ্র ॥ কী বলবো ?

রামকৃষ্ণ ॥ বা রে, ভুলে গেলি ?

নরেন্দ্র ॥ কী ?

রামকৃষ্ণ ॥ তোর সংসারের অভাব-অনটন দূরে করতে মার কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা ছিল না ?

নরেন্দ্র ॥ য়্যাঁ ? তাই তো ? মাকে দেখা মাত্র ওসব কথা যে মনেই এল না, ঠাকুর ! চাইলাম শুধু জ্ঞান আর ভক্তি ! কী হবে ?

রামকৃষ্ণ ॥ দূরে ছোঁড়া। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঐ বরটা চেয়ে নিতে পারলি নে। পারিস্ ত আর একবার গিয়ে ঐ বরটা চেয়ে নে। শীগ্গীর যা। আমি বলছি, তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দেবেন। চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি জগৎ

প্রসব করেছেন, ইচ্ছে করলে তিনি কী না করতে পারেন? যা—যা—শীগ্‌গীর যা।

[নরেন্দ্রনাথ পুনরায় মন্দিরের দিকে চলিলেন। রামকৃষ্ণ পুনরায় গান গাহিতেন লাগিলেন।]

'আমায় দে মা
পাগল করে,
আর কাজ নাই
জ্ঞান বিচারে (ব্রহ্মময়ী)
(দে মা পাগল করে)।'

[কথামৃত ॥ ১ম ভাগ ॥ ১২শ খণ্ড ॥ ৭৪ পৃঃ]

[নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন]

রামকৃষ্ণ ॥ কীরে, বলেছিস?

[নরেন্দ্র ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

কীরে বল্ না—বর চেয়েছিস? না, এবারও ভুলে গেছিস?

নরেন্দ্র ॥ না, এবার ভুলিনি, এবার মনে ছিল। কিন্তু তবু ওই প্রার্থনা আমার মুখ দিয়ে বেরুল না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন রে?

নরেন্দ্র ॥ তোমার সেই গল্পটা মনে পড়ল।

রামকৃষ্ণ ॥ কোন গল্পটা?

নরেন্দ্র ॥ সেই যে একজন খেতে না পেয়ে পথের ধারে মারা যেতে বসেছিল, এমন সময় রথে করে এলেন রাজা—লোকটা মারা যাচ্ছে দেখে বললেন, কী চাই বল আমি দেব।

রামকৃষ্ণ ॥ (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকটা রাজার কাছে লাউ কুমড়ো চাইতেই পারলো না—

নরেন্দ্র ॥ আমারও সেই দশা আজ ঠাকুর। না খেয়ে মারা যাচ্ছি আমরা সত্যি কিন্তু তাই বলে মা জগদম্বার কাছে জ্ঞান-ভক্তি বিবেক-বৈরাগ্য না চেয়ে চাইবো তুচ্ছ ভাত-কাপড়? আমি পারিনি ঠাকুর, আমি পারিনি।

রামকৃষ্ণ ॥ পারিস নি তো। দেখছি তোর নিজের সংসার সুখ নেই! তা আমি কী করব?

নরেন্দ্র ॥ আমার নিজের সংসার-সুখের কামনা কোনদিনই ছিল না। আজও নেই। কিন্তু—

রামকৃষ্ণ ॥ মা-ভাই-বোনের কথা ভাবছিস্ ? আচ্ছা যা—তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।

[ভবনাথের প্রবেশ]

ভবনাথ ॥ কী হল ? মান-অভিমান মিটলো তো ?

রামকৃষ্ণ ॥ মিটবে না মানে ? যেখানে রাগ সেখানেই অনুরাগ। হরি ! হরি !

ভবনাথ ॥ হরি নামে আমার গা যেন খালি হয়।

রামকৃষ্ণ ॥ যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। আর চৈতন্যদেব হরি নাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভালো। দেখো, চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন, এ অবশ্য ভালো।

[সহাস্যে] চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে ? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন, তাহ'লে আমাদের দেবেন। তাঁরা যে কালে খেয়ে গেছেন, সেকালে ভালোই হয়েছে।

[সকলের হাস্য]

রামকৃষ্ণ ॥ বৈষ্ণবধর্মের সার তিনটি ; নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর,—নাম নামী অভেদ জেনে অনুরাগের সঙ্গে নাম ক'রবে। ভক্ত ও ভগবান অভেদ। কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ। শ্রদ্ধা পূজা আর বন্দনা ক'রবে সাধু ভক্তদের। আর জানবে এ জগৎ সংসার কৃষ্ণের। তাই সর্ব জীবে দয়া—

['সর্বজীবে দয়া' বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন।]

জীবে দয়া—জীবে দয়া ? দূর শালা। কীটাণুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি ? দয়া ক'রবার তুই কে ? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

[পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন।]

ভবনাথ ॥ কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পাচ্ছি ! বেদান্তের সঙ্গে ভক্তি মিশে গেল ! যত্র জীব তত্র শিব।

ভবনাথ ॥ যত্র জীব তত্র শিব ! শিব জ্ঞানে জীবের সেবা ! এ কথার অর্থ ?

নরেন্দ্র ॥ বনের বেদান্তকে ঠাকুর আজ ঘরে এনে দিলেন। ঈশ্বরই প্রকাশিত হ'য়ে আছেন আমাদের সামনে জীবরূপে, জগৎরূপে, এক রূপে নয়, বহুরূপে। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ ! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভবনাথ ॥ আশ্চর্য ! সত্যই আশ্চর্য ! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ !

[শ্রীরামকৃষ্ণকে উভয়ের প্রণাম।]

॥ পর্দা ॥

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[কাশীপুর বাগান বাড়ি। ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। মাস্টার (মহেন্দ্রনাথ) একধারে বসিয়া তাঁহার নোটবুকে কি লিখিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

নরেন্দ্র ॥ ডায়েরী লিখছেন? আজ কত তারিখ?

মাস্টার ॥ ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬।

নরেন্দ্র ॥ ঠাকুরের কথা আপনি সব লিখে রাখছেন?

মাস্টার ॥ হ্যাঁ লিখে রাখছি আমার নিজের জন্য।

নরেন্দ্র ॥ খুব ভালো ক'রছেন। ঠাকুরের কথা অমৃত সমান।

মাস্টার ॥ "তব কথামৃতম্ তপ্ত জীবনম্, কবিভিরীডিতং কল্মষাপহম্। শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

[ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তের প্রবেশ।]

নরেন্দ্র ॥ আসুন ডাঃ দত্ত। ডাঃ সরকার বলেছিলেন, আপনি আসবেন। আপনি ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন, এ আমাদের খুব ভাগ্য। [মহেন্দ্রকে] ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ।

রাজেন্দ্র ॥ ও সব থাক। ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের কাছে শুনি আপনাদের ঠাকুরের কথা। শুনি মহাপুরুষ তিনি। মহেন্দ্র বলছিল, ঠাকুরের গলার ঘা-টা ক্যান্সার বলে সন্দেহ হচ্ছে। বড় কঠিন ব্যাধি। তাই ডাঃ সরকারকে বললাম, আমারও ভাই একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডাঃ সরকার শুনে খুব খুশি। তাই এসেছি। কেসটা মোটামুটি আমি শুনেছি, তবু পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো আমি আবার জানতে চাই⋯মানে ব্যারামের ইতিহাসটা।

নরেন্দ্র ॥ গত গ্রীষ্মে ভক্তরা ওকে খুব বরফ খেতে দিত। তা থেকে গলার বেদনাটা বোধহয় শুরু হয়। Throat specialist বউবাজারের ডঃ রাখাল চন্দ্র দত্তকে ডাকা হয়। তিনি দেখে-শুনে ওষুধ দেন। কিন্তু বলে দেন, কথা বলা, কি গান গাওয়া আর ভাব সমাধিস্থ হওয়া—এ সবই ছাড়তে হবে।

রাজেন্দ্র ॥ ছাড়লেন?

নরেন্দ্র ॥ পারলেন কই?

[শশীর প্রবেশ]

শশী ॥ [নরেন্দ্রকে] তুমি এস তো, ঠাকুর আসতে চাইছেন।

নরেন্দ্র ॥ [মহেন্দ্রকে] আপনি ওকে সব গুছিয়ে বলুন না। [ডাঃ দত্তকে] ইনি আমাদের মাস্টার ; মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের হেড মাস্টার। ব্রাহ্ম কিন্তু ঠাকুরের খুব ভক্ত।

[শশীর সহিত নরেন্দ্রের প্রস্থান]

মাস্টার ॥ গলায় ঐ ব্যথা কিন্তু তাই নিয়েই উনি গেলেন পেনেটি মহোৎসবে, ঝড়-জল মাথায় নিয়ে। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে। ভাবাবেশে ঠাকুর ব্যারামের কথা ভুলে গেলেন। নৃত্য-গীত ভাবসমাধি সব-ই হ'ল।

ডাঃ রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, ডাঃ সরকারের কাছে আমি শুনেছি। বহু ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দানের অত্যধিক পরিশ্রম মহাভাবে অনিদ্রা এই ব্যাধির কারণ।

মহেন্দ্র ॥ ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিকিৎসার সুবিধার জন্য ঠাকুরকে আনা হ'ল কলকাতায় শ্যামপুকুর স্ট্রীটের এক বাড়িতে। আর কোন চিকিৎসায় ফল না পেয়ে হোমিওপ্যাথ ডাঃ সরকারকে দিয়ে ঠাকুরের চিকিৎসা শুরু হয়। তিনিও যেমন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করেছেন, ভক্তেরাও ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি করেনি।

রাজেন্দ্র ॥ ডাঃ সরকার যে সব ওষুধ দিয়েছিলেন, তাতে তো কিছু ফলও হ'য়েছিল—শুনেছিলাম।

মাস্টার ॥ তা অবিশ্যি হ'য়েছিল। কিন্তু পরে আর উপকার হোল না দেখে, ভক্তদের মনে হ'ল ক'লকাতার রুদ্ধ দূষিত বায়ুর জন্যই ব্যায়রাম সারছে না। তাই শহরের বাইরে কাশীপুরের এই বাগান বাড়ি ভাড়া করে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়েছে—গত এগারোই ডিসেম্বর।

রাজেন্দ্র ॥ তা' এখানে আনা ভালোই হয়েছে। এখানকার বিধি ব্যবস্থাও দেখছি চমৎকার।

মাস্টার ॥ নরেন্দ্রের সু-পরিচালনাতেই সব কিছু এমন সুন্দরভাবে হ'তে পারছে।

রাজেন্দ্র ॥ নরেন্দ্রের কথা ডাঃ সরকারের কাছেও খুব শুনেছি। যেমনি পাণ্ডিত্য, তেমনি বিচার বুদ্ধি, আবার তেমনি ভক্তি।

মাস্টার ॥ আর তেমনি ত্যাগ। সামনে ওকালতী পরীক্ষা ; উকিল হয়ে বেরুলে ওর সংসারটা হয়ত টিকে যেত। কিন্তু ঠাকুরের চিকিৎসার, সেবা শুশ্রূষার জন্যে সে সবে আর মতি নেই।

[ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রবেশ।]

ডাঃ সরকার ॥ [ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তকে] এই যে তুমি এসে গেছ।

[নরেন্দ্র শশী প্রভৃতি রামকৃষ্ণকে ইতিমধ্যে নীচে লইয়া আসিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ আমরাও এসে গেছি। [ডাঃ সরকারকে] আজ আপনি জোড়ে এসেছ দেখছি।

ডাঃ সরকার ॥ [হ্যাঁসিয়া] হ্যাঁ, আমার বন্ধু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত; তোমাকে দেখতে এসেছেন। তা'এখন তো একটু ভালোই আছ মনে হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, আজ কয়দিন একটু ভালোই আছি।

রাজেন্দ্র ॥ ক'লকাতায় না থেকে কাশীপুরের এ বাগান বাড়িটিতে এসে ভালো করেছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ বড় খরচা হচ্ছে।

ডাঃ সরকার ॥ [ভক্তদের দেখাইয়া] তা' এরা সব প্রস্তুত। বাগানের খরচ দিতে এদের কোন কষ্ট নেই। [রামকৃষ্ণের প্রতি] এখন দেখ, কাঞ্চনও চাই।

রাজেন্দ্র ॥ তা উনি তো গৃহী, সন্ন্যাসী তো আর নন।

ডাঃ সরকার ॥ কিন্তু সন্ন্যাসীরও বাড়া। হ'লে হবে কি, কাঞ্চনও চাই, আবার কামিনীও চাই।

রাজেন্দ্র ॥ [হাসিয়া] হ্যাঁ, তাও চাই। পথ্য রাঁধতে।

ডাঃ সরকার ॥ এঁর পরিবারই রেঁধে-বেড়ে দিচ্ছেন। [ঠাকুরের প্রতি] তা' হলেই দেখলে—?

রামকৃষ্ণ ॥ [ঈষৎ হাস্য করিয়া] বড় জঞ্জাল।

ডাঃ সরকার ॥ জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।

রামকৃষ্ণ ॥ স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে, সেখানটা ঝন্-ঝন্ করে, যেন শিঙিমাছের কাঁটা বিঁধলো।

ডাঃ সরকার ॥ তা' বিশ্বাস হয়;—তবে না হ'লে চলে কই?

রামকৃষ্ণ ॥ টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে,—ঈশ্বরের সেবা—সাধু ভক্তের সেবা করে, তাতে দোষ নেই।

"স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

রাজেন্দ্র ॥ সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করতে হবে।

ডাঃ সরকার ॥ বাঃ! বেশ বলেছ তো! [রামকৃষ্ণকে] এ-ব্যাধির ডাক্তারি করতে হবে তোমাকে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে। যাকে বলে, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। কী গো, পারবে তো?

নরেন্দ্র ॥ সেই যে মুচি বলত না, Nothing like leather.

রামকৃষ্ণ ॥ ওটা কি?

নরেন্দ্র ॥ যে মুচির কাজ করে সে বলে চামড়ার মতো উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর কিছু নেই। ওরা হোমিওপ্যাথ কিনা, তাই আপনার কাছে ভব-ব্যাধির হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চাইছেন।

[সকলের উচ্চ হাস্য। নরেন্দ্রের প্রস্থান।]

ডাঃ সরকার ॥ [রামকৃষ্ণকে] নরেনের মত বুদ্ধিমান ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। এত পাণ্ডিত্য, অথচ কী বিনয়! এ সমস্ত ছেলে যদি ধর্মের জন্য অগ্রসর হয় তো দেশের অনেক কল্যাণ হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তা হবে না কেন গো? ওর জন্যেই তো এবার এখানকার [নিজের দেহ দেখাইয়া।] আসা।

ডাঃ সরকার ॥ সে মশাই তুমিই জান। আমি যা দেখছি তাই বলছি। কাশীপুরের এই বাগান বাড়িটা এ ক'দিনের মধ্যেই আপনার জন্য শুধু hospital করেনি এটাকে সেই সঙ্গে একটা মঠ আর একটা ইউনিভার্সিটি করে তুলেছে। সেদিন রাতে এসে দেখি ভক্তরা কেউ সাধন-ভজন করছে, কেউ বসে শাস্ত্রপাঠ করছে, কেউ বা পড়ছে ইতিহাস আর কেউ বা পড়ছে দর্শন।

রাজেন ॥ নরেন্দ্রকে আমিও দেখেছিলাম। চেহারাটাতে একটা ব্যক্তিত্ব আছে।

রামকৃষ্ণ ॥ যেন খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে। জন্ম থেকেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী। নিত্যসিদ্ধের থাক। মাকে তো বলি, 'মা, নরেনের অদ্বৈত অনুভূতি তোর মায়াশক্তি দিয়ে আবরণ করে রাখ মা—আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে। কী গো? খাদ্য না দিলে তো গড়ন হয় না।

ডাঃ সরকার ॥ খালি নরেন কেন? এখানে দেখছি কেউ কম না। রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, তারক, লাটু—এ সব ছোকরা ভক্তদেরও দেখছি, আবার বলরাম, রামচন্দ্র, গিরিশ, ঈশান প্রভৃতি গৃহী ভক্তদেরও দেখেছি। এ যেন তোমার জন্যে ফুলে-ফলে ভরা একটি বাগান তৈরী হয়েছে।

রাজেন্দ্র ॥ [রামকৃষ্ণকে] আর কিছুদিন বেঁচে থেকে গোটা দেশকে এমনি একটা বাগান তৈরী করে দিয়ে যান।

রামকৃষ্ণ ॥ সেটা মার ইচ্ছা।

ডাঃ সরকার ॥ [রামকৃষ্ণকে] যাক্ এখন আমাদের ইচ্ছা আমরা দুই বন্ধুতে মিলে তোমাকে একটু পরীক্ষা করি। [রাজেন্দ্রকে] আমি তো—এদ্দিন দেখেছি, এবার তুমি দেখ।

[রাজেন্দ্র রামকৃষ্ণের নাড়ী পরীক্ষায় রত হইলেন।]

॥ অন্ধকার ॥

॥ সময় ক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

রামকৃষ্ণ ॥ [মাস্টারকে] আজ কত তারিখ হে ?

মাস্টার ॥ আজ একুশে পৌষ, কৃষ্ণা চতুর্দশী, সোমবার। ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃঃ।

[নরেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

নরেন্দ্র ॥ ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

রামকৃষ্ণ ॥ কোথায় রে ?

নরেন্দ্র ॥ দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায়। ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো।

রামকৃষ্ণ ॥ না। ম্যাগাজিনের লোকেরা অত রাতে তোকে ওখানে যেতে দেবে না। কেন, পঞ্চবটী বেশ জায়গা। অনেক সাধু, ধ্যান-জপ করেছে।

নরেন্দ্র ॥ কিন্তু মশাই, বড় শীত আর অন্ধকার।

রামকৃষ্ণ ॥ কীরে! আর আইন পড়বি না ?

নরেন্দ্র ॥ একটা ওষুধ পেলে বাঁচি, যাতে এখন পড়া-টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই। এখন কি ইচ্ছে হয়, জানেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ সে তো বলেছিস। তিন-চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাস্।

নরেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। কখনো কখনো এক একবার খেতে উঠবো।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই তো বড় হীন বুদ্ধি। বার বার ঐ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না ? কোথায় কালে বটগাছের মতো হয়ে শত শত লোককে শান্তি ছায়া দিবি, তা না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস! এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর! সমাধির চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে। এই তো গান গাস্, 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।' কত উঁচু অবস্থা, বল।

নরেন্দ্র ॥ আর উঁচু অবস্থা! আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগলো, আর বললে, 'কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন এক্জামিন এত নিকটে, পড়াশুনা নেই, হো হো করে বেড়াচ্ছ!

মাস্টার ॥ তোমার মা কিছু বললেন ?

নরেন্দ্র ॥ না ; তিনি খাওয়াতে ব্যস্ত ; হরিণের মাংস ছিল, খেলাম, কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মাস্টার ॥ তারপর ?

নরেন্দ্র ॥ দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে, পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল। পড়াটা কি যেন কি ভয়ের জিনিস ! বুক আটুপাটু করতে লাগল। অমন কান্না কখনো কাঁদিনি।

মাস্টার ॥ তারপর ?

নরেন্দ্র ॥ তারপর বইটই ফেলে দৌড়। রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো-টুতে-রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম গায়ে-মাথায় খড়, আমি দৌড়াচ্ছি কাশীপুরের রাস্তায়।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন রে ?

নরেন্দ্র ॥ বিবেক চূড়ামণি। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায় অনেক ভাগ্যে মেলে,— মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ ? ভাবলাম আমার তো তিনটিই হয়েছে। অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে—অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে, আর অনেক তপস্যার ফলে [রামকৃষ্ণকে দেখাইয়া] এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে। ছুটবো না ? দৌড়ব না ? পায়ে এসে পড়বো না ? [ভাবাবেগ দমন করিতে গেল।]

মাস্টার ॥ আহা !

রামকৃষ্ণ ॥ [মাস্টারকে] অথচ এই নরেন আগে সাকার মানতো না। এখন এর প্রাণ কেমন আটুপাটু হয়েছে দেখেছ ! সেই যে আছে একজন জিজ্ঞাসা করে-ছিল—ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায় ? গুরু বললে এসো আমার সঙ্গে—তোমায় দেখিয়ে দিই কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরল। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিল ?' সে বললে, 'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল।'

মাস্টার ॥ কি আশ্চর্য ! আজ নরেনেরও তাই।

রামকৃষ্ণ ॥ ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুপাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নেই। অরুণ উদয় হলে, পূর্বদিক লাল হলে বুঝা যায় সূর্য উঠবে।

[সময় ক্ষেপক অন্ধকার] বিসর্জনের বাদ্য বাজিতেছে। অন্ধকার অন্তে এবার যখন দৃশ্য আলোকিত হইল দেখা গেল গভীর রাত্রি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভারী অসুস্থ। নিদ্রা নাই। নরেন্দ্র, রাখাল, মণি, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তগণ ঠাকুরের সেবা করিতেছে।]

রামকৃষ্ণ ॥ [নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া ভক্তদিগের প্রতি]-এর ভিতর দুটি আছে। একটি তিনি। [ভক্তরা নীরব রহিল] একটি তিনি; আর একটি, ভক্ত হয়ে আছে। তাঁরই এই অসুখ করেছে, বুঝেছ? [ভক্তরা নীরব] দেহ ধারণ করলেই কষ্ট আছে। তবু দেহ ধারণ ভক্তের জন্য। [নরেন্দ্রের প্রতি] চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি! সে বললে, ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার কর! তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি তুমি, বিচার কর! শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, তিনগুণ;—কোন গুণে লিপ্ত নয়।

নরেন্দ্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামকৃষ্ণ ॥ গুণাতীত, মায়াতীত। অবিদ্যামায়া, বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনী কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এসব বিদ্যার ঐশ্বর্য। শঙ্করাচার্য বিদ্যামায়া রেখে ছিলেন। তুমি আর এরা যে আমার জন্যে ভাবছো—এই ভাবনা বিদ্যামায়া!

'বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপরের পইটে—তার পরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পোঁছানোর পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে;—জ্ঞানলাভের পরও বিদ্যার 'আমি' রাখে, লোক-শিক্ষার জন্য। আবার ভক্তি আস্বাদ করবার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য।'

রাখাল ॥ আপনি বলুন, যাতে আপনার দেহ থাকে।

রামকৃষ্ণ ॥ সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র ॥ আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ সে তো আমি বলেছিলুম। বলেছিলুম, 'মা, খেতে পাচ্ছি না, খেতে দে। তা মা তোমাদের দেখিয়ে বললেন, "অত মুখে তো খাচ্ছিস! তা তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করেছি—সবাই যদি বল যে—'এত কষ্ট—তবে দেহ যাক—তা হলে দেহ যায়।'"

[কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। নরেন্দ্র বাদে অন্যান্য ভক্তগণ নীরবে অশ্রুপাত করিতে করিতে একে একে কক্ষ ত্যাগ করিল। ঠাকুরকে নিদ্রাগত প্রায় বোধ হইতেছে।]

নরেন্দ্র ॥ এ কি নিদ্রা, না, মহাযোগ? 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে!'

[রামকৃষ্ণ জাগিলেন। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন নরেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ নাই। সস্নেহে নরেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—]

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ, সাধনকালে আমার অষ্টৈশ্বর্য লাভ হয়েছিল, তা কোন কাজে লাগেনি; তুই নে, কালে তোর অনেক কাজে লাগবে।

নরেন্দ্র ॥ মশায়, ওতে ভগবান লাভ করব্যর কোন সুবিধে হবে কি?

রামকৃষ্ণ ॥ না, তা' হবে না বটে, কিন্তু ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকবে না।

নরেন্দ্র ॥ তবে মশায়, ওতে আমার প্রয়োজন নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ তোরা মান-অভিমান ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে রাজপথে ভিক্ষে করতে পারবি কি?

নরেন্দ্র ॥ আমরা ছেলেরা সবাই পারি।

[রামকৃষ্ণ পরম আনন্দিত হইয়া একটা গৈরিক বসন দান করিলেন। নরেন্দ্র তাহা মাথায় ঠেকাইয়া রাখিলেন। রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।]

রামকৃষ্ণ ॥ নরেন! আমার এই সব ছেলেরা রইল তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ওদের রক্ষা করিস। সৎপথে চালাস। আমি শীগ্‌গীরই দেহ ত্যাগ করবো।

নরেন্দ্র ॥ [সকাতরে] হ্যাঁ?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ বাবা, আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।

[নরেন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্র বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত শিষ্যগণ পুনরায় কক্ষে আসিল এবং নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। নরেন্দ্রও নীরবে রামকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ চক্ষু মেলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—]

রামকৃষ্ণ ॥ কি নরেন? এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার একাধারে এই রামকৃষ্ণ! কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।

[সহসা যদি কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় অতখানি চমকাইয়া উঠিতেন না।]

নরেন্দ্র ॥ [করজোড়ে]

"প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তঃ যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদি—দেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাম,
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণ—পাত্র মিদং ভোঃ॥

[ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।]

[য ব নি কা]

স্মরণীয় উদ্ধৃতি

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর,—নাম নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া—" (প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব্ব জীবে দয়া' পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর্ শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না,—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণ করিতে পারিবে।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ
(পঞ্চম খণ্ড)
ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

পূর্ণাঙ্গ নাটক

অমর প্রেম

নাট্যকার মন্মথ রায়

নাট্যদিক্‌পাল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনভিত্তিক

থিয়েটারের থিয়েটার

॥ পরিচিতি ॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬—১৯১৬)

নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধ্যক্ষ। ১লা এপ্রিল, ১৮৭৬ জন্ম। পিতা দ্বারকা-নাথ রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দি ছিলেন। মধ্যম অগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দার্শনিক রূপে প্রসিদ্ধ। অমরেন্দ্রনাথ ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের ভূমিকায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন সময়ে গ্র্যান্ড, নিউক্লাসিক' স্টার, মিনার্ভা ও গ্রেট ন্যাশনাল (১৯১১) প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে স্বত্বাধিকারী পরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবে জড়িত ছিলেন। 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়' ও 'ন্যাট্যমন্দির' নামে তিনখানি সাময়িক পত্রের স্রষ্টা। এঁর রচিত 'কাজের খতম', 'দোললীলা', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'মজা', দুটি প্রাণ', 'প্রণয় না বিষ' (নাট্যরূপ) প্রমুখ পঞ্চবিংশ গীতিনাট্য এবং নাটক সেকালের রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। হরিরাজ (হরিরাজ), হুসেন (আলিবাবা) গোবিন্দ-লাল (ভ্রমর), ভীম (পাণ্ডব গৌরব), কুলীরক (সওদাগর) প্রভৃতি অমরেন্দ্র-নাথের অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা। ১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ স্টারে ঔরংজীব (শাজাহান) রূপে শেষ অভিনয়। সমকালীন রঙ্গমঞ্চের সংস্কার সাধনে এঁর আন্তরিক প্রয়াস সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। মৃত্যু: ৬ই জানুয়ারী, ১৯১৬।

"অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট যাহার নামে দর্শক আকৃষ্ট হইত।"
('বাঙলা'-পত্রিকা)

উদ্ধৃতি: একশ বছরের বাংলা থিয়েটার—শিশির বসু:

"HE WAS THE NAPOLEON OF THE INDIAN STAGE"
—Natyacharya SISIRKUMAR.

প্রবেশানুক্রমিক

চরিত্রলিপি

পুরুষ-চরিত্র :—

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

রঘুনাথ পোদ্দার—অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু।

মহেন্দ্র মল্লিক— (ঐ)

রাখহরি মাস্টার—অমরেন্দ্রনাথের শিক্ষক।

অঘোরনাথ পাঠক—রেলির কর্মচারি ও অভিনেতা।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অমরেন্দ্রনাথের সহচর।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
রেলির মুৎসদ্দি বড়বাবু।

কেদারনাথ মিত্র—অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী,
রেলির কর্মচারি।

কৃষ্ণদাস—বাউল।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের
পুত্র ও অভিনেতা।

চুনীলাল দেব—অমরেন্দ্রনাথের বন্ধু অভিনেতা।

নিখিলকৃষ্ণ দেব— (ঐ)

ভূতনাথ দাস—থিয়েটারের হারমোনিয়ম বাদক।

প্রবোধ ঘোষ (দশরথ)— (ঐ) অভিনেতা।

১ম ভদ্রলোক—পাওনাদার।

২য় ভদ্রলোক— (ঐ)

আশুতোষ বড়াল—থিয়েটারের কর্মসচিব।

আত্মীয়—অমরেন্দ্রনাথের সম্পর্কিত মেসোমশায়।
গোপাল— (ঐ) ভাগিনেয়।
পুলিস অফিসার
রাজা—ভিক্ষুক।
গায়ক—ভিক্ষুক (দক্ষিণেশ্বর)।
মতিলাল বোস—অমরেন্দ্রনাথের হিতকামী বন্ধু,
বোস সার্কাসের অধিকারী।
ডাক্তার—কেদারনাথের গৃহচিকিৎসক বন্ধু।
সজ্জাকর : থিয়েটারের বেশকারী।
ডাক্তার : থিয়েটারের ডাক্তার।
কীর্তনীয়া দল—
২।৪ জন অভিনেতা—

স্ত্রী-চরিত্র :—

রক্ষাকালী দেবী—অমরেন্দ্রনাথের মাতা
হেমনলিনী দেবী— (ঐ) পত্নী।
তারাসুন্দরী—অভিনেত্রী।
কুসুমকুমারী—অভিনেত্রী।
ঝর্ণা—থিয়েটারের পরিচারিকা।
নর্তকীগণ।

অমর প্রেম

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। কাল: প্রভাত। হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের কাছাকাছি একটা পথে 'চন্দ্রশেখর' নাটকের অভিনয়ের পোস্টার। তাহার সামনে দণ্ডায়মান অমরেন্দ্র নাথ (১৮) এবং তাহার দুইজন তরুণ বন্ধু—রঘুনাথ ও মহেন্দ্র (পূর্ববঙ্গবাসী)।

অমর ॥ ছ্যা-ছ্যা, ঐ নাকি অভিনয়!

রঘুনাথ ॥ বলিস কি কালু? একে স্টার থিয়েটার, কলকাতা শহরের সেরা থিয়েটার।

মহেন্দ্র ॥ তার উপর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমন মনমাতানো কেচ্ছা—'চন্দ্রশেখর'। উঃ, প্রতাপশৈবলিনীর কি লভ! লুকিয়ে পড়ি, গা শিরশির করে।

রঘু ॥ আর তুই বলছিস, ছ্যা ছ্যা! দেখে বলছিস, না, না দেখে বলছিস?

অমর ॥ দেখেই বলছি ভাই—দেখেই বলছি। কাল সতীশকে নিয়ে বই-এর ওপেনিং নাইটেই বক্সের টিকিট কেটে আগাগোড়া দেখে এসে তবেই না বলছি। অতগুলো টাকা একেবারে জলে গেছে! প্রতাপ যিনি সেজেছিলেন, তিনি একটি রাঙা মুলো। আর শৈবলিনী! ছ্যা-ছ্যা।

রঘু ॥ পোস্টারে তো দেখছি, সেজেছে—তারাসুন্দরী।

অমর ॥ হ্যাঁ, তারাসুন্দরী। তা সুন্দরীই বটে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—'নাহি জানি ভাইরে লক্ষণ, এই কি রে রাজ্যসুখ।" নাঃ থিয়েটারে আমার অভক্তি এসে গেল কালকের ঐ প্রতাপ আর শৈবলিনী দেখে। (একটি সিগারেট ধরাইয়া ম্যাচ বাক্সটি এক বন্ধুকে ছুঁড়িয়া দিলেন। সে লুফিয়া লইল) পুড়িয়ে দে ঐ স্টার থিয়েটারের পোস্টার।

রঘু ॥ বলিস কিরে কালু! ঐ স্টার থিয়েটারের ভিতরে ঢুকে প্লে দেখবি, এ না ছিল তোর কতদিনের ধ্যান জ্ঞান?

অমর ॥ ছিল বৈকি। বাইরে থেকে ঐ থিয়েটারের বাড়িটা আমি দেখতাম, আর মনে হত ওটা যেন আমার আগের জন্মের বাড়ি। ফাঁক পেলেই পালিয়ে আসতাম থিয়েটারটার সামনে। অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা গাড়ি করে যেত আসত। আমি দেখতাম আর ভাবতাম—কি সুখী ওরা, কত আনন্দেই না থাকে। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে আমি হব থিয়েটারের অ্যাক্টর। কিন্তু কাল যা ওদের অ্যাক্‌টিং দেখলাম! দেখে কেবলই মনে হল, ও থিয়েটার আর নয়, থিয়েটার করব—আমি। সেজন্য যত টাকা লাগে, ঢালব। পোড়া—পোড়া, পোস্টারটা পুড়িয়ে দে।

মহেন্দ্র ॥ (দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া পোস্টারের কাছে যাইয়া) বল হরি—হরিবোল।

[তিনজনে পোস্টারটিকে ঘিরিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'বল হরি—হরিবোল]'

রাখহরি ॥ একি হে! আমি রাখহরি মাস্টার থাকতে আমার সামনে বল হরি—হরিবোল বলে বিদায় দিচ্ছ কাকে?

তিনবন্ধু ॥ (একত্রে) এ কি স্যার, আপনি!

রাখ ॥ হ্যাঁ, আমি। বাজার করতে যাচ্ছি, দেরি হয়ে গেছে। হনহন করে যাচ্ছিলাম, বল হরি—হরিবোল শুনে দাঁড়ালাম। তুমি কালু এখানে? দূরে এই রাখহরি মাস্টারকে দেখেই বুঝি, বল হরি—হরিবোল বলে আমাকে ওয়েল-কাম করলে তোমরা? এত ভালবাসতাম তোমাকে কালু, তার প্রতিদান এই?

অমর ॥ না—না স্যার, মাইরি বলছি, একেবারেই তা নয়। আমরা স্টার থিয়েটারের ঐ পোস্টারটা পোড়াতে গিয়ে বল হরি—হরিবোল বলেছি।

রাখ ॥ ও, তাই বল। ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ল বাবা। হ্যাঁ, তাই তো ভাবছিলাম, পড়াশুনা করতে না বলে রোজই দু'এক ঘা বেত মারতাম। সে তোমার ভালর জন্যই মারতাম। কলকাতার কত বড় বনেদী ঘরের ছেলে তুমি। তুমি লেখাপড়া না শিখলে চলে? তাই তোমার ভালর জন্যই আমার যা কিছু মারধোর। তা ভাল তো হলেই না, স্কুলই দিলে তুমি ছেড়ে। হ্যাঁ, এঁচোড়েই পেকে গেছ, যেমন চেহারায়—তেমনি চিন্তায়। তোমার লেখা আমি পড়তাম আর অবাক্ হতাম।

রঘু ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। অমর এই বয়সেই 'ঊষা' নামে একটা তিন অঙ্কের গীতিনাট্য লিখে ফেলেছে।

রাখ ॥ কে হে তুমি? মা-র কাছে মামার বাড়ির গল্প করতে এস না। ওর সে বই আমাকে পড়তে দিয়েছে। অপূর্ব লেখা। শুধু দুটো লাইন ছিল অশ্লীল। ঊষার রূপের বর্ণনায় লিখেছিল—

"সুকোমল বক্ষ'পরি জগৎ সৌন্দর্য হরি,
বিরাজিছে কুচগিরি গরবের ভরে।"

লাইন দুটো আমি লাল কালি দিয়ে কেটে দিয়েছিলাম।

রঘু ও মহেন্দ্র ॥ সত্যি স্যার, অশ্লীল স্যার—অশ্লীল।

রাখ ॥ হ্যাঁ অশ্লীল। এখনকার থিয়েটারে নাকি ঐসব চলছে।

অমর ॥ হ্যাঁ স্যার, চলছে। আর তাই আমরা ঐ থিয়েটারের পোস্টার পোড়াচ্ছিলাম।

রাখ ॥ খুব ভাল কাজ করছিলে। হ্যাঁ পোড়াও। আমার বাজারের দেরি হয়ে যাচ্ছে, তা যাক্। দাও দিয়াশলাই, আমিই ঐ পোস্টারের মুখাগ্নি করছি। দিয়াশলাইটা দাও।

অমর ॥ না-না স্যার, ও যা করবার আমরাই করছি। বাজারে আজ গঙ্গার ইলিশমাছ ভীষণ সস্তা। টাকা টাকা ডজন। এই একটু আগে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এখন গিয়ে পাবেন কি না—

রাখ ॥ বল কি হে! তবে তো ছুটতে হয়। কিন্তু অমর থিয়েটারের পোস্টার পুড়িয়ে কি হবে! থিয়েটারগুলো পুড়িয়ে দিতে পারবে? দেশের সর্বনাশ করছে। আমার স্ত্রী—তোমাদের গুরুমা, থিয়েটার দেখার জন্য পাগলা হয়ে থাকে, রুখতে পারি না।

অমর ॥ পোড়াব স্যার—থিয়েটারই পোড়াব।

রাখ ॥ আহা, কি রত্ন ছেলে তুমি। দুঃখ এই, লেখাপড়া শিখলে না। আর হাঁ, কে যেন সেদিন বলছিল, তুমি না রেলি ব্রাদার্সের ফার্মে তোমার দাদার মুৎসুদ্দির আপিসের হেড ক্যাশিয়ারের পোস্ট পেয়ে গেছ—একশ' টাকা মাস মাইনে? এই বয়সেই অতবড় চাকরি পেয়েছ শুনে তো আমার বুক দশ হাত। এক সময় গুরুগিরি করেছি তো।

অমর ॥ নিশ্চয় স্যার—নিশ্চয়। যা কিছু হয়েছে, আপনার আশীর্বাদেই হয়েছে। কিন্তু ইলিশমাছগুলো—

রঘু ॥ সে কি আর এখনও আছে?

মহেন্দ্র ॥ না না, এখন গেলেও—

রাখ ॥ যাচ্ছি—যাচ্ছি, অত সস্তা ইলিশ ঘরে না নিয়ে গেলে তোমাদের গুরুমা আঁশবটিতে আমাকেই কাটবে। আমি চলি। সুখে থাক—সুখে থাক বাবারা সব। কিন্তু অমর, তোমার বিয়েতে কিন্তু আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না।

রঘু ॥ সে কি স্যার! আপনি আছেন কোথায়? পনেরো বছর বয়সে

কালুর বিয়ে শেষ। বটতলার বিখ্যাত ধনী জয় মিত্রের নাতনী, ক্ষীরোদ মিত্রের পরমাসুন্দরী মেয়ে হেমনলিনীর সঙ্গে কি ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল—

রাখ ॥ য়্যাঁ!

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ স্যার, শুধু কি বিয়ে। কালু সতেরো বছর বয়সেই ছেলের বাপ হয়ে গেছে।

রাখ ॥ বল' কি হে? (অমরের দিকে তাকাইয়া সখেদে) তবে তোমার ছেলের বিয়েতেই নেমন্তন্নটা কর। যে সব খারাপ খবর পেলাম, ইলিশ মাছ আর পাব বলে মনে হচ্ছে না, তবু দেখি। চলি—

[হনহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেলেন রাখহরি। রঘুনাথ আর ক্ষণকাল হাসিয়া চাপিয়া রাখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

অমর ॥ (বিষণ্ণকণ্ঠে) নাঃ, সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন উনি। ও'কে নেমন্তন্ন না করা সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

[রেলির কর্মচারী, সিটি থিয়েটারের অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠক-এর প্রবেশ। তাঁর হাতে বাজারের থলি।]

অঘোর ॥ একি কালু! তোমরা এখানে কি করছ? কাল তো অফিসে যাওনি—

অমর ॥ হ্যাঁ অঘোরদা, কাল শরীরটা বড় খারাপ বোধ করছিলাম।

অঘোর ॥ কিন্তু ঐ খারাপ শরীরে তুমি কাল রাত্রে স্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' দেখেছ।

অমর ॥ কে বলেছে অঘোরদা?

অঘোর ॥ তুমি সকলের জানা ঘরের ছেলে। অনেকের চোখ তোমার উপর। আর এ নিয়ে খুব কানাকানি শুনে এলাম আমাদের আড্ডায়। তুমি আর তোমার প্রাণের বন্ধু সতীশ বক্সে বসে থিয়েটার দেখেছ।

অমর ॥ আজ অফিসে গিয়ে দাদার কানে এ কথা তুলবেন বুঝি?

মহেন্দ্র ও রঘু ॥ (একত্রে) এই রে!

অমর ॥ (বন্ধুদের প্রতি চটিয়া) তোরা এখান থেকে যা দেখি।—গেলি? ওঁর সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে।

[অমরের ইঙ্গিতে রঘুনাথ ও মহেন্দ্রের প্রস্থান]

অমর ॥ অত্যন্ত বাজে থিয়েটার দেখেছি কাল অঘোরদা স্টার থিয়েটার যে এত বাজে থিয়েটার তা ভাবতে পারিনি। এর চেয়ে অনেক ভাল অ্যাক্টিং

আমি করতে পারি। আপনি তো করেনই। আপনার পায়ে পড়ি অঘোরদা। আপনি আপনাদের সিটি থিয়েটারে ঢুকতে আমাকে একটা চান্স দিন না।

অঘোর ॥ ওরে বাবা, বলিস কিরে কালু! তুই বড়বাবুর ভাই—আর তোকে আমি থিয়েটারে ঢোকাব? শেষে বড়বাবু ভাবুক, এই অঘোর পাঠকই আমার ভাইটির কচি মাথাটি খেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরির দফাও গয়া হোক। না বাবা, ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি স্পষ্ট বুঝেছি, সুখে থাকতে তোকে ভূতে কিলোচ্ছে। ও সব মতলব ছেড়ে দে। চলি—

অমর ॥ দাঁড়ান। তবে আপনি থিয়েটার করছেন কেন? তাতে কোন দোষ হচ্ছে না?

অঘোর ॥ আমি আমার কাজকর্ম সংসার-ধর্ম বজায় রেখে অভিনয় করে আনন্দ করি। কিন্তু মোসাহেবদের পাল্লায় পড়ে টাকা ওড়াইনি, নৈতিক চরিত্র জলাঞ্জলি দিইনি, নেশা ভাঙে মেতে উঠিনি। যা এই বয়সেই তুমি শুরু করেছ কালু। বলি বলি করে কথাটা এদ্দিন বলিনি। কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে আর না বলে পারলাম না। তোমার দাদা আমার মনিব হলেও—আমার বন্ধু। কত বড় ঘরের ছেলে তুমি! ঐ সতীশ-টতীশের কুসঙ্গ তুমি ছাড়।

[সতীশের প্রবেশ]

অঘোর ॥ এই যে সতীশ, তোমারই নাম করছিলাম হে। অনেকদিন বাঁচবে। (অমরকে) আচ্ছা, আমি চলি—

[অঘোরনাথের প্রস্থান]

সতীশ ॥ দু'মুখো সাপ! কি বলছিল হে আমার নামে?

অমর ॥ আরে ওর কথা ধরিস নে। এখন বল দেখি, কিছু এগুল? দেখা পেলি? আমার আর তর সইছে না। আরে কথা কইছিস না যে? কি হয়েছে বল না?

সতীশ ॥ দেখা হয়েছে—

অমর ॥ দেখা হয়েছে?

সতীশ ॥ হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। কিন্তু বড় কঠিন ঠাঁই।

অমর ॥ কঠিন কি কোমল সে পরে বুঝব। আগে বল, দেখা হল কার সঙ্গে? আর কথাই বা বললি কার সঙ্গে?

সতীশ ॥ প্রথমে মায়ের পুজো দিয়ে তবে না মেয়ের দেখা পেলাম।

অমর ॥ রাজী?

সতীশ ॥ আকাশের তারা বুক পকেটে পুরতে চাইছ। ব্যাপারটা তো অত সোজা নয়। দামও হেঁকেছে আকাশছোঁয়া।

অমর ॥ আঃ, বল না শুনি, কি দাম হেঁকেছে।

ম-৪৯

সতীশ ॥ তা শুনলে চোখ কপালে উঠবে ! দেড় শো টাকা মাসোহারা, ছ'মাসের আগাম। সেই সঙ্গে সেলামী হচ্ছে—বত্রিশ ভরির একটি বিছে-হার। এই শর্ত মেটাতে যদি রাজী থাক, তবে চল। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি তোমাকে পছন্দ হয় তবেই স্টার থিয়েটারের স্টার—তোমার ঐ শৈবলিনী সই, তোমার বুকে বাসা বাঁধবেন কথা দিয়েছে।

অমর ॥ এ টাকা আমি দেব। হাজার দেড়েক টাকা তো—আমি দেব। বিয়েতে আশীর্বাদ আর যৌতুকে যে টাকা পেয়েছিলাম, সব আমার কাছেই মজুত আছে। ঐ তারাসুন্দরী কাল থেকে আমার প্রতি মুহূর্তের ধ্যান আর জ্ঞান। শৈবলিনী সেজে কি আশ্চর্য অভিনয় করলে! ছোটবেলা থেকেই একটা থিয়েটার আমার স্বপ্ন। আমার স্বপ্নের থিয়েটারের মানস-প্রতিমা ঐ তারাসুন্দরী। তুমি এখনি গিয়ে বল, টাকা নিয়ে আমি আসছি।

[অমর উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া চলিয়া গেলেন]

সতীশ ॥ একেই বলে—কাপ্তেন, কাপ্তেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। শুধু দেখতে হবে, আমে দুধে মিশে গেলে আঁঠিটি মানে, অধম এই সতীশ চ্যাটার্জী গড়াগড়ি না যায়।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[হাতিবাগানে দত্তভবন। অমরেন্দ্রনাথের কক্ষসম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় কক্ষগাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁধান পট। বেলা ১২ ঘটিকা। অমরেন্দ্রনাথের তরুণী স্ত্রী হেমনলিনী জানালার সামনে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। ব্যস্তসমস্তভাবে অমরেন্দ্রনাথের মাতা রক্ষাকালী দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

রক্ষাকালী ॥ বৌমা!

[হেম আকস্মিক এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে চমকিত হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল—মাথায় কাপড় টানিয়া দিবার চেষ্টায় প্রায় পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম]

হেমনলিনী ॥ আমি চমকে উঠেছিলাম। ভাগ্যিস পড়ে যাইনি মা। আর কেউ ডাকলে আমি চমকে উঠি না। শুধু আপনার আর বটঠাকুরের ডাক শুনলে আমি কেমন ভয় পাই মা।

রক্ষা ॥ এক ছেলের মা হয়েছ, এখনও তোমার ছেলেমানুষী গেল না। কালু কোথায়?

হেম ॥ জানি না তো মা! কোন কাজে-টাজে বের হয়েছেন নিশ্চয়।

তাই এত বেলা পর্যন্ত··· জানেন তো মা, কোন একটা কাজ ধরলে সেটা যতক্ষণ শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত—

রক্ষা ॥ আমি দেখেছি বৌমা, তুমি ওর কোন কাজেই দোষ দেখ না। বেলা বারোটা বাজে, এখনও বাড়ি ফিরল না। কখন নাইবে, কখন খাবে, কখন বা আপিসে যাবে? বেরোবার সময় তোমাকে কিছু বলে যায়নি?

হেম ॥ কিছু বলে গেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু নসুর কান্নাকাটিতে আমি কিছু শুনতে পাইনি মা। দুধ খাওয়াতে গেলেই নসুর যা চিৎকার, জানেন তো মা।

রক্ষা ॥ আচ্ছা, আজ কিছুদিন নাকি কালু অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরছে? কই আমাকে তো তা তুমি কিছু বলনি মা?

হেম ॥ আপনার ছেলে যখন আসেন, তার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তাই কখন আসেন আমি জানতে পারি না মা।

রক্ষা ॥ আজ দুদিন আপিসে বেরুচ্ছে না। ধীরু ভারী রেগে গেছে। তা আমি ওকে ধরতেই পারছি না যে, একটু বকে দেব।

হেম ॥ কি বকবেন বলুন? আপনার ছেলে এলে, ঠিক আপনি যেমন করে যা বকলেন, আমি ঠিক তেমনি করেই তাঁকে বলে দেব।

রক্ষা ॥ থাক্—থাক্, তুমি যা বকবে তা আমি জানি। সে এলেই তুমি তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

হেম ॥ নিশ্চয়ই দেব মা। যদি না যান, আমি আপনার কাছে চলে যাব। যা বলবার বলবেন।

রক্ষা ॥ তোমাকে আমার দরকার নেই, দরকার আমার তাকে।

] অফিস যাওয়ার বেশে সজ্জিত ধীরেন্দ্রনাথের প্রবেশ]

ধীরেন্দ্রনাথ ॥ এই যে মা, কালু এখনও বাড়ি ফেরেনি?

রক্ষা ॥ না ধীরু।

ধীরেন ॥ তার মানে, সে আজও অফিসে বেরুচ্ছে না! কালুর সম্বন্ধে আমি এখন যে সব খবর পাচ্ছি, তা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। বৌমা, তুমি ও-ঘরে যাও তো।

[হেম চট করিয়া দুই হাতে কান ঢাকিয়া চলিয়া গেল]

ধীরেন ॥ নাও, দু'কান ঢেকে ঘরে চলে গেল। বউটি এমন ছেলেমানুষ হওয়াতেই কালু আরো প্রশ্রয় পাচ্ছে। এর মধ্যে একদিন রাতে বাড়ি ফেরেনি, তোমার কানে গেছে মা?

রক্ষা ॥ হ্যাঁ, ক্ষুদি ঝি বলছিল বটে, আমি বিশ্বাস করিনি। এ বাড়ির ছেলে, এতটা দুঃসাহস হবে ভাবতে পারি না যে!

ধীরেন ॥ কেন, বৌমা কিছু বলেনি ?

রক্ষা ॥ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলে সারা রাত ঘুমের ঘোরে থাকি, কিছু জানতে পারি না।

ধীরেন ॥ এক ছেলের মা। বোঝেও সব—জানেও সব, কালুর ভয়ে তার সব দোষ ঢেকে রাখে।

রক্ষা ॥ না, তা ঠিক নয় বাবা। ভয়ে নালিশ না করতে পারে, কিন্তু ওসব দোষ দেখলে মুখের হাসিটি থাকত না। হাসি তো ওর মুখে লেগেই রয়েছে।

ধীরেন ॥ বিপদ হয়েছে কি মা জানো ? লেখাপড়া শেখেনি, তাও আমি ওকে হেড ক্যাশিয়ারের চাকরি করে দিয়েছি। এতেই সাহেবদের কাছে নালিশ গেছে। তার উপর সাহেবরা যদি জানে, ভাইটি আমার চরিত্রহীন, তবে সাহেবরা বলবে, ওর হাতে ক্যাশ রাখা চলবে না। সাহেবদের অফিসে বাবা এই বংশের যে সুনাম তৈরি করে দিয়ে গেছেন, কালুর জন্যই তা বুঝি আর থাকে না।

রক্ষা ॥ ওকে আমি এখন পাই কোথায় ! কোন্ আড্ডায় ওর এখন যাতায়াত, তার খোঁজ নাও দেখি।

ধীরেন ॥ তা কি আর নিইনি মা, তাও নিয়েছি—নিচ্ছি। (উচ্চকণ্ঠে) অঘোর, এদিকে এস।

[অঘোর আসিতেই রক্ষাকালী দেবী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন]

ধীরেন ॥ না না, এ অঘোর আমার অফিসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। একে তুমি জানো। তারকেশ্বর থেকে সেই যে তোমার বাতের মাদুলি এনে দিয়েছিল। যাতে তুমি প্রায় সেরে গেছ।

রক্ষা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, (অঘোরকে) বাবাটি আমার, কেমন আছেন, ভাল তো ?

অঘোর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ জ্যাঠাইমা। আপনার শ্রীচরণ আশীর্বাদে ভালই আছি, কিন্তু মনটা বড় খারাপ। তা সে ঐ কালুর জন্যই মনটা বড় খারাপ।

রক্ষা ॥ (ধীরেনের প্রতি তাকাইয়া) বাবাটি আমার বাতব্যাধি সারিয়ে দিচ্ছেন, আর কালুর এই সামান্য দোষ ত্রুটিটুকু শুধরে দিতে পারছেন না ? আর একবার তারকেশ্বর থেকে ঘুরে আসুন না বাবা। আমি এখান থেকেই বাবার পুজো মানত করছি।

ধীরেন ॥ মা, কালুর ব্যারাম এখন শিবের অসাধ্য। যে থিয়েটারের দূষিত আবহাওয়ার জন্য আমাদের আত্মীয় অতবড় অভিনেতা গিরিশ ঘোষকে আমি যা তা বলে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি, সেই থিয়েটারেই কিনা কালু কাল চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখেছে !

রক্ষা ॥ কে বলেছে ? —কে দেখেছে ?

অঘোর ॥ আমি দেখেছি জ্যাঠাইমা। জানেন তো, আমিও থিয়েটারে একটু অভিনয়-টভিনয় করি। চন্দ্রশেখর নাটকের খুব হাঁকডাক শুনে আমি তাই দেখতে গিয়েছিলাম। পেছনের সারিতে বসেছিলাম। আমাকে ওরা দেখেনি, কিন্তু আমি ওদের দেখেছি।

রক্ষা ॥ থিয়েটার দেখা তো শুনি এখন সব কলকাতার বাবুদের এক নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোসেদের বাড়ীতে ঐ থিয়েটার দেখতে গিয়েই তো আমার ব্যথা উঠল, কালুর জন্ম হল। থিয়েটার দেখাতে কোন দোষ হয়নি। তবে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করা—সে সব কি কিছু—

অঘোর ॥ না জ্যাঠাইমা, সে সব কেচ্ছা আমি আপনার সামনে মুখে আনতে পারব না। সময় থাকতে সাবধান করার জন্য আমি ধীরেনবাবুকে সব বলেছি।

ধীরেন ॥ তারাসুন্দরী নামে একটা অভিনেত্রী—না মা, সে সব কেলেঙ্কারীর কথা অঘোর যা শুনে এসে আমায় বলল, তা আমিও তোমার সামনে বলতে পারব না। বড় বউকে বলে গেলাম, তার মুখে শুনো। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—চলি। এসো অঘোর—

[অঘোরসহ ত্বরিৎপদে ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্থান]

রক্ষা ॥ তারাসুন্দরী ! ঠাকুর-দেবতার নাম। সে কি এত খারাপ হতে পারে ? কি জানি ! দিনকাল যা পড়েছে, কাউকে বিশ্বাস নেই। কইরে বৌমা, কোথায় গেলি ? এদিকে আয়, শুনে যা।

[দুই হাতে কান ঢাকিয়া হেমনলিনীর প্রবেশ]

রক্ষা ॥ একি, কান ঢেকে আছিস কেন ? ও—না না, হাত নামা। আমি এখন একবার বড় বৌমার কাছে যাচ্ছি। কালু এলেই ধরে নিয়ে যাবি আমার কাছে। না এলেও যাবি, কতক্ষণ না খেয়ে থাকবি ? শোন—কাছে আয়। স্বামীর কাছে একটু মান অভিমান করতে হয়। তোর বড় বিপদ রে, কালু আমার বিগড়ে যাচ্ছে। তারাসুন্দরী ! তারা ! তুমি এত নির্দয় হবে মা !

[সজল চক্ষে রক্ষাকালীর প্রস্থান। হেমনলিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেদারনাথ মিত্র—"কইরে নেড়ু, কোথায় তুই ?" বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গেসঙ্গে হেমনলিনী

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া হাসি
মুখে তাহার দাদাকে
অভ্যর্থনা করিল]

হেম ॥ এস বড়দা, ছোট বোনকে মনে পড়েছে? বাবা কেমন আছেন? মা? বৌদি? সব ভাল তো? আচ্ছা, আমার সেই পোষা হরিণটির নাকি বাচ্চা হয়েছে? আমাকে একেবারে ভুলে গেছ। বলে কয়েক দিনের জন্যে নিয়ে যাও না।

কেদার ॥ নিতেই এসেছি। এদিকে বাবার খুব অসুখ হয়ে পড়েছে। তোকে দেখতে চাইছেন।

হেম ॥ বল কি বড়দা! আমাকে তবে এখুনি নিয়ে চল। কিন্তু বটঠাকুর তো আপিসে। না না মেজ বটঠাকুর আছেন। সোজা লাইব্রেরী ঘরে চলে যাও। গিয়ে দেখবে, বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। ওঁর কাছে বললেও হবে—

কেদার ॥ হীরেনবাবুর কাছ থেকেই আসছি। দার্শনিক মানুষ, বলেন—'এতে এত উতলা হবার কি আছে! যা ঘটবার তা ঘটবেই, তাকে বাধা দিতে গেলে বিপদ বেড়ে যায়।, বললেন—বরং মা-র সঙ্গে দেখা করুন। কথাটা বলেই, আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। তা তোর শাশুড়ীর কাছেই আমাকে নিয়ে চল। কালুও বোধকরি অফিসে?

হেম ॥ এখন বাড়ি নেই। তা আপিসেও যেতে পারেন। মা বলে গেলেন—তিনি এলেই তাঁকে যেন আমি তাঁর কাছে ধরে নিয়ে যাই।

কেদার ॥ ধরে নিয়ে! কেন?

হেম ॥ জানো তো, ভারী রাশভারী মানুষ আমার শাশুড়ী। কথার মধ্যে খুব জোর থাকে। আমরা যেখানে বলব—ধরে আন, উনি বলবেন—বেঁধে আন। আমাকে যা হুকুম দিয়ে গেছেন, তা তামিল না করে ওঁর কাছে আমার যাওয়া চলবে না। তুমি একাই চলে যাও। শীগ্গির যাও, নইলে আবার উনি হয়তো পুজোয় বসে যাবেন। আমি বরং আমার কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

কেদার ॥ তা মন্দ নয় তুই তৈরি হয়ে নে, আমিই বরং ওঁর কাছে যাচ্ছি।

[অন্দরে কেদারনাথের প্রস্থান। হেম ঘরে ঢুকিবে এমন সময় নিঃশব্দে
চোরের মত অমরের প্রবেশ]

অমর ॥ নেড়ু!

হেম ॥ এই যে তুমি এসে গেছ! আর একটু দেরি হলে বাড়ির লোকেরা তোমার খোঁজে পুলিসে খবর দিত। জান, আমার বাবার খুব অসুখ।

অময় ॥ খুব ভাল—খুব ভাল। আমি দরজার আড়ালেই ছিলাম।

তোমার দাদার সব কথাই শুনেছি। তুমি এখনি নসুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাও। আর এখানে এস না।

হেম ॥ মানে! আর আসব না মানে?

[অমর কি বলিবেন ভাষা খুঁজিতেছিলেন]

হেম ॥ এ তুমি কি বললে! ওগো, কথা কইছ না যে?

অমর ॥ আমিও এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আজই এখনি। এখানে আর আসব না।

হেম ॥ সে কি গো! এসব কি অলক্ষুণে কথা তুমি বলছ? কোথায় যাচ্ছ?

অমর ॥ যাচ্ছি তীর্থে—

হেম ॥ তীর্থে মা গিয়াছেন।

অমর ॥ তিনি তাঁর তীর্থে গেছেন, আমি আমার তীর্থে যাচ্ছি।

হেম ॥ আমার বাবা যাতে সেরে ওঠে, তুমি তার জন্যে পুজো দিও। নসুর যাতে মঙ্গল হয়, তার জন্যে পুজো দিও। মা-র যাতে ভাল হয়, তার জন্যে পুজো দিও। এ বাড়ির সবার যাতে ভাল হয়, তার জন্যে পুজো দিও। চল, মা-র কাছে চল। মা তোমার জন্যে না খেয়ে বসে আছেন।

অমর ॥ না না, তবে আর আমার তীর্থে যাওয়া হবে না। ঐ একটি লোকই আছেন, যিনি আজ আমাকে আটকাতে পারেন। বুদ্ধদেবের গল্প শুনেছ তো, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র রাজ্য ঐশ্বর্য সব কিছু ছেড়ে গোপনে চলে গিয়েছিলেন—তপস্যা করতে। আমিও তাই যাচ্ছি। আমার তীর্থের দেবতা, ঐ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস। গিরিশ ঘোষকে উনি দয়া করেছেন। (ছুটিয়া পটের কাছে গিয়া) ঠাকুর, তুমি আমাকেও দয়া কর। (হেমকে) আমার সিন্দুকের চাবিটা দরকার।

[হেম আঁচল থেকে চাবির রিং অমরেন্দ্রর হাতে দিল। অমর কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন]

হেম ॥ (রামকৃষ্ণের পটের সম্মুখে গিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল) ঠাকুর! আমি কিছু বুঝি না, আমি বোকা—আমি মুখ্যু। কিন্তু ঠাকুর, এটুকু আমি বুঝছি, আমার চেয়ে বড় কিছু পেয়েছেন বলেই, আমাকে ছেড়ে আজ এমন করে চলে যাচ্ছেন। জান তো, ওঁকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই, কারোরই নেই। তুমি এইটুকু শুধু দেখ ওঁর যেন মঙ্গল হয়।

[তোয়ালে দিয়া জড়ানো একটি ক্যাশবাক্স লইয়া অমরেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের মত বাহির হইয়া আসিলেন এবং চাবির গোছা হেমনলিনীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন]

হেম ॥ একটু দাঁড়াও।

[গললগ্নিকৃতবাসা হইয়া হেম অমরকে প্রণাম করিল]

হেম ॥ ঠাকুরের কাছে সব সময় প্রার্থনা করব, তোমার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়—তুমি যেন সুখী হও। তোমার সুখেই আমার সুখ।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[মুঙ্গের। গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণীর ঘাটের ধারে একটি ভাড়া করা বাড়ির শয়নকক্ষ সম্মুখস্থ অলিন্দ। কাল: সকাল। মধ্যবয়সী বাউল কৃষ্ণদাস গাহিতেছে লালন ফকিরের একটি গান—]

গান—

"কি এক অচিন পাখী পুষলাম খাঁচায়
না হল জনমভরে তার পরিচয়।"

অথবা,

'আপনার আপন খবর নাই।
গগনের চাঁদ ধরব বলে মনে করি তাই।'

অথবা,

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমন আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।"

[তারা সুন্দরী হারমোনিয়ম বাজাইতেছে এবং গানটি শিখিতে চেষ্টা করিতেছে]

(দ্রষ্টব্য ॥ 'উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংলার বাউল গান')

কৃষ্ণদাস ॥ গানটা খুব সুন্দর তুলে নিয়েছ। মুঙ্গেরে আর ক'দিন আছ মা?

তারাসুন্দরী ॥ কি জানি বাবা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কদিন থাকব বলতে পারেন উনি।

কৃষ্ণ ॥ থাক মা থাক, যদ্দিন পার থাক। মুঙ্গেরের গঙ্গাতে এই কষ্ট-হারিণীর ঘাট মানুষের সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয়।

তারা ॥ সত্যিই তা দেয়। কলকাতায় থাকি, বাড়িতে লোকের ভিড়ে কর্তা আমি দুজনেই হাঁপিয়ে উঠি, কাজের ভিড়ে আমরা কেউ কাউকে নিরি-বিলিতে পাই না। আমার মা বললেন—এখানকার এই ঘাটের কথা! তাই না বাবুকে নিয়ে এখানে পালিয়ে আসা, দু'দিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচা।

কৃষ্ণ ॥ তোমার বাবুকে আমি দেখেছি—রাজপুত্তুর। ঘুম থেকে ওঠেননি বুঝি?

তারা ॥ না—ওঠেননি, খুব দেরিতে ওঠেন। এই ফাঁকে তুমি বাবা আমার হাতখানা দেখবে? আমাদের সতীশবাবু বলছিলেন—তোমার নাকি হাত দেখার আশ্চর্য ক্ষমতা!

কৃষ্ণ ॥ আমি কিছু জানিনে মা, কিন্তু লোকে ছাড়ে না। গেরুয়া দেখলেই এদেশের লোক ধরে নেয়—ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ! চোখ বুজে গঙ্গা মাকে মনে মনে বলি—মাগো, যা বলবার আমার মুখ দিয়ে তুমিই বলে দাও। তাই বুঝি সব মিলে যায়। না না, হাত দেখাতে হবে না, তোমার মুখ দেখেই মা গঙ্গার কৃপায় যা বুঝছি, আমি বলছি—এ কি! বাবুটির ধর্মপত্নী তুমি তো নও মা। (তারা মাথা নীচু করিল) না না, মাথা নীচু কর না, মুখ দেখতে দাও।

তারা ॥ (মুখ তুলিয়া) কণ্টহারিণীর ঘাটে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে উনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন—'আমাদের সম্বন্ধ দু'দিনের নয়, চিরদিনের।' মা গঙ্গার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি—ধর্মের এই অঙ্গীকার যে ভঙ্গ করবে, এ পৃথিবীতে সে কখনও সুখী হতে পারবে না।

কৃষ্ণ ॥ তবে তো আর বলবার কিছু নেই। বিয়েটাই শেষ কথা নয় মা, বিয়ের চেয়ে বড় সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ আত্মার আত্মায়—তোমাদের জীবনের লক্ষ্য কি মা?

[অমরেন্দ্রনাথ ইহাদের অলক্ষ্যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।
কাছে আসিয়া উত্তরটা তিনিই দিলেন]

অমর ॥ অর্থ নয়, পরমার্থ নয়—শুধু একটা থিয়েটার।

কৃষ্ণ ॥ সে আবার কি বস্তু বাবা?

অমর ॥ যাত্রাগান শুনেছ তো? তারই একটা শহুরে রূপ। কেউ রাম সাজছি, কেউ সাজছে রাবণ, কেউ বা সীতা, কেউ বা সাজছে হনুমান।

তারা ॥ যাত্রার পালার মতই সব পালা। তবে কাপড়ের পরদায় ছবি এঁকে বলে দেয় ঘটনাটা ঘটেছে কোথায়।

অমর ॥ সবই অভিনয়, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরা।

কৃষ্ণ ॥ খুব ভাল কাজ বাবা। যাত্রায় দেখেছি, খুব লোকশিক্ষা হয়।

অমর ॥ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণও তাই বলেছেন। তিনি তো কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান বাবা।

অমর ॥ তা বাবাজী আমাদের আশীর্বাদ কর—আমাদের সাধনা যেন সার্থক হয়। পরাধীন এই ঘুমন্ত জাতটাকে আমরা যেন জাগাতে পারি।

কৃষ্ণ ॥ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তোমরা যে শপথ করেছ, তা যদি রক্ষা কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আচ্ছা, আমি এখন আসি। জয় হোক তোমাদের। জয় মা তারাসুন্দরী—

(কৃষ্ণদাস ইহাদের আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন)

তারা ॥ (আত্মগতভাবে) আমাদের সম্বন্ধ দু'দিনের নয়, চিরদিনের। মা গঙ্গার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি—ধর্মের এই অঙ্গীকার যে ভঙ্গ করবে, এ পৃথিবীতে সে কখনও সুখী হতে পারবে না।

অমর ॥ নিশ্চয়। তোমার মনে কি এখনো কোন সন্দেহ আছে তারা ?

তারা ॥ আছে।

অমর ॥ আছে !—এখনো সন্দেহ আছে ?

তারা ॥ তুমি তোমার অমন সুশীলা সুন্দরী ধর্মপত্নী—তোমারই সন্তানের জননীকে পরিত্যাগ করেছ। শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখেই না তাকে বিয়ে করেছিলে ?

অমর ॥ পরিত্যাগ করিনি তারা। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে ঘর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাই বলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করেননি। আমিও না। তবে হ্যাঁ, তোমাকে সাধন-পথের সঙ্গিনী করে আমার জীবনের ধ্রুবতারার উদ্দেশ্যে ছুটেছি। আমার সে ধ্রুবতারা—জনজাগরণ আর লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত একটি নাট্যশালা। যা তুমিও চাও তারা—তুমিও চাও। সই, আমার শৈবলিনী, আমার বুকের ধন—এবার আমার বুকে এস।

তারা ঃ আঃ কি করছ, কে আসছে—

[বাহির হইতে হাতে বাজারের থলি ও বুক পকেটে চিঠিপত্র লইয়া সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রবেশ করিলেন]

সতীশ ॥ ওঃ, কি বিরাট কাতলা মাছের মুড়ো ! তোমরা মুড়ো খাবে, না মুড়োই তোমাদের খাবে, বুঝে উঠতে পারছি না। আর কাঁকড়া যা পেয়েছি, ব্যাটারা যেন এক একটা কাছিম ! এক ডজন গলদা চিংড়ী এনেছি। খাবে কি একজিবিশনে দেবে, এখন ভেবে দেখ। আর এনেছি, এক জোড়া মুরগী। কেটে কুটে এমন ড্রেস করে দিয়েছে যে, কাঁচাই খেতে ইচ্ছে যায়।

তারা ঃ আমি মুরগী খাই না—খাবও না।

অমর ঃ তুমি না খেলে আমরা কেউই খাব না।

সতীশ ॥ আঃ, কতবার বলব যে, গঙ্গাতীরে কোন পাপ হয় না। এখানে সব কিছু পাপ গঙ্গার মাহাত্ম্যে একেবারেই পাপ নয়—এখানে সবই পুণ্য। তা আমি খাব। জানলা দিয়ে মা গঙ্গাকে দেখব আর মুরগীর ঠ্যাং চিবাব। ও

হ্যাঁ ভাল কথা—চিঠি আছে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া অমরকে) এটা তোমার। প্রেরক—শ্রীআশুতোষ বড়াল। (তারাকে) আর এটা তোমার! এটার প্রেরক দেখছি—শ্রীমতী নিত্যকালী দাসী।

তারা ॥ আমার মা। চিঠি দুটো আপনিই পড়ুন সতীশবাবু। আপনি বড় সুন্দর পড়েন।

সতীশ: তাই নাকি! নাটকে পার্ট বিলি করবার সময় কথাটা আপনাদের মনে থাকে না, এই যা। আমি বাজারের থলিটা হেঁসেলে ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়ে আসছি।

[সতীশের রন্ধনশালায় প্রস্থান]

তারা ॥ মা না জানি কেমন আছে! আমাকে এতদিন ছেড়ে কখনো থাকেনি।

অমর ॥ আশুর চিঠি এল! নিশ্চয়ই লিখেছে— টাকা ফুরিয়ে গেছে।

[সতীশের পুনঃপ্রবেশ]

সতীশ ॥ কর্তার চিঠিটাই আগে পড়ি, টাকা পয়সার ব্যাপার তো!— আশু লিখেছে—(পাঠ)

"মান্যবরেষু—

বাবু, শতকোটি নমস্কার জানিবেন। সাতদিন পরে ফিরিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন। আপনার ইন্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাবের রিহার্সালের খরচ খরচা বাবদ মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। উহা সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই বাবু আর বিবিদের তাগিদে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। খানাপিনায় আর তেমন খরচ করিতে পারিতেছি না বলিয়া বাবুরা-বিবিরা অনেকেই আর বাগ-মারী বাগানে গোশা করিয়া আসিতেছেন না। আপনারা শীঘ্র না আসিলে দল ভাঙ্গিয়া যাইবে আশংকা হয়। আপনাদের কুশল চাই। নিবেদন ইতি।

দাসানুদাস।

শ্রীআশুতোষ বড়াল"

না না, শেষ হয়নি। আবার পুনশ্চও আছে। (পাঠ) "হ্যান্ডনোটের পাওনাদাররা আপনার ঠিকানা চাহিল, আমি দিই নাই। বলিয়াছি—জানি না।"

অমর ॥ আশুটা কি বেয়াকুফ! ঠিকানাটা দিলেই পারত। ভয়টা কিসের? গিয়েই তো দেনা সব শোধ করে দিচ্ছি। ঠিকানা না দিলেই, পাওনাদাররা নানা সন্দেহ করে। যাক, এবার মাঠাকরুণ কি লিখেছেন, পড়ে শোনাও। আমি ঘরে যাচ্ছি।

তারা ॥ না না, ঘরে যাবে কেন? তুমিও শোন। মা-ও নিশ্চয় টাকার কথাই লিখেছে।

সতীশ ॥ (পাঠ) "আমার নয়নমণি তারাসুন্দরী মা গো, তোমার খোঁজ নিতে দু'দিন তোমাদের বাগানে গিয়েছিলাম। সে যা দেখলাম—ভূতের নেত্য মা গো—ভূতের নেত্য! খালি মদ আর বমি—বমি আর মদ, মদের ফোয়ারা ছুটছে। গেল, গেল মা, তোমার সব গেল। দেখে শুনে আমার শূলের ব্যামো বেড়ে গেছে। তুই কি শেষে ভিখারিণী হবি মা? শীগ্‌গির ফিরে আয়। আমি আর বাঁচিনে, আমাকে দেখবি আয়। তোর হতভাগিনী গর্ভ-ধারিণী।

নিত্যকালী দাসী।"

ভাষাটা বড় সুন্দর হয়েছে। মনে হয়, কেউ লিখে দিয়েছে। তা দিক। কিন্তু যা ঘটছে, তা সত্যিই খুব মারাত্মক!

তারা ॥ অমরবাবু! আমি তো আর না গিয়ে পারছি না।

অমর ॥ হ্যাঁ, এরপর আর একদিনও এখানে থাকা চলে না।—না। সতীশ! ভাই, তুমি এখনি স্টেশনে গিয়ে কলকাতার প্রথম যে ডাকগাড়ি পাবে, তাতে একটা ফার্স্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করে এস। আমি টাকা দিচ্ছি।

[অমর ঘরে চলিয়া গেলেন]

সতীশ ঃ এমন যে হবে আমি এখানে এসেই কালুকে বলেছিলাম।

তারা ॥ মা আমার কিছু মিছে লেখেনি। আমিও তো নিজে দেখে এসেছি, রিহার্সাল তো নয়—ফুর্তির ফোয়ারা। অমরবাবু আবার ভূতনাথবাবুর পেড়াপিড়িতে কুসুমকুমারীকে দলে টানছেন।

সতীশ ॥ তার মানেই ভূতের নেত্য! এবার জমবে ভাল।

[অমর আসিয়া সতীশকে টাকা দিলেন]

অমর ॥ ফেরবার সময় দু'এক বোতল স্যাম্পেন যদি পাও, নিয়ে এস।

সতীশ ॥ সে আর বলতে! শুধু গাড়ি রিজার্ভ নয়, ফুর্তিটাও রিজার্ভ করা চাই। তবে না জানি। একি আর আমি জানি না? হ্যাঃ—

[সতীশের প্রস্থান]

অমর ॥ তারা, কি ভাবছ?

তারা ॥ ভাবছি, স্টারের মত সেরা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে এ কোথায় এসে পড়লাম।

অমর ॥ না না, এসব তুমি একেবারেই ভেব না। আমার মানসপ্রতিমা—তোমাকে আমি যখন পেয়েছি তারা, থিয়েটার আমরা করবই। আর সেটাই হবে শহরের সেরা থিয়েটার।

তারা ॥ স্টার থিয়েটারের চেয়েও বড় থিয়েটার! যে থিয়েটারকে গড়ে তুলেছে অতবড় অভিনেত্রী বিনোদিনী, নটগুরু গিরিশচন্দ্র, রসরাজ অমৃত বোস, আরো কত সব নামজাদা অভিনেতা, অভিনেত্রী—আমার নামটাও ওখানে কিছু কম ছিল না গো। সেই স্টারের চেয়েও বড় থিয়েটার করবে তুমি?

অমর ॥ হ্যাঁ, আমি। তোমাকে যখন পেয়ে গেছি, এখন এজন্য যদি আমার সর্বস্ব দিতে হয়—তাও দেব।

তারা ॥ সে না হয় দিলে। কিন্তু শুধু টাকাতে তো থিয়েটার গড়ে ওঠে না অমরবাবু। অনেকের অনেক প্রতিভার যোগাযোগ হলে—তবে গড়ে ওঠে একটা থিয়েটারের মত থিয়েটার।

অমর ॥ আমার থিয়েটারও তাই হবে তারা। তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখ তারা।

তারা ॥ বিশ্বাস রাখছি, তোমার টাকা আছে বলে নয়, বিশ্বাস রাখছি, কারণ তোমার অমন স্নেহময়ী মা আর অমন সুন্দরী স্ত্রী তোমাকে বাড়িতে বেঁধে রাখতে পারেন নি, তাই। কিন্তু একটা কথা অমর, তুমি বাড়ি যাও না কেন—সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ এমন করে ত্যাগই বা করলে কেন? আমি তো এটা চাইনি।

অমর ॥ তুমি জান না—তুমি জান না তারা, আমার মা আর আমার স্ত্রী—এঁরা দু'জনেই কি ভয়ঙ্কর জিনিস! না—না তারা, এঁরা দু'জনেই কখনো কোন অভিযোগ করেন না—কান্নাকাটি করেন না। মা হয়তো মাঝে মাঝে বড় জোর কিছু উপদেশ দেন, কিন্তু আমার স্ত্রী—মানে হেমনলিনী, সে আরো সাংঘাতিক।

তারা ॥ মানে?

অমর ॥ সে শুধু হাসে আর বলে—তোমার সুখেই আমার সুখ। আমি থিয়েটার ভালবাসি দেখে, সে থিয়েটার না দেখেই থিয়েটার ভালবাসে। তারা—তারা, থিয়েটারের জন্য যদি আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে থাকি, জানবে—এই হেমনলিনীও এই থিয়েটারের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। আর তা করেছে—হাসিমুখে। জেন, আমার হেমনলিনী—আমার এই তারাসুন্দরীকেও ভালবাসে। সত্যই আশ্চর্য! ওদের আমি তাই এত ভয় পাই—আর বাড়িও যাই না তাই।

তারা ॥ এমন মেয়ে! অথচ আমি যে গিয়ে তাকে একটি দিন দেখব, তারও তো কোন উপায় নেই। কারণ—(কম্পিত কণ্ঠে) আমি বেশ্যা—আমি বেশ্যার মেয়ে বেশ্যা।

অমর ॥ তোমার জন্মের জন্য তুমি দায়ী নও তারা। আমি ভেবে পাই না তারা, তোমরা থিয়েটারের অভিনেত্রীরূপে রামায়ণ মহাভারতের পুণ্য কাহিনী প্রচার করছ, মহামনীষীদের লেখা নাট্য জীবনী প্রচার করছ, দেশের

বিপুল নিরক্ষর দর্শকদের মধ্যে ধর্মানুরাগ সঞ্চার করছ। দেশের-লোক মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আনন্দের মধ্য দিয়ে ধর্মের চেতনা লাভ করছে। তবু থিয়েটারের বাইরে দিনের আলোতে ভদ্রসমাজে কেন তোমরা হয়ে থাকবে অপাঙক্তেয়—অস্পৃশ্য। এর বিরুদ্ধেই আমার বিদ্রোহ।

[হঠাৎ কৃষ্ণদাস বাউলের পুনঃপ্রবেশ]

কৃষ্ণ॥ আমি না এসে পারলাম না মা। তুমি বাবুটির ধর্মপত্নী নও দেখে কেমন একটা অশুচি বোধ করছিলাম। তাই কণ্টহারিণীর ঘাটে মা গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়ে দেখি, অমন সুশীতল জল কেমন আগুন হয়ে রয়েছে। চমকে উঠে মনে মনে গঙ্গাজীকে স্মরণ করলাম। রুষ্ট কণ্ঠে মা আমাকে বললেন—'ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই শুদ্ধ। মানুষই তাকে অশুদ্ধ করে। আবার মানুষই তাকে শোধন করতে পারে। যা—কথাটা ওদের বলে আয়।'

(অমরকে) তুমি বাবা আমার তারাসুন্দরী মাকে শোধন করে নাও—শোধন করে নাও। আমার পাপটা খণ্ডন হোক। জয় মা গঙ্গা—জয় মা গঙ্গা

[চকিতে কৃষ্ণদাস বাউলের প্রস্থান]

অমর॥ আশ্চর্য!

তারা॥ আশ্চর্য!

অমর॥ মনে হচ্ছে দৈববাণী!

তারা॥ দৈববাণী।

[দুজনেই কেমন অভিভূত হইয়া বাউলের গমনপথের দিকে তাকাইয়া রহিল]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[বাগমারীতে অমর দত্তর বাগানবাড়ি। হলঘর। কাল : সন্ধ্যা। দেওয়ালে একটি বড় সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে। তাহাতে লেখা :—ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব। স্থাপিত—১লা জানুয়ারী, ১৮৯৫ সাল। ফরাসের উপর কয়েকটি তাকিয়া ও দেওয়ালের ধারে ধারে খানকয়েক চেয়ার ও টিপয়। অভিনেত্রী কুসুমকুমারী নাচিতেছে। নর্তক নৃপেন (নেপা) বোসও সঙ্গে নাচিতেছেন। ভূতনাথ দাস হারমোনিয়ম বাজাইতেছেন 'অমর দত্তর কর্মসচিব আশুতোষ বড়াল ও পরিচারিকা ঝর্ণা দেখাশোনা করিতেছে। মেম্বারদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), চুনীলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব সকলেরই ঈষৎ মত্ত অবস্থা। অদূরে দুইজন ভদ্রলোক ফরাসে বসিয়া নাচ দেখিতেছেন। নাচ শেষ হইলে সকলেই হাততালি দিয়া অভিনন্দন জানাইলেন।]

চুনীলাল॥ কারও তোয়াক্কা না রেখে আমি চুনীলাল দেব বলছি—আমাদের এই কুসুমকুমারী ভাল অ্যাকটিং করে, কিন্তু নাচে আরো ভালো।

দানীবাবু ॥ নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একমাত্র ওয়ারিশ আমি—দানী ঘোষ বলছি—নাচায় আরো ভালো।

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন]

দানী ॥ হাসছ যে? বাবা ভূতনাথ, তুমিই বল না, কথাটা কি মিথ্যে বলেছি?

ভূতনাথ ॥ আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতাটা হয়তো বেশী, তাই বলেছ।

[হো হো করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন]

কুসুমকুমারী ॥ এমন সব কথা বললে, আর আমি নাচব না তো।

চুনী ॥ অমর দত্তর মনে ধরলে তোমার ঘাড় নাচবে।

নিখিল ॥ বাবা ভূতনাথের মতলবটাও তো তাই। তাই না এনেছে!

ভূত ॥ মোটেই না নিখিলবাবু। অমরবাবু বাগানটা দেখতে আসতে বলেছিলেন, আমাদের তাই আসা। নাচতে তো বললে তোমরা।

নেপা বোস ॥ যেখানে কর্ত্রী ঠাকরুন হচ্ছেন তারাসুন্দরী, নাচের লোক ঠিক করবার মালিক তিনিই। তিনের পা, পাঁচের পা, সাতের পা, এ সব আমি নেপা বোস তারার কাছেই শিখেছি। অমরকে আমি কুসুমের নাচের কথা বলিনি। বলেছিলাম—এই ভূতুবাবুর হারমোনিয়ম বাজানর কথা। কী বাজায়! হারমোনিয়ম যেন কথা বলছে!

দানী ॥ তা বটে। বাপীও ভূতনাথের খুব প্রশংসা করে। (কুসুমের দিকে তাকাইয়া) না না, বাপী তোমার নাচের কথাও খুব বলে।

চুনী ॥ ও আশুবাবু! খরায় তো দেখছি গলাটলা সব শুকিয়ে গেল।

নিখিল ॥ এ বাড়ির সুনামটা আপনার হাতে মারা যাচ্ছে যে।

আশু ॥ মারা তো আমিও যাচ্ছি স্যার। সাত দিনের বিশ্রামের জন্য মুঙ্গেরে যাচ্ছি বলে, আমার হাতে সাত দিনের খরচা তুলে দিয়ে কর্তা সেই যে বেরুলেন, চৌদ্দ দিন হতে চলল, তাও তো ফেরার লক্ষণ দেখছি না।

দানী ॥ এ বাবা হানিমুন!

চুনী ॥ তা যা বলেছ দানী। হানিমুনে রাতদিন জ্ঞান থাকলে, সে আর হানিমুন হয় না।

[একটি ট্রেতে করিয়া রঙিন সরবৎপূর্ণ গ্লাস লইয়া ঝর্ণার প্রবেশ ও পরিবেশন]

নিখিল ॥ কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়াল। অমর থাকতে আসত—পেলেটির খানা, পামারি স্যাম্পেন। অমর না থাকায় আসছিল কালী মার্কা কারণ, আর এবার বাবা কয়েক গ্লাস রঙিন সরবৎ! অমর কথায় কথায় বলে

থাকে—'নাহি জানি ভাইরে লক্ষণ, এই কিরে রাজ্যসুখ!' এসো আমরাও আজ তাই বলি। আর এই সরবতই পান করি।

দানী ॥ আমার বাপী বলে থাকে—'দুধের সাধ ঘোলে মেটে না।' আমি উঠছি। বাপী বলেছে, আজ নতুন পার্ট শেখাবে। এখন থেকেই আমার গা কাঁপছে। চলি—

অন্যান্য অনেকে ॥ হ্যাঁ, শিবহীন যজ্ঞ—সে হয় না। অমরবাবু হানিমুন সেরে আসুন। খবর দিও, তখন দেখা যাবে।

চুনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল—সেই ভাল। (আশুকে) বই তো সেই পলাশীর যুদ্ধই হবে, না কি সরকারের ভয়ে মত বদলেছে?

আশু ॥ না, পলাশীর যুদ্ধই হচ্ছে। গিয়েই চিঠি দিয়েছেন, কুসুমকুমারী যদি না আসে তবে আর একজন ভাল নর্তকীর খোঁজ রেখ। নবাবীর বই—যেমন চাই বেগম, তেমনি চাই বাঈজী।

ভূত ॥ না না, আমাকে বলেছিলেন—আমি তো এনে দিয়েছি।

চুনী ॥ বুঝলাম: ভূতবাবু মুখ বদলাতে চাইছে।

[সকলের হাস্য]

কুসুম ॥ এমন জানলে আমি এখানে আসতাম না। (ভূতনাথকে) ভূতনাথবাবু, আপনি যাবেন তো আসুন, নইলে আমি চলে যাচ্ছি।

[রাগতভাবে কুসুমের প্রস্থান]

দানী ॥ ভূতনাথ আমার চেয়েও মোটা। কুসিকে ধরতে হলে ছুটতে হবে আমাকে। কিন্তু বাপী, মানে নটগুরু গিরিশচন্দ্র বলে থাকে, ছুটোছুটি কোর না। হোঁচট খাওয়া ভাল নয়।

[সকলের হাস্য এবং নাট্যশিল্পীদের প্রস্থান]

১ম ভদ্রলোক ॥ ব্যাপারটা সব বোঝা গেল আশুবাবু। মনের মানুষ নিয়ে কর্তা ভেগে পড়েছে। (২য় জনকে) কি বলেন মশাই আপনি?

২য় ভদ্রলোক ॥ তা ছাড়া, আর কি! মধু ফুরিয়েছে, ভোমরার দলও ভেগে পড়ল। দেখলেন তো?

১ম ॥ কিন্তু আমাদের ভেগে পড়লে চলবে না। রক্ত জল করা অতগুলো টাকা হ্যান্ডনোটে ধার দিয়েছি।

২য় ॥ আমি তো দেবই না বলেছিলাম। তা অত বড় বনেদী ঘরের ছেলে। এমন করে হাত জড়িয়ে ধরল, না দিয়ে পারলাম না।

১ম ॥ হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ তো শেষ হয়ে গেল।

২য় ॥ আপনাকে তো বলেছি, আমারও তাই। এখন নালিশ করা ছাড়া আর পথ কি?

আশু ॥ না না না, নালিশ কেন ? কর্তা তো আসছেন।

১ম ॥ কি করে বলছেন, আসছেন ?

২য় ॥ সাত দিনের নাম করে গিয়েছিলেন, চোদ্দ দিন পেরিয়ে গেল। এখানকার খরচ-পত্রও আর চালাচ্ছেন না। (১ম জনকে) আচ্ছা ভাই, আপনি শুনুন তো।

[দুইজনে সরিয়া গিয়া গোপন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে আশুও ঝর্ণাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া আনিয়া কিছু নির্দেশ দিল]

১ম ॥ (২য়-কে) হ্যাঁ, এ ছাড়া আর পথ নেই।

২য় ॥ হ্যাঁ, এভাবে আমিও ঠকতে রাজী নই।

[আশুর নির্দেশমত ঝর্ণা ইতিমধ্যে একটি ট্রেতে এক বোতল মদ ও দুইটি পাত্র লইয়া আসিয়াছে।]
[আশু অন্য কাজে মন দেওয়ার ভাণ করিল]

ঝর্ণা ॥ (ভদ্রলোক দুইজনের কাছে গিয়া হাস্যে লাস্যে) তা দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন ? পাশের ঘরে আসুন—বসুন, একটু গড়ান—খানাপিনা করুন। বাবুর সব খবর আমার কাছে পাবেন।

১ম ॥ আচ্ছা, সে হবে এখন। আগে বল দেখি, এখন কি করা যায় ?

ঝর্ণা ॥ আঃ, ওঘরে চলুন না। দেখছেন না, ওখানে আশুবাবু রয়েছেন। আঃ, আসুন না।

২য় ॥ কি দাদা, যাবেন ? একবার দেখাই যাক না।

১ম ॥ না না, মদ আমার সয় না। খেলেই গড়াগড়ি। আমি চলে

২য় ॥ সুন্দরী, মদের চেয়ে আমার টাকার নেশা বড়। যদি তোমার কিছু বলবার থাকে, সরাসরি এখানেই বলে ফেল।

ঝর্ণা ॥ (ট্রেটি যথাস্থানে রাখিয়া) তাহলে শুনুন। আমি বলছিলাম কি, কলকাতায় থিয়েটারটা খুব লাভের ব্যবসা। দেখছেন তো, অমরবাবুও তাই থিয়েটার করছেন। আমি বলছিলাম কি, আপনারাও দু'জনে তাঁর সঙ্গে যোগ দিন না। যে টাকাটা আপনারা দিয়েছেন, অমরবাবুকে বলুন—ওঁর থিয়েটারে আপনাদের ঐ টাকার অংশ দিতে।

ভদ্রদ্বয় ॥ (একত্রে) অ্যাঁ !

ঝর্ণা ॥ হ্যাঁ। বুদ্ধিটা আমার নয়, ঐ আশুবাবুর। ও আশুবাবু, এদিকে আসুন না।

[আশু প্রস্তুতই ছিল। ছুটিয়া আসিল]

আশু ॥ হ্যাঁ, অমরবাবুর সঙ্গে আপনারাও থিয়েটারের মালিক হয়ে পড়ুন। টাকার অনুপাতে অংশ অনুযায়ী বখরা নেবেন।

ঝর্ণা ॥ আর জানেনই তো, থিয়েটারের হাজার মজা—তাও লুটবেন।

ভদ্রদ্বয় ॥ অ্যাঁ!

আশু ও ঝর্ণা ॥ হ্যাঁ।

১ম ॥ আচ্ছা, ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক। কি বলেন আপনি?

২য় ॥ হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মতই বটে। বেশ, অমরবাবু এলে আমাদের খবর দেবেন।

১ম ॥ দেরি করবেন না কিন্তু। আচ্ছা, চলি—

[উভয়ের প্রস্থান। উহারা চলিয়া যাইতেই ঝর্ণা ও আশু পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ উভয়েই হো হো করিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িল]

আশু ॥ আমি জানি, অমরবাবু এতে কিছুতেই রাজী হবেন না। তবে নালিশটা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বোধ হয় ঠেকিয়ে রাখা গেল।

ঝর্ণা ॥ ধন্যি আপনার বুদ্ধি!

আশু ॥ কিন্তু বাহাদুরিটা তোমার। অভিনয়টা যা করেছ—চমৎকার!

ঝর্ণা ॥ তবু তো আমায় একটা পার্ট দেবার নাম করেন না আপনারা।

আশু ॥ হবে—হবে—হবে—

ঝর্ণা ॥ হবে না—হবে না—হবে না—

[ব্যস্তসমস্তভাবে অঘোরের প্রবেশ। ঝর্ণা ইতস্ততঃ কর্মব্যস্ত রহিল]

অঘোর ॥ এই যে আশু আমি আড়ালে লুকিয়েছিলাম। অমর ফেরেনি?

আশু ॥ না দাদা।

অঘোর ॥ জানো কি, কবে ফিরছে?

আশু ॥ না দাদা, তাও জানি না। তবে আমি চিঠি দিয়েছি, পত্রপাঠ চলে আসতে। কারণ, এখানে অচল অবস্থা।

অঘোর ॥ চিঠি দিয়েছ কবে?

আশু ॥ গত সোমবার।

অঘোর ॥ চিঠি তবে বুধবার নাগাদ পেয়েছে। চিঠিটাকে গুরুত্ব দিলে কালই এখানে আসা উচিত ছিল।

আশু ॥ তা গুছিয়ে গাছিয়ে আসা. দেরি একটু হতেও বা পারে। আজও আসার সময়টুকু যায়নি দাদা।

অঘোর ॥ এদিকে এক সর্বনেশে ব্যাপার আশু।

আশু ॥ কি দাদা ?

অঘোর ॥ মহাবীরপ্রসাদ মাড়ওয়ারী পাওনাদার অমরের দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোটের দরুন ডিক্রি করে অমর পালিয়ে আছে প্রমাণ করে তার নামে বডি ওয়ারেণ্ট বার করেছে।

আশু ॥ সর্বনাশ ! এই তো এখানে, একটু আগে দুই বাঙ্গালী পাওনাদারকে বলে কয়ে বুঝিয়ে নালিশ করা ঠেকিয়ে রাখিলাম। আর এদিকে মাড়ওয়ারী পাওনাদার এই সর্বনাশ করে বসল। এখন কি করা যায় ? বড় ভাইদের জানানো উচিত নয় কি ?

অঘোর ॥ আরে 'ধীরেনবাবুই তো আমাকে ডেকে বললেন—'তোমাদের অমরের কীর্তি শোন।' বডি ওয়ারেণ্ট বার করে ঐ মাড়ওয়ারী নিজেই ধীরেনবাবুকে গিয়ে বলেছে—'পুরো টাকা আমাকে দিয়ে ছোট ভাইকে বাঁচাতে হয় বাঁচান। নইলে, পরে দোষ দেবেন না।'

আশু ॥ ওরে বাবা ! তা ধীরেনবাবু কি বললেন ?

অঘোর ॥ বলেছেন—ও ভাই আমাদের গোল্লায় গেছে। ওকে শোধরাবার সব চেষ্টা জলে গেছে। ওর কোন ব্যাপারে আর আমাদের কিছু করবার নেই।

আশু ॥ এই যাঃ ! তবে তো দেখছি, অমরবাবু কলকাতায় ফিরলেই গ্রেফতার হবেন।

অঘোর ॥ সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দিতে না পারলে, অত বড় ঘরের ছেলের ঐ পরিণামই কপালে আছে দেখতে পাচ্ছি। ঐ টাকাটা যদ্দিন যোগাড় না হয় তদ্দিন ওকে লুকিয়ে রাখাই তোমাদের উচিত। এই কথাটাই তোমাদের আমি বলতে এসেছিলাম। আমি চলি— আমার ভয়, মাড়ওয়ারী বোধহয় স্টেশনেও ওকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করে রেখেছে। নাঃ, দেখছি থিয়েটারই আমাদের কালুর কাল হল।

[অঘোরের প্রস্থান। ঝর্ণা ছুটিয়া আসিয়া আশুর কাছে দাঁড়াইল]

ঝর্ণা ॥ আশুবাবু, এখন কি হবে ?

আশু ॥ অন্ধকার—চারিদিকে আমি অন্ধকার দেখছি ঝর্ণা। ভাইরা বেঁকে বসেছেন, মা-ও এখানে নাই শুনছি— তীর্থে গেছেন। একটা গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ?

ঝর্ণা ॥ হ্যাঁ, পাচ্ছি। তবে কি বাবু এলেন ?

আশু ॥ হতেও পারে বা। তুমি স্যাম্পেন রেডি রেখ, আমি দেখছি।

[আশু বাহির হইয়া গেল। ঝর্ণা ট্রেতে মদের সাজ-সরঞ্জাম সাজাইয়া উহা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল, আশু অমরকে লইয়া হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অমরের মুখে থমথমে ভাব, আচরণ উদ্‌ভ্রান্ত]

অমর ॥ এখানে আর কে আছে ?

আশু ॥ আমি আর ঝর্ণা।

অমর ॥ তোমরা ছাড়া আর কেউই নাই ?

আশু ॥ না স্যার।

অমর ॥ বাঁচালে। জান আশু, আমার এই কালো মুখ আর কাউকে দেখাতে চাই না, দেখাবও না।

[ঝর্ণা মদের ট্রে সামনে ধরিল। অমর মদের পাত্র মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাহার উদ্দেশ্যে]

অমর ॥ একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, যার উপর নির্ভর করা চলে। (পাত্রটি উজাড় করিয়া ঢালিয়া পান করিলেন)।

আশু ॥ আপনি একা কেন, আর সব ?

অমর ॥ তারা তো ? বাইরে যাও—আকাশে তাকাও—দেখবে।

আশু ॥ সতীশদা—

অমর ॥ সর্ষে ফুল দেখছে। বোস আশু, বোস। এই ঝর্ণা, একি জলো মাল দিয়েছিস ? আমার ব্র্যান্ডটা নিয়ে আয়।

[ঝর্ণা চলিয়া গেল]

অমর ॥ না না, বোস আশু। আমি এখনও মাতাল হইনি। জ্ঞানগম্যি এখনও আছে। কিন্তু আমার ব্র্যান্ড পেটে গেলে আর আমার মাথা ঠিক থাকবে না। তাই, কি হয়েছে, চটপট তোমাকে বলে রাখছি। পরে হয়তো আর সময় পাব না। (হঠাৎ ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি হেরে গেছি আশু।

আশু ॥ না—না স্যার, আপনি তো কখনো ভেঙে পড়েন না। কি হয়েছে আমায় বলুন।

অমর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি। আমি তোমার চিঠি পেলাম। তুমি লিখেছিলে—পত্রপাঠ চলে আসুন।

আশু ॥ হ্যাঁ স্যার।

অমর ॥ একই সঙ্গে তারাও তার মা-র চিঠি পেল। লিখেছে—তার ভারী অসুখ, চলে এস। হাওড়া স্টেশনে নেমেই তারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা

তার বাড়ির ভেতর ঢোকে। আমি আর সতীশ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ তারার মা রণচণ্ডী মূর্তিতে ছুটে এসে, আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে চিৎকার করে বলল—'ভাগো। আমার মেয়ে তোমার মত একটা দেনদারের সঙ্গে থাকবে না—আমি থাকতে দেব না। জোর জবরদস্তি করলে পুলিস ডাকব।, তারাকে চিৎকার করে ডেকেও আমি যখন কোন সাড়া পেলাম না, আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল।—ঝর্ণা কই, ঝর্ণা আসছে না কেন?

আশু॥ আপনার ব্র্যাণ্ডটা সেলাবে বন্ধ আছে।—আনছে—এল বলে—আপনি বলুন। তারপর—

অমর॥ সতীশকে নিয়ে—কোথায় গেলাম? —হ্যাঁ, থানায় গেলাম। অফিসার আমার বন্ধু—অনেক মদ খেয়েছে আমার। বললে—'দলবল নিয়ে আর সতীশবাবুকে নিয়ে আমি এখনি যাচ্ছি, আপনি বাগানে চলে যান। তারাবিবি যদি মায়ের অবাধ্য হয়ে আপনার কাছে আসতে চায়, সতীশবাবুকে দিয়ে আমি আজ এখনি আপনার বাগানবাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ কেউ রুখতে পারবে না।'—আমার গলা শুকিয়ে গেছে। ঝর্ণা কই—ঝর্ণা—

[ঝর্ণা একটু আগেই অমরের পিছনে মদ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আশুর ইঙ্গিতে মদ লইয়া অমরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পিপাসার্ত অমর এক চুমুকে পাত্রটি খালি করিয়া ঝর্ণার হাতে দিলেন]

অমর॥ আজ আমার ভাগ্যের মহাপরীক্ষা। সমুদ্রমন্থন করে আমি অমৃত পেয়েছি কি গরল খেয়েছি, আজ তা পরখ হয়ে যাবে। কোন গাড়ির শব্দ পাচ্ছ?

আশু॥ না তো।

অমর॥ জান আশু, শাস্ত্রেই বলেছে—"স্ত্রীয়াংশ্চরিত্রং দেবাঃ নজানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"। মুঙ্গেরের গঙ্গায় কণ্টহারিণীর ঘাটে—(হঠাৎ চিৎকার করিয়া) গাড়ির শব্দ পাচ্ছি। এরই মধ্যে কি আর আসবে। অথচ এই তারার জন্যে আমি কি না ছেড়েছি! জান তো তোমরা। আর আজ কি না সে মায়ের বুদ্ধিতে—

[নেপথ্যে সতীশের কণ্ঠ শোনা গেল—'এসে গেছে, এসে গেছে।' সতীশ ও আলুথালু বেশে নিরাভরণা তারাসুন্দরীর প্রবেশ। শান্তভাবে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যায় বিস্মিত অমরের কাছে]

অমর॥ এ কি! এ তোমার কি বেশ তারা? গা ভরা ছিল গয়নাগাঁটি, হাতের চুড়িগাছাটাও তো—

তারা॥ রাক্ষসী মা আমার সব কেড়ে নিয়েছে।

অমর॥ শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে—

তারা ॥ ধস্তাধস্তিতে—

অমর ॥ তুমি তবে আমার কাছে ফিরে এলে তারা ?

তারা ॥ আসতে হবেই। কণ্টহারিণীর ঘাটে মা গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞায় বাঁধা পড়েছি, সে বাঁধন যদি একমাত্র তুমিই নিজ হাতে কাট তবেই খসবে।নইলে কারো সাধ্য নেই সে বাঁধন খসায়। মা তো তুচ্ছ! বোধকরি, ঈশ্বরেরও সে সাধ্য নেই।

অমর ॥ তারা!

তারা ॥ গয়নাগাঁটি সব কেড়ে নিয়েছে—নিক, মা হয়ে আজ আমাকে মেরেছে—মারুক। মা নাকি খোঁজ নিয়ে জেনেছে—টাকাকড়ি তুমি সব উড়িয়ে দিয়েছ, তুমি নাকি আজ ভিখারি। তা হও না কেন ভিখারি, তবু আমি—তোমার।

সতীশ ॥ তারার ঐ কথা শুনেই, অফিসার তাঁর নিজের গাড়ি দিয়ে আমাদের বাগানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

[তারাকে অমরেন্দ্র বুকে টানিয়া লইলেন]

অমর ॥ আকাশের তারা যার বুকে, সে ভিখারি! এ কি, তুমি এমন থরথর করে কাঁপছ কেন তারা ? তুমি পড়ে যাবে। চল, তোমাকে শুইয়ে দিচ্ছি। সতীশ, তুমি ডাক্তার ডাক।

[সতীশ তখনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। অমর ও
ঝর্ণা তারাসুন্দরীকে ধরিয়া লইয়া ভিতরে
চলিয়া গেলেন। অঘোরনাথের
পুনঃপ্রবেশ]

আশু ॥ এ কি অঘোরদা! আপনি আবার ?

অঘোর ॥ পথে দেখলাম, মহাবীরপ্রসাদের কর্মচারী কয়েকজন লোক নিয়ে এই বাগানের দিকে আসছে। আমি ছুটে এলাম তোমাদের সাবধান করে দিতে। ঈশ্বর করুন, অমর যেন আজ না আসে।

আশু ॥ অঘোরদা, তিনি এসে গেছেন।

অঘোর ॥ সর্বনাশ!

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[বটতলায় হেমনলিনীর পিত্রালয়। কাল ঃ সন্ধ্যা। হেমনলিনী তার উপবেশন কক্ষের দেওয়ালে রক্ষিত রামকৃষ্ণের পটের সামনে ধূপধূনা দিতেছে। রামকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করিয়া পট প্রণাম করিল।]

১

হেম ॥ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

ওঁ নমো শ্রীভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়
নমো নমঃ।

২

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পা ধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

[পাশের ঘর হইতে রক্ষাকালী দেবীর প্রবেশ]

হেম ॥ একি মা, একা যে ? নসু কই ?

রক্ষা ॥ আমার আনা খেলনা নিয়ে মেতে আছে। খেলনায় সঙ্গী-সাথীও জুটে গেছে। আমি দেখলাম, এই সুযোগ। তোমার ঝিকে পাহারা রেখে পালিয়ে এলাম।

হেম ॥ নসুর দেখছি এবার খুব লাভ। আপনি তীর্থ থেকে খেলনা এনে দিলেন। এসব ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই বাবা-মাও তীর্থ থেকে ফিরবেন। তখন আর এক দফা।

রক্ষা ॥ নসুকে দেখি আর চোখের জলে ভেসে যাই। জন্মাবধি বাপের স্নেহ পেল না ছেলেটা।

হেম ॥ না মা, সেজন্যে তো ওর কোন কষ্ট নেই। এ বছর তো তাঁকে দেখেওনি। তার আগে দু'একবার যা দেখেছে, সেটা মনে রাখবার বয়েস ছিল না ওর কাজেই, ও কিছু পায়ওনি—হারায়ওনি।

রক্ষা ॥ ও কিছু পায়নি, কিন্তু তুমিই বা কি পেলে মা ?

হেম ॥ সে কি মা! আমি আপনাকে পেয়েছি, অমন দুজন ভাসুর পেয়েছি

আমার নসীরামকে পেয়েছি, (রামকৃষ্ণের পট দেখাইয়া) এমন একটি ঠাকুর পেয়েছি, কিছু পাইনি মানে ? আপনি আমাকে আপনাদের কাছে কবে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই বলুন।

রক্ষা ॥ সে তো আমি কেদারকে বলে রেখেছি। তোমার বাবা-মা তীর্থ থেকে ফিরলেই তোমাকে আমি আমার বুকে টেনে নেব মা। আমি এবার তবে চলি মা আমাদের গাড়িটা আমাকে বাড়ি পেঁছে দিয়েই ধীরুকে আনতে যাবে তার আপিসে। আর দেরি করা চলে না।

হেম ॥ কিন্তু দাদা তো আপিস থেকে ফিরলেন না, যাবার সময় দেখা হল না যে !

রক্ষা ॥ দেখা না হয়, সেই ভাল মা। আমি কেদারের কাছে, এ বাড়ির কারও কাছে, এমন কি তোমার কাছে, এমন কি নসুর কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা পাই মা। অথচ তীর্থ থেকে ফিরেই কেন এখানে ছুটে এলাম, তাও বুঝছি না।

হেম ॥ বলি বলি করেও আপনি আমাকে বলতে পারেননি, কেন এসেছেন। আপনি কিছু না বললেও, আমার বুঝতে বাকি নেই মা। দাদার কাছে আমি যা শুনেছি, আমি বলছি—আপনি শুনুন। এজমালী বিষয় বাঁধা দিয়ে আপনার সেজছেলে হাতে নগদ দশ হাজার টাকা পেয়ে আপিস যাওয়া একে-বারে বন্ধ করে দিয়েছেন।

রক্ষা ॥ একটা থিয়েটার খুলবে বলেছিল—খুলেছে ?

হেম ॥ না মা, এখনও তা খুলতে পারেননি। তবে বাগমারীর ঐ বাগান-বাড়িতে আজ কয়েকমাস ধরে দলবল নিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের মহলা চলছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা খুব ভাল কাজ করতে পেরেছেন। সাহিত্য-সাধনার জন্যে নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করে এই 'সৌরভ' কাগজটা বের করেছেন। তিনটে সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। (তিনটি সংখ্যা রক্ষাকালীর হাতে তুলিয়া দিয়া) আপনি নিয়ে যান মা, পড়বেন। দেখবেন, আপনার ছেলের লেখাও এর মধ্যে আছে। আর বিনোদিনী দাসী আর তারাসুন্দরী দাসী এদের কবিতাও এতে রয়েছে।

রক্ষা ॥ (কাগজ তিনখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) ও গুলো পুড়িয়ে ফেল। (উত্তেজিতভাবে) আসল কথাটা তুমি বলছ না কেন ? হতভাগা কি এ বাড়িতে এসে তোমাদের একটিবারও দেখে যায়নি ? একটা চিঠি দিয়েও কি খোঁজ খবর নেয়নি ?

হেম ॥ আমিও কিন্তু ছেলের মা হয়েছি মা। কাজেই, আপনার মন কি জানতে চায়, সেটা বুঝতে আমার বাকী নেই। তেমন কোন সুখবর থাকলে, এ বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই আপনি তা জানতে পারতেন। তবে এও তো

হতে পারে মা, তিনি যে বড় কাজটি হাতে নিয়েছেন, তাতে আমাদের খোঁজ খবর নিতে সত্যিই তিনি সময় পাচ্ছেন না। তব তাঁর হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি তাঁকে আশীর্বাদ করুন মা।

[হেমনলিনী রক্ষাকালীকে প্রণাম করিল। তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সাশ্রু নত্রে আশীর্বাদ করিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। হেমনলিনী তাঁহাকে অনুসরণ করিল। ক্ষণকাল পরেই হেমনলিনীর সঙ্গে তাহার দাদা কেদার মিত্রের প্রবেশ]

কেদার ॥ আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে যে মহিলাটি গাড়িতে উঠে চলে গেলেন উনি তবে তোর শাশুড়ী? কই, তুই তো আমাকে তা বললি না। আর উনিই বা কেমন, আমাকে দেখেও দেখলেন না।

হেম ॥ না দাদা, উনি আমাকে বলেই গেছেন—তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে ওঁর লজ্জা হয়। আজ সকালবেলায় তো তোমরা দুজনে কথাবার্তা বলেছ।

কেদার ॥ হ্যাঁ, তা বলেছি বটে। কিন্তু অমরের কথা উনিও তোলেননি, আমিও তুলিনি। তবে অফিসে গিয়ে ধীরেনবাবুর কাছে যা খবর পেয়েছি, সেটা দস্তুরমত একটা দুঃসংবাদ। সেটা উনি বাড়ি গিয়ে ধীরেনবাবুর মুখেই শুনবেন, সেই ভাল।

হেম ॥ কি দুঃসংবাদ দাদা?

কেদার ॥ সে সব আইনের কথা, তুই কিছু বুঝবি না।

[হঠাৎ অমরেন্দ্রনাথের প্রবেশ]

অমর ॥ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি দাদা।

কেদার ॥ নেড়ু আমাদের জলখাবার—

[কিন্তু হেম নড়িল না। অমর কেদারকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

কেদার ॥ তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে?

অমর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেদার ॥ বাঁচতে হলে হাজার পনেরো টাকা এখনি দাখিল করতে হবে। কেমন?

অমর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি জানেন দেখছি।

কেদার ॥ নেড়ু, জলখাবার—

[হেম দু'পা গিয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল]

কেদার ॥ দাদারা এ টাকা দেবেন না। ধীরেনবাবু আমাকে আজ নিজে

বলেছেন। কেমন, তাই তো?

অমর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেদার ॥ (সগর্জনে) নেড়ু!

[হেম তবু সেখান হইতে নড়িল না। দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল]

কেদার ॥ কিন্তু এই পনেরো হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব অমর।

[হেম চমকিয়া উঠিল, অশ্রুস্নাত চোখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল]

হেম ॥ (কম্পিতকণ্ঠে) আমি জলখাবার এখনি নিয়ে আসছি দাদা।

[হেম ছুটিয়া প্রস্থান করিল। অমর কেদারকে পুনরায় সকৃতজ্ঞ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন]

কেদার ॥ এস, বসা যাক।

(উভয়ে চেয়ার টানিয়া মুখোমুখি বসিলেন]

কেদার ॥ কিন্তু এই পনেরো হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব তিনটি শর্তে।

অমর ॥ বলুন।

কেদার ॥ প্রথম শর্ত হচ্ছে, তুমি তোমার দাদার অধীনে পূর্বতন চাকরিতে ফিরে যাবে। তিনি যাতে তোমাকে সে চাকরি দেন, সেটা আমি দেখব।

অমর ॥ আমি রাজী।

কেদার ॥ দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, বাগানবাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে।

[হেমনলিনী একটি ট্রেতে দুজনের জলখাবার লইয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে]

অমর ॥ আচ্ছা, তাও আমি রাজী।

কেদার ॥ তৃতীয় আর শেষ শর্ত হচ্ছে থিয়েটার করা তোমার চলবে না।

অমর ॥ (মুহূর্তকাল কি ভাবিয়া) আমি পারব না দাদা।

[হেমনলিনী কম্পিতকণ্ঠে জলখাবারের ট্রে কোনমতে একটি সাইড টেবিলে রাখিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। অমর ইতিমধ্যে চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন]

কেদার ॥ পারবে না?

অমর ॥ না।

কেদার ॥ আমার ভগ্নীর মুখের দিকে চেয়েই আমার এই প্রস্তাব। বেশ, সেই বা কি বলে, শুনে যাও।

[কেদার অন্দরে চলিয়া গেলেন। অমর উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। ধীর পদক্ষেপে হেমনলিনীর প্রবেশ]

হেম ॥ তোমাদের সবার গুরু গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'না, ওটা থাক। ওতে লোকশিক্ষা হয়।' তুমি তো ঠাকুরের সেই থিয়েটারই করতে চাইছ গো।

অমর ॥ (কম্পিতকণ্ঠে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

হেম ॥ আমার মনের ভিতর থেকে আমার ঠাকুর বলছেন—তুমি আমার এই গয়নার বাক্স নিয়ে যাও। তোমার বিপদ কেটে যাবে, থিয়েটারও হবে। এই নাও—

[কম্পিতহস্তে অমরেন্দ্র গহনার বাক্স গ্রহণ করিলেন]

অমর ॥ (অভিভূতকণ্ঠে) হেম! হেম! নেড়ু!

হেম ॥ জলখাবারটুকু খেয়ে যেতেও আমি আর বলব না। শুধু প্রণামটুকু করবার সময়টুকু নিচ্ছি। আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমাকে সুখী করতে পারি—সুখী করতে পারি। আর বিন্দুমাত্র দেরি নয়। এবার তুমি এস—

[গহনার বাক্স হাতে লইয়া অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

বাগমারী রোডে অমরেন্দ্র দত্তের ভাড়া করা নতুন বাড়ি। কাল ঃ সন্ধ্যা। রিহার্সাল ঘরে তারাসুন্দরী দময়ন্তীর পার্ট মুখস্থ করিতেছে। একটি হ্যাণ্ডবিল হাতে ভূতনাথ দাসের প্রবেশ।

ভূতনাথ ॥ নাও, সব সন্দেহ চুকিয়ে দিয়েছেন অমরবাবু। আজ পথে ঘাটে হ্যাণ্ডবিল বিলি হচ্ছে—এমারেল্ড থিয়েটারে অমরবাবুর ক্ল্যাসিক থিয়েটার খুলছে। 'নল-দময়ন্তী' মহাসমারোহে অভিনয়—শুক্রবার গুডফ্রাইডে—১৬ই এপ্রিল ইংরেজী ১৮৯৭ সাল—সন্ধ্যা ৭টা। বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন, বালেশ্বরাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর।

তারা ॥ দেখি—(একখানি হ্যাণ্ডবিল হাতে লইয়া চোখ বুলাইল) দলে নাম দেখছি—মহেন্দ্রলাল বোস, অঘোরনাথ পাঠক, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—

ভূত ॥ আরে ও সব তো জানাই ছিল। তোমার নামও থাকবে জানতাম, আছেও দেখছি—তারাসুন্দরী, লেখা আছে—দি স্টার অব দি স্টার থিয়েটার। কিন্তু যে নামটা দেখে অবাক্ হচ্ছি, সেটা হচ্ছে—কুসুমকুমারী, এখানে লেখা হয়েছে—দি জুয়েল অব দি মিনার্ভা থিয়েটার। ভাবগতিক যা দেখছিলাম,

তাতে অবশ্য খুব অবাক্ হচ্ছি না। কিন্তু এত সকালে, এত সহজে, এমনটা হবে, এ কিন্তু আমিও ভাবিনি।

তারা ॥ এখন আর ন্যাকা সেজ না ভূতনাথবাবু, খাল কেটে কুমির এনেছ। অবশ্য তখন অমরবাবু দু' হাতে টাকা ছড়াচ্ছিলেন। কুসুমকে লীজ দিয়ে কিছু কামাই করতে চেয়েছিলে। এখন অমর ফতুর। তাই না তোমার এই মাথা ব্যথা।

ভূত ॥ না না, আমি বরং হাতি পোষার দায় থেকে মুক্তি পেলাম। মিনার্ভার মত নামকরা থিয়েটার ছেড়ে অমরবাবুর ফুটো নৌকায় কুসি যে উঠে এল, এ এল নিজের দায়িত্বে—আমাকে না জানিয়ে কেন এল, সেটা আমি কতকটা বুঝছি। কিন্তু তুমি সেটা বুঝতে গেলে মাথা ব্যথাটা তোমারই হবে তারা।

তারা ॥ তুমি বলতে চাইছ, অমরবাবুর থিয়েটারে কুসির আনাটা টাকা পয়সার কোন ব্যাপারই নয়—এই তো ?

ভূত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব দুর্বোধ্য নয়—কিন্তু দুর্বোধ্য তুমি। অমরবাবু যখন হাজার হাজার টাকা ওড়াচ্ছিলেন, তখন সেই টাকার গাছটিতে তুমি বাসা বেঁধেছিলে, সেটার মানে বোঝা যায়। কিন্তু সেই ঝরাপাতা গাছ এখনো তুমি আঁকড়ে ধরে রয়েছ, এটা কি ? কুসিরও যদি তাই হয় তোমার মাথা ধরাই উচিত। সতীন কাঁটা বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি নেই ?

তারা ॥ তুমি বড় ইয়ে—এখন যাও, আমাকে পার্ট পড়তে দাও।

ভূত ॥ যাচ্ছি, কিন্তু তুমি জান, তোমার ঐ তারাটি আমার আকাশে উঠুক এ আমার কত কালের স্বপ্ন !

[ফুলকুমারী সাজে সজ্জিতা কুসুমকুমারীসহ অমরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। হাতে একটি পোশাকের বাক্স]

অমর ॥ এই যে তারা, তোমার দময়ন্তীর পোশাক। কুসুম ফুলকুমারী পোশাক নিজে বাছাই করে নিয়ে পরেছে। তা মানিয়েওছে বেশ। তুমি দময়ন্তী সাজতে যে পোশাক চেয়েছিলে, সেটা কিনে আনিয়েছি। এই নাও। দেখ, মানায় কি না।

তারা ॥ আমি পোশাকটা কোনদিনই বড় করে ধরি না। তা বলছ, দেখছি। (কুসুমকে) কুসুম, এস তো ভাই। দেখে বল—কেমন হয়েছে।

কুসুম ॥ তুমি যা পরবে, তাতেই মানাবে। চল—দেখছি।

[কুসুম ও তারার সাজঘরে প্রস্থান]

ভূত ॥ আচ্ছা অমরবাবু, গিরিশ ঘোষের 'নল-দময়ন্তী' বই-ই তো আমরা করছি ? কিন্তু তাতে ফুলকুমারী বলে পার্ট নেই তো।

অমর ॥ হেঁঃ—হেঁঃ—হেঁঃ। ওটা আমি একটু নতুনত্ব করেছি।

আমাদের হ্যাণ্ডবিলটা দেখেননি ? (হ্যাণ্ডবিলটা টানিয়া লইয়া) এই তো রয়েছে—'নল-দময়ন্তী'

Splendid Lotus Scene

একটি ক্ষুদ্র কমলকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে ! তাদেরই মধ্যমণিটি হচ্ছে—ঐ ফুলকুমারী, মানে—কুসুমকুমারী।

ভূত ॥ বাঃ, চমৎকার আইডিয়া ! বাজারে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

[সতীশ ও অঘোরের প্রবেশ]

সতীশ ॥ হ্যাণ্ডবিল তো ? হ্যাণ্ডবিল দেখে তো বাজারে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেছে, দেখে এলাম। এই নাও অমর, তোমার কলিরাজ—অঘোরদা।

অঘোর ॥ দেখ কালু, তোমার বড়দা তোমার ঐ থিয়েটার নিয়ে মাতামাতি কোনদিনই সমর্থন করেননি। বলেন—ঐ থিয়েটারই ওর কাল হয়েছে। কিন্তু তোমার দলে নামবার আগে আমি ওর অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম। বন্ধু হলে কি হবে, মনিব তো। ভয় ছিল ক্ষেপে না যায়। কিন্তু আশ্চর্য ! বললেন—আমাদের সকলের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে, এত দুঃখ দুর্গতি সয়ে ছেলেটা যখন তার লক্ষ্য আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, ওতেই ওর ইষ্টলাভ হোক। বললেন মাও নাকি তাই বলেছেন।

অমর ॥ অঘোরদা—অঘোরদা, এতবড় আশীর্বাদ তুমি আমার জন্য বয়ে এনেছ ! হয়তো বা আমি এই আশীর্বাদের জোরেই বেঁচে যাব। নইলে, কে আমি ? সেই মূর্খ, যে বন্ধু বান্ধবী নিয়ে বাগানবাড়িতে কাপ্তেনী করে থান দুই নাটকের রিহার্সাল দিতে তিন বৎসরে লাখ টাকারও বেশী দেনা করে। সেই উন্মাদ, যে দেনা শোধ দিতে পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ষোলো আনা অংশ, শুধু তাই নয়, তার মা যখন মারা যাবেন, তখন তাঁর পরিত্যক্ত বিষয়সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অংশ, এ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, দেনা মুক্ত হয়ে, নগদ মাত্র চারটি হাজার টাকা হাতে নিয়ে আজ এই ক্ল্যাসিক থিয়েটার খুলতে উদ্যত। হ্যাঁ, সেই মূর্খ—সেই উন্মাদ—আমি। কিন্তু মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—আমার দুই অগ্রজের এই শিক্ষা, আমারও জীবনের প্রতিজ্ঞা। ভাগ্যের পাশা-খেলায় শেষ দানটি দেওয়ার জন্য নাটকের নল রাজার মতই আজ আমি প্রস্তুত। একমাত্র ভরসা—আমার শুভাকাঙ্খীদের, আর থিয়েটারের দেবতা রামকৃষ্ণ পরমহংসের কৃপা।

অঘোর ॥ তুমি জিতবে—তুমি জিতবে অমর। নল রাজার মতই তুমিও হবে একদিন আমাদের নাট্যজগতের পুণ্যশ্লোক অমর দত্ত।

[ভাবাবেগে অমরেন্দ্র অঘোরের পায়ের ধুলো লইলেন। অঘোর অমরকে বুকে লইলেন]

অঘোর ॥ জয়স্তু।

সতীশ ॥ থিয়েটার তো এখানেই জমে গেল কাল্‌। এর পরে আবার এই ড্রেস রিহার্সাল—

অমর ॥ না না, ড্রেস রিহার্সাল হতেই হবে। কনসার্ট। নল দময়ন্তী—প্রথম অংক—প্রথম গর্ভাংক—অপ্সরাদের নাচটা—হুইসিল—

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল]

[পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল—হ্যাণ্ডবিলে বর্ণিত অপ্সরাদের পুষ্পনৃত্য। তাদের মধ্যমণি—ফুলকুমারীরূপিণী কুসুমকুমারী]

[পদ্ম হইতে দেববালাগণের আবির্ভাব ও নৃত্য-গীত]

নৃত্য-গীত

"হায় রে হায়। প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা ?
দিলে নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি,
পরাব না, পরব ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা-বেচা,
ভালবেসে পুরায় আশা।"

[রাজ্যচ্যুত নলরূপে অমরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। পশ্চাতে দীনবেশে দময়ন্তীরূপিণী তারার প্রবেশ]

অমর ॥ কী অপূর্বই না হয়েছে, অপ্সরাদের এই নৃত্য-গীতের সিন! কলকাতার লোকের তাক লেগে যাবে। ভাগ্যিস ধর্মদাস সুর মশায়ের মত স্টেজ ম্যানেজার, অঘোরদার মত মিউজিক মাস্টার, তারাসুন্দরীর মত নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী আর কুসুমকুমারীর মত নৃত্য-গীত পটিয়সী অভিনেত্রী আমরা পেয়েছি! তাই না এই সিনটা এমন জমে গেল। এইবার আমাদের পরীক্ষা তারা। এস—

সতীশের প্রবেশ

সতীশ ॥ তৃতীয় অংক—প্রথম গর্ভাংক। কলির চক্রান্তে রাজ্যহারা নল আর দময়ন্তী কাননে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাননের সিন—লাইট ফেল—হুইসিল—

নল ॥ বারি, তুমি জীবের জীবন।
দময়ন্তী! অভাগিনী। বারি কর পান;
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ।
দেখ, দেখ স্বর্ণপাখা বিহঙ্গম
বসে আছে ডালে
দেখ, অনাহারী আছি তিনদিন,
পাব ধন—নগরে বেচিব;
অদ্য তাহে হবে প্রিয়ে! জীবন যাপন।

[পক্ষী ধরিতে গমন]

পক্ষী ঃ পক্ষীরূপে কলি আমি,
শুন রে অজ্ঞান।
যেই অক্ষে সর্বনাশ তোর—
সেই অক্ষপাটি দ্বাপর আমার সখা,
অবহেলি মো সবারে
দময়ন্তী বরিল তোমারে
প্রতিফল দিব, হতজ্ঞান।

[বস্ত্র লইয়া পক্ষীর প্রস্থান]

নল ঃ প্রিয়ে। প্রিয়ে! এস না এখানে;
বিবসন, কিরাত অধম,
দিগম্বর আমি;
বস্ত্র লয়ে পক্ষী পলাইল।

দম ঃ নাথ! এক বস্ত্র পরিব দুজনে,
বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোরা—
লজ্জা কিবা তাহে প্রভু?

[দময়ন্তীর গমন ও বস্ত্র দান]

নল ঃ স্বকর্ণে শুনিলে প্রিয়ে। কালগ্রস্ত
আমি;—
মোর সনে কেন আর রবে?
বহু দুঃখ পাবে;—
যাও তুমি পিত্রালয়।
শুন প্রিয়ে!
রাজবালা—
ক্লেশ তব নাহি সয়।
দেখ, অতিশয় দুর্গম কানন—
নরঘাতী জন্তু ফিরে কত;
যাও দময়ন্তী! ফিরে যাও;
যবে কলির প্রভাবে
পড়িব অশেষ ক্লেশে,
একমাত্র বুঝাইব মনে—
সুখে আছ তুমি চন্দ্রাননে।

প্রিয়ে ! বাড়ে দুঃখ দ্বিগুণ আমার
তোমার এ দশা হেরে ;
প্রিয়ে !
প্রভাত-সমীর
লাগিলে বদনে তোর,
ভাবিতাম—ব্যথা বুঝি পাও—
তিন দিন আছ অনাহারে ।
যাও প্রিয়ে !
অভাগারে ছেড়ে যাও ।
মরি ! বিমলিনী—
শুকায়েছে সুবর্ণ নলিনী !
অভাগিনী !
কেন অভাগারে বরেছিলে ?
আমি পাপাচার—
দেব-কার্য না করি উদ্ধার !
আহা ! সরলা ললনা—
আমি তব দুঃখের কারণ ।

দম ঃ নাথ ! কি বল—কি বল !
পতি বিনা কিবা সুখ আছে মোর ?
তোমা ল'য়ে নিরবধি রব,
তোমারে সেবিব—
সুখ-সাধ এ হতে না করি ।
ওহে মহামতি ! জান ধর্মনীতি,
ভার্যা চির-সাথী ;
তবে কেন দাসীরে বিমুখ প্রভু !
চল দোঁহে যাই বিদর্ভ নগরে ;
আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর ।

নল ঃ প্রিয়ে ! বুঝ না, সরলা তুমি,—
কলিগ্রস্ত আমি,
সে আদর এ সংসারে নাহি আর ;
সাধে কিহে ছেড়ে যেতে চাই ?
বন দেখে অন্তরে শুকাই ।
প্রিয়ে ! তুমি কুসুম জিনিয়ে সুকোমল ;

হেরি মুখপদ্ম মলিন তোমার,
জীবনে না হয় সাধ আর।
কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে!

দম ॥ প্রাণনাথ! বাঁচাও আমায়;
এ কি কথা বল প্রভু?

নল ॥ কেঁদ না—কেঁদ না প্রিয়ে;
সতর্ক করেছে কলি;
পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায়।
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিনু;
লোভে পক্ষী-আশে গেল বাস;
শান্তি আশে আত্ম-বিসর্জন
কদাচন করিব না, প্রাণেশ্বরি!
কহি সত্য করি,—
জান তুমি, সত্য মম নাহি টলে।
প্রিয়ে! তোমা বিনে রহিতে কি পারি?
তোমা ছেড়ে যেতে কিহে চায় প্রাণ?
দৈব-বিড়ম্বনে, চন্দ্রাননে! যেতে বলি;
প্রিয়ে! ক্লান্ত দোঁহে অতিশয়—
এস করি শ্রান্তি দূর।

দম ॥ (স্বগত) শঙ্কা হয়,
রাজ্য যদি ছেড়ে যায়;
আমি একবাসে—কেমনে যাইবে?
নয়ন মেলিতে নারি।

[উভয়ের শয়ন]

নল ॥ এই ত সময়—অভিভূত প্রায়—
হায়, এ শয্যায় চন্দ্রাননী।—
"যাও চলে" কে আমারে বলে;
এক বস্ত্র,—কেমনে পলাব?
না-না-ছেড়ে যাব,
দময়ন্তী কোথা যাবে আমা সনে?
চ'লে গেলে—আমারে না হেরে
যাবে সতী বিদর্ভ-নগরে।

মির প্রাণের প্রেয়সী,
পূর্ণশশী ধরাতলে।
বিবসন! কেমনে পলাব?

[পার্শ্বে অস্ত্র দেখিয়া)

একি! খড়্গ হেথা এল কোথা হতে?
এও মায়া—হ'ক মায়া—
করি নিজ কার্যোদ্ধার।

[বসনচ্ছেদন]

এই ত ছেদিনু বাস,
মম অদর্শনে,
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে?
চন্দ্রাননে! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয়—
প্রিয়তমে! দেখা হবে;
নহে এই শেষ দেখা!
ছি! ছি! আমি কি নির্দয়,
আমা বিনে সে কভু না জানে,
একা রেখে দুর্গম কাননে
কোন্ প্রাণে যাব চলে?
হায়! কে যেন রে বলে—
"এস, এস, বিলম্বে জাগিবে বালা।"
যাই প্রিয়ে! যাই;
দেখ দেখ যতেক দেবতা,—
সতী একা বনমাঝে।
হে মধুসূদন!,
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও;—
আহা! দুখিনীর কেহ আর নাই!
দেখ দেখ, কর হে করুণা,
অবলা ললনা,
আমা বিনা হবে উন্মাদিনী;
চিন্তামণি! নিরুপায়ে দিও হে আশ্রয়
আর কেহ নাই—

শ্রীচরণে পত্নী সঁপে যাই ;
দয়া কর দয়াময় ।
আসি প্রিয়ে !   মাগি হে বিদায় ।
(ফিরিয়া) প্রাণ কাঁদে—চলে যেতে নারি ;
সাধে কি হে ফিরি ?
সাধে যাই—দেখে যাই আঁখি ভরে ;
আহা !
দময়ন্তী ধূলায় লুটায়—
এ দশায় কেমনে ফেলিয়া যাব ?
না-না-সুকুমারী, রাজার ঝিয়ারী
কষ্ট পাবে মোর সনে ;
যাই দূর বনে, নহে জনক-ভবনে
প্রিয়া মম না ফিরিবে ;
অনাথিনী-অর্ধবাস এ কানন-মাঝে—
দেখ· রেখ, দীননাথ ।
যাই, যাই পলাইয়ে ।

[নল-এর প্রস্থান]

[কলির প্রবেশ]

কলি ॥ তবু মম মন না পুরিল ;
বিচ্ছেদ হইল,
কিন্তু,
প্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ প্রবাহ বহিছে ।
ফেলে গেছে, ফেলে গেছে ;
যার তরে দেবে অনাদর—
দেখিব নয়ন ভরে ;
হতাশ বিকল বামা কি করে কাননে ।

[কলির প্রস্থান]

দম ॥ (উঠিয়া) নাথ !
কোথা প্রাণনাথ ?
একি !   অর্ধবাস মম পরিধানে ?
নাথ !   প্রাণেশ্বর, কোথা তুমি ?
দাও দেখা—নহে যায় প্রাণ ।

[কলির পুনঃপ্রবেশ]

কলি ॥ ছেড়ে গেছে। তবু চায় নলে
ঈর্ষানলে প্রাণ মম জবলে।
না, না,—প্রাণে প্রাণে
বিচ্ছেদ না হবে কভু।

[কলির প্রস্থান]

দম ॥ প্রাণেশ্বর ! দাও দেখা,
একা আমি বনমাঝে ;
দাও দরশন ; নহে, না রবে জীবন।
প্রাণনাথ ! কোথা গেলে ?
ঘোরবন—হৃদিকম্প হয় ঘন ঘন ;
দেখা দাও—দেখা দাও—প্রাণেশ্বর !
রাখ নাথ ! রাখ পরিহাস,
হতেছে হুতাশ ;
কত সহে কামিনীর প্রাণে আর ?
মরে হে অধীনী, হৃদয়ের মণি !
দেখে যাও—সঙ্গে যদি নাহি লও ?
বল স্রোতস্বতি ! কোথা গেল পতি ?
পুণ্যবতি ! বাঁচাও এ অভাগীরে ;
বল পাখি, শাখি,
প্রাণনাথে দেখেছ হে যেতে ?
কোন্ পথে বলে দাও মোরে ;
লতা ! কহ কথা ;
কাঙ্গালিনী চায় পতি-দরশন ;
উধর্বশির-দেখ, গিরিবর !
কোথা প্রাণেশ্বর,
বল হে সত্বর—যাব আমি পতি-পাশে,
পতি বিনা বাঁচি না হে শৃঙ্গধর !
প্রাণেশ্বর ! দেহ না উত্তর—
কাতরা কিঙ্করী তব।
হায় ! কোন্ পথে যাব ?

প্রাণনাথে কোথা দেখা পাব ?
পদচিহ্ন নাহি হেরি পথে।
মম প্রাণেশ্বরে কে নিল হে হরে ?
দে রে, ফিরে দে-রে, অভাগীর নিধি।
হায়! হায়! কি হ'ল, কি হ'ল—
কিবা ছলে ভুলে—ত্যজে গেলে প্রাণনাথ ?
প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন,
শ্রীচরণে ক রে সমর্পণ
আশ্রয় লয়েছে দাসী—
ভুলে তারে কোথা আছ প্রভু ?
একি! একি!
দেখা দিয়ে কেন হও অদর্শন ?
এই নাথ! এই যে তোমারে হেরি ;
প্রাণনাথ! পলাইও না আর—
দেখ, বুঝি যায় প্রাণ।

[দময়ন্তীর প্রস্থান]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

দত্তভবন। অমরেন্দ্রনন্দন নসীরামের জন্মতিথি দিবস। কাল : রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা। রক্ষাকালী দেবী একাকী অলিন্দের জানালা পথে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।]

[হেমনলিনীর প্রবেশ]

হেম॥ মা, বাজনদাররা খেয়ে বাড়ি চলে গেল।

রক্ষা॥ তা যাবে না তো কি, তোমার ছেলের জন্মতিথি সারাদিন হল, আবার সারারাতও হবে ? এত রাত পর্যন্ত বাজিয়েছে, এই ঢের।

হেম॥ বটঠাকুর আর মেজঠাকুর দুজনেই কাঙ্গালী ভোজন দেখাশোনা করছিলেন। তাও শেষ হয়ে গেল। সবাই কি আনন্দ করে খেল। দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল—ওদের আশীর্বাদে নসুর কোন দিন কোন অমঙ্গল হবে না। ওমা, বটঠাকুর আসছেন।

[মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া এক কোণে হেম সরিয়া দাঁড়াইল। ধীরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।]

ধীরেন ॥ মা, রাত ১১টা বেজে গেল। কার জন্য এখনও তুমি পথ চেয়ে আছ? সে কি মানুষ! সে এখন পশু।

রক্ষা : চুপ্—চুপ্। বৌমা—

ধীরেন ॥ ও। বৌমা, তোমার ছেলের জন্মতিথি। রান্নাবান্না এত ভাল হয়েছে যে, সবাই পেট পুরে খেয়ে খুব আশীর্বাদ করে গেছেন। ভেবেছিলাম, চার ভাই এক সঙ্গে খেতে বসব, মা আমাদের এক সঙ্গে খাওয়াবেন। এই ইচ্ছাটাই কেবল পূর্ণ হল না। তা যাক্, তোমার বাপের বাড়ির লোকেরা কিন্তু খেয়ে দেয়ে খুব খুশী হয়ে গেছে। মা, ব্যাপার যখন শেষ, এইবার তোমরা গিয়ে যা কিছু মুখে দিতে হয় দাও। যাও বৌমা, যোগাড়যন্ত্র কর।

[হেমনলিনীর প্রস্থান। একজন আত্মীয়ের উদ্গার তুলিতে তুলিতে প্রবেশ।]

আত্মীয় ॥ এই যে বাবা ধীরেন। ভাইপোর জন্মতিথিটা এমন জাঁকিয়ে করলে, যে, সবাই বলাবলি করেছে—বাপ কুলাঙ্গার হলে কি হবে, জ্যাঠারা নেই? ঠাকুরমা নেই? সবই হবে, ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা হবে।

ধীরেন ॥ থাক্ থাক্ মেসোমশায়। আপনার খেতে এত দেরি হল যে?

আত্মীয় ॥ তুমি তো জান না, তোমার মা ঠাকরুন রক্ষাকালী দেবী জানেন। এত আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে খাই যে, খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে পড়ব—হজম হবে, আবার জাগব—আবার খাব। আমি তো সবার সঙ্গে বসি না, আলাদা জায়গায় বসি। তোমার মা-এর চারিদিকে নজর। আমার জন্য পাতের কাছে একটা কান বালিশও রাখেন। তা চলি বাবা। ঐ কুলাঙ্গার কালুটার সুমতি হক, এই কামনাই আমি করে যাচ্ছি। দুর্গা-দুর্গা, দুর্গা শ্রীহরি—

[আত্মীয়ের প্রস্থান]

রক্ষা ॥ আর আমি সইতে পারি না বাবা।

ধীরেন ॥ সেই হতভাগার জন্য তুমি কি সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে মা?

রক্ষা : অঘোর বলে গেছে, যেমন করেই হক কালুকে এখানে একবার ধরে আনবেই আনবে। আমি তারই অপেক্ষা করছি।

[অপর একজন আত্মীয় পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

২য় আত্মীয় ॥ এই যে বড়মামা, অনেক রাত হল। আচ্ছা, এ কি ব্যাপার? ছেলের জন্মতিথি, অথচ বাপের দেখা নেই!

রক্ষা ॥ তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না গোপাল।

ধীরেন ॥ খাওয়া দাওয়া যখন হয়ে গেছে, যেতেও হবে অনেক দূর—আর দেরি করছ কেন?

গোপাল ॥ ঐ সেজ মামাকে একবারটি দেখে যেতে। ক্ল্যাসিক থিয়েটার খুলে বিগ বিগ নাটকে যা সব বিগ বিগ পার্ট করেছে, শহরে হৈ হৈ পড়ে গেছে। লোকের মুখে ফিরছে ওর নাম। তাই বড় ইচ্ছে ছিল, একটিবার পায়ের ধুলো নি। এত রাত হল, কখন আসবেন?

ধীরেন ॥ আর আসবেন। তুমি এখন বাড়ি যাও দেখি বাপু—বুড়ো বাপ-মা ভাবছেন।

গোপাল ॥ ভেবেছিলাম সেজমমাার কাছ থেকে। ডজন খানেক পাশ লিখিয়ে নেব।

ধীরেন ॥ (চটিয়া গিয়া) এটা তোমার থিয়েটার নয় গোপাল।

গোপাল ॥ (ভয় পাইয়া) ও হ্যাঁ, আচ্ছা যাচ্ছি।

[গোপালের প্রস্থান]

ধীরেন ॥ মা, তুমি বৌমাকে নিয়ে তোমাদের খাওয়া দাওয়া সব সেরে ফেল।

রক্ষা ॥ দুঃখ কি বাবা জানিস, নসুর জন্মতিথি। তা কিনা হতভাগা একবার এল না, ছেলের মাথায় হাত রেখে একটা আশীর্বাদ করে গেল না। ছেলের মা সারাটা দিন উপোস করে রয়েছে।

ধীরেন ॥ তা যদি বল মা, নাতির জন্মতিথিতে নিজেও তো দাঁতে কুটো কাটোনি। কুলাঙ্গার! আমি দারোয়ানকে সদর দরজা বন্ধ করতে বলে শুতে যাচ্ছি, তোমাদের এখন যা ইচ্ছে কর।

[ছুটিয়া আসিল হেমনলিনী]

হেম ॥ মা, ঐ যে অঘোরদাদা এসেছেন।

ধীরেন ॥ কিন্তু দেখছি একা।

[ধীরে ধীরে অঘোরনাথ সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অঘোর ॥ না জ্যাঠাইমা, ধরে আনতে পারলাম না। তারাসুন্দরীর সঙ্গে খুব গোলমাল চলছে।

রক্ষা ॥ জয় মা কালী। গ্রহটা যদি এইবার কাটে!

অঘোর ॥ না জ্যাঠাইমা। থিয়েটারে ওসব সিংহাসন শূন্যে থাকে না, একজন নামে আর একজন ওঠে। তারাসুন্দরী নামবেন—কুসুমকুমারী বসবেন। নতুন বই খোলা হচ্ছে, নাচ-গানের বই, নাম—'আলিবাবা'। নায়িকা—কুসুমকুমারী। তারই জোর রিহার্সাল হচ্ছে। বলল—এ বই নামানো মানে মর্যাদার ব্যাপার। আসবার উপায় নেই। আমার হাতে তার সব চেয়ে বড় সোনার মেডেলটা পাঠিয়ে দিয়েছে—নসুকে তার আশীর্বাদ। এই যে—

ধীরেন ॥ ওটা আশীর্বাদ নয়—ওটা অভিশাপ।

[ধীরেনের প্রস্থান]

রক্ষা ॥ না না, এমন দিনে অমন কথা বলতে নেই। বৌমা, নসু ঘুমিয়ে পড়েছে? তা পড়ুক। বাপের আশীর্বাদটা আজই ওর গলায় পরিয়ে দাও। আর দেখে যাও, নীচে কেউ খেতে বাকী আছে কিনা।

[অঘোরের হাত হইতে মেডেলটি লইয়া হেমনলিনীর হাতে
দিলেন রক্ষাকালী দেবী]

রক্ষা ॥ এস বাবা অঘোর, তুমি খাবে এস।

[রক্ষাকালী অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন, পিছনে পিছনে
গেলেন অঘোরনাথ]

হেম ॥ (মেডেলটি হাতে লইয়া করজোড়ে) জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ, থিয়েটারের দেবতা তুমি। ওঁর হাত দিয়ে যে মেডেল এল, তাতে নসু শুধু ওঁর আশীর্বাদই পেল না। সেই সঙ্গে পেল—তোমারও। জয় রামকৃষ্ণ—জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

[মেডেলটি বারবার হেমনলিনী মাথায় ছোঁয়াইতে লাগিল]

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

ক্ল্যাসিক থিয়েটারে হুসেনবেশী অমরেন্দ্রনাথের নিজস্ব কক্ষ।
অমরেন্দ্রনাথ একা বসিয়া একটি নাটকের খাতা
(Script) পড়িতেছেন। সতীশচট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

সতীশ ॥ কালু। যাক্, তবু তোমাকে একটু একলা পেলাম। একটা গোপন কথা আছে।

অমর ॥ বল। কিন্তু তার আগে বল, অভিনেতা অভিনেত্রীরা এখানে ওখানে বসে গুলতানি করছে। কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনা দেখছি। ব্যাপারটা কি ?

সতীশ ॥ সেইটে বলতেই তো এসেছি। আগে বাগমারীর বাগানবাড়িতে যখন রিহার্সাল হত, তখন মদ আর পেলেটির খানা দেওয়া হত। ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাবে যে সব সুখ-সুবিধা দেওয়া হত এখন এমন জমজমাট ক্ল্যাসিক থিয়েটারে সে সব সুখ-সুবিধা দেওয়া হবে না জেনে আর্টিস্টদের গোঁসা হয়েছে।

অমর ॥ এই কথা ! আচ্ছা, সে আমি রিহার্সালের আগে ওদের বুঝিয়ে বলব। তুমিও তো সব জান। না কি, তুমিই ওদের লীডার ?

সতীশ ॥ কী যে কও! এসব ফাজলামো ভাল লাগে না। আমি যাচ্ছি।

[সতীশেব প্রস্থান। আশুব প্রবেশ]

আশু ॥ স্যার, আমাকে ডেকেছিলেন ?

অমর ॥ হ্যাঁ আশু। তিনটে ফটো এনলার্জ করে বাঁধিয়ে আমাদের ক্ল্যাসিক থিয়েটারের লবীতে টাঙিয়ে রেখে দিতে বলেছিলাম। আমার ক্ল্যাসিক থিয়েটার খুলেছে এই ১৮৯৭ সালেই ১৬ই এপ্রিল। আজ এই সাত মাসেও তুমি তা পারলে না? বোধ হয় বেমালুম ভুলেই গেছ। কার কার ফটো টাঙাতে বলেছিলাম ?

আশু ॥ আজ্ঞে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, নটগুরু গিরিশচন্দ্র আর—আর—

অমর ॥ আর তৃতীয় লোকটি কে ?

আশু ॥ আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক মনে করতে পারছি না। বোধ হয়—তারাসুন্দরী—

অমর ॥ ইডিয়ট! নবীনচন্দ্র সেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রণেতা কবি নবীনচন্দ্র সেন। যিনি মিনার্ভা থিয়েটাবে তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকে আমার অভিনয় প্রথম দেখে নটগুরু গিরিশ ঘোষের সামনে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। যার জোরে এত বিপর্যয়ের মধ্যেও এই ক্ল্যাসিক থিয়েটারকে শ্রেষ্ঠ থিয়েটার করবার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমাদের নতুন বই 'আলিবাবা' যেদিন খুলবে সেদিন যেন এই ফটো তিনখানি দেখতে পাই। যাও—

[আশু যাইতেছিল]

অমর ॥ আচ্ছা শোন। তিনখানা নয়—চারখানা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নটগুরু ঘোষ, কবি নবীন সেন—আর—আর—আর—

আশু ॥ আর ?

অমর ॥ অভিনেত্রী তারাসুন্দরী—আমার মানসপ্রতিমা। মানে, আমার থিয়েটারের মানসপ্রতিমা।

আশু ॥ (মাথা নিচু করিয়া) শুনেছি, উনি নাকি এ থিয়েটার ছেড়ে দিচ্ছেন!

অমর ॥ দিতে হয়—দিন। কিন্তু যেটা সত্য—সেটা অক্ষয় হয়ে থাক্ আশু। যাও—

[অঘোরনাথ পাঠকের প্রবেশ]

অঘোর ॥ কালু, একটা কথা বলতে এসেছি।

অমর ॥ বলুন অঘোরদা।

অঘোর ॥ তারাকে নাকি তুমি ছেড়ে দিচ্ছ ?

অমর ॥ অঘোরদা, আমি জানি আমার অনেক দোষ। বাল্যকাল থেকেই উচ্ছৃঙ্খল—কৈশোর থেকেই আমি চরিত্রহীন। দত্ত বংশের মান-মর্যাদা আমি ধূলিস্যাৎ করেছি। মনের মত থিয়েটার খোলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে লক্ষ টাকা উড়িয়েছি, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু খুইয়েছি। কিন্তু সত্যকে কখনও খোয়াইনি। আপনি আমার অতি আপনজন। আপনি আমাকে ছোটবেলা থেকে জানেন। বলতে পারেন, আমি মিথ্যা বলেছি কখনও ?

অঘোর ॥ না। অন্ততঃ আমি তোমাকে কখনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে দেখিনি কালু।

অমর ॥ আপনি জেনে রাখুন, তারাসুন্দরীকে আমি ছাড়াইনি। তারাসুন্দরীই ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে। যাচ্ছে তার পুরানো স্টার থিয়েটারে। যে স্টার থিয়েটার আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

অঘোর ॥ থিয়েটারে দল ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়েই থাকে, নতুন কিছু নয়! সত্যি কথা বলতে কি, এটা একটা আত্মবিকাশের প্রতিযোগিতা। আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা যেখানে পাবে, আর্টিস্ট সেখানেই যাবে। আমিও তোমাকে আজ নোটিশ দিচ্ছি। 'আলিবাবা'য় আমি থাকছি না, আমি স্টারে যোগ দিচ্ছি।

অমর ॥ কাউকে আমি বাধা দেব না অঘোরদা। সাধাসাধি করে আমি কাউকে ধরে রাখব না। আপনি শুধু আমাকে আশীর্বাদ করে যান দাদা—যে ইষ্টের সন্ধানে আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করে উন্মাদের মত ছুটে চলেছি, সেই ইষ্ট যেন আমার লাভ হয়।

অঘোর ॥ কায়মনোবাক্যে সে আশীর্বাদ আমি তোমাকে করছি। পরম শ্রদ্ধেয় অমর্ত বসু স্টারের উদ্বোধনের দিন একটা কবিতায় বলেছিলেন—

'ধর্ম' প্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়
ধর্ম' রঙ্গালয়'
তুমি সেই ধর্ম' রঙ্গালয় স্থাপন করে তোমার অমর নাম সার্থক কর।

[অঘোরনাথ প্রস্থান করিবেন, এমন
সময় তারাসুন্দরীর প্রবেশ]

অঘোর ॥ এই যে তারা, কালুকে আমার যা বলবার ছিল—আমি বলেছি। তুমি যা বলবে, বলে এস। আমি কি তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করব ?

তারা ॥ না পাঠকমশাই, ভূতনাথবাবু আমাকে স্টারে নিয়ে যাবে বলেছে।

অমর ॥ আপনি ভাবছেন কেন অঘোরদা ? এ বাবা ভূতনাথ, শাঁ করে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

অঘোর ॥ (হাসিতে হাসিতে) ও, তাও তো বটে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে! হাঃ হাঃ হাঃ—

[অঘোরনাথের প্রস্থান]

অমর ॥ তাহলে স্টারে আজই জয়েন করছ ?

তারা ॥ হ্যাঁ।

অমর ॥ (হাসিয়া) মুঙ্গের—গঙ্গাজল—প্রতিজ্ঞা !

তারা ॥ হ্যাঁ। মুঙ্গের। গঙ্গাজল। প্রতিজ্ঞা।

অমর ॥ ক্ল্যাসিক থিয়েটারের এই সাত মাসে ঐতিহাসিক নাটক—পলাশীর যুদ্ধ, হরিরাজ ; মিলনান্ত নাটক—দেবীচৌধুরানী, রবীন্দ্রনাথের বিয়োগান্ত নাটক—রাজা ও রানী, পৌরাণিক নাটক—নল দময়ন্তী, দক্ষযজ্ঞ ; সামাজিক নাটক—হারানিধি, তরুবালা ; ভক্তিমূলক—বিল্বমঙ্গল, ধর্মমূলক—বুদ্ধদেব চরিত—দশ দশটা নাটকে তুমি আর আমি অভিনয় করেছি। নাম খ্যাতি যশ দুজনেরই হয়েছে প্রচুর—অজস্র। দর্শকদের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। কিন্তু বেশির ভাগ দর্শকই পাশ-এর দর্শক, টাকা দিয়ে টিকিট কেনা দর্শকের ভিড় আমাদের হচ্ছে না। জান তুমি ?

তারা ॥ জানি।

অমর ॥ উপায়ান্তর না দেখে গুরুগম্ভীর নাটক ছেড়ে দিয়ে, নাচ গানের তরল নাটক 'আলিবাবা' অভিনয় করে যখন আমি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্কট রুখতে যাব, তখনই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ !

তারা ॥ হ্যাঁ। যাচ্ছি।

অমর ॥ প্রতিজ্ঞাটা ভাঙল কে, আমি না তুমি ? (হাসিয়া) কামনার

খন থিয়েটারটা বাঁচাতে কুসুমকে এনেছি দেখে মুঙ্গেরের গঙ্গাটা নর্দমা হয়ে গেল, না ?

তারা ॥ অমরবাবু ! অমর ! তুমি যে আর কাউকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসবে—আমি তা—হ্যাঁ—তা আমি সইতে পারব না—পারছি না। তাই —আমি—হ্যাঁ, আমি—তাই চলে যাচ্ছি। (পাগলের মত হাসিতে হাসিতে) এতটুকু নতুন কিছু করছি না। এমন তো আমরা কত নাটকে অভিনয় করেছি। কিন্তু সে সব অভিনয় যে নিজের জীবনে এমন সত্য হবে—তা কখনো ভাবিনি, ভাবতে পারিনি। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে ছেড়ে যাওয়া।

অমর ॥ কিন্তু ঐ ভূতনাথ ?

তারা ॥ ভেবেছিলাম ওকে আঁকড়ে ধরলে—মনটা তোমার জ্বলবে। তা দেখলাম, এতটুকু জ্বালা নেই। আর তখনই বুঝলাম, কুসিরই হয়েছে জয়—আর আমার পরাজয়। কিন্তু এ নিয়ে আমি দুঃখ করব কার কাছে ? বিচার চাইব কার কাছে ? বেশ্যার ভাগ্যই এই। আমি এইবার চলি। যদি কখনও দরকার হয় আমাকে ডাকলেই আসব।

[দরজার আড়াল থেকে আশু]

আশু ॥ আসতে পারি স্যার ?

অমর ॥ এস।

আশু ॥ এই যে তারাদি। আপনার সবচেয়ে ভাল ফটোটা আমাদের দরকার।

তারা ॥ কেন বল তো ?

অমর ॥ আশু, তোমার তারাদির ফটো আমার কাছে যা আছে, তারাদির কাছে তা নেই। তা ছাড়া, ওর সবচেয়ে ভাল যে ফটো, সেটা আমিই তুলেছিলাম মুঙ্গেরে কষ্টহারিনী গঙ্গার ঘাটে। সে ফটো। আমার কাছেই আছে, ওর কাছে নেই। তোমাকে এই ফটো আমি দেব। এখন রিহার্সালের ঘণ্টা দাও।

তারা ॥ (আশুকে) ব্যাপার কি, ফটো ?

আশু ॥ আসুন বলছি।

[আশু ও তারা বাহিরে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে সতীশের প্রবেশ। রিহার্সালের ঘণ্টাও বাজিল]

সতীশ ॥ আর্টিস্টদের বুঝিয়েছি। সবাইকে প্রায় দ্বিগুণ মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছ, বেনিফিট নাইট চালু করছ! এসব কথা শুনে সবাই মদ আর পেলেটির খানার দাবিটা আপাততঃ শিকেয় তুলে রেখে, সব হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে গুটি গুটি ড্রেস রিহার্সালের সাজসজ্জা নিতে গেছে। কিন্তু ভাই, থিয়েটারে নিজের

পয়সায় মদ খাওয়া, সেটা বাপ্‌ বন্ধ করতে যেও না। তবে কিন্তু আমি চলে যাব।

অমর ॥ কি যে বলিস! তবে কি আমিই থাকতে পারব রে? তবে হ্যাঁ, ধীরে ধীরে ওটা তুলে দিতে হবে। মদ ছাড়তে পারছি না সত্যি, কিন্তু নট-নটীর জীবনে মদের মত শত্রু নেই, সেটা বুঝতে বাকী নেই। দেখ, ড্রেস রিহার্সালের কতদূর।

সতীশ ॥ দেখছি।

[সতীশ দরজা খুলিতেই মরজিনাবেশিনী কুসুমকে দেখিয়া]

সতীশ ॥ মরজিনা যখন তৈরী—

কুসুম ॥ হ্যাঁ মশাই, শুধু মরজিনা তৈরী নয় —তৈরী হয়েছে প্রায় সবাই। বাকী শুধু হুসেনসাহেব।

[সতীশেব প্রস্থান। কক্ষমধ্যে কুসুমেব প্রবেশ]

কুসুম ॥ ও, জনাবও তৈরী॥ বন্দেগি জনাব।

অমর ॥ চমৎকার মানিয়েছে!

কুসুম ॥ দাসী বাঁদির আবার মানামানি কি! বরং মানিয়েছে হুজুরকে। তারাবিবি বলছিল—

অমর ॥ তারা তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে গেল বুঝি॥

কুসুম ॥ তা কেন নেবে না, এত দিনের একটা সম্বন্ধ তো!

অমর ॥ আমার কথা কি বলছিল?

কুসুম ॥ বলল—"আমার যা বলবার, বাবুকে বলে বিদায় নিয়ে এসেছি। খালি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটা বলে যাচ্ছি তোকে। দেখ কুসি, শোবার আগে বাবুকে রোজ এক ফোঁটা কালীফশ ওষুধটা খাইয়ে দিবি। নতুবা ঘুমের ঘোরে এমন গোঙাবে, আঁতকে উঠতে হয়।"

অমর ॥ (সকৌতুকে) ও!

কুসুম ॥ হ্যাঁ, তাই তো বলল।

অমর ॥ তুমি কি বললে?

কুসুম ॥ বললুম—তোমাকেও বলে রাখছি ভাই, ভূতনাথবাবুরও ঠিক এ ব্যারাম। উনি আবার শুধু গোঙান না, কামড়ান। কোন ওষুধে থামে না, ধরে ঠ্যাঙাতে হয়।

অমর ॥ তা তুমি ঠ্যাঙাতে নাকি?

কুসুম ॥ রোগীকে তা বলব কেন? আমার দাওয়াই হচ্ছে—যখন যেমন, তখন তেমন।

অমর ॥ আমি গোঙাই কিনা জানি না। কিন্তু আমার থিয়েটারটি গোঙাচ্ছে। তোমার কথাতেই 'আলিবাবা' খুলছি। আমার ভাগ্যের পাশা খেলায়, আমার শেষ দানটি—তুমি।

কুসুম ॥ ভাববেন না অমরবাবু। দেখবেন—'আলিবাবা'তেই আপনার বাজি মাৎ।

অমর ॥ তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক কুসুম। এবার ড্রেস রিহার্সাল।

[ড্রেস রিহার্সালের ঘণ্টা বাজিল]

কুসুম ॥ ও মশাই, কে আপনি—ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

অমর ॥ না না, ওদিকে যাবেন না। ওটার কর্তার ঘর।

কুসুম ॥ বা রে, এ তো বেশ—শুনছে না!

অমর ॥ তবু এগিয়েই চলেছে—!

কুসুম ॥ আঃ, তোমরা করছ কি! লোকটাকে গলাধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও।

নেপথ্যে লোকটা ॥ আমি রাখহরি। তোমাদের কর্তা আমাকে চেনেন।

অমর ॥ ব্যাপার কি!

[রাখহরি এক ধাক্কা খাইয়া অমরের সামনে আসিয়া পড়িলেন]

রাখ ॥ ওরে বাবা! আপনি আবার কে? আমি অমর দত্তকে চাইছি?

অমর ॥ একি মাস্টারমশাই! কি চাই বলুন, আমিই অমর দত্ত।

রাখ ॥ রাজা সেজেছ? আমি শুনেছি, তুমি এখন থিয়েটারের রাজাই হয়েছ। আমি তোমার ছোটবেলার সেই রাখহরি মাস্টার।

অমর ॥ এত বেত খেয়েছি, কেন চিনব না! কিন্তু এখন এখানে কেন?

রাখ ॥ হ্যাঁ। দারুণ বিপদে পড়ে, তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে কত গলাধাক্কা খেয়ে তবে তোমায় এই পেলাম বাবা। তোমার গুরুমার কলেরা। চিকিৎসার খরচা নেই। অবস্থা এখন তখন। আমার এতকালের সাথিটা আমার চোখের উপর মরে যাচ্ছে।

অমর ॥ না না না, মরবেন কেন! আশু—আশু এখানে আছ?

[আশু সামনে আসিয়া দাঁড়াইল]

আশু ॥ বলুন স্যার।

অমর ॥ ক্যাশ থেকে ওকে এখুনি শ'খানেক টাকা দিয়ে দাও।

আশু ॥ ক্যাশে ওই শ'খানেক টাকাই আছে স্যার, আজকের রিহার্সালের খরচা—

অমর ॥ যা হয় হবে। আর দেরি না করে ঐ টাকাটাই দিয়ে দাও। আর, আমার এই আংটি দুটো কোথাও রেখে আজকের রিহার্সাল খরচ চালিয়ে নাও।

বাখ ॥ না না, তবে থাক। এত লোকের অসুবিধা করে আমার একটি লোক বাঁচুক, এও আমি চাই না। চলি বাবা।

কুসুম ॥ না না, আপনি যাবেন না। (অমরকে) তাবাদিব কাছে আমি কিছু টাকা পেতাম, সেটা তিনি আজ আমাকে এখানে দিয়ে গেছেন। আমি ঐ একশো টাকা দিচ্ছি।

[কুসুম একশো টাকাব একখানি নোট বাহির করিল
এবং রাখহরিকে দিল]

বাখ ॥ ইনি বুঝি তোমাব বেগম বাবা ?

কুসুম ॥ না না, আমি কোন বেগম নই। আমি এক বাঁদি।

বাখ ॥ যেই হও, তুমি আমার মা। তোমার জয় হক। আমি চলি মা।

কুসুম ॥ আপনাব আশীর্বাদ যখন পেলাম, জয় আমাদের হবেই।

অমব ॥ গুবুমার খববটা দেবেন।

বাখ ॥ দেব দেব। অমব, তুমি অমর হও বাবা।

[ছুটিযা বাখহবির প্রস্থান]

অমব ॥ সবাই চল রিহার্সালে।

[ভিড় সবিযা গেল]

অমব ॥ এ টাকা তুমি কালই পাবে কুসুম।

কুসুম ॥ না অমরবাবু। আমার কথাতেই আপনি 'আলিবাবা' বইটা ধরেছেন। টাকাটা ফেবত দিয়ে যে আশীর্বাদটা এই মাত্র পেয়েছি তা কেড়ে নেবেন না।

অমব ॥ বেশ। কুসুম, তোমারই জয় হক। তোমার জয়েই আমার জয়।

[কুসুমকে বুকে লইযা শিবচুম্বন]

[কালক্ষেপক অন্ধকারে কনসার্টের পর 'আলিবাবা'-র ড্রেস রিহার্সাল]

(আলিবাবা'র নির্বাচিত অংশ)

আলিবাবা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

(মরজিনার প্রবেশ)

—গীত—

"ছি ছি, এত্তা জঞ্জাল
এত্তা বড়া বাড়ি মে এত্তা জঞ্জাল।
হরদম্ লগতা ঝাড়ু তব্ বি অ্যায়শা হাল্ ?
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান।
জঞ্জাল পূরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম্
ময়লা মোকাম্—
বড়ি ময়লা মোকাম্
ময়লা মাণিম্ মেরা—লেংরা বেচাল
দিল্ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামে হাল ?"
আবাদালা ! আবদালা !
আবদালা !! (নেপথ্যে) হুজুর—জনাব—খোদাবন্দ।

(আবদালার প্রবেশ ও গীত)

"আয়া হুকুম বরদার্।
আয়া হুকুম বরদার্ !!
বড়ি কামপিয়ারা হরদম্ লেও ভরপুর কামদার !!
দেখো যেত্তা কালা রং
আখের তেত্তা জবর ঢং
সারা ঝট্‌পট্ কাম্ করনেওয়ালা সাচ্চা সমজদার।
বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার ?"
(গীতান্তে) আরে কে-ও ? বেগম সাহেব ? মরজিনা খানুম ?

মর ॥ যেদিন বেগম হব সেদিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।

আব ॥ আঃ, বাঁচলেম। বড় শখ ছিল, একদিন তোর হাতের কোড়া খাই। আল্লার কিরে, বলে রাখছি, যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মর ॥ বড় মসকরা কচ্চিস যে। আমি বেগম হতে পারি না ?

আব ॥ দেখ বাঁদী—থুড়ি বিবি থুড়ি রোগ নেই, শোক নেই—খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে, হেসে হেসে মরে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে ? ও কথা হাড়ান দাও, বিবি সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মর ॥ ফের মসকরা ? তবে আমি যেমন করে পারি বেগম হব।

আব ॥ আমিও কণ্ঠায় কণ্ঠায় মার খাব।

মর ॥ আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।

আব ॥ ইস ! তাই বটে, আমার পিঠটে সড়সড় করছে !

সাকিনা ॥ (নেপথ্যে) মরজীনা !

মর ॥ বিবিসাহেব।

আব ॥ মরজিনা, একটু আড়াল কর, পালাই।

মর ॥ চললি কেন ? একটা কথা আছে, শোন না !

আব ॥ এর পর বিবিজান, আমার হাই উঠছে ! বেগম সাহেবের হাঁক শুনলেই আমার (নিদ্রার অভিনয়) তোবা তোবা।

[আবদালার প্রস্থান। সাকিনার প্রবেশ]

সাকিনা ॥ কোথায় তুই মরজীনা ?

মর ॥ হুকুম বিবিসাহেব।

সাকিনা ॥ আবদাল্লা পাজী কোথায় গেল ?

মর ॥ তোমার কথা শুনে পালাল।

সাকিনা ॥ কাসিমকে বলে তাকে বেচে ফেলতে হবে। তার বড় আস্পর্ধা বেড়েছে।

মর ॥ কোন কাজ আছে কি ?

সাকিনা ॥ একবার আলির স্ত্রীর কাছে যা ত। বলে আয়, আজ আমাকে পাঁচ মণ কাঠ দিতে হবে।

মর ॥ আচ্ছা।

[মরজিনার প্রস্থান]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[বনপ্রান্তস্থ কুটির]

আলিবাবা, হুসেন।

হুসেন ॥ হ্যাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাটতে চলেছ ?

আলি ॥ কি করি বাবা ! তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইল না। বুঝি বনে চির বনবাস করতে হয়।

হুসেন ॥ কেন ?

আলি ॥ ওই যে আসছেন, ওর মুখে শুনলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখন।

(ফতিমা ও মরজিনার প্রবেশ)

আলি ॥ কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হল ?

ফতিমা ॥ আজ পাঁচ মণ।

মর ॥ আর দু'মণ ফাউ, আধ মণ কাঠের চাকলা—সেটা কি বলব বাছা ?

আলি ॥ সেটা কি আর বলতে আছে ? ব্যবসা করতে গেলে দু'একমণ এদিক ওদিক হয়।

ফতিমা ॥ নাও নাও, তামাশা কর না। এই দাম নাও—নিয়ে বাজার করে আন। ওকি, তুমি আবার কুড়ুল কাঁধে করেছ যে ?

আলি ॥ ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। ওটার দিকে নজর কর না। ইস, আজ যে অনেক টাকা রোজগার করেছ দেখছি। এই সাড়ে সাত মণ আট মণ কাঠের দাম এক টাকা ছ' পয়সা ?

মর ॥ তাই বা কৈ ? আমার এখনও দস্তুরি পাওনা।

ফতিমা ॥ বটে বটে, বাছাসেটা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে এই ছটা পয়সা

মর ॥ (হুসেনের প্রতি) এই ছটা পয়সা তোমাকে বক্শিশ করলুম বাবু সাহেব। এমন উপযুক্ত সন্তান তুমি, বাপ রোজগার করে আনে, তুমি খাটিয়েও খেতে জান না। কাঠগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে পার না ? আমার মনিব, আমি বলতে পারি না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয়, তাও দেখতে পারি না।

ফতিমা ॥ ঠকায় নি মা—ঠকায়নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই নেয়, তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে ?

আলি ॥ তবে বলে নেয় না কেন ?

ফাতিমা ॥ বড়মানুষের মেয়ে চাইতে যদি একটু লজ্জা হয়—তা হলে একটু আধটু গোলমাল করে নিতেও বা দোষ কি? দাম যে দেয় এই যথেষ্ট। না দিলে কি করতুম? ও যদি বড়মানুষের মেয়ে না হত, তোমার ভাই যদি রোজগার করতে না পারতো, তা হলে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হত। আমি সব বুঝি—বুঝে চুপ করে থাকি—নাও এস। নেহাতই যাও তো একটু সরবৎ খেয়ে যাও।

[আলি ও ফাতিমার প্রস্থান]

হুসেন ॥ মরজিনা, আমাদের অবস্থা দেখে তোর মনে কষ্ট হয়েছে?

মর ॥ একটু একটু হয়েছে বৈকি।

হুসেন ॥ আচ্ছা মরজিনা—

মরজিনা ॥ কি? বলতে বলতে থামলে কেন?

হুসেন ॥ এই তু-তু-তু—

মর ॥ বলতে কি সরম হচ্ছে?

হুসেন ॥ না সরম কেন—সরম কেন? এই তুই কি আমাদের ভা—ভা—ভা—

মরজিনা॥ ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছ?

হুসেন ॥ হি হি হি—হ্যাঁ মরজিনা।

মরজিনা ॥ একটু একটু বাসি বৈকী।

হুসেন ॥ তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তা মরজিনা!

মর ॥ কি?

হুসেন ॥ তা—তা—তা—মরজিনা!

মর ॥ আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হুসেন ॥ দাঁড়াইনি, দাঁড়াইনি—এই চলে যাচ্ছি? তা মরজিনা?

মর ॥ কি?

হুসেন ॥ তু—তু—আমা—না—না—তুমি সরবৎ খাবে?

মর ॥ বুঝেছি, বুঝেছি পালাও, পালাও, আবদাল্লা আসছে।

হুসেন ॥ অ্যাঁ—অ্যাঁ—আবদালা? তা মরজিনা!

মর ॥ তা হয় না হুসেন—আমি বাঁদী।

হুসেন ॥ খোদা, মরজিনাকে ফুরসৎ দাও—মরজিনাকে রানী কর—মরজিনা

মর ॥ পালাও, পালাও!

হুসেন ॥ তা হলে মরজিনা?

মর ॥ আবার মরজিনা? হা আল্লা!

হুসেন ॥ হা আল্লা!

[হুসেনের প্রস্থান। আবাদালার প্রবেশ]

আব ॥ আইয়ে বেগম সাহেব। ওদিকে হুজুরের জরুরী তলব পড়েছে।

—গীত—

আব ॥ 'আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি—
আমি বাদশা বনেছি—'

মর ॥ 'বেশ হয়েছে আয় তবে তোর ল্যাজটা ছেঁটে দি ॥
বান্দা বানর বাদশার ল্যাজ লোকে বলবে কি ?'

আব ॥ 'থাক ল্যাজ, তুই চটপট আয় বেগম করে নি। এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবিনি।

মর ॥ পাব না কি ? বলিস কি রে ? ও কি কথা রে—'ওরে তোর জন্য তক্তাউস কফিন কিনেছি, কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি।'

আব ॥ আমি বাদশা বনেছি'

মর ॥ 'আমি বেগম হয়েছি'

উভয়ে ॥ 'বাদশা-বেগম ঝমঝমাঝম বাজিয়ে চলেছি :

॥ নবম দৃশ্য ॥

ক্ল্যাসিক থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথের অফিস ঘর।
কাল ঃ সন্ধ্যা। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অঘোরনাথ
পাঠকসহ সতীশের প্রবেশ]

সতীশ ॥ আপনারা স্যার বসুন। বাবু এখনি এসে যাবেন। রিহার্সালের সময় হয়ে গেছে তো। আজ আমাদের সবাইকে নিয়ে জরুরী মিটিং করবেন তাও বলে রেখেছেন। আপনারা স্যার বরং বসুন, আমি দেখছি।

[সতীশ ইঁহাদের অলক্ষ্যে মদের বোতল, গ্লাস ইত্যাদি লুকাইতে ব্যস্ত হইল।
অবশ্য ইঁহারা দু'জনে আড়চোখে তাহা দেখিলেন]

সতীশ ॥ ঐ যে একটা গাড়ির শব্দ পাচ্ছি, আমি দেখছি।

[সতীশ ছুটিয়া পলাইল]

ধীরেন ॥ থিয়েটার না মদের দোকান বোঝা মুশকিল।

অঘোর ॥ তা আর কি হবে! স্বয়ং নটগুরু গিরিশচন্দ্র—তিনি যদি মদ খাওয়া ছাড়তেন, তবে হয়ত থিয়েটারে মদটা বন্ধ হতে পারত। তাঁর দেখাদেখি সবাই মা কালীর প্রসাদ বলে চালিয়েছেন। কিন্তু দেখছি, কালু এটা বন্ধ করতে চেষ্টা করছে।

ধীরেন ॥ দেখ পাঠক, থিয়েটার দেখতে আমিও খুব ভালবাসি। তোমাদের নাটের গুরু গিরিশচন্দ্র তো আমাদের আত্মীয়। ওঁর ইচ্ছা হল আমি একটা থিয়েটার খুলি। আমি প্রায় রাজীও হয়েছিলাম। উনি আমাকে স্টার থিয়েটারের ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ঢলাঢলি দেখলাম, তাতে এত বিরক্ত হলাম যে, তার পরদিন যখন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখাই করিনি। তিনি রেগে বলে এসেছিলেন, আমাদের বংশে তিনি থিয়েটার আনবেনই আনবেন। তা তিনি এনেওছেন।

অঘোর ॥ হ্যাঁ, কালুও তাঁকে গুরুর সম্মানই দেয়—পরামর্শাদি নেয়। কিন্তু অভিনয়টা তাঁর কাছে শেখেনি। লোকে বলে অমর দত্তর অপূর্ব এই অভিনয়, তার নিজের বৈশিষ্ট্য। থিয়েটারে শিক্ষানবিস না করে বাইরে থেকে এসে এই থিয়েটারিচক্রের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই অমর। এক 'আলিবাবা' নাটক করেই অমরের ক্ল্যাসিক থিয়েটার লাভ করেছে লাখ টাকা। আলিবাবার পর যে নাটকই খোলা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে অমর দত্ত ছাড়া একা একজনের নামে থিয়েটারে এত বিক্রি এখন আর কারও নাই।

ধীরেন ॥ এতে আমি খুশী। গিরিশবাবু এ আনন্দ করতে পারেন যে, আমাদের বংশের কাউকে পাকে প্রকারে থিয়েটারে নামিয়েছেন। কিন্তু তার কাছে তাঁকে হার স্বীকারও করতে হয়েছে অনেক বিষয়। কালু আমাদের কুলের কলঙ্ক—কিন্তু কালু আমাদের কুলের গৌরবও। না অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি এখন চলি। ওকে বল তো কালু যেন আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করে। খুব জরুরী একটা দরকার আছে।

[ধীরেন্দ্রনাথ উঠিলেন, অঘোরও দাঁড়াইলেন। এমন সময়
ছুটিয়া সতীশের প্রবেশ]

সতীশ ॥ আমাদের বাবু এসে গেছেন।

[অমরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। তিনি সোজা গিয়া ধীরেন্দ্রনাথের
পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন]

অমর ॥ আমি কখনও ভাবতে পারিনি বড়দা—আপনি এখানে আসবেন।

ধীরেন ॥ তবেই বোঝ, ব্যাপারটা গুরুতর। একটু গোপনীয় কথা আছে।

[শোনামাত্র অঘোর ও সতীশের প্রস্থান]

অমর ॥ কি বড়দা ?

ধীরেন ॥ কলকাতার কোন কোন বস্তিতে প্লেগ হয়েছে। কলকাতার লোক-জনের মধ্যে পালাই পালাই ভাব এসে গেছে—অনেকে পালানো শুরুও করেছে।

অমর ॥ জানি বড়দা। আমাদের থিয়েটারের সেল এ হপ্তায় খুব পড়ে গেছে। গিরিশবাবু আমাকে ডেকেছিলেন। আমি সেখান থেকেই আসছি।

ধীরেন ॥ তিনি কি বললেন ?

অমর ॥ বললেন—এমন সংক্রামক রোগ আর নেই। প্লেগ হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। দলে দলে যখন লোক পালাচ্ছে, থিয়েটার দেখবে আর কে ? তা ছাড়া এরকম সংক্রামক ব্যারামের সময় থিয়েটারের বন্ধ ঘরে জনসমাবেশ বিপদজনক।

ধীরেন ॥ হুঁ তারপর ?

অমর ॥ বললেন—কলকাতার সব থিয়েটারই এখন বন্ধ রাখা উচিত।

ধীরেন ॥ হুঁ, তারপর ?

অমর ॥ গিরিশবাবু সদলবলে কলকাতার বাইরে রাজসাহী চলে যাচ্ছেন। সেখানে অভিনয় করবেন।

ধীরেন ॥ তুমি কি করবে কালু ?

অমর ॥ না বড়দা, আমি বলে এলাম, থিয়েটার বন্ধ করব না। বরং, প্লেগ রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য আমার থিয়েটারের দলবল নিয়ে লেগে যাব। আমি প্লে-ও বন্ধ রাখব না। কিছু না কিছু লোক হবেই। এই প্লেগের আতঙ্কের মধ্যেও গেল শনিবার আমার লেখা নতুন গীতিনাট্য 'দোল-লীলা' প্রায় ফুল হাউসে প্লে হয়েছে। বড়দা, ঠাকুরের কৃপায় এ বিশ্বাস আমার এসেছে—আমি যদি বনে গিয়েও প্লে করি, তাও দর্শকের অভাব হবে না। তা ছাড়া আমার এখানকার প্লে হবে চ্যারিটি। সেলের সব টাকাটাই রোগীর সেবায় আর মৃতের সৎকারে খরচ করে যাচ্ছি।

ধীরেন ॥ অথচ তুমি যাতে এই প্লেগের সময়টাতে আমাদের সঙ্গে কাশী গিয়ে থাক, সেইজন্যই আজ আমি এখানে এসেছি। জানবে—এটা মা-র ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা, বৌমার তো বটেই।

অমর ॥ বড়দা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এ আদেশ করবেন না। আপনি জানুন এবং আর সবাইকে বলবেন—এ আমি যা করছি, এ ঠাকুর রামকৃষ্ণের ইচ্ছা।

ধীরেন ॥ এর পর আর কোন কথা বললে, তোর এই বড়দা বড় ছোট হয়ে যাবে রে কালু।

[অমর পুনরায় ধীরেনের পদধূলি লইলেন, ধীরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথকে বুকে টানিয়া লইলেন]

অমর ॥ না, না বড়দা। আপনি আমার বড়দা আছেন, চিরদিন বড়দাই থাকবেন।

ধীরেন ॥ তোর বড়দার শুধু একটা আদেশ রইল কালু, অসুখ-বিসুক করলে কিংবা তোর নিজের জন্য টাকার দরকার হলে আমি যেন যথাসময়ে খবর পাই। আমি জানি ঠাকুরই তোকে রক্ষা করবেন। চলি—

[অমরেন্দ্রনাথ সহ ধীরেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেলেন।
কিন্তু পরক্ষণেই একটি ভিখারি এবং একটি পুলিস-
অফিসার সহ অমরেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ]

অমর ॥ আরে মিস্টার চৌধুরী, থানার মালিক আপনি। এমন একটা মশা মেরে হাত কালি করছেন কেন?

পুলিস-অফিসার ॥ না অমরবাবু, এই সব ছিঁচকে চোরগুলোই পরে ডাকাত হয়। প্লেগের ভয়ে লোকজন সব পালাচ্ছে, জিনিস-পত্রের দিকে নজর রাখতে পারছে না। সেই ফাকে লোকের দামী জিনিসপত্র সব হাতিয়ে নিচ্ছে। দেখুন দেখি, এই পাঁচ সাত শো টাকা দামের কাশ্মীরি শাল হেদুয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করছিল। চোরাই মাল সন্দেহ হওয়াতে লোকে চেপে ধরেছে। লোকের ভিড় দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সব শুনে দু'ঘা লাগাতেই বলে কিনা আপনি নাকি এত দামী এই শাল ওকে দান করেছেন।

ভিখারি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।

অফিসার ॥ চোপরও! অত দামী শাল! আমি যে থানার মালিক, আমাকেও প্রেজেন্ট করেন নি কোনদিন—আর তুই কিনা রাস্তার এক কুকুর—

অমর ॥ হ্যা, শালটা দেখছি আমারই। এই দেখুন, লেখা রয়েছে—এ, ডি, অমর দত্ত।

অফিসার ॥ তবেই দেখুন, আমি ধরলুম বলেই এত বড় একটা শাল চুরির কিনারা হল। এই ব্যাটা থানায় চল।

ভিখারি ॥ কত্তা, আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না কত্তা? আজ্ঞে আমি রাজা, আমি আপনার থিয়েটারের সামনের ফুটপাতে মাগ-ছেলে নিয়ে বাসা বেঁধে ভিক্ষে করে খাই। গেল মাঘ মাসে খোলা ফুটপাতে শেষরাতে হাড়-কাঁপানো শীতে হু-হু করে আমরা কাঁপছিলাম দেখে, আপনার গায়ের এই শালটা দিয়ে আমাদের ঢাকা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন কত্তা। এখন বলুন, এটা আমি চুরি করেছি?

অমর ॥ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এই জন্য—পরদিন তুমি ঐ শালটা সুন্দর করে ভাঁজ করে আমায় ফিরিয়ে দিতে এসেছিলে। না—না মিস্টার চৌধুরী, এ চোর নয়। বরং বলব—এ দাতা। কর্তব্যবোধে ও একটা শালও দান করতে পারে। ওকে ছেড়ে দিন।

অফিসার ॥ যা ব্যাটা ভাগ, তুই বেঁচে গেলি।

অমর ॥ দাঁড়াও। তোমার এই শালটা তুমি বিক্রি করতে চাইছিলে কেন রাজা?

রাজা ॥ আমার পরিবার কয়—প্লেগ লাগল, সবাই পালাচ্ছে। পালাতে গেলেও তো টাকা চাই! রেলভাড়া, খাওয়া-দাওয়া—পাব কোথায়?

অমর ॥ কেন পালাবে? আমি বলি—পালাসনে। পালিয়ে যেখানে যাবি, সেখানেও তো ব্যারাম পীড়া আছে রে। তার চেয়ে এখানেই থেকে যা। জানবি, রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে!

রাজা ॥ খাঁটি কথা করেছেন কত্তা। লাখ কথার এক কথা।

অফিসার ॥ কি আশ্চর্য! প্রাইভেটলি আপনাকে বলছি আমিও আমার ওয়াইফকে ঠিক ঐ কথা বলেই কলকাতায় আটকে রেখেছি। স্টাফের কাছে অবশ্য বলি—ড্যাম ইওর প্লেগ! আচ্ছা চলি, বাই বাই।

[অফিসার যাইবার সময় হঠাৎ ফিরিয়া ভিখারিকে বলিলেন]

অফিসার ॥ শালটা যদি বিক্রিই করিস, আমাকেই করিস। আমার ভারি পছন্দ হয়েছে।

অমর ॥ আপনার মত পুলিস অফিসার কোনকালে কিছু কেনেন নাকি। না না, ওকে ওভাবে আর মারবেন না। ওর চেয়েও ভাল একটা শাল আমি আপনাকে প্রেজেন্ট করব। আপনি ভাববেন না।

রাজা ॥ এই শাল আর আমি বিক্রি করি! এ শাল এখন আমার প্রাণের চেয়েও বেশী।

অফিসার ॥ আচ্ছা অমরবাবু, বাই বাই—

অমর ॥ নমস্কার—

[পুলিস অফিসার প্রস্থান করিলেন। ভিখারি রাজা
অমরেন্দ্রনাথের পায়ে পড়িল]

রাজা ॥ আমাকে খুব বাঁচিয়েছ কত্তা।

[অমর রাজাকে ধরিয়া তুলিলেন]

রাজা ॥ আমি যাব না, কোনখানে যাব না। তোমার এই থিয়েটারের

ছায়াতেই বাসা বেঁধে পড়ে থাকব চিরকাল। তোমার ঐ কথাটাই সত্য—রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে।

অমর ॥ খুব ভাল কথা। তুমি আজ থেকে আমার থিয়েটারের চৌকিদার হলে, পাহারা দেবে। বেতন মাসে তিরিশ টাকা।

রাজা ॥ রাখে হরি মারে কে—আমার সেই হরি তুমি কত্তা—তুমি। যাই কত্তা, ছুটে গিয়ে পরিবারকে কথাটা বলি।

[ভিখারি রাজার প্রস্থান। গোপবালার
রূপসজ্জায় কুসুমকুমারীর প্রবেশ]

অমর ॥ এই যে কুসুম, গিরিশবাবু তো প্লেগের ভয়ে পালাচ্ছেন।

কুসুম ॥ হ্যাঁ, নেপেনবাবু তা শুনে এসে আমাদের বলছিলেন বটে।

অমর ॥ সে খবর তবে তোমরা পেয়ে গেছ?

কুসুম ॥ হ্যাঁ, আর তা নিয়ে আলোচনাও তো হয়ে গেল এতক্ষণ।

অমর ॥ শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হল তোমাদের?

কুসুম ॥ আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক।

অমর ॥ (হাসিয়া) রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে?

কুসুম ॥ তা ছাড়া আর কি?

অমর ॥ খুব খুশী হলাম কুসুম। রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে। খুব সাধারণ লোকের মুখেই শোনা যায়। কিন্তু কথাটা সত্যি অতি অসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম সত্য রয়েছে এতে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"Cowards die many times before their death" এ কথাটাও খুব সত্যি। মৃত্যুর আগেই কাপুরুষরা বারবার মারা যায়। আমরা কি কাওয়ার্ড, কাপুরুষ?

কুসুম ॥ (চারিদিকে তাকাইয়া) সুপুরুষকে কুপুরুষ বলবে কে? 'আর আমার কথা যদি বল'—আমি কি পুরুষ?

অমর ॥ এই, দুষ্টুমি হচ্ছে?

কুসুম ॥ বেশ, দুষ্টুমী আর করব না। কেন রং দিলি ঢং করে 'দোললীলা'র এই গানটিও আর গাইব না।

অমর ॥ তা না বলে পারছি না কুসুম, গেল শনিবার আমার 'দোললীলা'র প্রথম অভিনয়েই ঐ একখানা নাচ-গানেই তুমি আর নেপেন সবাইকে এমন মাতিয়ে দিয়েছ যে, আমিও অবাক্ হয়েছি।

কুসুম ॥ তাও তো মশাই ভাল রিহার্সালই হয়নি। দু'এক জায়গায় তাল কেটে গেছে।

অমর ॥ না না, সেটা তবে রিহার্সালে ঠিক করে নাও।

কুসুম ॥ সেইজন্যেই তো গোপবালা সেজে বসে আছি।

অমর ॥ বেশ—বেশ। যেটুকু কাজ করবে, সেটুকু নিখুঁত হওয়া চাই, তবে না সৃষ্টি! যেমন 'আলিবাবা'য় তোমার মর্জিনার নাচ। একেবারে নিখুঁত। আর তাতেই না আজ এই ক্ল্যাসিক থিয়েটারের ভাগ্য গেছে ফিরে। নিখুঁত কাজ অবশ্য তারাও করত, কিন্তু—

কুসুম ॥ কিন্তু?

অমর ॥ কিন্তু খুঁত ছিল তার মনে। থিয়েটারকে সব দিক দিয়ে বড় করব মনে করে তোমাকে আনলাম, সে যেন ক্ষেপে গেল। সে ভুলে গেল একই আকাশে সূর্যও ওঠে, আবার চাঁদও ওঠে।

কুসুম ॥ (চপল দৃষ্টিতে) আকাশটা কে—আপনি? আর কেই বা সূর্য আর কেই বা চাঁদ?

অমর ॥ আবার দুষ্টুমি শুরু হল?

কুসুম ॥ বারে! কথাটা তো আপনিই তুলেছেন, আমি শুধু উত্তরটা চাইছি। এটা যদি দুষ্টুমি হয়, তবে 'কেন রং দিলি ঢং করে' এ গান আমি গাইবও না নাচবও না। পুরোপুরি দুষ্টুমির গান ওটা।

অমর ॥ না না, ঐ প্লেগের রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য আমরা টাকা তুলব ঐ 'দোললীলা' অভিনয় করে। চল, 'কেন রং দিলি ঢং করে' এখনি রিহার্সাল দেবে।

কুসুম ॥ রিহার্সাল ঘরে তো 'জনা' রিহার্সাল হচ্ছে।

অমর ॥ হচ্ছে, বেশ তো। একটা তো নাচ গান, তোমরা এই ঘরে দাও।

কুসুম ॥ তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে উত্তরটা চাই। আকাশ না হয় বুঝলাম মাথার ওপরেই আছে। কিন্তু সূর্যটি কে আর চাঁদটিই বা কে?

অমর ॥ উত্তরটা দিতে হবে?

কুসুম ॥ (চটুল দৃষ্টিতে) হ্যাঁ, দিতেই হবে।

[অমর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া কুসুমকে কাছে টানিয়া আনিয়া]

অমর ॥ সূর্যের আলোতে তাপ আছে। সে তাপ মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু চাঁদের আলো শীতল স্নিগ্ধ, দাহ নেই—কিন্তু দীপ্তি আছে। সব সময়েই ভালো লাগে। তুমি আমার ভাগ্যাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

[কুসুমকে বুকে টানিয়া শিরশ্চুম্বন]

[কনসার্ট বাদ্যের মধ্যে কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে নেপা বোস ও
কুসুমকুমারীর সেই বিখ্যাত সংগীত ও নৃত্য
"কেন রং দিলি ঢং করে"

—গীত—

গোপা ॥ কেন রং দিলি এ ঢং করে।
শাদা কাপড় রাঙিয়ে দিলি পিচকিরি মেরে ॥

গোপ ॥ তোর কালবরণ ভালবাসি,
যখন তখন তাইত আসি,
আড়াল থেকে আড়ে দেখে,
তোর পায়ে পায়ে বেড়াই ঘুরে।

গোপা ॥ (তোর) থ্যাবড়া মুখে জেবলে নুড়ো,
ফাগের গুঁড়ো দিই,
যেমন দিবি তেমনি পাবি,
শোধ তুলে ত নিই ;
(ওরে) করলি যে খুন, তরুণ অরুণ,
মরি মরি ঝকমারি ॥

উভয়ে ॥ এমন দিনে বুকের ধনে,
ফাগ মাখাতে হয়,
ওরে না মাখালে নয়,
অনেক দিনের অনেক আশা
রেখেছি রে প্রাণ পুরে ॥

বি—র—তি

॥ দশম দৃশ্য ॥

দক্ষিণেশ্বর। নহবতখানার বারান্দা। ১৯০১ সাল,
১৮ই ফেব্রুয়ারী। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মতিথি।
রক্ষাকালী দেবী ও হেমনলিনীসহ
কেদারনাথের প্রবেশ।

কেদার ॥ দেখছি, দক্ষিণেশ্বরের এই নহবতখানাটাই আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মদিনে এখনও যা একটু নিরিবিলি আছে। মন্দির আর ঠাকুরের ঘর সব তো দেখে শুনে এলেন। এবার এখানে বসে বরং একটু বিশ্রাম করুন আমি

না ফেরা পর্যন্ত এখান থেকে কেউ নড়বেন না কিন্তু। ভিড় যা বাড়ছে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

রক্ষা ॥ ঐ ভিড়ের ভয়েই তো আমার ধীরেন আর হীরেন আমাকে বাড়ির বের হতে দেয় না। তবে বৌমার কথায় তুমি আমাদের নিয়ে আসবে শুনে কোন আপত্তি করেনি। আরও ভাল লাগত যদি তোমার বৌটিকেও নিয়ে আসতে।

কেদার ॥ সে হল গিয়ে হেমের ঠিক উলটো। ভিড়ের ভয়ে সে বাড়ির বারই হয় না।

হেম ॥ বড়দা, খুব কথা শোনাচ্ছে তো! বছরের মধ্যে আমিই বা ক'টা দিন বাইরে যাই? ঠাকুরের জন্মোৎসবে তো এলুম এই প্রথম। খুব ভয়ে আজ এখানে আসবার কথাটা তোমার কাছে পেড়েছিলাম। তা দেখলুম বরাত ভাল, সঙ্গে সঙ্গে তুমি রাজী হয়ে গেলে।

কেদার ॥ কেন রাজী হয়েছি সে আমিই জানি। এখন ঠাকুরের কৃপায় সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, একমাত্র এই কামনা। কত রকম লোকই তো আসছে। ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, সাধু-সন্ন্যাসী, এমন কি থিয়েটারের সব লোকও আসছে। ভেতরের উঠোনে এক কোণে অমন যে পাঁড় মাতাল গিরিশ ঘোষ, দেখলাম—বসে হাত জোড় করে বিড়বিড় করে কি বলছে, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। এমন কত এসেছে, কত আসবে। হঠাৎ হয়তো দেখতে পাবেন কত আপনজন। যাদের সঙ্গে একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। মন্দিরে ঢোকবার ঐ তো পথ। এখানে বসেই দেখতে পাবেন। আমি আসছি—

[কেদারনাথের প্রস্থান]

রক্ষা ॥ গিরিশ ঘোষ কত গুণী, আবার তেমনি মাতাল আর চরিত্রহীন। জান তো, উনি আমাদের আত্মীয়?

হেম ॥ জানি মা। অমনটি হয়েও ঠাকুরের কত না কৃপা পেয়েছেন। আপনার ছেলেও তো মা ওঁর পথই ধরেছেন। আমাকে বলে গেছেন থিয়েটারই তাঁর একমাত্র সাধনা। আজ এখানে এসে ঠাকুরেরকাছে শুধু ঐ ভিক্ষেই চেয়েছি—ঠাকুর, তাঁর সাধনা সিদ্ধ কর।

রক্ষা ॥ (হেমকে বুকে টানিয়া লইয়া) ওরে, আমারও সেই ভিক্ষে চাইতেই আজ এখানে আসা।

হেম ॥ (রক্ষাকালীর পায়ের ধুলা মাথায় ঠেকাইয়া) আপনার ছেলের কি ভাগ্য মা, যে আপনার মত মা পেয়েছেন!

রক্ষা ॥ না না, সৌভাগ্য নয় মা, দুর্ভাগ্য। সাধু সন্ন্যাসী হয়ে ও যদি ঘর-সংসার ছেড়ে যেত—সে বরং ভাল ছিল। তোমার নসীরাম একদিন ওর

বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসত। কিন্তু কালু যে থিয়েটারের পথে গিয়ে ওর অংশের বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দিলে। নেই বললে, আজ তোমার আর নসুর কিছুই নেই। মা হয়ে তো আমি কালুকে ঠেকাতে পারলাম না।

হেম ॥ শুনেছি, থিয়েটারে নাকি খুব নাম যশ হচ্ছে।

রক্ষা ॥ হাজার হাজার টাকাও আসছে। কিন্তু অঘোরের মুখে শুনেছি, সেও তো উড়েও যাচ্ছে।

[নেপথ্যে কোলাহল—'ওরে, ওই যে তারাসুন্দরী যাচ্ছে, তারাসুন্দরী']

হেম ॥ শুনলেন মা থিয়েটারের তারাসুন্দরী, ঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছে।

রক্ষা ॥ আসুক। তাতে আমাদের কি? তুমি সব কিছু যেমন সয়ে সয়ে যাচ্ছ, তেমন সয়ে যাও। ঠাকুর রামকৃষ্ণ থাকতেন সামনের ঐ ঘরে, আর সারদা মা থাকতেন—এই নহবতখানায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ—কিন্তু তা ছিল শুধু মনে মনে। ঘর সংসার বলতে যা বোঝায়, তা কোন দিনই হয়নি। কিন্তু সেজন্যে মনে ক্ষোভ ছিল না কারও। বরং আনন্দেই ভরা ছিল দুজনের মন। আজ এখানে এসে আমার বার বার মনে হচ্ছে—তোর মাঝেও আমি যেন সেই সারদা মাকেই দেখছি। সব কিছু সহ্য করে কেমন হাসিমুখেই আছিস!

[নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল ঃ—'অমর দত্ত, অমর দত্ত—
কুসুমকুমারী আর অমর দত্ত]

রক্ষা ॥ থাক থাক, ওদিকে আর তাকাতে হবে না। একি মা, তুমি কাঁপছ যে—পড়ে যাবে দেখছি। (হেমকে বুকে ধরিয়া) এসে আমরা কি ভুল করেছি—কি ভুল করেছি!

[কম্পমানা হেমনলিনীকে ধরিয়া রক্ষাকালী বসিয়া পড়িলেন।
কোলাহল ক্রমশঃ দূরবর্তী হইয়া গেল। একটি
ভিখারি গাহিতে গাহিতে আসিয়া ইঁহাদের
নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল]

হেম ॥ আমি আপনার ছেলেকে এখান থেকে দেখতে পেয়েছি মা। আপনি দেখেছেন?

রক্ষা ॥ না। আমি দেখিনি, আর দেখতে চাইও না।

[নিস্তব্ধতা! ক্ষণ পরেই হাতে ভোগের
প্রসাদসহ কেদার নাথের প্রবেশ]

কেদার ॥ ভোগের প্রসাদ মিলেছে মা! আর একবার যদি মন্দির দেখতে যাওয়া

যায়, তবে আপনাদের মনস্কামনাও পূর্ণ হবে। যাকে দেখতে পাবেন আশা করে এসেছিলেন, সেও এসে গেছে।

হেম ॥ না বড়দা, মা দেখতে চাইছেন না। আর আমার দেখা হয়ে গেছে।

কেদার ॥ তা হলে আমরা এখন গাড়িতে গিয়ে উঠি ?

রক্ষা ॥ হ্যাঁ বাবা। এখানকার স্বর্গ এখন আমার নরক। এখান থেকে পালাতে চাই। চল—চল—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

[ঠিক এই সময়—অগ্রে কুসুমকুমারী, পশ্চাতে অমরেন্দ্রনাথ নহবতখানার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথ ইঁহাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সকলেই মুখ নত করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ভাবাবেগ দমন করিতে সেখানে আর না দাঁড়াইয়া কুসুমকুমারীর অনুসরণ করিলেন]

॥ একাদশ দৃশ্য ॥

১৯০১ সালের ১৫ই মার্চ। ক্ল্যাসিক থিয়েটারের অফিস-কক্ষ। কর্মসচিব আশু বড়াল খাতাপত্র লইয়া দেখিতেছেন। ঝর্ণার ছুটিয়া প্রবেশ।

ঝর্ণা ॥ ও মশাই আশুবাবু! ঐ দুটি ছোকরাবাবু তো নাছোড়বান্দা। বলছেন, কর্তার সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যাবেন না। আমি যতই বলি, কর্তা এখন রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত, ওঁরা বলেন—তোমাদের কর্তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যাংটাকালের বন্ধু কালু। গিয়ে বল, মহেন্দ্র আর রঘু এসেছে। একবার কানে গেলেই ছুটে আসবে।

আশু ॥ আঃ, কাজের সময় কি সব ঝামেলা! আচ্ছা আমার কাছে নিয়ে এস। দরকার হলে সেই বাঘ—বুঝলে ?

ঝর্ণা ॥ (হাসিয়া) আপনার মাথায় সত্যি এতও আসে! বন্ধু দুটিকে নিয়ে আসছি।

[ঝর্ণার প্রস্থান]

আশু ॥ এখানে যিনিই আসেন, সবাই বলেন—হয় আত্মীয়, নয় বন্ধু। দেখছি, শত্রু শুধু আমরাই।

[অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু, রঘুনাথ ও মহেন্দ্রকে ঋর্ণা
কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল]

মহেন্দ্র ॥ আপনি মশাই কে ? চিনলাম না তো !

আশু ॥ আমি ক্ল্যাসিক থিয়েটারের সেক্রেটারী। কি বলবার আছে শীঘ্র সংক্ষেপে বলুন, আমি ভীষণ ব্যস্ত।

রঘু ॥ ওরে বাবা ! আমরা এসেছিলুম কালুর সঙ্গে—

আশু ॥ এখানে কালু-টালু কেউ নেই। এটা ক্ল্যাসিক থিয়েটার, আর এর সর্বেসর্বা বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। হতে পারে তাঁর আর এক নাম কালু, তবে সে কালুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হলে যেতে হবে তাঁর বাগানবাড়ি।

মহেন্দ্র ॥ আরে মশাই, আমাদের সেই কালুই আজ অমর হয়েছে। খবর দিন, রঘুনাথ পোদ্দার আর মহেন্দ্র মল্লিক দেখা করতে এসেছে।

রঘু ॥ বলে পাঠান, স্টার থিয়েটারের পোস্টার পুড়িয়েছিল যে বন্ধুরা—তারাই। খাতিরের বহরটা দেখবেন তখন !

আশু ॥ হবে না মশাই—হবে না। কোনক্রমেই এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁরই হুকুম।

মহেন্দ্র ॥ তাহলে আর কি করা যায় ! আমি এসেছিলাম একটা প্রাইভেট খবর নিতে। তা হয়তো আপনিও খবরটা দিতে পারেন। দেখুন আমি এবার গ্র্যাজুয়েট হয়েছি। মুন্সেফির জন্য চেষ্টা করছি। তা শুনলাম, কালুর এই ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসদের বেতন দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে গেছে।

রঘু ॥ অনেকে হাজার দু'হাজার টাকা বোনাস পাচ্ছে। কেউ বেনিফিট নাইট পেয়ে রাতারাতি দু'তিন হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছে।

মহেন্দ্র ॥ এ সব কথা সত্যি কি ?

আশু ॥ ঠিকই শুনেছেন থিয়েটার জগতে অমরেন্দ্রনাথের এটা একটা বিরাট কীর্তি।

মহেন্দ্র ॥ বাঁচালেন মশাই, তবে আর মুন্সেফ হচ্ছি না।, কালুর যখন থিয়েটার, এ থিয়েটারে আমি হিরো সাজবই সাজব।

আশু ॥ হিরো কখনো সেজেছেন ?

মহেন্দ্র ॥ সাজিনি মানে ? পাড়ার থিয়েটারে আমিই তো 'মেঘনাদ বধ' এ মেঘনাদ, 'হরিরাজ' এ হরিরাজ, 'বিষবৃক্ষে' বিষবৃক্ষ—

আশু ॥ বিষবৃক্ষে যখন বিষবৃক্ষ, তবে আর ভাবনা নেই। কর্তার বাগমারীর বাগানবাড়িতে যাবেন, হয়ে যাবে।

রঘু ॥ ওর তো হয়ে যাবে মশাই, কিন্তু আমার ? আমারই বা হবে না কেন ? এই হিরো যে স্টেজে প্লে করে, সেই স্টেজের ম্যানেজার আমি। রাতা-

রাতি মাঠের মধ্যে স্টেজ গড়ে দিই মশাই, জানেন ? তবে হ্যাঁ, কালু তার এই ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অনেক নতুনত্ব আমদানি করেছে দেখছি। স্টেজের ওপর জ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে আসা ওকেই প্রথম দেখলাম। আগে সব থিয়েটারে ওঠা নামা ঝোলা সিন-এ প্লে হত। কালুকেই প্রথম দেখলাম, কয়েকটা নাটকে 'ঠ্যালা সিন', 'কাটা সিন', বক্স সিন' ; সিন অনুযায়ী উইংস, যবনিকা হিসাবে কার্টেন, রঙীন আলো, স্পট লাইট, এমনি সব নতুনত্ব আমদানি করেছে। কিন্তু তবু বলব—কালু আমাকে পেলে কখনই ছাড়বে না। কারণ আমারই হাতে গড়া স্টেজে আজকের এই অমর দত্তের প্রথম হাতে খড়ি। লজ্জা পাবে বলেই না অ্যাদ্দিন দেখা করিনি।

আশু ॥ বলেন কি ! তবে আপনার নির্ঘাৎ—

মহেন্দ্র ॥ তবেই দেখুন, আমাদের নির্ঘাৎ চাকরি। আপনি মশাই খবরটা দিন, স্বচক্ষে দেখুন, আপনার মালিক ছুটে এসে কেমন করে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে।

আশু ॥ দেখছি। (চিৎকার) ঝর্ণা—ঝর্ণা—

(ছুটিয়া ঝর্ণার প্রবেশ)

আশু ॥ কর্তার কাছে এঁদের নিয়ে যেতে হবে, এখনি। সেই বাঘটা—

ঝর্ণা ॥ বাঘ ! সে বাঘ তো মশাই ক্ষেপে গেছে। কেউ সামলাতে পারছে না।

মহেন্দ্র ও রঘু ॥ (একত্রে) বাঘ !

আশু ॥ রামের বনবাস-এর রিহার্সাল হচ্ছে। কর্তার ইচ্ছা বনের সিনে সত্যিকার একটা বাঘ দেখাবেন। মতি বোসের সার্কাস থেকে একটা বাঘ ভাড়া করে আনা হয়েছে। কিন্তু জানোয়ারটা কিছুতেই বাগ মানছে না। (ঝর্ণার প্রতি) কর্তা কোথায় ?

ঝর্ণা ॥ শুনলাম বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঐ পাগলা বাঘের সামনে।

আশু ॥ সেখানেই ছেড়ে দিয়ে এস এদের। কর্তার সঙ্গে দেখা না করে এঁরা যাবেন না।

মহেন্দ্র ও রঘু ॥ (একত্রে) না না, থাক।

মহেন্দ্র ॥ আমরা চলে যাচ্ছি।

রঘু ॥ পরে আসব।

[মহেন্দ্র ও রঘুনাথের পলায়ন। ঝর্ণা ও আশু ক্ষণকাল পরস্পরের মুখের দিকে নিঃশব্দ কৌতুকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একযোগে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং ঝর্ণার প্রস্থান]

আশ্ব ॥ দ্বনিয়ার এতও আছে !—(খাতায় মনোনিবেশ)

[থিয়েটারের বিজনেস ম্যানেজার সতীশ চট্টোপাধ্যায় সদ্য প্রকাশিত এক সংখ্যা 'রঙ্গালয়' পত্রিকা হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন]

সতীশ ॥ এই দেখ আমাদের পাঁচকড়ি বাঁড়্বজ্জে কেমন ধ্বরন্ধর সম্পাদক। আমাদের 'রঙ্গালয়' পত্রিকা এই ১৯০১ সালে ১লা মার্চ প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল। আজ ১৫ই মার্চ, ঠিক দিনটিতেই তৃতীয় সংখ্যা বের করে দিলেন। গত ৮ই মার্চ নটকুলচ্বড়ামণি মহেন্দ্রলালের জীবনী, মায় ছবি পর্যন্ত পাঁচকড়িবাব্ব ছেপে দিয়েছেন এই সংখ্যায়। নাঃ, অমরের জয়জয়কার। সব দিকেই নতুনত্ব। এ দেশে নিছক নাট্য-পত্রিকা ছিল না। এই 'রঙ্গালয়' বের করে তারও প্রথম প্রবর্তক হল আমাদের অমর।

আশ্ব ॥ উচ্ছ্বাসটা এখন একটু রাখ্বন। মাথা ঠাণ্ডা করে শ্বন্বন। শোক-সংবাদ আরও আছে।

সতীশ ॥ শোক সংবাদ ! আবার কে মারা গেল ?

আশ্ব ॥ মারা যেতে বসেছি আপনি, আমি এবং আরো অনেক কর্মচারি।

সতীশ ॥ মারা যেতে বসেছি ! কেন, আবার প্লেগ এল নাকি ?

আশ্ব ॥ হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। আয়-ব্যয়ের সব হিসাব অডিট হচ্ছে। অপিসে প্লেগ।

সতীশ ॥ তবে এটা ঐ সার্কাসওয়ালা মতিলাল বোসের কাজ। সার্কাস করে হাতি ঘোড়া নাচিয়ে দ্বটো পয়সা করেছে বলে তাকেই কিনা অমর বসিয়ে দিল আমাদের মাথার উপর স্বপারিন্টেন্ডেন্ট করে! সার্কাসের লোক থিয়েটারের বোঝেটা কি ?

আশ্ব ॥ এখন তো দেখছি সবই বোঝে। বাব্বকে কেবলই বলে বেড়াচ্ছে, কলকাতার সেরা থিয়েটার তোমার। দ্বপ্বরে শো, রাত্রে শো, সব ফুল হাউস —অসম্ভব বিক্রি। তব্ব তোমার টাকার এত টানাটানি কেন ? বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বপারিন্টেন্ডেন্ট পদে বহাল। অনবরত খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে, ভাউচার পরীক্ষা করছে। খরচ-পত্রের কোন আইন-কান্বন ছিল না এতকাল। জবাব দিহি করতে করতে আমার তো প্রাণান্ত। এখন বলতে শ্বর্ব করেছে—আমি আপনি, আরো যারা প্বরানো লোক রয়েছি, আমরা নাকি সবাই প্বকুর চুরি করেছি। আর তা প্রমাণ করে অডিট রিপোর্টের সঙ্গে নিজেও এক রিপোর্ট খাড়া করেছে। বাব্বর হাতে কালই দেবে।

সতীশ ॥ তা দেখছি এটা সংবাদই বটে। প্লেগও বলতে পার। কিন্তু বেহিসাবী খরচ, সে তো অমরেরই সবচেয়ে বেশী। আগে তো পার্টির অন্ত ছিল না। পেলেটি থেকে হরদম খানা আসত, পামারি স্যাম্পেনের ফোয়ারা

ছুটত। বিষয়সম্পত্তি উড়ে যাবার পর সে সব যদিও বা কমে গেছে কিন্তু দান? এত দান করলে ফতুর হতেই হবে। হচ্ছেও তাই।

আশু॥ ক্ল্যাসিক থিয়েটার পত্তনের আগে যা হৈ হৈ রৈ রৈ হয়ে গেছে, মতিলাল বোস সে সব ধরছে না। ধরছে ক্ল্যাসিক থিয়েটারের পত্তন ১৮৯৭ থেকে আজ এই ১৯০১ সালের মার্চ পর্যন্ত যত খরচ হয়েছে, তারই হিসাব।

সতীশ॥ ওরে বাবা! এতেও মারা যাব যে। বেটা নালিশ-টালিশ করে বসবে না তো? ও আশু, তোমার ঝর্ণা কই। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে যে, এক গ্লাস জল আনতে বল।

আশু॥ (চিৎকার করিয়া) ঝর্ণা, এক গ্লাস জল। আপনি ভেঙ্গে পড়লেন যে সতীশদা? ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আমি অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়েছি কাজে লেগে যেতে পারেও বা।

[এক গ্লাস জল লইয়া হাস্যে লাস্যে ঝর্ণা আসিয়া দাঁড়াইল]

আশু॥ জল এনেছ? ওকে দাও। এই সাদা জল না খেয়ে একটু রঙীন খাবেন?

সতীশ॥ পাব কোথায়? ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ!

আশু॥ আমি দিচ্ছি। ঝর্ণা—

[ঝর্ণাকে ইঙ্গিত। ঝর্ণা আলমারি খুলিয়া বোতল হইতে
একটি পাত্রে মদ ঢালিয়া তাহা সতীশকে দিল]

ঝর্ণা॥ আমি তো অবাক্ হচ্ছিলাম, আপনি আবার সাদা জল খান কবে!

সতীশ॥ (ঝর্ণার দিকে চাহিয়া) কথায় বার্তায় থিয়েটারি ঢং এসে গেছে। চেহারাটিও বেশ ডালিম ডালিম হয়েছে। (আশুর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া) তা ভাল হাতেই পড়েছ। হবে—তোমার হবে।

আশু॥ তা যা হচ্ছে, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। বাকী শুধু হাতে দড়ি আর পায়ে বেড়ি। ঝর্ণা দেখে এস তো, বাবু এখন কোথায় কি করছেন? দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।

[ঝর্ণার প্রস্থান]

সতীশ॥ হাতে দড়ি পায়ে বেড়ি! সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে যে আশু! তা তুমিও তো একটা তালেবর ছেলে, চুপ করে বসে আছ?

আশু॥ বললুম তো অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়েছি। লাগে তুক, না লাগে তাক। বাবু আসবার আগে কথাটা আপনাকে বলে রাখছি, আপনি তৈরি থাকবেন।

সতীশ ॥ আলবৎ তৈরি থাকব, বল।

আশু ॥ আজ কয়েকদিন হল, আমার হাতের লোকজন দিয়ে কলকাতার সব থিয়েটার মহলে একটা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছি। গুজবটা পাকে প্রকারে অঘোর পাঠকের কানেও তুলে দিয়েছি অঘোর পাঠক বাবুকে যেমন ভালবাসেন, বাবুও তেমনি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। ঝর্ণার কাছে খবরও পেয়েছি, অঘোর পাঠক কাল গোপনে বাবুর সঙ্গে দেখা করে কি সব বলেছেন, যা শুনে বাবু নাকি রেগে টং হয়ে যান।

[ছুটিয়া ঝর্ণার প্রবেশ]

সতীশ ॥ কিন্তু সে গুজবটা কি ?

ঝর্ণা ॥ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব আর বাবু আপিসে আসছেন।

আশু ॥ বলা আর হল না। আপনি 'রঙ্গালয়' এর পাতা ওলটান, আমি খাতা-পত্র দেখছি। ঝর্ণা সব ঠিকঠাক করে রাখ।

[সকলেরই ব্যস্ত সমস্ত ভাব। রাম-এর সাজসজ্জায় সজ্জিত অমরেন্দ্রনাথ এববং কাগজপত্র ভর্তি বড় একটি ব্যাগ হাতে মতিলাল বোসের প্রবেশ]

মতি ॥ ব্যাপার কি বল ত? তুমি আমাকে জরুরী দরকার আছে বলে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনলে, অথচ কোন কথাই কইছ না ?

অমর ॥ কি আর বলব ? আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি মতিলাল।

মতি ॥ সেকি গো ! তোমার মুখে কথার খই ফোটে। কি এমন হল যে, মুখে ভাষা যোগাচ্ছে না ?

অমর ॥ আমি মদ খাইনি, মাতাল হইনি অভিনয়ের পোশাক পরলেও অভিনয় করছি না। সুস্থ দেহে, শান্ত মনে তোমাকে বলছি—আমার বন্ধু সাজে তুমি আমার পরম শত্রু—মিথ্যাবাদী—বিশ্বাসঘাতক—বেইমান।

মতি ॥ কিন্তু ব্যাপারটা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না অমর।

অমর ॥ আমার থিয়েটারে বেহিসাবী খরচ বন্ধ করে, দেনাপত্র শোধ করে কাজকর্মে নিয়ম-শৃঙ্খলা এনে তুমি আমাকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করবে বলেছিলে। তোমার নিজের সার্কাস পার্টি অত কম টাকায় চালিয়ে, এত লাভের ব্যবসা করেছ স্বচক্ষে দেখে আমার এতকালের বন্ধু তুমি—তোমাকে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম। ক্ল্যাসিক থিয়েটারের গোটা ব্যবসাটাই তোমার হাতে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার নিজের প্রয়োজন হলে তোমার অনুমতি পেলে তবে আমি টাকা নিচ্ছিলাম। সত্য ?

মতি ॥ সত্য।

অমর ॥ তোমার উপর আমার এই নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে তুমি থিয়েটারের বাজারে রটিয়ে দিয়েছ, আমি নাকি বিশ হাজার টাকায় তোমাকে ক্ল্যাসিকের অর্ধেক স্বত্ব বিক্রয় করেছি ?

মতি ॥ মিথ্যা—ডাহা মিথ্যা। তুমি এই দারুণ মিথ্যা বিশ্বাস করেছ ?

অমর ॥ করেছি। অঘোর পাঠক নিজে আমাকে কাল বলে গেছেন। কলকাতার প্রত্যেক থিয়েটারে এ কথা রটে গেছে।

মতি ॥ তুমি বিশ্বাস করেছ ! তুমি বিশ্বাস করেছ ! কর। বিশ্বাসই যখন করেছ, তখন আর নয়। এই রইল তোমার খাতা-পত্র, অডিট রিপোর্ট—এই আমার রিপোর্ট। এতে দেখবে—এই ছয় সাত মাসের মধ্যে সমস্ত দেনা পরিশোধের পর, সমস্ত খরচ খরচা বাদ—মায় তোমার নিজের ব্যয় অপব্যয়' দান খয়রাত বাদ এই যে পাশ বই তোমার নামে, ব্যাঙ্কে, প্রায় ছাব্বিশ হাজার টাকা জমা। থিয়েটারের পার্টনার হব আমি ? নেড়ে চেড়ে দেখলাম তো—একটি নরককুণ্ড। বিদায় ভাই—বিদায়। শুধু একটি কথা বলে গেলাম নিজে নজর দিলেই দেখবে—এখানে পুকুর চুরি হয়। এ যদি রোধ করতে না পার, সেদিনের আর বেশী দেরি নেই, যেদিন তোমাকে ইন্‌সল্‌ভেন্সি নিতে হবে, দেউলে হতে হবে।

[মতিলালের প্রস্থান। অমরেন্দ্রনাথ ব্যাঙ্কের
পাশ বই দেখিতে লাগিলেন]

অমর ॥ সব দেনা শোধ, আর ব্যাঙ্কে জমা ছাব্বিশ হাজার ! আশ্চর্য ! (চিৎকার) মতি—মতি—মতি—

আশু ॥ গাড়ি ছাড়ার শব্দ পাচ্ছি, চলে গেছেন স্যার—

অমর ॥ তোমরা করছ কি ? তোমরা এখনি ওঁর বাড়ি যাও, পায়ে ধরে নিয়ে এস। গিয়ে বল—আমি ক্ষমা চাইছি।

সতীশ ॥ হ্যাঁ, আমরা, ফিরিয়ে আনতেও চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি ক্ষমা চাইছ, একথা বললে ভদ্রলোক ভাববেন—এখন তুমি তোমার নিজের স্বার্থ রক্ষা করতেই ক্ষমা চাইছ। কি বল আশু ?

আশু ॥ হ্যাঁ, এখন বাবু ক্ষমা চাইলে, ওই রকম একটা কদর্থই তিনি করতে পারেন বটে। তবে আমরা যাচ্ছি। খাতা-পত্রগুলো কি তুলে রাখব স্যার, না আপনি দেখবেন ?

অমর ॥ না না, সব তুলে রেখে যাও। ও সব দেখবার সময় এখন আমার নেই। মতিলাল নির্বাসিন গেল, এবার রামের বনবাস।

[আশু ঝর্ণাকে খাতা-পত্র তুলিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। ঝর্ণা ইঙ্গিত মত কাজ করিতে যাইলে, আশু অমরেন্দ্রনাথকে মদ দিবার ইঙ্গিত করিল ঝর্ণাকে। সতীশকে লইয়া আশু বাহিরে যাবেন এমন সময় অমর বলিয়া উঠিলেন]

অমর ॥ থাক, তোমাদের যেতে হবে না। যাওয়া উচিত ছিল আমারই। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়, আর তোমাদেরও যাওয়ার দরকার নাই।

সতীশ ॥ হ্যাঁ, আমরা গেলে, যদি মুখের ওপর বলে বসে—আমি তার চাকর না প্রজা যে, পাইক এসেছ তোমরা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে ?

অমর ॥ (মদ্যপান করিতে করিতে) থাক, তোমরা দু'জন দেখ তো, ড্রেস রিহার্সাল-এর দেরি হচ্ছে কেন ? ঝর্ণা, কুসুমকে আমি দেখা করতে বলেছিলাম। দেখ তো, সে আসছে না কেন ?

[সতীশ ও আশু হৃষ্টমনে প্রস্থান করিল। ঝর্ণা দুয়ারের বাহিরে গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া কহিল]

ঝর্ণা ॥ কুসুমদি এসে গেছে।

[কুসুমের প্রবেশ]

অমর ॥ ঝর্ণা, তুমি দেখ এখানে এখন কেউ যেন না আসে।

[ঝর্ণার প্রস্থান]

অমর ॥ কুসুম, তুমি এখনও সীতার মেক-আপ নাওনি ?

কুসুম ॥ দেখতেই পাচ্ছেন।

অমর ॥ এ তুমি কি পাগলামী করছ কুসুম ? এখনি ড্রেস রিহার্সাল শুরু হবে, কাল বই খুলবে। চিফ্ জাস্টিস এ নাটক দেখতে চেয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নির্দেশ ছিল, লোকশিক্ষার জন্য রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ প্রচার করা। সেই নির্দেশ পালন করতে গিরিশ ঘোষ আর তারাকে অত টাকা মাইনে দিয়ে এখানে এনে এই 'রামের বনবাস' নাটক খুলছি।

কুসুম ॥ কৈকেয়ীর পার্ট আমাকে না দিয়ে তুমিই বরং আমাকে বনবাসে পাঠাচ্ছ।

অমর ॥ বাঃ, বেশ বলেছ তো !

কুসুম ॥ কেন বলব না ? এতদিন যত রকমের বড় পার্ট, কঠিন পার্ট, সব করে তোমার মাথায় যশের মুকুট পরিয়ে দিয়ে ক্ল্যাসিকের ভাগ্যলক্ষ্মীরূপে যে অভিনেত্রীটি তোমারই অভিনন্দন পেল, তাকে আচমকা দূরে সরিয়ে দিয়ে

কৈকেয়ীর পার্টটা কঠিন বলে বাড়তি বেতনে আনা হল তারা বিবিকে। মানেটা কি, কৈকেয়ীর পার্টটা কি আমি করতে পারতাম না ?

অমর ॥ তুমি পারবে। কেন পারবে না ? কিন্তু ওর মতো পারবে না। প্রত্যেক বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা অপর আর একজনের নেই। যেমন 'আলিবাবা'তে মর্জিনার পার্ট। ও তুমি যা করেছ, তারার সাত জন্মে সাধ্য হবে না তা করতে। যাও, সীতা সাজ গিয়ে, প্লেস। রিহার্সালের সময় হয়ে এসেছে।

কুসুম ॥ যতই বলুন অমরবাবু, আমি বলব, আমাকে সরিয়ে দিয়ে এটা "মরে যাওয়া" আপনার প্রথম প্রেমের পুনর্জন্ম। জীবনে একটা জিনিস ভোলা যায় না। সেটা হচ্ছে প্রথম প্রেম।

অমর ॥ (হাসিয়া) কথাটা মিথ্যা বলনি কুসুম, খুবই সত্য কথা। কিন্তু আমার প্রথম প্রেম কে তা কি তুমি জান ?

কুসুম ॥ জানি বলেই তো ঝগড়া করছি। কিছুতেই সইতে পারছি না।

অমর (চট করিয়া হাত ধরিয়া কুসুমকে কাছে টানিয়া আনিয়া) সে প্রেম আর যেই হোক, তোমার এই তারাসুন্দরী নয়। যাও, নিশ্চিন্তমনে সীতা সেজে বনে গিয়ে আমার সঙ্গে একটু প্রেম করতে প্রস্তুত হও দেখি। লক্ষ্মীটি আমার।

কুসুম ॥ তবে কি প্রথম আমি ?

অমর ॥ না কুসুম, তুমিও নও। সে থাকে আমার এই সোনার লকেটে। একে বুকে নিই শুধু থিয়েটারের মঞ্চে। নইলে আমার অভিনয়ে প্রাণ আসে না।

কুসুম ॥ কে ইনি ? দেখি—

অমর ॥ না।

কুসুম ॥ না ? কি সাংঘাতিক লোক মশাই আপনি। সবাইকে এক সঙ্গে খেলাচ্ছেন ? আচ্ছা—বেশ আমি যাচ্ছি সীতাই সাজছি ধন্য আপনি অমরবাবু, আপনাকে চেনা দায় !

[কুসুমকুমারীর প্রস্থান। আশুর প্রবেশ]

আশু ॥ তারাসুন্দরী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

[অমর নিজে উঠিয়া গিয়া তারাসুন্দরীকে ভিতরে আনিলেন। আশু বাহিরে গেল]

তারা ॥ বাব্বাঃ। আশু বলল পার্ট শেখানো হচ্ছে। ঘরে দোর দিয়ে পার্ট শেখানো, মানে—লাভ সিন তো ?

অমর ॥ কুসুমকে লাভ সিন শেখাতে হবে।

তারা ॥ তা যা বলেছ। ওর লাভ সিন মানেই ঢলাঢলি। ঢলাঢলি কাউকে শেখাতে হয় না। নাচিয়ে মেয়ে। যেমন নাচে, তেমনি নাচায়। তোমাকেও তো নাচাচ্ছে। দেখলুম তো। বরং ভেবে অবাক্ হই, আমাকে তুমি আবার কি করে আনলে! যেখানে ঐ মেয়েই হচ্ছে সর্বেসর্বা।

অমর ॥ তারা! থিয়েটার হচ্ছে একটা সাধনা। এজন্য পাঁচ ফুলের একটি সাজি চাই। যেখানে যত ভাল ফুল আছে, সব যোগাড় করে তবেই না নাট্য-লক্ষ্মীর সত্যিকার পুজো! তোমাকে দরকার ছিল, এনেছিলাম। কুসুমকে দরকার হল, আনলাম। তাতে রাগ করে তুমি চলে গেলে। পুজো আমার অসম্পূর্ণ থাকছে দেখে আবার তোমাকে ধরে এনেছি তারা। থিয়েটারের সাধনায় ব্যক্তিগত মান-অভিমান সরিয়ে রাখতেই হবে তারা। তবেই না আসবে সিদ্ধি। কুসুম চেয়েছিল কৈকেয়ী সাজবে সে। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি— কৈকেয়ী সাজবে দেশবিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। হ্যান্ডবিল দেখনি?

তারা ॥ দেখেছি—তুমি আমাদের অনেক ঊর্ধ্বে অমর। (একটু থামিয়া) আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম অমর (একটু থামিয়া) এখন দেখছি তোমার জীবনে আমি মরিনি। হ্যাঁ, সগৌরবে বেঁচেই আছি। (একটু থামিয়া) আমি অনুতপ্ত, আমাকে তুমি ক্ষমা কর অমর।

অমর ॥ (তারাকে কাছে টানিয়া আনিয়া নিম্নস্বরে) তোমার অভিনয় দেখেই আমার মনে হয়েছিল, তোমাকে নিয়েই আমি নতুন এক থিয়েটার গড়ে তুলব। সেদিনও তুমি ছিলে আমার থিয়েটারের মানস-প্রতিমা। আজও তাই আছ তারা (তারাসুন্দরীর শিরশ্চুম্বন করিলেন) হ্যাঁ, কৈকেয়ীর সাজসজ্জা তোমার ঠিকই হয়েছে।

মাতঃ! পিতৃসত্য অবশ্য পালিব!
এবে চল ড্রেস রিহার্সালে।

[তারাসুন্দরীসহ অমরের প্রস্থান]

[কালক্ষেপক অন্ধকার মধ্যে কনসার্ট বাদ্য। মঞ্চ আলোকিত হইলে দেখা গেল রামের বনবাস-এর ড্রেস রিহার্সাল চলিতেছে]

রামের বনবাস

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ॥

[গিরিশরচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা]

[মূর্ছাচ্ছন্ন দশরথ ধরাশয্যায় শয়ান। পার্শ্বে উপবিষ্টা কৈকেয়ী]

[রামের প্রবেশ]

রাম ॥

একি! একি! কেন পিতা ধরাতলে?
পিতঃ! পিতঃ! আসিয়াছি বন্দিতে চরণ,
আশীর্বাদ কর তাতঃ!
কেন হেন,
চঞ্চল জনক মোর কহ গো জননি!
কেন ধরাসনে,
মধুর-বচনে নাহি সম্ভাষেণ মোরে;
হৃদি বিদরে জননি,
এ দশায় হেরিয়ে পিতায়।
স্বর্ণকান্তি ধূলোয় ধূসর,
কেমনে দেখ গো মাতা!
কেন পিতা কথা নাহি কন?
থাকিলে গো রোষে,
হাসে পিতা আমায় হেরিয়ে;
আজি, কি লাগিয়ে না দেন উত্তর,
কাঁদি গো চরণতলে?
কি দোষে অভাগা দোষী পদে,
কোন্ অপরাধে পদে নাহি দেন স্থান
ওগো প্রবাসে, ভরত,
প্রবাসে মা শত্রুঘ্ন,
কহ শুভবাদ উভয়ের;

হায় মা !
কেমনে তুমি আছ গো দাঁড়ায়ে,
ধরাতলে পিতা মোর,
আঁখি-জলে ভাসে গো দু'কূল,
এস দোঁহে করি গো মিনতি,
যদি তাহে শান্ত হন পিতা।

কৈকেয়ী ॥ অঙ্গীকারে বদ্ধ রাজা
আছে মোর ঠাঁই, দিবে দুই বর মোরে ;
এক বরে
চতুর্দশ বর্ষ তুমি যাবে বনবাসে
আর বরে,
ততকাল ভরত হইবে রাজা।
রাজ্যরক্ষা করিবে ভরত,
যতদিন তুমি না আসিবে ;
অঙ্গীকারে বদ্ধ তব বাপ।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাস রাজায়।
কর এবে যেবা রুচি তব,
ইচ্ছা যদি, পিতৃঋণ কর পরিশোধ।

রাম ॥ মাতঃ, পিতৃ-সত্য অবশ্য পালিব,
দেখ মাতা মূর্ছাগত পিতা !
পিতঃ ! পিতঃ ! রাম আমি,
দেখ পিতা রাম আমি।

দশরথ ॥ কে রে, রাম আমার,
রাম ! রাম !
দেখ চেয়ে, পিশাচ জনক তোর ;
পিতা বলে না ডাক আমারে,
আমি শনি তোর রাম,
পাষাণী কৈকেয়ী সত্যে বাঁধিয়াছে মোরে।

রাম ॥ হেন দুঃখ,
কি হেতু মা দিয়েছ পিতারে ?
তুমি আজ্ঞা করিলে জননী,
যাইতাম বনবাসে।
আনন্দ আমার,
রাজা যদি হয় গো ভরত।

উঠ পিতা, ত্যজ ধরাসন,
সফল জনম মম, বহু পুণ্যফলে
পিতৃসত্য করিব পালন ;
ধরি দেহ তোমার কৃপায় দেব,
এ দেহের তুমি অধিকারী।
সত্য সার শিখিয়াছি তোমার প্রসাদে,
উঠ নরপাল !
সূর্যবংশে সূর্যসম দেব তুমি,
কাতর নহ ত কভু প্রতিজ্ঞা পালনে।
যেই আমি—সেই ত ভরত তব
গুণের ভরত ভাই !
তব মহত্ত্ব রহিবে, রাজ্য রক্ষা হবে,
পুত্র রাজা হেরিবে ভূপাল,
তব আশীর্বাদে,
অবাধে আসিয়া পুনঃ বন্দিব চরণ ;
কি হেতু রোদন দেব ;
পিতঃ ! জন্মাবধি তোমা বিনা নাহি জানি ;
শুধু কণামাত্র ধার,
অধিকার দেহ মোরে।

দশরথ ॥ আরে রে পিশাচি !
দেখরে বারেক চেয়ে,
দেখ চেয়ে রামে।
কেমনে রে এ সন্তানে দিব বনে ;
ওরে,
ধরি তোর পায়, বাঁচারে আমায়,
প্রাণ যায় কথা শুনে ;
ওরে, রামে কোথা পাব,
প্রাণ কেমনে বুঝাব ;
পতি চাহে প্রাণদান,
এ সম্মান রাখ গুণবতি !

কৈকেয়ী ॥ সত্য ভঙ্গ করহ আপনি,
সত্য ভঙ্গ উপদেশ কেন দেহ মোরে।

দশরথ ॥ ধন্য ধন্য বলি তোরে,
নারী ধর্ম পাইলি কোথায়

সত্য না লঙ্ঘিব কভু,
কিন্তু মন্দ মোর, তুই কি কৈকেয়ী,
কিবা, পিশাচিনী আইল রে তোর বেশে ?
ভাবি তোর সহবাসে,
এতদিন কিরূপে রহিল প্রাণ ?
রাম ! রাম ! শনি রে তোর আমি !

রাম ॥ ভাবি দুখ তব দুঃখে পিতা ;
বাঁধি বুক আপন গৌরবে ;
পিতৃকার্যে রহিব বিপিনে,
এ চিত্ত-প্রসাদ ইন্দ্রাসনে নাহি পিতা !
মাগো ! পিতারে করগো সেবা,
বৃদ্ধ পিতা মম ;
কাতর হইবে তাত মোরে না হেরিলে।
মাতা, গুণধর ভরত হইবে রাজা,
গুরুজন তোমা দোঁহে,
সত্য কহি আনন্দ অপার মম,
রাজ্য-যোগ্য নহি কভু,
প্রের দূত আনিতে ভরতে।

কৈকেয়ী ॥ ভরত না আসিবে আমার,
যতদিন তুমি রবে অযোধ্যায়।

রাম ॥ মাগো, অযোধ্যায় কেন রব আর !
নাহি অধিকার মম রহিতে এস্থানে।
রাজ-আজ্ঞা পিতৃ-আজ্ঞা কভু না লঙ্ঘিবে,
বনে যাব না আসিতে যামী ;
রব মাত্র সীতারে সঁপিতে মাতা করে—
কহিব সীতারে
সেবিবারে তোমা সবাকারে।

দশরথ ॥ রাম ! রাম ! আয় কোলে,
ক্ষণেক জুড়াই প্রাণ ;
রাম আমার ! রাম আমার !
পিতা নহি, পাষাণ রে আমি।

অমর ॥ আচ্ছা, এতো একরকম হল। কৈকেয়ীকে নিয়ে আর যে সব কঠিন কঠিন সিন আছে, সেগুলি তারা কালকেই তুলে নিয়েছে। এখন বরং সীতা আর রামের সেই সিনটা ধরা হক—তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—কুসুমে।

[সীতার রূপসজ্জায় কুসুমের প্রবেশ]

অথবা

উপরোক্ত সিন শেষ হইলে মঞ্চ অন্ধকার হইবে। সময়োচিত বাদ্য বাজিবে। বাদ্যান্তে নিম্নোক্ত দৃশ্যারম্ভ।

গিরিশ রচনাবলী—চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৬৪

রাম ॥ দেবি,
বিচারের নাহি অধিকার,
বনে যাব পিতার আদেশে,
আসিয়াছি লইতে বিদায়।
মন্থরার মন্ত্রণার ছলে,
ভুলিলা কৈকেয়ী মাতা ;
আছিলেন প্রতিশ্রুত পিতা,
বর দিতে জননীরে,
পিতার আদেশে যাব বনবাসে প্রিয়ে ;
ভরত হইবে রাজা।
চতুর্দশ বৎসর রহিব বনে ;
ফিরি যদি, দেখা হবে পুনঃ।
জনক জননী মম,
কাঁদিবেন আমা বিনে,
রহি অযোধ্যায়,
সেবা তুমি কর দোঁহে।
এস প্রিয়ে,
সঁপে যাই মাতায় তোমায়।

সীতা ॥ চাও প্রভু কাহারে সঁপিতে ?
দয়াময়।
আমি, আমি নয়,
রামময় প্রাণ মম।
তুমি যাবে বনে, রহিব ভবনে,
কেমনে কহিলে নাথ !
দাসী শ্রীচরণে
ধ্যানে জ্ঞানে চরণ সেবিব আশু।

যথা যাবে যাব সাথে সাথে,
দাসী বিনে সেবা কে করিবে,

রাম ॥ প্রিয়ে! এ কি কথা ?
ব্যথা কেন দেহ মোরে ?
রাজ-বধূ, রাজার নন্দিনী,
দুখ কভু নাহি জান ;
দুর্গম গহনে,
কি কারণে যাবে প্রাণেশ্বরি ?
রাজার ঝিয়ারী,
ফলাহারী কেমনে হইবে,
ভ্রমিবে শ্বাপদ সনে ?
বৈসে তথা শুভঙ্কর নিশাচর ;
তাই করি মানা,
গৃহে রহ গুণবতী,
বনে যেতে করো না বাসনা।
জনক আমার
হাহাকার করিবেন আমা বিনে ;
চাহি তব মুখ,
ক্ষণ বা বাঁধিবে বুক।
জননী কাঁদিবে
কে তারে দেখিবে তুমি গেলে প্রিয়ে সাথে ?

সীতা ॥ এ কঠিন বাণী কেন কহ চিন্তামণি,
সতী পতি ছাড়ি রহে কবে ?
বিধি-বিড়ম্বনে, সত্যের পালনে,
দুঃখ তব দয়াময় !
অকারণে কেন দুখ দিবে মোরে ?
তব সনে,
গহন বিপিনে রব রাজ-রানী।
রাম মম হৃদয়ের রাজা।
অধীনীরে ঠেল না চরণে,
দাসী বিনে সেবা কে করিবে তব ?

রাম ॥ সাথে যাবে প্রাণের লক্ষ্মণ,
সদা মম সেবা-রত ;

দুখ প্রিয়ে না হইবে তায়।
ধর বচন আমার,
অযোধ্যায় রহ সতী।

সীতা ॥ দাসীর মিনতি ঠেল না নাথ,
শেলাঘাত কর না হে বুকে।
মন দুখে ভ্রমিবে কাননে,
ভবনে কি সুখে রব ?
ধরি পায়, বঞ্চনা কর না প্রভু।

রাম ॥ যুক্তি নহে গুণবতী,
রমণী লইতে সাথে ;
রক্ষঃগণে বৈসে সদা বনে,
নারী লয়ে পড়িব বিষম ফেরে।
জটাধারী হব কদাকার,
হেরিয়ে বাড়িবে দুখ;
বাকল বসনে,
চন্দ্রাননে,
নেহারি তোমারে,
কেমনে ধরিব প্রাণ ?
নারী লয়ে দ্বন্দ্ব সদা হয়,
বাসি ভয়
নহে প্রসন্ন অদৃষ্ট মম।

সীতা ॥ নাথ !
পতি বিনে কে রাখে নারীরে ?
এক নারী,
দুই ধনুধারী,
রক্ষিতে নারিবে প্রভু ?
স্বচক্ষে দেখেছি ভাঙ্গিতে হরের ধনু,
গভীর গর্জনে স্বর্গরোধ বাণে,
দেখেছি নয়নে নাথ ;
পদাশ্রিতা নারী, নাহি কারে ডরি,
হেন বীর-পতি সহবাসে।
তুমি বনে যাবে, এ রাজ্যে কে রবে,
হেথা কে রক্ষিবে মোরে ;

যেই রাজ্য কাড়ি লবে,
ভার্য্যা তারে দিবে,
হেন কি বাসনা তব ?
দয়াময় !
এ কথা নিশ্চয়,
পদাশ্রয় কভু না ছাড়িব।
যাব সাথে, কে রোধিবে মোরে ?
পতি ব্রহ্মচারী,
ফলাহারে নাহি ডরি ;
মুখ নিরখিব, আপনা ভুলিব,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে দূরে।
ঋষিগণে,
অদৃষ্ট গণনে কহিত জনকে সদা,
পতি সনে যাব বনে ;
শুনি প্রাণ আনন্দে নাচিত।
প্রাণনাথ,
কর না হে মানা ;
মানা না মানিব,
প্রাণ দিব শ্রীচরণে।

রাম ॥ প্রিয়ে,
চাহে কি এ প্রাণ ছাড়িতে তোমারে তিলে ?

সীতা ॥ সঙ্গে তব লহ রঘুনাথ।

রাম ॥ এস প্রিয়ে,
মার কাছে বিদায় মাগিব।
প্রিয়ে, ভিখারি তোমার পতি,
বনে অন্য কিবা পাব,
প্রেম দিব যত চাহ।

[উভয়ের প্রস্থান]

[সময়োচিত গীতকণ্ঠে বৈতালিকের প্রবেশ এবং
গীতশেষে বৈতালিকের প্রস্থান]

॥ দ্বাদশ দৃশ্য ॥

অমরেন্দ্রনাথের বাগানবাড়ি বাসভবন। ১৯০৬ সালের শেষাংশ। ঝর্ণা আসবাবপত্রের ধূলা ঝাড়িতেছে উদভ্রান্তভাবে রোগজীর্ণ মানসিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট অমরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।

অমর ॥ ভারতে বৃটিশরাজের উচ্ছেদ সাধন করাই ছিল এই নবাব সিরাজ-দ্দৌলার পণ। কিন্তু আত্মীয় বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে হেরে গেলাম—কোতল হলাম। নতুন করে কোতল করলেন আমাকে নটগুরু গিরিশ-চন্দ্র। আমাকে ক্ল্যাসিক থিয়েটারে চাকরি করা কালে শর্ত অনুযায়ী নাটক লিখলেন—'সিরাজদ্দৌলা'। কিন্তু সে 'সিরাজদ্দৌলা' তিনি আমাকে প্রথম অভিনয় করতে না দিয়ে নিয়ে গেলেন অন্য থিয়েটারে—আমাকে কোতল করে—আমাকে কোতল করে। সিরাজদ্দৌলা আমি—ও সিরাজদ্দৌলা আমার। কে ওখানে?

ঝর্ণা ॥ আমি ঝর্ণা।

অমর ॥ এখনও তুই আছিস! দেনার দায়ে ইনসলভেন্সি নিয়েছি, একথা জেনে এখনও তুই আছিস? তোর পা দুটো কি খোঁড়া, পালাতে পারলি না তুই? যেমন আর সবাই পালিয়েছে?

ঝর্ণা ॥ তারা-মা যখন আমাকে আপনার কাছে চাকরি করতে এনে দেন, বলেছিলেন—এ চাকরি তোর চিরদিনের। আপনি না তাড়ালে আমি তো যেতে পারি না কত্তাবাবু।

অমর ॥ চিরদিন! হাঃ হাঃ হাঃ। তারা যখন বলে চিরদিন, সে চিরদিন সে চিরদিনের মানে জানিস না?—দু'দিন। তুই নিজেই তো দেখেছিস।

ঝর্ণা ॥ তা দেখেছি। অনেক কিছুই দেখেছি।

অমর ॥ তবে তুইই আমার সেই মহাকাল, যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখে। আর যখন কাউকে পাচ্ছি না, তোমাকেই গোপনে বলে রাখছি মহাকাল।

ঝর্ণা ॥ কাকে মহাকাল বলছেন? আমি তো মেয়েমানুষ।

অমর ॥ মহাকাল পুরুষও নয়, নারীও নয়, মহাকাল পাষাণ। তোমার বুকে আমার শুধু এই কথাটি লেখা থাক মহাকাল—আমার থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জনজাগরণ আর পরাধীনতার বেদনা সঞ্চারই ছিল আমার জীবনের লক্ষ্য। ১৯05 সালে বঙ্গবিভাগ হতেই পর পর আমি দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় করে

চলেছিলাম। 'হল কি' নাটক অভিনয়ে গেয়ে উঠেছিলাম—"বাংলা দেশের বাংলা মা-টি, এখন মোদের লাগছে খাঁটি। বুটের ঠোকর আর কেন খাও? চাকরিতে ভাই ইস্তফা দাও।" 'এস যুবরাজ' নাটকে দেখিয়েছিলাম আমাদের রাজভক্তি কত ঘৃণ্য, কত উৎকট। কিন্তু শত্রু-মিত্রের চক্রান্তে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আমাকে আজ বসে থাকতে হচ্ছে এই ইনসল্‌ভেন্সী নিয়ে। উঃ, কী লজ্জা—কী অপমান! হে অন্তর্যামী মহাকাল তুমিই সাক্ষী থাক আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের।

[বাহির দরজায় করাঘাত]

অমর ॥ ঐ কে আসছে—না না, এ কালামুখ আমি আর কাউকে দেখাব না পালাই। যেই আসুক না কেন, তুই বলে দে—আমি বাড়ি নেই। কখন ফিরবে, তাও তোর জানা নেই।

[অমরেন্দ্রনাথের অন্তরালে গমন। ঝর্ণা বাহির দরজা খুলিতে গেল এবং ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল তাহার সঙ্গে আসিয়াছে তারাসুন্দরী]

ঝর্ণা ॥ সত্যি বলছি, কত্তা বাড়ি নেই। বাড়ি যে আজ ফিরবেন, এ ভরসাও আমি করি না। কোথায় গেলেন, কখন ফিরবেন, কিছু বলে যাননি। দেউলে হয়ে মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছে।

তারা ॥ অথচ এই সোনার সংসার আমিই পেতে দিয়েছিলাম। অত যশ, তা সত্ত্বেও ক্ল্যাসিক থিয়েটারের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ল, নালিশ হল, থিয়েটার হাত ছাড়া হয়ে গেল। কার্জন থিয়েটার হাতে নিয়ে নিউ ক্ল্যাসিক থিয়েটার খুলল। সে থিয়েটারেও তো রোজগার, তবু কেন এই দেনা?

ঝর্ণা ॥ ওঁকে ভালমানুষটি পেয়ে, ওঁর লোকজনেরাই পুকুর-চুরি করে ওঁর কপালে আজ দেউলের ছাপ দেগে দিল তারা-মা। একে তো গ্রহণী রোগে অ্যাদ্দিন ধরে ভুগছেন—মড়ার ওপর এই খাঁড়ার ঘা সইতে পারবেন কি না জানি না।

তারা ॥ অথচ নিতান্ত ঠেকে পড়ে বলেছিলাম—আমার বেতনটা একটু বাড়িয়ে দাও। তা দিলে না। তাই আমাকে চলে যেতে হল।

ঝর্ণা ॥ যাকে তোমরা বলে থাক, 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'—তাই না তারা মা?

তারা ॥ ঠিক বলেছিস তুই। লোকটা চিরদিনই তাই রে। নিজের ভাল মন্দ বোধ ওর কোন দিনই নেই, তাই কখনও রাজা কখনও ফকির। লোকটার জন্য সত্যিই বড় কষ্ট হয়। ওঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি যেন আর টিকতে পারছি না—আমি বসছি। হ্যাঁরে, আমার সেই রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা যেখানে

রেখেছিলাম, সেখানে আছে তো? নাকি পাওনাদাররা সেটাও তুলে নিয়ে গেছে?

ঝর্ণা ॥ না না, সে মূর্তি আছে। আমি এখনো ধূপ-ধূনা ফুল জল দিই। তুমি আর মিছি মিছি বসে কি করবে?

তারা ॥ না না, আমি বসব। বরং আমি রাধাকৃষ্ণ প্রণাম করে আসি। জয়পুর থেকে কিনে আনিয়েছিলাম ঐ বিগ্রহ—

[বলিতে বলিতে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল তারাসুন্দরী।
অমরেন্দ্রনাথ আর আত্মপ্রকাশ না করিয়া পারিলেন না]

অমর ॥ এ কালা মুখ দেখাবার নয় তারা। তাই এই, আত্মগোপন। ঝর্ণাকে ক্ষমা কর।

ঝর্ণা ॥ সত্যি তারা মা আমাকে ক্ষমা কর। তুমিই বলে দিয়েছিলে—এ সম্বন্ধ চিরদিনের। সবাই গেছে, কিন্তু আমি তাই এখন আছি। যখন যেমন বলেন, করি।

[তারাসুন্দরী আহত হইলেও তাহা হাসিমুখে সহিল]

তারা ॥ অ্যাঁ! হ্যাঁ। তা তো বটেই। তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে ঝর্ণা। এইবার তুমি যাও তো, ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

[ঝর্ণা চলিয়া গেল]

তারা ॥ না এসে থাকতে পারলাম না। তোমাকে অনেকদিন পর দেখলাম। কিন্তু এমন চেহারা দেখব আশা করিনি।

অমর ॥ কেন এলে? আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। তুমি আজ কেন এলে তারা?

তারা ॥ আজই তো আমার আসবার দিন অমর।

অমর ॥ উঁ!

তারা ॥ হুঁ। আজ তোমার কেউ নেই—আজ তুমি দেউলে, তাই আমার আসা।

অমর ॥ ভুল। আমার সব আছে। এখনও মা আছেন, দাদারা আছেন, আমার স্ত্রী আছেন—আছে আমার সন্তান।

তারা ॥ হ্যাঁ আছেন, কিন্তু থেকেও নেই। তাঁদের আর তোমার মাঝে একটা কাঁচের দেওয়াল তুমি তুলেছ।

অমর ॥ (আর্তনাদ করিয়া) ওহো-হো-হো, তুমি ঠিক বলেছ। সত্যিই একটা কাঁচের দেওয়াল। ঐ যে ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে। আমি চাই না, এই কালামুখ ওরা দেখে। আমি পালাতে চাই—আমি পালাতে চাই তারা।

তারা ॥ আমি জানতাম, আমি বুঝেছি—আর এসেছিও তাই। চল, এ কলকাতায় আর নয়। বাইরে, দূরে।

অমর ॥ সেকি। কোথায়? মুঙ্গেরে? (পাগলের মত হাস্য) হাঃ হাঃ-হাঃ—

তারা ॥ (উত্তেজিত কণ্ঠে) আমি জানি—আমি জানি অমর। মুঙ্গেরের গঙ্গা আর আজ গঙ্গা নয়। (জাদুকরীর দৃষ্টিতে) আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি ভুবনেশ্বরের পীঠস্থান, ভুবনেশ্বরে। সেখানে আমি বাড়ি পাচ্ছি। মনোরম জল-হাওয়া—আশ্চর্য শান্তি—সৌন্দর্য—আশ্চর্য সান্ত্বনা। দু মাসেই তোমাকে আমি সারিয়ে তুলব। থিয়েটার তো অনেক হল। আর থিয়েটার নয়। এবার চল, সত্যিকার জীবনে। জীবনের স্বপ্নে-স্বপ্নের জীবনে।

অমর ॥ তারা!

তারা ॥ (মোহময়ী দৃষ্টিতে) প্রথম প্রেম মরে না। মরে কি?

অমর ॥ না মরে না। কিন্তু থিয়েটারই যে আমার প্রথম প্রেম তারা; থিয়েটার আমাকে ছেড়েছে। কিন্তু থিয়েটার আমি ছাড়তে পারব না। থিয়েটারই আমার বাড়ি—আমার ঘর—আমার জীবন—আমার সংসার।

তারা ॥ থাম! একথা কেন বলছ, আমি জানি। আমি জানি, কেন থিয়েটার আজ তোমার বৃন্দাবন। নির্লজ্জ—বিশ্বাসঘাতক—প্রবঞ্চক!

অমর ॥ যা মনে কর তুমি যাই-ই বল না কেন, আমার জীবনের পরম সত্য থিয়েটারই আমার বৃন্দাবন—বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

তারা ॥ থাক। কিন্তু গঙ্গা যদি সত্য হয়, তার জলে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞা —সে প্রতিজ্ঞা যদি মিথ্যা কর—তবে মা গঙ্গার অভিশাপেই জেনো, সুখী হতে তুমি পারবে না। সুখী আমিও হতে পারব না জানি। কিন্তু মা গঙ্গা জেনে রাখলেন, আমি শেষ রক্ষা করতে চেয়েছিলাম—তুমিই দিলে না।
আচ্ছা, চলি অমর।

অমর ॥ এস তারা যদি আবার থিয়েটার গড়তে পারি, ডাকলে এস।

তারা ॥ আমরা অভিনেত্রী। অভিনয় আমাদের পেশা ডাকলে কেন আসব না! কিন্তু তুমি তো শুধু আমার থিয়েটার নও, তুমি আমার নেশা! আমাকে আসতেই হবে!

[টলিতে টলিতে তারাসুন্দরীর প্রস্থান]

অমর ॥ ঝর্ণা! আমার নেশা কই? দিয়ে যা।

[ঝর্ণার প্রবেশ]

ঝর্ণা ॥ আনছি! কিন্তু কুসুমদি অন্দরে এসে আপনার শোবার ঘরে বসে আছেন।

[কুসুমের প্রবেশ। ঝর্ণার মদ আনিতে প্রস্থান]

কুসুম ॥ বাপবাঃ। কি এত আলাপ হচ্ছিল? আকাশের তারা হলেই বুঝি এক আকাশ কথা বলতে হয়?

অমর ॥ দেখলেই তো।

কুসুম ॥ কই আর দেখলাম। পালিয়ে ঘরে ঢুকলাম, পালিয়ে রইলাম। আপনিই তো বলেন love scene-এ disturb করতে নেই।

অমর ॥ তুমি এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। তোমাকেই মনে মনে চাইছিলাম এই শোন। থিয়েটারের ব্যাপারে তো দেউলে হয়ে গেছি। আমার শরীর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গেছে। কবরেজ বলেছে, থিয়েটারের অত্যাচার আপনার আর সইবে না। ওটা ছেড়ে দিন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসা বেঁধে বাকী জীবনটা শান্তিতে আর আনন্দে কাটিয়ে দিন।

কুসুম ॥ কবরেজ যখন বলেছেন আর এটা যখন শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপার, তবে তাই করাই আপনার উচিত। তাই করুন।

অমর ॥ হ্যাঁ কুসুম, তাই ভাবছি। দেখলাম তো থিয়েটার। জীবনই দিলাম বলা যায়। কিন্তু কি পেলাম! শুধু কৃতঘ্নতা—কুসুম! আমি থিয়েটার ছেড়ে দেব। কোন ভাল জায়গায় ছবির মত পরিবেশে একটা বাসা বাঁধব। ঘর সংসার করব। গৃহস্থের জীবন যাপন করব।

কুসুম ॥ বেশ তো। স্ত্রীটি তো সারা জীবন এই জন্যই তপস্যা করেছেন।

অমর ॥ সে পথে আমার কাঁটা পড়েছে, তা কি জান না? বোঝ না? এই কলঙ্কিত জীবনে ঐ নিষ্কলঙ্ক জীবন আর কি মেশে? মেশে না—মেশে না তুমি আমার হাত দু'খানা ধরবে? এই শীর্ণ হাত দু'খানা? বাঁধবে আমার সঙ্গে জীবনটা? বম্বে যাবে? সেখানে আমার এক প্রভাব প্রতিপত্তি-শালী বন্ধু—বরেন ঘোষ—কতবার ডেকেছে। যাবে তুমি—থাকবে তুমি—আমার সঙ্গে?

কুসুম ॥ আমি!

অমর ॥ হ্যাঁ, তুমি—তুমি—আমার জীবনের স্বপ্ন—আর সেটা হবে স্বপ্নের জীবন!

কুসুম ॥ অমরবাবু—না অমরবাবু—না। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। থিয়েটার আমি ছাড়তে পারব না।

অমর ॥ পারবে না? আমার জন্যও না?

কুসুম ॥ আপনার জন্যই পারব না। আপনার কাছেই শিখেছি, প্রেরণা পেয়েছি—থিয়েটার কি! থিয়েটার আজ আমার জীবনের চেয়েও বড়। থিয়েটার আমার প্রাণ।

অমর ॥ কুসুম! কুসুম! তুমি আমায় বাঁচালে। আমি তোমায় পরীক্ষা

করছিলাম—দেখলাম আমার সাধন-সঙ্গিনী—আমার জীবনসঙ্গিনী—একমাত্র তুমি—আমার কুসুমকুমারী।

॥ ত্রয়োদশ দৃশ্য ॥

(১৯১৩ সাল—১৩ই মে)

হেমনলিনীর পিত্রালয়। হেমনলিনীর শয়নকক্ষ। হেমনলিনীর শয্যার পার্শ্বে নানাবিধ ঔষধপত্রের শিশি বোতল। কক্ষে মধুর কীর্তন গান হইতেছে। কীর্তন শেষ হইলে ডাক্তার সহ কেদারনাথের প্রবেশ।

ডাক্তার ॥ কই, পেশেণ্ট কোথায় ?

কেদার ॥ বললাম যে, অমর আসতেই তাকে বললে—কীর্তন হচ্ছে হক, তুমি আমাকে ধরে নিয়ে ঠাকুরঘরে চল। আজ একসঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করব।

ডাক্তার ॥ না না, এতটা নড়াচড়া করা কি ভাল হয়েছে ? আজ সকালে হার্টের অবস্থা খুব ভাল দেখিনি।

কেদার ॥ কি করব বল ? ওই স্বামীই ওর কাল হল। তুমি তো জান ডাক্তার, কি স্বাস্থ্য ছিল হেমের !

ডাক্তার ॥ জানি না। এই কয়েক বছরই না বালিগঞ্জে উঠে গেছি। তবু এতকাল তোমাদের বাড়িতে ডাক্তারি করছি। কিন্তু বলতে পারব না এর আগে হেম আমার ওষুধ খেয়েছে কখন।

কেদার ॥ সেই মেয়ের আজ এই হাল করেছে ওই স্বামী। থিয়েটার করতে গিয়ে, করলেন কেবল চারিদিকে দেনা! বাড়ি ভাড়ার মামলায় হেরে গিয়ে ক্ল্যাসিক থিয়েটারটি যখন হাতছাড়া হয়ে গেল, পাওনাদারেরা সবাই একযোগে করল নালিশ। তোমাদের নটকেশরী ইনসলভেন্সী নিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু মারলেন আমার এই বোনটিকে।

ডাক্তার ॥ মানে ?

কেদার ॥ জানই তো, থিয়েটারি জীবনের অত সব অত্যাচার আর ব্যাভিচার তার উপর এল এই দেউলে হওয়ার মনস্তাপ। যার ফলে পতিদেবতার হল জীবন সংশয় অসুখ তাকে সারিয়ে তুলতে গিয়ে সতী সাধ্বীর নিজের স্বাস্থ্যটির হল সর্বনাশ। তারই শেষ পরিণতি আজ এই।

ডাক্তার ॥ বড়ই দুঃখের বিষয়! অমরবাবুর একদিকে যেমন সুনাম, আর

একদিকে তেমনি দুর্নাম দেখেওছি—শুনিও তো। কিন্তু লোকটি যে একটি জিনিয়াস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাক গে, ওহে বেশ কীর্তন হচ্ছিল। শোনাও না আর একটা। (কেদারকে) এস, আমরা বসি।

[কীর্তনের মধ্যেই দেখা গেল অমরেন্দ্রনাথ হেমনলিনীকে সতর্কতার সঙ্গে সযত্নে ধরিয়া আনিয়া শয্যায় বসাইয়া দিলেন। কীর্তন শেষ হইল]

কেদার ॥ (কীর্তনীয়াদের প্রতি) এখন ডাক্তারবাবু এসেছেন, দিদিমণিকে দেখাশোনা করবেন, তোমরা এস।

হেম ॥ ওঁরা যেন থেকে যান। (দলপতিকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া) আমি যে কীর্তনটা শুনতে সবচেয়ে ভালবাসি, সেটা আমায় না শুনিয়ে বাড়ি যেও না।

[সম্মতি জানাইয়া কীর্তনের দল বাহিরে চলিয়া গেল]

ডাক্তার ॥ (হেমকে) এ বেলা বেশ হাসি খুশী দেখছি।

হেম ॥ (অমরের দিকে চাহিয়া) বললাম না আমার মনে হচ্ছে আমি সেরেই উঠেছি।

ডাক্তার ॥ কতটা সেরেছ দেখছি।

[ডাক্তার হেমের নাড়ী এবং বুক পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন]

ডাক্তার ॥ সত্যিই অনেকটা ভাল। আশ্চর্যই হচ্ছি। (অমরকে) অমরবাবু, আপনি যদি মথুরাপুরী এই শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকতে পারেন, তাহলে সত্যিই আমাদের এই বোনটি দেখতে দেখতে সেরে উঠবে।

অমর ॥ না না, আমি রোজই একবার করে আসব। তবে জানেন তো, ক্ল্যাসিকের পর সাত ঘাটের জল খেয়ে এখন স্টার থিয়েটারের মালিক হয়ে বসেছি। থিয়েটারের হাজারো ঝামেলা। হেমই আমাকে বলেছে—থিয়েটারকেই আগে দেখবে।

কেদার ॥ হ্যাঁ, থিয়েটারটাই যে আমার ভগ্নীপতির প্রাণ, এটা জানতে কি তোমার বাকী আছে ডাক্তার?

অমর ॥ যা বলতে হয় বলুন দাদা। ওতে আমি লজ্জা পাব না। দেশপূজ্য কবি নবীন সেন আমার থিয়েটারে 'ভ্রমর' নাটক দেখে ভারী খুশী হয়ে আমাকে লিখেছিলেন—দাঁড়ান, চিঠিটা আমার নোট বইয়ে সযত্নে রাখা। (চট করিয়া পকেট-নোটবুক হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া ডাক্তারকে দিলেন)।

ডাক্তার ॥ বাঃ, সুন্দর লেখা তো! "A Nation is known by its Theatre—কথাটা বড়ই ঠিক। আমাদের যেমন দেশ, থিয়েটারের প্রতি লোকের

শ্রদ্ধাও তদ্রূপ ! তোমার অবিদিত নাই,—অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া অভিমান রাখেন, তাঁহারা থিয়েটারের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন ! কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাঁহারা যত বড় লোকই হউন, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না । তুমি সুখী হও, তুমি জয়ী হও, রঙ্গভূমির প্রতি ভালবাসা তোমার অক্ষয়-অমর-অজেয় হউক ।

তোমার নবীন"

বাঃ চমৎকার !

[হঠাৎ দেখা গেল পরমোৎসাহে হেমনলিনী বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিয়া উঠিল]

হেম ॥ কি সুন্দর চিঠিটা ! (অমরের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাইয়া) কিন্তু এ চিঠিটার কথা আমাকে কেউ বলেনি ।

কেদার ॥ নবীন দেশপূজ্য কবি, দেশের নামকরা হাকিম ! যা বলেছেন, মিথ্যা কিছু বলেননি । থিয়েটার তো আর জিনিসটা খারাপ নয় ! লোক-শিক্ষার বাহন বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণও থিয়েটারকে আশীর্বাদও করে গেছেন । কিন্তু লোক যে এখনও থিয়েটারকে ঘৃণা করে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে, থিয়েটার করা বেশ্যাদের নিয়ে । অনেক সদ্বংশ জাতীয় থিয়েটারের অভিনেতাকে ঐ বারাঙ্গনা সংশ্রবের জন্যই সামাজিক ব্যাপারে নেমন্তন্ন করা হয় না । এমন কি, তাদের আত্মীয়-স্বজনকেও নেমন্তন্ন করতে কুণ্ঠা দেখি । আমাদের অমরবাবু চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে অনেক জজ ম্যাজিস্ট্রেট, এমন কি স্যার যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুজ্জে. দেশপূজ্য নবীন সেনকে ধরে ধরে এনে থিয়েটার দেখাচ্ছে, পার্টি দিয়ে নট-নটীদের সঙ্গে পরিচিত করছে । কিন্তু ঐ নবীন সেন মশাই-ই কি ঐ তারাসুন্দরী আর কুসুম-কুমারীকে করবেন নেমন্তন্ন তাঁর বাড়ীর কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ? অন্ততঃ আমি তো করব না ।

হেম ॥ (হাসিয়া) কিন্তু নটী বিনোদিনী ঘরে এসেছে জেনেও ঠাকুর রাম-কৃষ্ণ কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দেননি দাদা ।

কেদার ॥ আরে পাগলী, তিনি হচ্ছেন পতিতপাবন । আর আমি হচ্ছি অধমাধম কেদার মিত্তির । যাক গে এসব কথা, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তুই আজ ভাল আছিস, বিছানায় উঠে বসেছিস । অমর, লোকে যে তোমাকে জাদুকর অভিনেতা বলে, দেখলাম তা মিথ্যা নয় । এস ডাক্তার ।

ডাক্তার ॥ বেশ লাগছিল । কিন্তু এখন আমায় যেতেই হবে । আর একটা জরুরী কল আছে । ওষুধ যা দেওয়া আছে তাই থাকছে । এখন সবচেয়ে বড় দরকার—মনে আনন্দ আর বিছানায় বিশ্রাম । উত্তেজক কোন আলাপ আলো-চনা একেবারেই নয় । হার্টের বিশ্রাম চাই । অমরবাবু, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন ।

মনের মত আলাপ-টালাপ হক, গান টান শুনতে চায়—শুনুক। আচ্ছা চলি।

কেদার ॥ অমর, তুমি তো কিছুক্ষণ আছ ?

[ডাক্তারের প্রস্থান]

অমর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। অন্ততঃ রাত দশটা পর্যন্ত ?

হেম ॥ কেন,প্লে নাই আজ ?

অমর ॥ আজ আমার স্টারে দুটো বই। দুটোই সামাজিক। প্রথমটাতে বড়রা নেই! দ্বিতীয়টাতে আমি আছি। সামাজিক বই, আমার সাজসজ্জার কোন বালাই নাই। রাত দশটা পর্যন্ত এখানে থেকে আমি সোজা গিয়ে দাঁড়াব মঞ্চে, ইস্টনাম স্মরণ করে।

কেদার ॥ ভালই হল। এখন তো সবে রাত আটটা। তোমার মা আর আমার মা-বাবা সবাই বড় উদ্বিগ্ন রয়েছেন। এই ফাঁকে চিঠিগুলো আমি লিখে ফেলি।

[কেদারের প্রস্থান]

হেম ॥ (দুলিয়া) কি ভালই লাগছে আজ!

অমর ॥ আমার নসীরাম কোথায় ? এসে অবধি দেখছি না তো!

হেম ॥ ওমা! সে বুঝি জানো না ? তোমার মেজ শালী আমার কল্যাণে আজ নারায়ণ পুজো করছে। বাড়ির সবার নেমন্তন্ন। বৌ-ঝিদের সঙ্গে গেছে নসু। যাবার সময় আমাকে চুমো খেয়ে বলে গেল—আমি নিজহাতে তোমার জন্য নির্মাল্য আর প্রসাদ আনব মা। ওগো দেখ, নসুও খুব বড় হবে, তোমার মুখ রাখবে! তুমি যে সব প্লে কর, নসু তার সব বিজ্ঞাপন জমাচ্ছে। অতবড় একটা বাক্স ভরে গেছে।

অমর ॥ তাই বুঝি! কিন্তু পড়াশুনা ?

হেম ॥ তোমার মন ছিল না, ওর আছে। শোন, চুপি চুপি তোমায় বলছি—দাদার একেবারে ইচ্ছে নয়, নসু থিয়েটার দেখে। আর জানোই তো, আমার বাপের বাড়ির এই বনেদী ঘরে থিয়েটার দেখা একেবারেই নিষেধ। তাই, তোমার যে অমন সব অভিনয়, এত লোকে দেখে, কত নাম করে, শুধু দেখা হয় না আমার।

অমর ॥ সে বলব, ভালই হয়েছে। আমার থিয়েটারে গেলে তোমাকে স্বচক্ষে দেখতে হত, ঐ সব বারাঙ্গনা মেয়েদের সঙ্গে আমি কি চুটিয়ে প্লে করছি। হলই বা নাটক। কিন্তু নাটক জমে গেলে, ওটা যে নাটক তা মনেই থাকে না। তুমি সইতে পারতে না।

হেম ॥ এ তুমি কি বলছ গো। তুমি যখন আমাকে ছেড়ে—ঘর সংসার

ছেড়ে চলে গেলে। থিয়েটারের সাধনা করতেই তো গেলে। তুমিই তো আমাকে বলেছিলে—ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশবাবুকে বলেছিলেন—থিয়েটারে থাক, ছেড় না। তাই না আমিও তোমাকে ছেড়ে দিলাম। থিয়েটার করতে গেলে, যাদের সঙ্গে থিয়েটার করবে তাদের ভাল না বাসলে থিয়েটারটা ভাল হবে কি করে গো? তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী এদের সঙ্গে বাগানে থেকে আনন্দ পাও—সুখে থাক। আমার তো তাতেই সুখ গো। তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। শপথ করে বলেছি, আজও বলছি—তুমি যাতে সুখী হও—তাই কর, আমার কোন দুঃখ নেই। আমি শুধু চাই, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক—সিদ্ধ হোক।

অমর ॥ তুমি অনেকক্ষণ কথা বলছ নেড়ু, আর তুমি কথা বল না। বরং আমি বলি—তুমি শোন। সাধন পথে নেমে দেখছি—এ সাধনা বড় কঠিন সাধনা, এ যেন রাবণের সাধনা—পাপের পথে স্বর্গজয়ের সাধনা।

হেম ॥ দোহাই তোমার, অত বড় কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিও না। আমার খুব একটা ইচ্ছা ছিল জান, এর আগে যেদিন দেখা, সেদিন তোমাকে বলেওছি—

অমর ॥ কি বল তো? ভুলে গেছি নাকি।

হেম ॥ তোমার তারাসুন্দরী কি এই কুসুমকুমারী, ওদের সঙ্গে একটিবার কথা কইতে ইচ্ছা হয়। ছবি দেখেছি, কিন্তু তাতে মন ভরে না।

অমর ॥ তোমাদের এই বাড়িতে? ওরে বাব্বা! একটু আগেই শুনলে না তোমার দাদার সব মন্তব্য? তবুও আমি কুসুমকে বলেছি। কিন্তু তারাকে বলার সুযোগ পেলাম না। তারা আর আমার থিয়েটারে নাই।

হেম ॥ সে কি গো! তারাই তো ছিল তোমার থিয়েটারের তারা?

অমর ॥ হ্যাঁ। কিন্তু সেই তারাটি বেতন বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন আকাশের চাঁদ হতে চাচ্ছে। আর বেতন বাড়ালে অন্যদের প্রতি অবিচার হয়। আমি রাজী না হওয়ায় সে অন্য থিয়েটারে চলে গেছে।

হেম ॥ চলে গেছে! তোমার মত রত্নের চেয়ে তার বেতনটাই বড় হল? কুসুমকুমারী আছে তো?

অমর ॥ কুসুমই এখন আমার থিয়েটারের ভরসা।

হেম ॥ কত বড় ভাগ্য বল, তোমাকে খুশী করতে পেরেছে। না জানি কত গুণ। তাই একটিবার আলাপ করতে ইচ্ছা হয়।

অমর ॥ আমি বলেছি ও আসবে। আমি এখানে থাকতে থাকতেই আসবে বলেছে।—ঐ কে আসছে।

[এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। একতারা হাতে, ফোটা তিলক আঁকা
বৈষ্ণবীর সজ্জায় কুসুমকুমারীর প্রবেশ। কুসুমকুমারীর
সহিত চকিতে অমরের দৃষ্টি বিনিময় হইল।

কুসুম ॥ জয় রাধে—জয় রাধে! ভিক্ষা চাইলাম, দারোয়ান বললে—বাড়ীতে অসুখ। আমি যতই বলি—চাই না ভিক্ষা। কৃষ্ণের নাম শোনাব, রোগীর ভাল হবে। দারোয়ান মানে না। বাড়ির কর্তা শুনতে পেয়ে, তবে না দিলেন এখানে পাঠিয়ে। কার অসুখ? (হেমকে) তোমার?

অমর ॥ হ্যাঁ, ওঁরই। অসুখ ছিল, কিন্তু আর নাই। তোমাকেই ও দেখতে চাইছিল। তুমি যখন এসে গেছ, অসুখ আর নয়—এখন সুখ। হেম, ইনি বৈষ্ণবীর সাজে নৃত্যগীত পটিয়সী অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

[গাল টিপিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া হেম আদরে
আদরে কুসুমকে আচ্ছন্ন করিল।]

হেম ? তুমি—তুমি—তুমিই কুসুমকুমারী—

অমর ॥ ও নামটি আর মুখে এন না নেড়ু। তোমার দাদার কানে গেলে—

হেম ॥ ওরে বাব্বা। না না, তুমি আমার মধু সই। কি মধুর তোমার মুখখানি, কি মধুর তোমার চোখ দুটি, কি মধুর তোমার চেহারাটি! (অমরকে) আর মধুর হচ্ছ তুমি। আমার এতদিনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করেছ। তোমারই তো সব কারসাজি। সে আমি বুঝি গো বুঝি।

অমর ॥ তোমরা কথা বল, আমি গিয়ে বাঘা কর্তাটিকে আগলাই। কথা-বার্তা তাড়াতাড়ি সেরে গান না ধরলে তিনি কিন্তু এখানে এসেও পড়তে পারেন বা।

[অমরের প্রস্থান। হেম ও কুসুম পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল
মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল]

কুসুম ॥ বড় সাধ ছিল—দেখব।

হেম ॥ আমারও।

কুসুম ॥ দেখতে সাধ ছিল এইজন্য যে, আমরা বেশ্যা—ছলাকলাময়ী অপ্সরার জাত। পুরাণে পড়বে, ইতিহাসে দেখবে, মুনি-ঋষির ধ্যান ভেঙেছি আমরা—সাধু সন্ন্যাসীর মন কেড়ে নিয়েছি আমরা। জান তো?

হেম ॥ (মৃদুহাস্যে) হুঁ।

কুসুম ॥ অভিনয়ে আমার এত নাম! শুনেছ তো?

হেম ॥ হুঁ।

কুসুম ॥ জন্মের দোষে বেশ্যা। কিন্তু তবু তো মানুষ। মনে ভালবাসা পেলে প্রেমেও পড়ি—পড়েওছি।

হেম ॥ (দুষ্টু হাসিতে) হুঁ, কার সঙ্গে?

কুসুম ॥ সে কি গো! জান না?...তোমারই স্বামীর সঙ্গে যে গো।

হেম ॥ (প্রশান্ত হাস্যে) জানি তো। ওর সঙ্গে প্রেমে না পড়ে উপায় আছে? যদি না পড়তে তবে আমার রাগ হত। মনে হত, তুমি কানা। দেখবার চোখ নেই তোমার। যাকে আমি এত ভালবাসি, তাকে যদি না বেসে কেউ তাচ্ছিল্য করে আমার সয় না। সে তুমি জেনে রেখ গো।

কুসুম ॥ না না, প্রেমে আমি পড়েছিলাম। অত বড় অভিনেত্রী তারা-সুন্দরী, সে-ও ওঁর প্রেমে পড়েছিল। আর কত মেয়ে ওঁর প্রেমে পড়েছে—পড়ছে। কিন্তু—

হেম ॥ কিন্তু! থামছ কেন?

কুসুম ॥ ওঁর দেহ আমরা পেয়েছি। কিন্তু মন পায়নি কেউ।

হেম ॥ অ্যাঁ!

কুসুম ॥ হ্যাঁ সই। মন পায়নি কেউ। ওঁর মন পেয়েছে শুধু একজন। জানো কি?

হেম ॥ কে?

কুসুম ॥ জানো না?

হেম ॥ না তো।

কুসুম ॥ তুমি।

হেম ॥ আমি!

কুসুম ॥ হ্যাঁ তুমি।

হেম ॥ (মৃদু হাস্যে) না—না—না, আমি নই। আমাকে সেই কবে ছেড়ে গেছেন। আমিই যদি হব, তবে উনি এতকাল থিয়েটারেই পড়ে আছেন? এটা ঠিক, কটু কথা বলেননি কখনও আমাকে। কিন্তু থিয়েটারে চলে যাবার পর আদর করে বুকে টেনে নিয়েছেন—তাও তো মনে করতে পারছি না সই। আমি বুঝতে পারছি, এই মিছে কথাটা কেন তুমি আমাকে বলতে এসেছ।

কুসুম ॥ মানে?

হেম ॥ হ্যাঁ। । শুনেছ আমার বাঁচবার আশা নেই। এমনি একটা খোশখবর দিলে যদি আমার মনটা চাঙ্গা হয়, আর তাতে যদি সেরে উঠি, তাই এসব বলছ। কিন্তু আমি আমার ঠাকুরের এই লকেট ছুঁয়ে শপথ করে বলছি —ও যে আমাকে ভালবাসে না, তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। ও যদি আর কাউকে ভালবেসে সুখী হয়, ওতেই আমি—সুখী ওকে এত ভালবাসি।

কুসুম ॥ ঠাকুরের ছবি লকেট করে গলায় পর দেখছি।

হেম ॥ আমার ইষ্ট, পরব না?

কুসুম ॥ অমনি একটা লকেট অমরবাবুরও পরেন। সব সময় নয়, যখন অভিনয় করেন।—দেখেছ?

হেম ॥ কি করে দেখব? আমি তো ওঁর অভিনয় দেখিনি।

কুসুম ॥ (চুপিচুপি) আমি একদিন চুরি করে দেখেছি। মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে এমন মাতাল হয়েছিলেন যে, ওঁর জ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে আমি দেখলাম, লকেটে যার ছবি—সে তারা নয়, এই কুসুম নয়, আর কেউ নয়—সে তুমি।

হেম ॥ আমি! কি যে বল! কি করে আমাকে চিনলে তুমি ?

কুসুম ॥ অমরবাবুর অ্যালবামে এই মুখখানি আমরা কতবার দেখেছি।

[হেমনলিনী কেমন অস্থির হইয়া পড়িল]

হেম ॥ না না, সে কি! ওঁর লকেটে আমি! সারাটা জীবনে যে আমাকে চাইল না, সে রেখেছে আমাকে বুকে ধরে লকেটে! না না, এ হতে পারে না। তোমরা অভিনেত্রী। সব তোমাদের অভিনয়—সব তোমাদের ছলনা। সব মিথ্যা। যা—যাও বলছি যাচ্ছ না? আমি আমার দাদাকে ডাকছি। (রুদ্রমূর্তিতে চিৎকার) দাদা—দাদা—শীগগির এদিকে এস। দেখ এসে—যা নয়, তাই সব বলে আমায় কী বিরক্ত করছে! মিথ্যা বলে আমায় অপমান করছে।—ঐ যে পালাল—ধর—ওকে ধর—

[কুসুমকুমারী বেগতিক বুঝিয়া এখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।
কেদার ও অমর রুদ্ধশ্বাসে এখানে ছুটিয়া আসিলেন এবং হেমনলিনীর
উন্মাদিনী মূর্তি দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন]

কেদার ॥ অমর—অমর—তুমি হেমকে ধর, আমি ডাক্তার দেখছি।

[কেদারের ছুটিয়া প্রস্থান। হেমনলিনী উন্মত্ত
বাঘিনীর মত অমরকে গিয়া ধরিল]

হেম ॥ তোমার গলার লকেট কই ? আমি লকেটটা দেখব। না না, বাধা দিও না। বাধা দিলে শুনছে কে ? হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি।

[লকেটটি টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া হেমনলিনী নিজের করতলে রাখিয়া
বিস্ফারিত-নেত্রে উহার মধ্যস্থ ফটোটি দেখিল]

হেম ॥ আমি !—আমি !!—এ যে আমি !!!

অমর ॥ হ্যাঁ তুমি—তুমিই যে আমার প্রথম প্রেম। তোমার যৌতুকেই শুরু আমার থিয়েটার। আমার সাধনার ধন, থিয়েটারের প্রাণটিই যে তুমি।

হেম ॥ আঃ, কি ভুলই করেছি আমি! কী ভুলই বুঝেছি! আমায় এত ভালবাসতে তুমি! (ধীরে ধীরে গা ছাড়িয়া দিল, অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুক চাপিয়া ধরিয়া) ও হো—হো—হো—আমার বুক গেল—আমার বুক—

[ঢলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল হেম, অমরেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন]

অমর ॥ নেড়ু!—নেড়ু!!—নেড়ু!!!—সব শেষ—আমার সব শেষ! তীরে এসে আমার সোনার তরী ডুবে গেল।

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল]

["মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"
এই বিখ্যাত কীর্তনটির সুর যেন আকাশে বাতাসে বাজিয়া উঠিল]

॥ চতুর্দশ দৃশ্য ॥

(১৯১৫ সাল—১২ই ডিসেম্বর)

স্টার থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথের মেক-আপ রুম। ১২ই ডিসেম্বর ১৯১৫। 'সাজাহান' নাটক অভিনয়। থিয়েটারে কনসার্ট বাজিতেছে। অমরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিয়া আছেন। সজ্জাকর তাহার কর্তব্য করিতেছে। অমরেন্দ্র আপনমনে আবৃত্তি করিতেছেন—

অমর ॥ 'দেবি!

যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে! ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব,—তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল—নিষ্ঠুর!
অমোঘ তোমার দণ্ড—কঠোর বিধান।'

(সজ্জাকরকে) একি সাজালি আমাকে? যমদূত সাজাতে পারিস আমাকে—যমদূত?

সজ্জাকর ॥ বই হচ্ছে 'সাজাহান', আপনি তো ঔরংজেব স্যার।

অমর ॥ ঔরংজেব! আমি? ঠিক বলেছিস—

'অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল
(হাস্য করিয়া) আমিই আমার মাত্র উপমা কেবল।'

সজ্জাকর ॥ একি বলছেন স্যার আপনি! এ তো 'পাণ্ডব গৌরব' এ আপনার ভীম-এর পার্ট।

অমর ॥ জানি হতভাগা, জানি।

সজ্জাকর ॥ আজ আপনি ঔরংজেব সাজছেন।

অমর ॥ তাও জানি। (পার্ট বলছেন)

"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক

নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসংকুল। এত প্রশস্ত যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হতে হবে—এই নৌকা নিয়েই।"

'ভ্রান্ত হয়ে শ্রান্ত চিত্তে চাহি চারিধার,
কণামাত্র আলো নাই, সকলি আঁধার।
আঁকড়িয়া ধরিবার, কিছু নাহি পাই আর,
কানে কানে কে যেন রে কহিল আমার!
"পায়ে ঠেলে দেছ ফেলে—যে ছিল তোমার" ॥'

সজ্জাকর ॥ ঔরংজেব-এর পার্টে কবিতা নেই তো স্যার।

অমর ॥ আছে রে হতভাগা, আছে। এই ঔরংজেব-এর মনে কবিতা আছে—'অনুতাপ'-এর কবিতা। ঐ 'নাট্যমন্দির'-এ বেরিয়েছে। (পার্শ্বে রক্ষিত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকাটি তুলিয়া লইয়া পাঠ)

"চমকিয়া চাহিলাম বুকের ভিতরে।
দেখিলাম, পড়ে আছে শুধু শূন্য ঘর ॥
আমার যে সুখে সুখী, আমার যে দুখে দুখী,
জীবনে জীবন—মোর মরণে মরণ,
ছিল যে—গেছে সেই—পেয়ে অযতন ॥"

[হঠাৎ প্রবল কাশির আক্রমণ। মুখ দিয়া রক্ত পড়িল। অঞ্জলি পাতিয়া অমরেন্দ্র তাহা ধরিলেন এবং উহা ফেলিয়া দিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন]

সজ্জাকর ॥ (চিৎকার) আশুবাবু—সতীশবাবু—কে কোথায় আছেন—দেখুন, কর্তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

অমরেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া আশু ও সতীশের প্রবেশ। সঙ্গে আরো ২।৪ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী]

সতীশ ॥ তোমার শরীরের এই অবস্থায় আজ কিছুতেই প্লে করা চলবে না।

আশু ॥ হ্যাঁ, আমরা প্লে বন্ধ রাখছি—টিকিটের টাকাও রিফাণ্ড দিচ্ছি।

অমর ॥ টাকাটা বড় কথা নয়। ফুল হাউস—আমি প্লে করবই—

কুসুম ॥ অমরবাবু, যার শোকে আপনি মরতে চাইছেন, সে কিন্তু চেয়েছিল আপনার থিয়েটারের সাধনা শেষ করে তবে আপনি যাবেন।

অমর ॥ হ্যাঁ কুসুম, তাঁর ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করছি। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। কনসার্ট দিয়ে ড্রপ তোল! আমি বলছি—ড্রপ তোল।

সতীশ ॥ (আশুকে) ডাক্তার—

আশু ॥ যাচ্ছি—

[কালক্ষেপক অন্ধকার এবং কনসার্ট অন্তে শেষ দৃশ্যের অভিনয়]

॥ পঞ্চদশ দৃশ্য ॥

স্টার থিয়েটার। 'সাজাহান' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য।
স্থান ঃ—ঔরংজেব-এর বহিঃকক্ষ। কাল ঃ দ্বিপ্রহর
রাত্রি। ঔরংজেব-বেশী অমর দত্ত।

ঔরংজেব ॥ "যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ, কি অন্ধকার! কে দায়ী? আমি! এ বিচার! ওকি শব্দ!—না বাতাসের শব্দ! এ কি! কোনমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে পাচ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া) ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির! সুজার রক্তাক্ত দেহ!—মোরাদের কবন্ধ।" একি!

[অমরেন্দ্রনাথের রক্তবমন। অঞ্জলিতে উহা ধরিলেন]

রক্ত! রক্ত? সবার রক্ত আজ আমি বমি করছি। (অঞ্জলি ভরা রক্ত দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) "যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তারা আবার! আমায় ঘিরে নাচছে। কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও। চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কি সব! ওঃ! (চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া) যাক্! চলে গিয়েছে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে। মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।"—নাঃ, আর আমি পারছি না—আর আমি পারছি না—আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও—

[টলিতে টলিতে পড়িয়া গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। স্টেজের
মধ্য হইতে সকলে চিৎকার করিলেন]

নেপথ্যে সকলে ॥ পড়ে গেছেন—পড়ে গেছেন—
ঃ সর্বনাশ—সর্বনাশ—
ঃ ডাক্তার—ডাক্তার—
ঃ জল—জল—
ঃ একটা পাখা—

[ছুটিয়া ডাক্তার আসিলেন এবং নাড়ী পরীক্ষা করিলেন]

ডাক্তার ॥ না না, জ্ঞান নেই, কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন। এখনি বাড়ি নেওয়া দরকার। আপনারা এখানে ভিড় করবেন না। খুব সাবধানে ওঁকে তুলে নিন।

সতীশ ঃ কিছুক্ষণ আগেও বলছিলেন—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

আশু ॥ কিন্তু আমি বলব—এটা আত্মহত্যা—

কুসুম ॥ না। প্রেমের বেদিতে এটা আত্মাহুতি—আর কেউ না জানুক—আমি জানি।—এ এক অমর সাধনা, এ এক অমর প্রেম।

সতীশ ॥ সাধনা শেষ। ড্রপ ফেলো।

* * *

[অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শোকোচ্ছ্বাস সংগীত]

মূর্তি তোমার লুপ্ত সত্য,
কীর্তি তোমার চিরপ্রদীপ্ত,
নহ মৃত তুমি জীবিত সতত,
তুমি যে অমর পাপ ধরায়।
সুহৃদ স্বজন আত্ম পরিজন,
আশ্রিত পালিত কাঁদিছে ওই
কোথা তুমি সখা! পিতা! ভ্রাতা! গুরু!
অন্নদাতা! কই—তুমি কই।

(নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সুরসংযোজিত।)

—য ব নি কা—

দেবাসুর

লেখকের কথা

আমার "চাঁদ সদাগর" নাটকের ন্যায় 'দেবাসুর'ও আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ এর উৎসাহে এবং উদ্যোগে লিখিত হইয়া, গত শনিবার, ১৫ই বৈশাখ, মহা সমারোহে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে দেবাসুর-সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগের দেশী বিদেশী দুই একটি আখ্যানের রূপ-রেখা আমার পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে খুব ভুল করা হইবে কি না জানি না, কিন্তু পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অনেকস্থলে আমার পরিকল্পনা পুরাণের বিরোধীও বটে।

আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী দধীচির আত্মদান আখ্যানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, মুগ্ধচিত্তে তাঁহার দেওয়া সেই ইঙ্গিত আজ স্মরণ করিতেছি। এতদ্‌ভিন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, স্কটিসচার্চ্চ কলেজে আমার সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক বাগচি আমার এই নাটক প্রণয়নে যে সব উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সৌভাগ্যক্রমে আমার গানের রিক্ততা ছিল বলিয়াই আমার নাটক, খ্যাতনামা কবি আমার সোদরোপম শ্রদ্ধেয় বান্ধব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রদেবের গীতলেখার মধুপাত্র হাতে পাইয়াছে। প্রার্থনা করি আমার গানশূন্য জীবনে তিনি যেন চিরকাল এমনি করিয়াই স্নেহ-বর্ষণ করেন। আর্টের নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অসুরবালাদের একটি গান লিখিয়া দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ সেক্রেটারী অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকের প্রযোজনা কার্যে যেরূপ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে শুধু এই কথাই মনে পড়ে যে তাঁহারা আমাকে আন্তরিক ভালোবাসেন, তাঁহাদের প্রতি মামুলি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলে সেই আন্তরিক প্রীতি স্নেহের অমর্যাদা হইতে পারে আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

প্রত্নতত্ত্ব-আচার্য্য পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তক আমার পরম প্রিয় শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ যেসব বন্ধু এবং বান্ধব আমাকে এই নাটক প্রণয়নে উৎসাহ, উপদেশ, প্রেরণা এবং সাহায্যদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণ অন্তরে আজ শুধু এই কথা নিবেদন করি "ইহাই শেষ নহে, আরো চাই।"

"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট (দিনাজপুর),
১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৫

মন্মথ রায়

সঙ্কলনীপত্র

[* ঋগ্বেদ উল্লিখিত দেবাসুর-সংগ্রাম ভারত ইতিহাসে আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধরূপে পরিচিত, তাহারই ছায়ায় এই দেবাসুর নাটক রূপ পাইয়াছে ।*]

পাত্র-পাত্রী

ইন্দ্রদেব	....	....	দেবরাজ
দধীচি	....	....	ঋষিশ্রেষ্ঠ।
দস্র নাসত্য	} অশ্বিনীকুমারদ্বয়	....	ঐ শিষ্য।
ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা)	....	....	দেবশিল্পী।
বৃত্রাসুর	....	....	অসুর-সম্রাট।
বলাসুর	...	....	বৃত্রাসুরের কৃতদাসতুল্য ভ্রাতা
পিপ্রু উরণ কুযব	....	....	বৃত্রাসুরের অনুচরগণ।
সূর্য্যা	....	....	সূর্য্যদেব-দুহিতা।
উষা	....	....	উষাকালের দেবী।
শচী	....	....	ভূতপূর্ব্ব অসুররাজ পুলোমনের

কন্যা পৌলমী। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পুলোমন নিহত হইলে পৌলমী দধীচি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া শচী আখ্যা প্রাপ্ত হন ; পরে ইন্দ্র-দেবের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রাণী রূপে পরিচিতা হন।

এতদ্ভিন্ন—বরুণদেব বায়ুদেব প্রভৃতি দেবগণ। ত্বষ্টার শিষ্য ঋভুগণ। অসুরগণ। দধীচির পালিতা কন্যা রৈভী। অসুরবালাগণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অভিনয়কালে নাটকের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্দ্ধিত হয়।

দেবাসুর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :

[দূরে তুষারমন্ডিত পর্ব্বত-শিখর দেখা যায়। অরণ্যানীর প্রান্তে দেবজয়ী অসুর-সম্রাট বৃত্রাসুরের পাষাণ-দুর্গ। দুর্গের একটি বিস্তীর্ণ লৌহ-বাতায়ন উন্মুক্ত।

শেষরাত্রি। সূর্য্যা দুর্গমধ্যে বন্দিনী। শৃংখলিতা সূর্য্যা বাতায়নে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

বাতায়ন-নিম্নে সূর্য্যার প্রহরীরূপে বলাসুর। বলাসুর তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছিল উষার সঙ্গীত-লহরী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বলাসুর ক্রমে সচেতন হইল। সে সূর্য্যার দিকে চাহিয়া দেখে, সূর্য্যা ঐ বাতায়নেই ভর দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বলাসুর সূর্য্যাকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল ; কিন্তু, সূর্য্যার ঘুম যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, তৎ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে সে বামপার্শ্বের সোপান-পথে অন্যত্র চলিয়া গেল।

উষার সঙ্গীত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। উষার আলোও ফুটিয়া উঠিল। "ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান" উষাদেবী ধরার বুকে অবতীর্ণা হইয়া "নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ (দুগ্ধাধার) প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। ঐ নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্র-বসনা আকাশদুহিতা, অন্ধকার দূর করতঃ দর্শনগোচর হইয়াছেন।" [৯২।১১৩ সূক্ত, ১ম মণ্ডল, ঋগ্বেদ।]

উষার গান

আমি হেথায় গাইতে আসি তরুণ আলোর গান।
নিত্য নীরব নিশার শেষে, এইটুকু মোর দান ॥
নীল আকাশের জ্যোতির মেয়ে,
পূব-সাগরে এলেম নেয়ে
মুখের পানে চেয়ে আমার
মুগ্ধ ধরার প্রাণ ॥
শুভ্রপ্রাতে রঙীন বেশে,
আমি যখন দাঁড়াই এসে
দিগন্তের ঐ আঁধার দেশে
মুক্ত হাসির বাণ ॥

[উষার নৃত্যগীতে সূর্য্যা জাগিয়া উঠিয়াছেন ; উষা নৃত্যগীত শেষে অন্তর্হিতা হইতে যাইবেন এমন সময় সূর্য্যা আর্ত্তস্বরে উষাকে ডাকিলেন।]

সূর্য্যা। ঊষা! ঊষা!

[ঊষাদেবী ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কোথা হইতে কে তাহাকে ডাকিতেছে।]

সূর্য্যা ॥ ঊষা! ঊষা!

ঊষা [এইবার দেখিতে পাইয়া]···তুমি!···তুমি!···তুমি সূর্য্যা এখানে! তোমায় কত খুঁজেছি, বনে বনে, পথে পথে, নদীর পারে ঝর্ণার ধারে,···পাইনি, কোনখানেই তোমায় পাইনি।···এসো, নেমে এসো,···চলে এসো!

সূর্য্যা ॥ [শৃঙ্খলিত হাত দুখানি তুলিয়া দেখাইয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে]···আমি বন্দিনী!··· ওগো ঊষা! আমি বন্দিনী!

ঊষা ॥ বন্দিনী!···তু—মি বন্দিনী!···কার এত সাহস?···কি তার নাম?

সূর্য্যা ॥ বন্দিনী! আমি বন্দিনী!···বিশ্বদেব সূর্য্যের মেয়ে আমি··· তবু.. আমি বন্দিনী!

ঊষা ॥ কার এই দুঃসাহস? কার এই দুর্গ?

সূর্য্যা ॥ মেঘের মতো তার রূপ!···আগুনের মতো তার চোখ! ঝড়ের মতো তার গতি!···দস্যু সে···দৈত্য সে....রাক্ষস সে!

ঊষা ॥ কে সে?····শম্বরাসুর সরস্বতী-পারে দেবতার সুখ-স্বর্গ চুরমার করেছে।··আমার নূপুরধ্বনি শুনে দেবতারা জেগে উঠে সামগান গাইত··· শম্বরের অত্যাচারে সেখানে দেবতার আর ঠাঁই নেই,—আজ সেখানে দৈত্যের তাণ্ডব-নৃত্য দেখি।···তবে এ কি সেই শম্বরের পুরী?

সূর্য্যা ॥ শম্বর নয়, শম্বর নয়।···এ তার চাইতেও ভীষণ। তুমি একে দেখো নি···তুমি একে দেখো না···পালাও···পালাও —

ঊষা ॥ তবে কি নমুচি দৈত্য?··দৃশ্যদ্বতীর তীরে দেবতারা যখন যজ্ঞ করতেন, আকাশ-বাতাস যজ্ঞের ধূমে ছেয়ে যেত। তারি আড়ালে লুকিয়ে এসেছিল সে।···যজ্ঞভূমি রক্তে ভেসে গেল। দৃশ্যদ্বতীর জল রক্তরাঙা হয়ে দেবতাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।···এই তবে নমুচির পুরী?

সূর্য্যা ॥ নমুচি নয়, নমুচি নয়।···তুমি একে দেখো নি, তুমি একে দেখো না···পালাও···পালাও—

ঊষা ॥ পালাব না, আমি তাকে দেখব। অসুররা দেবভূমি জয় করেছে। ···দেবতারা তাও সহ্য করে পাহাড়ের গুহায়, বনের অন্তরালে লুকিয়ে দধীচি ঋষিকে পুরোহিত করে নতুন করে তপস্যা করছে।···কিন্তু—তোমায় হারিয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। ·আকাশে বাতাসে কান্নার রোল উঠেছে। সূর্যঠাকুর লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন। ইন্দ্রদেব তোমার পথ চেয়ে আছেন। বরুণদেব

কালোজলের অতল বুকে তোমায় খুঁজে মরছেন।...দধীচি ঋষি তপস্যা ছেড়ে পথে বের হয়েছেন। অশ্বিনীরা দুই ভাই ক্ষেপে উঠেছে, চোখে ঘুম নেই, সারাটি রাত বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু চীৎকার করে ডাকছে "সূর্য্যা! সূর্য্যা! কোথায় তুমি! কথা কও! দেখা দাও!"

সূর্য্যা॥ ...সর্ব্বনাশ! ওগো উষা · ফেরাও ...তাদের ফেরাও।

উষা॥ ...কেমন করে ফেরাব ?...কেন ফেরাব ?

সূর্য্যা॥.. ফেরাও ...ফেরাও!...এ শম্বর নয়, নমুচি নয়, শুষ্ণ নয়, এ তাদের রাজা। পুলোমনকে বধ করে সে আজ অসুরের রাজাধিরাজ। শোননি তার নাম ? শোননি তার কথা ?

উষা—বৃত্রাসুর ?

সূর্য্যা॥—বৃত্রাসুর।

উষা॥ সর্ব্বনাশ!...দধীচি ঋষির আশ্রম পুড়িয়ে দিয়েছে সে।...তার ভাই বলাসুর—

সূর্য্যা॥ ...আছে, আছে, সেও আছে। উঃ ...[ভয়ে চোখ বুজিয়া] রাক্ষস সে!

উষা॥ দধীচি ঋষির আশ্রমে অঙ্গিরা ঋষির গোধন ছিল।.. লুট করে এনেছে সে।

সূর্য্যা॥ আর শচী ? শচী ? .. ঋষির মেয়ে ?

উষা॥ বুকে বুকে রাখেন ঋষি তাকে।...কোন ভয় নেই তার।...কিন্তু আর কথা নয়। আমি চললুম। দৈত্যেরা এখনি জেগে উঠবে।...তার পূর্ব্বে আমি দেবতাদের খবর দিয়ে নিয়ে আসছি এখানে!...[প্রস্থানোদ্যতা]

সূর্য্যা॥ না—না—না—।

উষা॥ [ফিরিয়া] কেন ?

সূর্য্যা॥.. পাষাণ! পাষাণ।...পাষাণ এই দুর্গ।... তার চাইতেও পাষাণ সেই দস্যুরাজ!... আগুনের মতো তার চোখ! কালো মেঘের মতো তার রূপ। ... আমার বুক ভয়ে কেঁপে উঠছে!...না—না—না।

উষা॥...ভয় নেই।... কোন ভয় নেই। তোমাকে উদ্ধার না করলেই নয়। ... তোমাকে পেয়ে দেবতার দীপ্তি ছিল।...তোমাকে হারিয়ে দেবতার সেই দীপ্তি নেই।...সুরলোকের হাসি আজ এই অন্ধকার পাষাণ কারাগারে বন্দিনী।... উদ্ধার চাই, তোমার উদ্ধার চাই।.. আমি চললুম; ঐ...কে আসে!...ওরে সূর্য্যা! সাবধান... খুব সাবধান... [অন্তর্ধান।]

[ধীরে ধীরে বলাসুরের প্রবেশ। তাহাকে দেখিবামাত্র
সূর্য্যা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

বলাসুর ॥ [ভক্ত যেমন দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হয়, বলাসুরও তেমনি সূর্য্যার বাতায়ন-নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সূর্য্যা তাহাকে দেখিয়াই সভয়ে দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন।] ওরে আমার আগুন।·· ওরে আমার আলো !···দয়া কর ! দয়া কর···আমার দিকে একটিবার ফিরে চা ···!

সূর্য্যা ॥ [তদ্রূপ অবস্থাতেই রহিলেন।]

বলাসুর ॥ ওরে আমার আগুনের ফুলকি। ওরে আমার আলোর চকমকি ! তোর মুখে কি কথা নেই ?··কথা বল কথা বল। তোর জন্য মহুয়া ফুলের মধু এনেছি, কেয়া ফুলের তোড়া এনেছি, একটিবার আমার দিকে তাকা—!

সূর্য্যা ॥ তুমি যাও ··· তুমি যাও··· নইলে আমি মরলুম !

বলাসুর ॥ চলে আয় তুই আমার সঙ্গে ··ঐ বনে যেখানে মহুয়া ফুটেছে হাজার হাজার, মৌমাছি জুটেছে লাখে লাখ···, মাতাল হয়েছে ওরা। মাতাল হয়েছে ওরা ! ...আয় ! আয় ! আয় ! মহুয়ার তাজা মদ নিবি আয় ! আমি তোকে বাটিভরা দুধ দেব খেতে ! একপাল গরু এনেছি লুটে !

সূর্য্যা ॥ দস্যু তুমি ! অঙ্গিরার গোধন হরণ করেছ তুমি ! দধীচি ঋষির আশ্রমে লুট করেছ তুমি ! মরবে, তুমি মরবে !

বলাসুর ॥ মরতে আমি খুব পারি যদি তুই আমায় ভালোবাসিস। বাসবি ? বাসবি ?··

সূর্য্যা ॥ ওরে রাক্ষস !···সূর্য্যের মেয়ে আমি··বাবা তোকে পুড়িয়ে মারবে ! পুড়িয়ে মারবে।

বলাসুর ॥ রাগ করিস কেন তুই আমার ওপর ?. কি করেছি আমি তোর ?·· শুধু তোর মুখের কথা শুনতে চাই ! শুধু তোর চাহনিটুকু চাই ! ····এটুকুও কি দিবিনে তুই আমায় ?····আমি যে তোকে সব স—ব দিতে পারি ! কি চাস তুই ? কি চাস তুই ?

সূর্য্যা ॥ আমি চাই মুক্তি।····ছেড়ে দাও··· ছেড়ে দাও·আমায় ! ওগো দস্যু····দয়া করে ছেড়ে দাও আমায় !

বলাসুর ॥····দিতুম ! আমি দিতুম !··· [ক্ষণেক থামিয়া] কিন্তু, তোকে তো আমি ধরে আনিনি ! এনেছে বৃত্ররাজা !····আমি তার সঙ্গে জোরে পারি নে····!· জোয়ান ··পাহাড়ের মত·· লোহার মত····! উঃ না····কেমন করে তোকে ছেড়ে দেব ! ও আমাকে হারিয়ে দিয়েছে !····যদি না হারতুম····আমি হতুম রাজা, তোকে করতুম রাণী··· বুকে করে রাখতুম····না····না ছেড়ে দিতুম···· ছেড়ে দিয়ে তোর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতুম।

সূর্য্যা ॥ তোমায় দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে ! তুমি দূর হও····দূর হও····

বলাসুর ॥ আমাকে দেখে তোর ঘেন্না হয়? কি করব রে আমি!···
আমি কালো····বড্ড কালো!·· আর দুধের মতো তোর রং!··· তোর ঐ রং আমায় পাগল করেছে! কে দিয়েছে তোকে ঐ রং? আমি পুজো করি তাকে!···[ক্ষণপর] কে দিয়েছে আমাকে এই কালো রং?····জানিনে! আমি জানিনে! হাঁ, আমি কালো, বড়ই কালো, তাই····তাই··· তাই তোর ঐ রং আমায় পাগল করেছে, তাই··· তাই··· তাই তোকে অত ভালোবেসেছি!

[বৃত্রাসুরের প্রবেশ। বৃত্রাসুর আদিম অনার্য্য রাজার উপযুক্ত বেশে সুসজ্জিত।]
বৃত্রাসুরকে দেখিয়াই সূর্য্যা আবার সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন
"ও—হো—হো"। এবং তৎক্ষণাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ চমৎকার!···[বলাসুরকে] ওরে মূর্খ! কাকে ভালো-বেসেছিস? ও যে দেবতার মেয়ে! তুই যে অসুর!

বলাসুর ॥ [লজ্জিত হইয়া অবস্থান।]

বৃত্রাসুর ॥ ওরা আমাদের ঘৃণা করে।····ওদের চামড়া দেখছিসনে দুধের মতো সাদা।···· ওরা আমাদের ঘৃণা করে।··· ওরা বলে ওরা সভ্য, আমরা অসভ্য! ··· ওরা আর্য্য, আমরা অনার্য্য! ওরা দেবতা, আমরা দস্যু।····ওরা মিশবে না, ওরা আমাদের সঙ্গে মিশবে না।··· ওরা বলে আমরা সৃষ্টির অভিশাপ! আমরা আমাদের এই কালো চেহারায় এই সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করেছি! তাই ওরা আমাদের ধ্বংস কর্ত্তে চায়, বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়, শিশুকে হত্যা করে,···· এই ওদের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে শেষে ওরা আমাদের বলে, যদি বাঁচতে চাও, আমাদের ক্রীতদাস হও, আমাদের সেবা কর,··· যা বর্ব্বর, কর ওদের সেবা ····দাসত্ব কর····ওরে কালো! ঐ আলোর আলেয়ার পেছনে পেছনে ছুটে যা ··· প্রেম কর····যা—

বলাসুর ॥··· যাব না, আমি যাব না, কিন্তু,····[সূর্য্যাকে দেখাইয়া] দাও ওকে ছেড়ে দাও····ঐ দেখ····ও কাঁদছে! দাও····দাও··· ছেড়ে দাও····ওকে ছেড়ে দাও—

প্রহরী-বেষ্টিত দধীচি ঋষির প্রবেশ

দধীচি ॥ ছেড়ে দাও····ওকে ছেড়ে দাও····যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি অসুরকুলের মঙ্গল চাও, সূর্য্যাকে মুক্ত কর—

সূর্য্যা ॥ ঋষিরাজ! ঋষিরাজ! আমায় মুক্ত কর··· আমায় বাঁচাও!

বৃত্রাসুর ॥····[তীব্র দৃষ্টিতে ঋষির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] দধীচি ঋষি? চিনেছি!····তোমারই প্রতীক্ষায় আমি পথ চেয়েছিলুম। জানতুম যে তুমি আসবে।····তোমার মধুবিদ্যার কুশল তো?··· তোমার শিষ্য দুটি কোথায়?

আমি যে তাদেরও চাই।...মধুবিদ্যা প্রভাবে মরা মানুষ বাঁচানো যায়, কিন্তু জ্যান্তো মানুষ মারা যায় না কেন ঠাকুর? তবেই তো...

দধীচি ॥...যাবে, তাও যাবে। যেদিন তোমার অত্যাচারের মাত্রা পরিপূর্ণ হবে, সেইদিন...তাও যাবে। যদি মঙ্গল চাও...সূর্য্যাকে মুক্ত কর—

বৃত্রাসুর ॥ মঙ্গলটা কি শুনি!

দধীচি ॥ সূর্য্যের আলোক।...কাকে তুমি শৃঙ্খলিতা করেছ জানো না কি মুর্খ?

বৃত্রাসুর ॥ সূর্য্যের আলোক কি শুধু অসুরের প্রয়োজন?...তোমাদের বুঝি ও আলোক অনাবশ্যক?

দধীচি ॥...সৃষ্টি তবে রসাতলে যাক্—

বৃত্রাসুর ॥..তোমাদেরও তবে সাথী পাব।...এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে!

দধীচি ॥ তবে তুমি সূর্য্যাকে মুক্তি দিতে সম্মত নও?

বৃত্রাসুর ॥ সম্পূর্ণ সম্মত।

দধীচি ॥..তবে দাও—

বৃত্রাসুর ॥ দিচ্ছি।...একটা গল্প শোনো। পুলোমন নামে আমাদের একজন রাজা ছিলেন।

দধীচি ॥..গল্প!...তুমি তাকে স্বহস্তে হত্যা করেছ।

বৃত্রাসুর ॥ করেছি না কি?..তাই তো, কেন করেছিলুম!...শোনো। তার এক মেয়ে ছিল।..অপরূপা রূপসী ছিল সে। কোথা হতে কেমন করে অসুরের ঘরে 'দেবতার ও চোখ ঝলসে দেওয়া' ঐ রূপ এল, ভেবেই পাইনি! এমনি ভেবে দেখেছি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ভেবে দেখেছি... তবু বুঝিনি কেন এল অসুরের আঁধার ঘরে ঐ অপূর্ব আলো!...শুধু মনে হয়েছে সমুদ্রের নীল জলের আভা আছে তার রঙে, জ্যোৎস্নার আভা আছে তার মুখে, তারার দৃষ্টি আছে তার চোখে!..তাকে যখন দেখতুম তখনো স্বপ্ন দেখতুম..তাকে যখন দেখতুম না, তখনো স্বপ্ন দেখতুম!

দধীচি ॥...কিন্তু সে স্বপ্ন কি আজো ভাঙে নি?...সে তো সেই দিনই ভাঙবার কথা যেদিন তোমার সেই স্বপ্নসুন্দরীরই পিতাকে... তোমার পিতৃতুল্য সেই বৃদ্ধ রাজাকে রাক্ষসের মতো হত্যা করেছিলে তুমি!

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ..করেছিলুম। একদিন তিনি..আমায় ব্যঙ্গ করে বললেন আমার মেয়ের দেবতার মতো রূপ। দেবতার সঙ্গে দেব তার বিয়ে।" তিনি ঘটকালি করবার জন্য এক ঋষিকে নিমন্ত্রণ করে তার পুরীতে এনে পূজা করলেন। ঋষির নাম ছিল...হাঁ, মনে আছে...আমি তাকে আপাদমস্তক চিনে

রেখেছিলুম···সেদিনই রক্ত পান কত্তুম··কি তার নাম ? হাঁ···বেশ মনে আছে··· তার নাম "দধীচি" !···কি বলো ঋষিবর ?

দধীচি ॥ হাঁ, তার নাম দধীচি।····দেবতা-অসুরের মিলনপ্রার্থী পুলোমন রাজার কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করা আমি পরম গৌরব মনে করেছিলুম সে কথা আজও তোমার সম্মুখে অকুতোভয়েই বলছি।····সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করছি···পুলোমনকে হত্যা করে দেবতা-অসুরের সেই মিলন-মাল্য ছিন্ন করবার অপকীর্ত্তি যুগে যুগে বহন করবে তুমি !

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিবর, অসুরের কন্যা দেবতার শুভ্রবর্ণের মোহে কুলত্যাগ করে না।···আপনি তাকে বন্দিনী করে রেখেছেন !

দধীচি ॥ বন্দিনী!···তুমি তার পিতাকে সভামধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে রাক্ষসের মতো হত্যা করলে····অন্তঃপুরে বসে আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই মাতৃহীনা পৌলমীকে নিয়ে—

বৃত্রাসুর ॥—পালিয়ে গেলেন আপনার আশ্রমে। তার পর···

দধীচি।। কন্যানির্ব্বিশেষে আমি তাকে পালন করেছি।···তাকে বেদ শিক্ষা দিয়েছি, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি····

বৃত্রাসুর ॥ আর তোমার মধুবিদ্যা ?

দধীচি ॥···প্রয়োজন হয়, তাও দেব।

বৃত্রাসুর ॥ না হয় আমার সঙ্গে তার বিবাহে তার পালক পিতা ঐ বিদ্যাটা যৌতুকই দিলেন ! কি বলো ?····

দধীচি ॥ তোমার সঙ্গে তার বিবাহ ?

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ।··· কেন ? কালোয় কালোয় কি মানায় না ?

দধীচি ॥ এ বিবাহে আমি সম্মতি দিতে পারি না—কখনই না···

বৃত্রাসুর ॥ কেন ?

দধীচি ॥ তুমি তার পিতৃহন্তা—

বৃত্রাসুর ॥ সে তা জানে না—

দধীচি ॥ আমি এবার বলব—

বৃত্রাসর ॥ বলবার পথ রুদ্ধ। হয় সম্মতি দাও....না হয় মৃত্যু বরণ কর।...

দধীচি ॥ আমার সম্মতি পেলেও সে তোমায় বিবাহ কর্ব্বে না দস্যু !... তার সে শিক্ষাই নয়—

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিবর ! আমি তার সঙ্গে গোপনে বহুবার দেখা করেছি, বিবাহের প্রস্তাব করিনি শুধু এই দেখে যে অতি তুচ্ছ কাজেও সে তোমার সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকে।....আজ আমি তোমার সেই সম্মতি চাই।

দধীচি ॥ ··আমি তোমার প্রলাপ বচন শুনতে আসি নি। ··জানতে এসেছি তুমি সূর্য্যাকে মুক্ত করবে কিনা ?

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিরাজ! আমিও তোমার প্রলাপ বচন শুনতে চাইনে। আমি জানতে চাই তুমি আমার সঙ্গে তার বিবাহে সম্মতি দেবে কি না ? তারই উত্তরের উপর নির্ভর করে দধীচির জীবন আর সূর্য্যার মুক্তি।

দধীচি। [স্তম্ভিত হইলেন।]····বটে!

বৃত্রাসুর ॥ [ব্যঙ্গে] হাঁ!

দধীচি ॥ আমার উত্তর "না।"

সূর্য্যা ॥ ঋষিরাজ! ঋষিরাজ!

দধীচি ॥ না।

বৃত্রাসুর ॥ [সূর্য্যার প্রতি চাহিয়া] ভয় নেই সুন্দরী! এখনি উনি বলবেন 'হাঁ।"····[দধীচিকে]··· বলো "হাঁ"—

দধীচি ॥ "না"!

বৃত্রাসুর ॥ বলাসুর!

বলাসুর। রাজা!

বৃত্রাসুর ॥ তুমি ঐ রূপসী দেবকন্যার মুক্তি চাও ?

বলাসুর ॥ [বৃত্রের পদতলে মাথা খুঁড়িয়া] চাই! চাই! চাই!

বৃত্রাসুর ॥ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক।··· ওঠ—

বলাসুর ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যার দিকে তাকাইয়া] কেঁদো না! কেঁদো না····আর কেঁদো না তুমি!

বৃত্রাসুর ॥ [বলাসুরকে]··· দাঁড়াও।··· মুক্তির ক্ষণেক বিলম্ব আছে। ···অগ্রে তুমি আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বিনাবাক্যব্যয়ে পালন কর। বুঝলে ?

বলাসুর ॥ [সোৎসাহে] অবশ্য করব।

বৃত্রাসুর ॥ এই লৌহকীলক দিয়ে একজনকে ঐ দুর্গপ্রাচীরে বিঁধতে হবে। প্রথমে তার দক্ষিণ হস্ত। তার পর····তার চরণ দুখানি।

সূর্য্যা ॥ ও—হো—হো!··· কে কোথায় আছ বাঁচাও। আমায় বাঁচাও—

[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইয়া বাতায়ন অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।]

দধীচি ॥ ভয় নেই ·ভয় নেই····[দুর্গদ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বলাসুর বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

বৃত্রাসুর ॥ ওকে নয়··· ওকে নয়··· [বলাসুরের প্রতি] একে—[দধীচির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।]

বলাসুর ॥ [ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো দধীচিকে ধরিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের

অলদ্ দুর্গপ্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া লৌহকীলক বিদ্ধ করিল। তীর বেগে রক্ত ছুটিল।]

দধীচি ॥ [ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ এইবার আমি পৌলমীকে চাই।...পাব ?

দধীচি ॥ না।

বৃত্রাসুর ॥ [বলাসুরের প্রতি]—বাম হস্ত।

বলাসুর ॥ [আদেশ পালন করিল।]

বৃত্রাসুর ॥... পাব ?

দধীচি ॥ না।

বৃত্রাসুর ॥ না ?

দধীচি ॥ না—না—না—!

বৃত্রাসুর ॥ চাই... চাই...তবু আমি চাই !.. আমার মাথা ঘুরছে।... একি দেখলুম। [ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] একি! একি!...ঐ লৌহ কীলকে কি আমারি হাত বিদ্ধ হয়েছে। আমারি কি বুক কেঁপে উঠছে ? ও—হো—হো...দেখতে পারি না! অসহ্য...অসহ্য...

[বিষম ব্যাকুলতায় বলাসুরকে ইঙ্গিত করিলেন...দধীচিকে সরাইয়া তাহার দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যাইতে—বলাসুর তাহাই করিল। সে দধীচিকে কীলকমুক্ত করিয়া দৃশ্যের পার্শ্বস্থ নেপথ্যে রাখিয়া আসিল।]

বৃত্রাসুর ॥ মহুয়া ! মহুয়া ! মহুয়া আনো বলাসুর...টাট্‌কা... তাজা... [বলাসুর চলিয়া গেল।]...ঐ ফলমূলাহারী তপস্যা-ক্লিষ্ট ঋষির দেহ কি পাষাণে নির্ম্মিত ?... ঐ শুষ্ক দেহের আবরণে যে অস্থি আছে.. তাতেই কি লুকিয়ে আছে সেই তেজ, শক্তি, যা আজ এই কঠিন কঠোর নির্ম্মম হৃদয় কাঁপাল... টলাল... শতধায় চূর্ণ করে দিয়ে গেল!

[অস্থির চিত্তে পাদচারণা।]

বৃত্রাসুর ॥ [সহসা উত্তেজিত ভাবে আপনমনে] তবু... চাই .. চাই .. ঐ নারী আমি চাই—ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে পারি তবু ঐ নারী আমি চাই—

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রবেশ]

[এক জনের নাম "দস্র", আর একজনের নাম "নাসত্য।" উভয়ে দেখিতে একরূপ, কারণ উভয়ে যমজ ভ্রাতা।]

উভয়ে এক সঙ্গে ॥ পাবে না! তুমি পাবে না!

বৃত্রাসুর ॥ [চমকিয়া উঠিলেন।] কে তোমরা ? ···ও···চিনেছি···অশ্বিনী কুমার যমজ ভাই দুটি ? এসো ভাই, এসো—আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষায় ছিলুম,··· সূর্য্যাদেবী কুশলেই আছেন।···হয়তো ঘুমিয়ে আছেন।··· ডাকো··· ডাকো···তার ঘুম ভাঙুক !

অশ্বীদ্বয় ॥ সূর্য্যা ! সূর্য্যা !

[বাতায়ন পথে সূর্য্যাকে আবার দেখা গেল।]

সূর্য্যা ॥ এসেছ ! এসেছ ! তোমরা এসেছ !···পালাও···ঐ···ও—হো হো—হো !

অশ্বীদ্বয় ॥ [ছুটিয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে যাইতেই বৃত্রাসুর দুইজনকে দুই-হাতে ধরিয়া আটকাইলেন।] হাত ছাড়ো···হাত ছাড়ো···

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [দৃঢ় মুষ্টিতে সজোরে তাহাদের হাত চাপিয়া ধরিলেন।]

অশ্বীদ্বয় ॥ ও—হো—হো···[যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া পরে যখন অসহ্য মনে হইল তখন শরীর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা পড়িয়া যাইতে ছিলেন এমন সময় বৃত্র তাঁহাদের হাত ছাড়িয়া দিলেন !]

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ এই মুষ্টির চাপে পাষাণ চূর্ণ করেছি !··· করিনি !

অশ্বীদ্বয় ॥ করেছ !···

বৃত্রাসুর ॥ কর ঐ বন্দিনীকে উদ্ধার—

অশ্বীদ্বয় ॥ [ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ সত্যই কি চাও ওর উদ্ধার ?···সূর্য্যদেব কোথায় ?···তিনি আসুন না ! তোমরা এসেছ কেন ? তোমরা ওর কে ?

দস্র ॥ ও আমাদের আলো !

নাসত্য ॥ আমাদের জীবন !

বৃত্রাসুর ॥ অর্থাৎ তোমরা ওর প্রণয়ী ! ভালোবাসো, খু—ব, না ?

অশ্বীদয় ॥—বাসি।

দস্র ॥—বাসি বলেই এসেছি—

বৃত্রাসুর ॥ মুক্তি আমি ওকে দিতে পারি, যদি তোমরা···

অশ্বীদ্বয় ॥—বল ···

বৃত্রাসুর ॥ যদি তোমরা তোমাদের গুরুর পালিতা কন্যা পৌলমীকে আমার হাতে তুলে দাও···

অশ্বীদ্বয় ॥ শচী

বৃত্রাসুর ॥ শচী।···প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যে মুহূর্ত্তে তাকে তোমরা আমার

হাতে এনে দেবে, সেই মুহূর্তে ঐ সূর্য্যাকে আমি তোমাদের রথে তুলে দেব—

নাসত্য ॥ তোর এই হীন প্রস্তাবে পদাঘাত করি—

বৃত্রাসুর ॥····বটে।··· উত্তম।

বলাসুরের মহুয়া লইয়া প্রবেশ

এই যে ভাই, এনেছ?····[মহুয়া পান] হাঁ·· তাজা! টাট্কা!·· বলাসুর ···ঐ বন্দিনী কন্যাকে আমি খুশী হয়ে তোমায় উপহার দিচ্ছি· তুমি তাকে গ্রহণ কর····

[বলাসুরের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ পাইল না, তাহা তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল।···সে ত্বরিৎপদে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল]

বৃত্রাসুর ॥ এইবার?

দস্র ॥ [নাসত্যকে] ভাই, প্রাণ যায় যাক্, শেষ চেষ্টা! শেষ চেষ্টা!

[ধনুকে তীর যোজনা করিয়া বৃত্রের প্রতি লক্ষ্য। নাসত্যও তাহাই করিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বৃথা চেষ্টা। ও তীরের ফলক এই পাষাণের বুকে বেঁধে না।····আমি শুধু ভাবছি বলাসুর সূর্য্যাকে না জানি কি লাঞ্ছনাই করছে!

অশ্বীদ্বয় ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] সূর্য্যা! সূর্য্যা

সূর্য্যা ॥ [আকুল আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]
প্রিয়তম! প্রিয়তম! [সেই সময় বলাসুর সূর্য্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে! [হাত ধরিয়া] তোমার হাতদুখানি কি নরম! ফুলের মত নরম! [পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে] আঃ।

দস্র ॥ [বৃত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া] দয়া কর! দয়া কর!

নাসত্য ॥ [নতজানু হইয়া] কর দয়া! দয়া কর!

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [অশ্বীদ্বয় ক্রোধে ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

দস্র ॥ নাসত্য! এ দৃশ্য অসহ্য!

নাসত্য ॥ এর চাইতে মৃত্যু ভালো।

দস্র ॥ মৃত্যু ভালো! মৃত্যু ভালো! এর চাইতে মৃত্যু ভালো!

সূর্য্যা ॥ তার আগে আমায় মারো! আমায় মারো!

বলাসুর ॥ কেঁদো না আলোর মেয়ে! কেঁদো না। তোমার চোখের জলের চাইতে তোমার মুখের হাসি ভালো।····হাসো! সেই হাসি হাসো!

বৃত্রাসুর ॥ [বিরক্ত হইয়া] বলাসুর, তোমার ঐ বন্দিনী প্রণয়িনীকে কক্ষান্তরে নিয়ে গিয়ে প্রেমালাপ কর—এখানে নয়—

সূর্য্যা ॥ ওঃ—[বলাসুর অতীব আনন্দে সূর্য্যাকে তৎক্ষণাৎ দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।]

বৃত্রাসুর ॥ [অশ্বীদের প্রতি]…জীবন দুর্ব্বিষহ বোধ হচ্ছে, না ?

অশ্বীদ্বয় ॥ আমাদের বধ কর দস্যু—

বৃত্রাসুর ॥ তোমরা দুজনেই ওর প্রণয়ী, [হাসিয়া] না…না…দেখছি বলাসুর তৃতীয়।…হাঃ হাঃ হাঃ… মরণের কথা মুখে না আনলে প্রণয়ের কথা ভালো জমে না, না ? [ব্যঙ্গে] মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু।… মর্ত্তে পার ? উত্তম ! হোক্ তবে আমার কথা…যদি তোমরা মৃত্যু বরণ কর, সূর্য্যা মুক্তি পাবে। উভয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াও…পরস্পরে পরস্পরের প্রতি একসঙ্গে তীর নিক্ষেপ কর।…মৃত্যুর পূর্ব্বে মুহূর্ত্তে দেখবে ঐ সূর্য্যা মুক্তা।… প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আমার ধর্ম্মের আমার জাতির নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি আমার কথা রাখব। (শ্লেষে) মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু ভালো ! এইবার মর—

অশ্বীদ্বয় ॥ প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছ ?

বৃত্রাসুর ॥ [উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিয়া] হাঁ, প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি !

অশ্বীদ্বয় ॥ মর্ব্ব ! আমরা মর্ব্ব ! তবু সূর্য্যা বাঁচুক !

বৃত্রাসুর ॥ বোধ হয় এরই নাম প্রণয়। বেশ, প্রণয়েরই পরীক্ষা হোক্ !

অশ্বীদ্বয় ॥ সূর্য্যা ! সূর্য্যা !

দূর হইতে সূর্য্যার উত্তর আসিল "প্রিয়তম ! প্রিয়তম !"

অশ্বীদ্বয় ॥ আমরা প্রস্তুত। আমাদের চোখ বেঁধে দাও। ভাই হয়ে ভাইকে হত্যা চোখে দেখতে পারব না।

দস্র ॥ ভাই !

নাসত্য ॥ ভাই ! [উভয়ে আলিঙ্গন।]

অশ্বীদ্বয় ॥ দাও দস্যু, আমাদের চোখ বেঁধে দাও।…

দস্র ॥ না, আমরা নিজেরাই বেঁধে নিচ্ছি। [পরস্পরে পরস্পরের চোখ বাঁধিলেন।]

অশ্বীদ্বয় ॥ আমাদের ধর্ম্ম আমরা রাখলুম, [বৃত্রকে] তোমার ধর্ম্ম তুমি রেখো দস্যু !

বৃত্র ॥ রাখব, অবশ্য রাখব।… বেশ হয়েছে,… এখন…হাঁ;…ঐ বৃক্ষে দেখছি একটি কাক বসে আছে। যে মুহূর্ত্তে ঐ কাক এবার ডেকে উঠবে, পরস্পরে পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর ।…যদি না মর, সূর্য্যার মুক্তি নেই ! যদি মর সেই মৃত্যু-মলিন চোখে দেখে যাবে সূর্য্যা মুক্ত।

দস্র ॥ ঐ কাকের এক রব। হাঁ, সেই ভালো, একসঙ্গে; এক মুহূর্ত্তে মর্ব্ব….

নাসত্য ॥ কেউ পিছে সর্বো না, একসঙ্গে··· সেই ভালো।

বৃত্র ॥ উত্তম! আমি দুর্গে চললুম সূর্য্যাকে পাঠিয়ে দিতে।

[বৃত্রাসুর দুর্গাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন]

দস্র ॥ একটি রব! ঐ কাকের একটি রব!

নাসত্য ॥ ডাকে না কেন কাক! এ যে যুগযুগান্তব্যাপী মৃত্যু-যন্ত্রণা··· সহ্য হয় না, সহ্য হয় না!

দস্র ॥ চুপ! চুপ!

[উভয়ে নীরব হইলেন, এবং কাকের ডাকের জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃত্রাসুরের ইচ্ছানুসারে সূর্য্যা মুক্তা হইয়া অনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আসিয়াই দেখেন অশ্বীদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত তীর লইয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যা বুঝিলেন—এ বুঝি তাহারই সহিত কোন প্রণয়-খেলা ছুটিয়া সূর্য্যা তাহাদের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃত্রাসুর দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া যে মুহূর্তে সূর্যাকে রক্ষার্থে উপস্থিত হইবেন, সেই মুহূর্তেই কাক ডাকিয়া উঠিল। অমনি দুইদিক হইতে দুই তীর ছুটিয়া সূর্য্যার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। সূর্য্যা আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া যাইতেই বৃত্রাসুর তাহাকে ধরিলেন। আর্তনাদ শুনিয়া, এবং নিজেরা কেহই আহত হইলেন না কেন, না বুঝিতে পারিয়া, অশ্বীরা তৎক্ষণাৎ চোখের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন]

দস্র ॥ একি হ'ল! একি হ'ল!

নাসত্য ॥ একি করলুম! এ আমরা কি করলুম! [দুইজনে বৃত্রাসুরের নিকট হইতে সূর্য্যাকে গ্রহণ করিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ আমি··আমি কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না—বলাসুর! বলাসুর!

[একটী পুষ্পপাত্র পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ছুটিয়া বলাসুরের প্রবেশ, এবং আসিয়াই সূর্য্যার ঐ অবস্থা দেখামাত্র যেন বাণবিদ্ধ হইল। পুষ্পপাত্র পড়িয়া গেল।]

দস্র ॥ সূর্য্যা! আদরের সূর্য্যা! কথা কও!

নাসত্য ॥ চোখ মেল! চোখ মেল!

দস্র ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা! যাদের তুমি প্রাণের চাইতে ভালোবেসেছিলে তাদের হাতেই হ'ল তোমার মৃত্যু! এও ছিল কপালে!

নাসত্য ॥ কথা কও! কথা কও! চোখ মেল! অক্ষম আমরা, অযোগ্য আমরা, তোমার মুক্তি-বিধান কর্তে পারিনি, কিন্তু মৃত্যু-বিধান করেছি··· কার মায়াবী চক্রান্তে···? অসুরের···অসুরের···সেই অসুরকে যে বধ করি··তারো শক্তি নাই.. [বৃত্রাসুরের প্রতি] বধ কর····বধ কর····আমাদেরও বধ কর তুমি!

দস্র ॥ নাও প্রাণ···নাও প্রাণ....দয়া করে ঐ সূর্য্যার সঙ্গে মৃত্যুর পরপারে পথ চলতে দাও!

বলাসুর ॥ [সূর্য্যার প্রতি]···কথা কও! কথা কও···আলোর মেয়ে! আগুনের মেয়ে! জাগো! জাগো! [হৃদয়ভেদী স্বরে] চোখ মেলে চাও! চোখ মেলে চাও!

দস্র ॥ মরেছে—মরেছে···জীবনের আলো নিভে গেছে। আজ যদি দধীচি থাকতেন···বাঁচাতেন···ওকে বাঁচাতেন!

নাসত্য ॥ কোথায় দধীচি! কোথায় দধীচি! নিয়তি! নিয়তি! সবই নিয়তি!···আজ দধীচি এখানে নাই···মধুবিদ্যা নিষ্ফল হল! দেবতার কাজে লাগল না! আমাদের সূর্য্যা....বাঁচল না! বাঁচল না! বাঁচল না! [বিলাপ]

দস্র ও নাসত্য ॥ [বৃত্রের প্রতি] বধ কর! বধ কর! আমাদেরও বধ কর!

বলাসুর ॥ আমায়ও···আমায়ও! [বৃত্রের পায়ে পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ দাঁড়াও—

[মুমূর্ষু দধীচিকে লইয়া আসিলেন বৃত্রাসুর। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইলেন।]

দস্র ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

নাসত্য ॥ নাই! নাই! সূর্য্যা নাই!

বলাসুর ॥ [মরিয়া হইয়া] ওকি কিছুতেই বাঁচে না?····কিছুতেই কি ঐ আলো আবার জ্বলে না? ঐ ফুল ফোটে না?····

বৃত্রাসুর ॥ বাঁচাও! বাঁচাও! তোমার মধুবিদ্যায় ঐ নিরপরাধ বালিকাকে বাঁচাও!

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ [ছুটিয়া আসিয়া দধীচির পায়ে পড়িলেন] গুরু! প্রভু! তুমি! বাঁচাও! আমাদের সূর্য্যাকে বাঁচাও!

বলাসুর ॥ আগুনের আলো নিভে গেছে। আলোর মেয়ে কথা কয় না··· কথা কয় না! বাঁচাও! বাঁচাও!

দধীচি ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যার সম্মুখে গেলেন, এবং তাহার মাথায় হাত রাখিয়া] আলোর মেয়ে! জাগো মা জাগো! আকাশে সূর্য্য উঠুক ···পাহাড়ের তুষার গলে যাক্—জাগো মা জাগো!

[দূরে সূর্য্যোদয় হইল। তাহার অরুণ আভায় পৃথিবী স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল। পর্ব্বতশিখরের তুষার ঝিকমিক্ করিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল।]

সূর্য্যা ॥ [চোখ মেলিয়া চাহিয়া দধীচির প্রতি] প্রভু!

দধীচি ॥ মা!

সূর্য্যা ॥ [অশ্বীদের প্রতি] প্রিয়তম! প্রিয়তম!

অশ্বীদ্বয় ॥ প্রিয়া !

বলাসুর ॥ [পাত্র হইতে পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া] ···আমাকে নয়, আমাকে নয়,··· আমি কালো····বড়ই কালো··· কিন্তু আমার এই ফুল··· এও কি তোর ভালো লাগে না—[নতজানু হইয়া সেই পুষ্পগুচ্ছ সূর্য্যাকে নিবেদন করিল।]

সূর্য্যা ॥—না।

বৃত্রাসুর ॥ [সূর্য্যাকে লক্ষ্য করিয়া] উপযুক্ত উত্তর। বলাসুরকে লক্ষ্য করিয়া] উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষা শুধু তোর নয়, শিক্ষা হোক্ সকলের, যারা কালো ··কালো চামড়ার তলে রক্ত লজ্জায় ঘৃণায় আরো লাল হয়ে উঠুক···· টগবগ করে ফুটে উঠুক।··· মুক্ত তুমি ঋষি। মুক্ত তোমার শিষ্যদ্বয়। আর মুক্ত ঐ আলোর মেয়ে। এ আমার মহানুভবতা নয়।····কালোর হাতে ফুল উঠেছিল বলে যারা সেই ফুলকেও ঘৃণা করে, তাদের সংস্পর্শে দূষিত বাতাস আমি সইতে পাচ্ছিনে বলেই····তোমরা আজ মুক্ত !

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[দধীচি ঋষির তপোবন। দূরে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা, তদুপরি সেতু। একটি মাত্র কুটীর···তরুলতার ছায়াতলে ঢাকা। কুটীর সম্মুখে যজ্ঞবেদী।]

*　　*　　*

[দধীচি ও রৈভী। রৈভী দধীচিকে প্রণাম করিয়া উঠিল।]

দধীচি ॥ শচী কোথায় ?

রৈভী ॥ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করছে।····সূর্য্যার উদ্ধার হয়েছে প্রভু ?

দধীচি ॥ শুধু উদ্ধার হয়নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। সূর্য্যদেব স্বয়ং তাকে সম্প্রদান করেছেন।····ঐ তারা এখানে আসছে—

[রৈভী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। উষা, তাহার পর সূর্য্যাকে মধ্যে লইয়া দুইপার্শ্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাহার পর সপ্তবর্ণের সূর্য্যরশ্মি দেবীগণ, তাহার পর অগ্নিদেব, তাহার পর ইন্দ্রদেব, বরুণদেব, বায়ুদেব প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ। উষার নেতৃত্বে দেবীগণ বর-বধূকে নৃত্য-গীতে বরণ করিলেন।]

—বরণ গান—

আজি গগনে শুভ লগনে, বাজে সঘনে শঙ্খ সুখছন্দে।
যুগল মধুকর কমল মুখ'পর মগন-মিলনে মন আনন্দে

নিখিল জনচিত মিলন পিপাসিত

উলসী ফুলকুল।

কাননে কুসুমিতে

সোহাগে শশীতারা, দোঁহার মাঝে হারা

আকুল মলয় মৃদু মৃগমদ গন্ধে।

[বরণের পর সূর্য্যাকে লইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির পাদবন্দনা করিলেন।]

দধীচি॥ [আশীর্ব্বাদ করিয়া]···জয়োস্তু!···জয় চাই—জয় চাই···চাই শুধু জয়! ·· দস্যুর হাত থেকে ঐ সূর্য্যাকে যেমন করে আজ উদ্ধার করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপণ রেখে, তেমনি···তেমনি করে উদ্ধার কর দস্যু-অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবভূমি! যেদিন তোমরা প্রথম আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, সেদিনও তোমাদের যে আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, আজো সেই আশীর্ব্বাদ করি, যতদিন না দেবভূমি পুনরায় দেবতার হবে, ততদিন শুধু ঐ এক কামনা, এক আশীর্ব্বাদই করব "জয়োস্তু।" জয়লাভ কর! [সূর্য্যার প্রতি] আর তুমি মা গৃহে গিয়ে গৃহের কর্ত্রী হও···তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর" আর আমার আশীর্ব্বাদ···"বীর প্রসবিনী হও"! আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে মা চাই—যে মা সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহ-কাতর করে না······—ভালোবেসে শুধু ভালোবাসা শেখায় না, চাই সেই মা ···যে মা দেশের অপমানকে নিজের অপমান মনে করে,···এবং সেই অপমানের গ্লানি দূর করবার ভার তার সন্তানের হাতে দেয়...—চাই সেই মা, যে মা সন্তানকে বলে "এই যে দেশ,···এ তোমার মাতারও মাতা···পিতারও পিতা···—দেবতারও দেবতা! ·· সেই পরম দেবতার পুজো কর ·· সেই পরম দেবতার জন্য প্রাণ দিতে হয়—প্রাণবলি দাও ·· বংশের মুখোজ্জ্বল হবে, জীবন সফল হবে ···মৃত্যু সার্থক হবে!"—এই শিক্ষা···এই শিক্ষা ·· এই শিক্ষা !···অসুর তোমাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে, কারাবন্ধন খসে যাবে—····মুক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে সুরলোক আবার স্বর্গ হবে!···এই আশীর্ব্বাদ! আমার এই আশীর্ব্বাদ!···]

অন্যান্য দেবগণ॥ আমাদেরও ঐ আশীর্ব্বাদ····ঐ আশীর্ব্বাদ!

ঊষা॥ [সূর্য্যার প্রতি]—ওগো রাজ্ঞী! "শ্বশুরকে বশ ক'রো, শ্বশ্রূকে বশ ক'রো···রাজ্ঞী আছ,—ননদ আর দেবরদের ওপর সম্রাজ্ঞী হ'য়ো!"—

দধীচি॥····"বধূ অতি সুলক্ষণযুক্তা,····সকলে এসো···দেখ····একে সৌভাগ্যের আশীর্ব্বাদ করে····নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর"—

[এমন সময় দেবদূতী সরমা ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

সরমা॥ সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! আমাদের মহা সর্ব্বনাশ!

ইন্দ্র ॥ [ব্যাকুলচিত্তে] কি সর্ব্বনাশ সরমা ?

সরমা ॥ বলাসুর অগণিত বর্ব্বরদস্যুদের সঙ্গে নিয়ে সূর্য্যদেবের দেওয়া যৌতুক অশ্বীদেবদের সমস্ত গোধন হরণ করে নিচ্ছে। গোরক্ষকগণ প্রায় সকলেই হয় বন্দী, না হয় মৃত !

ইন্দ্রদেব ॥ তবে যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! আবার যুদ্ধ !

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ [সূর্য্যাকে] আসি প্রিয়ে !

ইন্দ্র ॥ [দধীচির প্রতি] গুরু ! দেবীদের রক্ষার ভার তোমার—

দধীচি ॥ নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধে অগ্রসর হও ! রক্ষা কর দেশের মান—

দেবগণ ॥ আমরা কর্ব্ব রক্ষা দেশের মান।

দধীচি ॥ দেবীরাও রক্ষা করবে তাদের মান। দেশের আজ সেদিন নয়, যে দেবীরা অবলা। রমণী নয়, কামিনী নয়, তাঁরা আজ জননী, নির্য্যাতিত শৃঙ্খলিত সন্তানের জয়ার্থিনী শক্তিময়ী জননী ! [অগ্রসর হইয়া]....নিঃশঙ্ক-চিত্তে অগ্রসর হও দেবগণ, ঐ পথ....আজ আমার এই আশ্রমের ঐ বন্ধুর পথে তোমাদের জয়যাত্রা সুরু হোক্—

[পথ দেখাইলেন ; দেবগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।]

ঊষা ॥ [সূর্য্যা প্রভৃতি দেবীগণকে] ভয় নেই সূর্য্যা ! ওরা যাক্। চল আমরা ঐ দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখি।

রৈভী ॥ কিন্তু শচী ?

[দধীচির পুনঃ প্রবেশ]

দধীচি ॥ তার জন্যও ভয় নেই। সে আমার শিষ্যা। যেখানেই সে থাকুক, তার জন্য আমার আশঙ্কা নেই। চল দেবীগণ, আমি তোমাদের নিজ নিজ আশ্রমে রেখে আসি, তোমাদের শিশু সন্তানরা হয়ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ! রৈভী, আমার শরাসন—

রৈভী ॥ [রৈভী শরাসন আনিয়া দিল।] নিন প্রভু !

দধীচি ॥ এস—

[দেবীগণকে লইয়া দধীচির প্রস্থান।]

[ক্ষণকাল পর অন্য দিক হইতে পৌলমীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পৌলমী অরণ্য হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বেদগান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিলেন। পৌলমীর সেই গান ঋগ্বেদের ১ম অষ্টক ১ম মণ্ডল ১ম অধ্যায় ১ম সূক্ত।]

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

১। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ ; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি রীড্যো নূত্ত নৈরূত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে
যশসং বীরবত্তমম ॥ ৩ ॥

[কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল…]

[এদিকে বৃত্রাসুর অতি সন্তর্পণে সেই সেতুপথে নদী পার হইয়া পৌলমীর পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ;—তখনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"এই তোমার সেই আগুন ?"—

বৃত্রাসুর ॥ এই তোমার সেই আগুন ?—

শচী ॥ [বৃত্রাসুরকে দেখিয়াই পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া উঠিলেন। চোখে-মুখে কৌতুকের ছটা, সগর্ব্বে এবং সগৌরবে কহিলেন] আজ আবার বুঝি ছল করে শুধু ঐ আগুন দেখতেই এসেছ ?

বৃত্রাসুর। …এই আগুনে তোমাদের যজ্ঞ হয় ?

শচী ॥…হাঁ—

বৃত্রাসুর।…তোমার হাতের ঐ আগুনে তোমার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়।…কিন্তু তুমি তো তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না !…

শচী ॥…ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ?…সত্যি ?…

বৃত্রাসুর ॥ তবে কি আমি মিথ্যা বল্‌ছি ?… তোমায় দেখ্‌ছি—আর আমার মনে হচ্ছে …—ঐ যে সূর্য্য…তুমি তার চাইতেও সুন্দর….সেই যে চাঁদ …চাই না তার আলো যদি তুমি—যদি…আমার ঘরে ঐ আগুনের মতো চিরকাল জ্বলো !—

শচী ॥ আমি ‥ আমি যে কালো,—

বৃত্রাসুর ॥ [সাহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]—কালো ! কালো !… ঐ কথাটি-ই যে আজ আমি তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে চাই ! কালো !— তুমি কালো। আমরাও কালো।—সেই আমাদের গর্ব্ব,… সেই আমাদের গৌরব। তুষারের মতো দেবতার রং,—পাহাড়ের মতো আমাদের রং। লজ্জার কি আছে ?…ওরা গরুর দুধ খেয়ে মানুষ,—আমরা নদীর জল খেয়ে মানুষ।

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন ; দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নি দ্বারা ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

রমেশ দত্তের অনুবাদ

ওরা দুধের রং পেয়েছে, আমরা জলের রং পেয়েছি,⋯হলোই বা ওরা তুষারের দেবতা, আমাদেরও গর্ব্ব আমরা মাটির মানুষ⋯ আর তুমি তুমি⋯আমাদের সেই মাটির বুকে নীলমাণিক! তুমি আমাদের পিপাসার জল .. কালো জল ⋯শীতল জল!⋯তোমাকে দেখে আমাদের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়, তোমাকে পেলে আমাদের বুক ভরে ওঠে⋯[বলিতে বলিতে শচীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতে গেলেন—]

শচী ॥ [সভয়ে তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইয়া]⋯না—না—না—

বৃত্রাসুর ॥ দয়া কর! দয়া কর!—

শচী ॥⋯ তুমি অসুর—

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ, আমি অসুর। .. কিন্তু⋯তুমি?—

শচী ॥—আমি!

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ,⋯⋯ তুমি পৌলমী!

শচী ॥ আমি⋯আমি আর পৌলমী নই! আমি শচী—

বৃত্রাসুর ॥ না⋯না⋯না... সেদিনও যে পৌলমী ছিলে, আজো সেই পৌলমী তুমি!

শচী ॥ আমি শচী! আমি শচী! [বৃত্র হাসিয়া উঠিলেন] হাসির কথা নয়। হলুম-ই বা দধীচি ঋষির কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে,⋯তবু আমি দেবতা! [বিরক্তি সহকারে]⋯তুমি চলে যাও। তোমার কথা আমি বাবাকে বলেছিলুম। তিনি বলেছেন—তুমি যখন কালো, তখন তুমি দেবতা নও,— তুমি অসুর—

বৃত্রাসুর ॥⋯আমি কালো ;—আর তুমি?—

শচী ॥ নাই বা হ'ল দুধের মতো আমার রং⋯ তবু তবু আমি দেবতা।⋯ কুড়িয়ে পেয়ে আমায় যিনি পালন করেছেন, তিনি দেবতারও দেবতা⋯আজ আমি তাঁর-ই মেয়ে!—

বৃত্রাসুর ॥ বটে!—ঋষি দধীচিই তবে হলো তোমার পিতা! বেশ! বেশ! ⋯ চমৎকার!—তা কোথায় তিনি?

শচী ॥ সূর্য্যার খোঁজে কোথায় গেছেন। এখনি আসবেন। তুমি যাও⋯তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ।

বৃত্রাসুর ॥⋯হাঁ, যাব।⋯জানি তিনি এখনি আসবেন। আমি সেই ফাঁকে তোমার এখানে লুকিয়ে চলে এসেছি....শুধু তোমায় বলতে—তুমি কে⋯

শচী ॥ আমি⋯আমি⋯এখনো জানো না?

বৃত্রাসুর ॥ তুমি পৌলমী।⋯ না?

শচী ॥ [রাগিয়া]⋯ঠাট্টা?—ওর চাইতেও আমার ভালো নাম আছে⋯ যজ্ঞের কাজ করি বলে আমার নাম "শচী।"

বৃত্রাসুর ॥ [শ্লেষে] দেবী,⋯না?—

শচী ॥ [সগর্ব্বে]—একশবার—

বৃত্রাসুর ॥ সত্যি ?—

শচী ॥ তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইবো না।

বৃত্রাসুর ॥ কথা না বল্‌লে।…কিন্তু…ঐ যে নদীর জল সে তো কথা বলে না, তবু আমি দেখি শুধু তার জগৎজুড়ানো রং…আমি দেখি সে কি কালো !—

শচী ॥ কালো নয়, নীল—

বৃত্রাসুর ॥ কখনো কালো, কখনো নীল ! কালো তোমার চোখ…নীল তোমার আলো।…জানো না…দুধের মতো যাদের রং তারা দেবতা।…আর ঐ জলের মতো যাদের রং—তারা অসুর।—

শচী ॥ [অবিশ্বাসের স্বরে]—সকলেই বুঝি !—

বৃত্রাসুর ॥ দেবতাদের মধ্যে আর কার রং ঠিক্ তোমার মতো ?…বল…বল…

শচী ॥ তাই তো ! —তবে কি… তবে কি আমি—

বৃত্রাসুর ॥ তুমি দেবতার বন্দিনী,—অসুরের নন্দিনী !—

শচী ॥ অসুরকুলেই যদি আমার জন্ম…আমি এখানে কেমন করে এলুম ?

বৃত্রাসুর ॥ ওরা কুড়িয়ে পায়নি…কুড়িয়ে পায়নি তোমায় !—ওরা তোমায় চুরি করে এনেছে, লুট করে এনেছে !

শচী ॥ [শ্লেষে] তাই যদি হবে… তখন…তোমরা কোথায় ছিলে ?

বৃত্রাসুর ॥ [শিহরিয়া উঠিলেন, বিচলিত ভাবেই কহিলেন]—তখন—তখন—

শচী ॥ বুঝেছি—তবে তোমার সবই মিথ্যা।…তুমি যাও…চলে যাও....

বৃত্রাসুর ॥ না… না… না…!…মিথ্যা নয় !—সত্যি বল্‌ছি…ঐ দধীচি ঋষি…ঐ দধীচি ঋষি…তারি জন্য তোমাকেও হারিয়েছি, তোমার পিতাকেও হারিয়েছি !—শোন রাজকন্যা ! তোমার পিতা আমাদের রাজাধিরাজ পুলোমন…তাঁরই কন্যা তুমি "পৌলমী" !"

শচী ॥ বেঁচে নেই ? বেঁচে নেই তিনি ?

বৃত্রাসুর ॥ নেই…নেই… নেই…বেঁচে নেই !

শচী ॥ কে তাঁকে বধ কর্‌ল ?—কেন তাঁকে বধ করল ?

বৃত্রাসুর ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] কেন তাঁকে বধ করল ?

শচী ॥ তবে কি …তবে কি…ঐ দধীচি ঋষিই তাঁকে…

বৃত্রাসুর ॥ [শিহরিয়া উঠিলেন ; হঠাৎ যেন অন্য কথা পাড়িবার ছলে] …ঐ কার পদশব্দ· ·কে আস্‌ছে ! …তুমি এসো …চলে এসো তোমার রাজ্যে—।

তোমার পিতার সিংহাসন তোমার মুখ চেয়ে আছে, আমরা সকলে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছি···তোমার জন্যে মুকুট তৈরী ক'রে রেখেছি!—কত রংএর··· কত রূপের শত শত গহনা তৈরী করেছি!···মহুয়ার মধু রেখেছি! ··দুধ চাও ····তাও আছে, দেবতাদের গরু লুট করে রেখেছি!···তুমি এসো! তুমি এসো!····

শচী। [একটু অগ্রসর হইলেন, বোধ করি বৃত্রাসুরের কথাতে মন ভিজিয়াছিল—]

বৃত্রাসুর॥····এসো···এসো ··আমার হাত ধর····

শচী····কিন্তু···[কুটীরের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন]

বৃত্রাসুর॥ ওরা তোমার শত্রু ·· আমরা অসুর,····অসুরের কন্যা তুমি,···· ওরা তোমাকে লুট করে এনে দাসী করে রেখেছে!····তুমি ওদের বন্দিনী!···· হয়তো ওরা তোমাকে খুবই ভালোবাসা দেখায়, কিন্তু রক্তের টান কোথায়?···· কোথায় সেই আকর্ষণ—যার জন্য আজ শুধু আমি নই,—সমগ্র অসুরকুল তোমাকে এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে তোমার পিতার সিংহাসনে বসাবার জন্য জীবন-পণ করেছি····মরণ-পণ করেছি····করেছি কিনা দেখ্‌বে?····আমার হাত ধরে চলে এসো···ঐ কে আসে আসুক · মর্ত্তে হয় মর্ব্ব··· তোমার জন্যেই মর্ব্ব····আমার রাজকন্যার জন্য মর্ব্ব····এসো! এসো দেবতার বন্দিনী···· অসুরের নন্দিনী! এসো!—

শচী [বিহ্বলার মত তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন, বৃত্রাসুর তাঁহার হাত ধরিয়া সেতুপথের দিকে অগ্রসর হইলেন।]

নেপথ্য হইতে দধীচি॥ শচী? শচী?

[দধীচির প্রবেশ। তিনি অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা কুটীরে গেলেন এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া হৃদয়-ভেদী স্বরে ডাকিলেন]

দধীচি॥ শচী? শচী?

বৃত্রাসুর॥ [সেতুপথ হইতে] এই যে পৌলমী! অসুরেরই নন্দিনী, দেবতার বন্দিনী নয়!

দধীচি॥ [বৃত্রের পার্শ্বে শচীকে দেখিয়া] শচী, এ কি?

বৃত্রাসুর॥ হাঁ, শেষ দেখা দেখে নাও ঋষি!—অসুর-রাজকন্যা অসুরের রাজসিংহাসন আলো করবার জন্য আমার সঙ্গে শুভযাত্রা করছেন ··হাঃ হাঃ হাঃ····

দধীচি॥ দুর্ব্বৃত্ত দস্যু!···[মুখে আর কথা জুটিল না—শচীকে] মা! এর অর্থ? আমাদের ঐ পরম শত্রুর সঙ্গে!········

শচী॥ কে শত্রু?—আমি অসুরকন্যা।—[শ্লেষে] দুধের মতো তো

আমার রং নয়! দধীচি তো আমার পিতা নয়!—[সগর্ব্বে]—আমার পিতা রাজাধিরাজ পুলোমন!——ঋষি! প্রণাম!

[প্রণাম করিয়া উঠিলেন]

····আমি আমার রাজ্যে চল্‌লুম····বিদায়!····

দধীচি ॥ ওরে!····ওরে আমার পাগ্‌লি মেয়ে!····তোকে লালন করেছি আমি! পালন করেছি আমি!····ঐ দস্যু তোকে আমার বুক হতে ছিনিয়ে নিতে এসেছে··আয়! আয়!··· আমার বুকে আয়!—

[ছুটিয়া শচীকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেই বৃত্র মাঝখানে আসিয়া ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ [অট্টহাস্যে]—হাঃ হাঃ হাঃ—

দধীচি ॥ চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—ওরে মা! চেয়ে দেখ—তোকে চেয়ে পায়নি বলে ঐ দস্যু আমার হাতে লৌহ কীলক বিদ্ধ করেছে··রক্তে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভেসে গেছে,··· মাটি ভিজে গেছে,—তবু—তবু-ও—[দুঃখে ক্ষোভে স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল]

বৃত্রাসুর ॥···চলে এসো পৌলমী!···আমাদের অসুরসৈন্য দেবতাদের গোধন জয় করেছে——····দেবতাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বেধেছে, সে যুদ্ধেও তোমারই অসুরসৈন্য জয়লাভ করেছে····ঐ শোন তাদের জয়ধ্বনি!····তারা তোমার হাতে আজ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে···চল·· চল রাজকন্যা!—

[শচী বৃত্রের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যাইতে যাইতে দধীচি ঋষিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।]

দধীচি ॥··· যাবি? যাবি মা? সত্য-ই কি যাবি?—

শচী ॥····আমি যাব। কেন যাব না? কেন তোমরা আমায় হরণ করে এনে এখানে বন্দিনী করে রেখেছ?··· কেন?····কেন?—

বৃত্রাসুর ॥··হাঃ হাঃ হাঃ—শুনলে ঋষিরাজ!···[শচীর হস্তধারণ করিয়া] ····চলে এসো রাজকন্যা!—

দধীচি ॥····ওরে, তুই, আমায় ছেড়ে কার সঙ্গে যাস্‌?—

শচী ॥·· হাঁ, যাই।·· তার সঙ্গে যাই, যে আমায় আমার পিতার সিংহাসন দেবে।··· ছেড়ে যাই তাকে····যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে—

বৃত্রাসুর ॥ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া]····না—না—না!—

দধীচি ॥····আমি! আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি?—

বৃত্রাসুর ॥ [নীরব রহিলেন]

শচী ॥ [বৃত্রকে]····বল—বল····

দধীচি ॥····বলব ? বলব ?·· বলব বৃত্রাসুর ?

বৃত্রাসুর ॥ [উন্মত্তের মত]—না··· না—ব'লো না।···যদি বল··· যদি বল····তবে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমি তার প্রতিশোধ নেব····এমন প্রতিশোধ নেব · [তৎক্ষণাৎ দধীচির পায়ে পড়িয়া]—না ·· না··· ব'লো না··· দয়া কর ··· দয়া কর····

শচী ॥ [চীৎকার করিয়া] বল·· বল ·· —

দধীচি ॥—··· আমি বলব ! আমি বলব !—

বৃত্রাসুর ॥ [লম্ফ দিয়া উঠিয়া প্রদীপ্ত রোষে] তবে আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব—

শচী ॥ [বৃত্রকে] তবে আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা কর্ব্ব না]··· বল···· বল ঋষিরাজ····বল—

দধীচি ॥ —কোন দেবতা তোমার পিতাকে হত্যা করে নি—

শচী ॥ [বৃত্রকে] তবে তবে কি তুমি ? সত্য বল—বল ?

বৃত্রাসুর ॥ [দারুণ অন্তর্বিপ্লব। সত্য বলিবেন কি মিথ্যা বলিবেন কিছুতেই ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে সত্য বলাই ঠিক করিলেন। তাঁহার বুক ভাঙিয়া গেল। সত্য বলিলেন বটে কিন্তু এই এক সত্য তাহার হৃদয়কে চুরমার করিয়া দিল। অতি করুণ ভাবে বলিলেন···] হাঁ—! আমি ! আমি !

[কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। চলিয়া গেলেন।]

শচী ॥ [দধীচির পদতলে পড়িয়া]—বাবা ! আমায় ক্ষমা করুন··· ক্ষমা করুন বাবা ! [পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।]

দধীচি ॥ ··· ওঠ মা !··· আমি বুঝেছি দুর্ব্বৃত্ত তোমাকে··· মিথ্যা মায়ায় প্রলুব্ধ করেছিল ! [তাহাকে তুলিয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিতে লাগিলেন] ··· তুমি অসুরনন্দিনী, কিন্তু, যখন আমি তোমায় পালন করেছি,··· —তুমি দেবতারও দেবী ! তোমায় যে শিক্ষা দিয়েছি,—স্বয়ং সরস্বতী তা হিংসা করেন।··· তোমার যোগ্য বর একমাত্র দেবরাজ।··· আজ আমি তাঁর ই হাতে তোমায় সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হব।

শচী ॥ আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই ···

[দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র ॥ আমাদের এই পরাজয়ের, এই উপর্য্যুপরি পরাজয়ের প্রতিশোধ চাই !—

শচী ॥···দেবরাজ ! আপনিও শুনুন···আমি···আপনাদের আশ্রিতা। আমি আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই !—

ইন্দ্র ॥ —কে তোমার পিতৃহন্তা ?—

শচী ॥ ·· বৃত্রাসুর !—

দধীচি ॥ অসুররাজ পুলোমনের এই সেই কন্যা। দেবাসুর মিলনপ্রার্থী সেই অসুররাজ ···দেবরাজের হাতেই ওকে সম্প্রদানে করবে এই ছিল তার অন্তরের পরম কামনা। দেববিদ্বেষী বৃত্রাসুর শুদ্ধ এই কারণে পুলোমনের শির নিয়েছে, কিন্তু আমি তখনি আমার আশ্রমে তার কন্যাকে নিয়ে এসে বৃত্রাসুরের মনস্কামনা ব্যর্থ করেছি। তারপর হতে আমি নিজে ওকে আমার মানসকন্যার মত শিক্ষা দিয়েছি, প্রতিপালন করেছি। দেবরাজ ! ওর পিতার কামনা ছিল শচী ইন্দ্রাণী হয়। গ্রহণ কর দেবরাজ ! আমি আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্যাকে তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ-স্পৃহাকে চিরজাগ্রত রাখবার ভার দিয়ে আজ এই জাতীয় জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে তোমার করে সম্প্রদান কচ্ছি ! আমার অন্তরের অন্তরতম আশীর্ব্বাদে আমার শচীই হবে তোমার জয় শ্রী !

ইন্দ্র ॥ তথাস্তু !

[দধীচি দুই কর যুক্ত করিয়া দিলেন। ঊষা প্রভৃতি দেবীগণ ছুটিয়া আসিয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে বৃত্রাসুরের প্রবেশ। বৃত্রাসুর যেন এই এক রাত্রিতেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।]

বৃত্রাসুর ॥ [ধীরে, অতি ধীরে] ·· এ যে বিবাহ বাসর ! ·· বর কে ? ····এ কি ! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ? · আর বধূ ? [মুখ দেখিয়াই ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] এ কি !···এ আমি কি দেখলাম ! [বাণাহতের মতো দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন।]

ইন্দ্র ॥ পেয়েছি ·· এইবার তোমায় পেয়েছি অসুর !

বৃত্রাসুর ॥ [রুদ্ধ আক্রোশ মুক্ত হইল] আমিও তোমায় পেয়েছি ইন্দ্র ! কাঁদে ! কাঁদে ! অসুরের মেয়ে দেবতার জন্য কাঁদে ! [শচীকে] কেন কাঁদ ? কেন কাঁদ ?

পরস্পরকে পরস্পরের আক্রমণ। ইন্দ্রের অসি ভঙ্গ হইয়া পড়িয়া গেল। বৃত্র তাহার অসি ইন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ করিতে যাইবেন—এমন সময় শচী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল "ও—হো—হো !" বৃত্রাসুর চমকিত হইলেন। অসি সরাইয়া লইলেন।]

শচী ॥ আমার স্বামী ! আমার স্বামী !

বৃত্রাসুর ॥ আর অসুর ?···কেউ নয়···কেউ নয়···অসুর তোমার কেউ নয় ! কিন্তু তুমি ?—অসুরের সর্ব্বস্ব ! অসুরের মণি ! অসুরের মাণিক ! বাঁচুক··· তোমার স্বামী বাঁচুক। [ইঙ্গিত]

[অসুরসৈন্যগণ প্রবেশ করিল।]

বন্দী কর—

ইন্দ্র ॥···একদিন না একদিন নেবই এর প্রতিশোধ!

বৃত্রাসুর ॥ প্রতিশোধ! হাঃ হাঃ হাঃ [করুণ স্বরে] প্রতিশোধ নিয়ে কি করবে··· আজ তুমি যা নিয়েছ, যা নিলে··· যাকে পেলে···তার চাইতে কি বেশী নেবে? কি বেশী আছে? অসুরের কুলপ্রদীপ কেড়ে নিলে। চোখের আলো আঁধার হল··· বুকের আলো নিভে গেল! ও—হো—হো!

ইন্দ্র ॥ আর তুমি? তুমি যে আমাদের দেবভূমি কেড়ে নিয়েছ! যজ্ঞের অগ্নি নিভিয়ে দিয়েছ! দেবতার রক্তে দেবভূমি ভাসিয়ে দিয়েছ!

বৃত্রাসুর ॥ অধিকার দাও! দেবভূমিতে অসুরকে দেবতার সমান অধিকার দাও··· দেবে?·· দেবে?

ইন্দ্র ॥ সমান অধিকার? অসুরকে দেবতার সমান অধিকার? তাড়িয়ে দেবে···তাড়িয়ে দেবেই দেবে—জেনো মনে রেখো ···দেখো—

বৃত্রাসুর ॥ কিন্তু দেখ··· সে দেবগণও যে আজ আমার বন্দী! [ইঙ্গিত]

[অসুরসৈন্যগণ দেবগণকে বন্দী অবস্থায় আনয়ন করিল।]

দেখ··· চেয়ে দেখ····

ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ ॥ প্রতিশোধ! এরও প্রতিশোধ তুমি একদিন না একদিন পাবেই পাবে।

বৃত্রাসুর ॥ [রুখিয়া উঠিলেন] প্রতিশোধ! উত্তম! প্রতিশোধ···· প্রতিশোধ নেব আজ আমি! কিন্তু কার ওপর?····বল····বল···কে বলবে বল····কার ওপর আজ আমি প্রতিশোধ নেব! কে আমার বুকে সব চাইতে শেলাঘাত করেছে?

দধীচি ॥ আমি জানি। আমার ওপরই আজ তোমার ক্রোধ সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু সে তোমার অন্যায় ক্রোধ। পিতৃহন্তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয় না····আমি তা হতে না দিয়ে উচিত কার্য্যই করেছি। তাতে আমি ক্ষুব্ধ নই। নাও কি প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর নাও—, যে শাস্তি তোমার অভিপ্রেত···· আঘাত···হত্যা যা তোমার অভিলাষ··· দাও, আমায় দাও··· পুঞ্জীকৃত হোক্ তোমার অন্যায়, অত্যাচার, অনিয়ম। ক্ষেপে উঠুক দেবতা-মণ্ডল। যে দেবতা এখনো ঘুমিয়ে আছে, জেগে উঠবে সে। যে দেবতা এখনো সন্দেহে দোদুল্যমান, সকল সন্দেহ দূরে ঝেড়ে ফেলে দেবে সে! সকলে চোখ মেলে চেয়ে দেখবে, মনে প্রাণে অনুভব করবে অত্যাচারীর অত্যাচার। সার্থক হবে তোমার শাস্তি,ধন্য হবে আমার ক্লেশ।

দেবগণ ॥ [সমস্বরে] ঐ ঋষির প্রতি অত্যাচার আমরা কেউ সহ্য কর্ব্ব না ।

বৃত্রাসুর ॥ বটে ! [যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন ।] উত্তম ! [কি ভাবিতে লাগিলেন ।] নির্য্যাতনের নূতন অর্থ শুনলাম আজ তোমার কাছে ঋষি ! নির্য্যাতনে তবে বিপক্ষের ঘুম ভাঙে, ঘুমন্ত শক্তি জেগে ওঠে, সত্যই কি তাই ? উত্তম, মুক্ত তুমি ঋষি ···[কি ভাবিতে লাগিলেন, সহসা] হাঁ, মুক্ত তুমি—

ইন্দ্র ॥ তোমার এই সুবুদ্ধির জন্য তোমাকে অভিনন্দিত কচ্ছি অসুর !

বৃত্রাসুর ॥ ···[যেন ঘুম হইতে সহসা জাগিয়া উঠিলেন] ·· কে ? কে আমায় ব্যঙ্গ কর্ল ?···ইন্দ্র ? ···তুমি ? ···কিন্তু···· তোমাদের জন্য তো আমি মুক্তির আদেশ দেই নি !··· মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হও দেবগণ !···অসুর সেনানী, উত্তোলন কর তোমাদের অসি ·· অবিলম্বে শিরশ্ছেদ কর প্রতি দেবতার !

শচী ॥ [ইন্দ্রর বুকে লুটাইয়া পড়িয়া] ওগো দেবতা ! আমার জন্য—আমার জন্য ·· আমার জন্য আজ তোমাদের সকলের এই দশা ! [স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল]

বৃত্রাসুর ॥ [ব্যঙ্গে] চমৎকার ! কিন্তু পৌলমী ! সকল দেবতার দুর্দ্দশার জন্য ঐ মিথ্যা বিলাপ না ক'রে, মধুযামিনী যাপনের জন্য ঐ এক ইন্দ্রের মুক্তি লাভের জন্য যদি তোমার ঐ কাতরতা সত্য হয়, তাই মুখ ফুটে বল না ! না হয় ইন্দ্রদেবকে তোমার সঙ্গে বাসরঘরেই দিচ্ছি পাঠিয়ে—

শচী ॥ রসনা সংযত কর অসুর !

বৃত্রাসুর বটে ! আমি যদি বলি আমি শুধু এক দেবতাকে আজ মুক্তি দেব, এবং সে দেবতা হবেন তিনি তুমি যার মুক্তি চাইবে, কার নাম নির্গত হবে তোমার মুখ হতে পৌলমী ?

শচী ॥ উত্তর সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ।

বৃত্রাসুর ॥ নিষ্প্রয়োজন হবে না । শোন পৌলমী, আমি বৃত্রাসুর, প্রতিজ্ঞা কচ্ছি····

দধীচি ॥ সূর্য্যাস্ত সমাগত । সন্ধ্যা কর্ব্বার জন্য আমাকে স্নান কর্ত্তে হবে, তোমাদের বাকযুদ্ধের জন্য আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারি না, আমি নদীতে চললুম—

বৃত্রাসুর ॥ উত্তম, আপনি স্নান করুন । কিন্তু, তার পূর্ব্বে আমার প্রতিজ্ঞা শুনে যান, আমি বৃত্রাসুর প্রতিজ্ঞা কচ্ছি [মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিলেন । পরে সহসা] ঐ দধীচি ঋষি তাঁর ধর্ম্মরক্ষার্থে স্নান কর্ত্তে যাচ্ছেন, উনি না গিয়েই পারেন না, পারেন ?

দধীচি ॥ স্নান আমাকে কর্ত্তেই হবে—।

বৃত্রাসুর ॥ স্নান যখন আপনাকে কর্ত্তেই হবে, তবে ঐ স্নানের মধ্যে দিয়েই আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হোক্, পৌলমীরও পরীক্ষা হোক্। সে হবে পরম কৌতুক, কি বলেন দেবগণ ?

দধীচি ॥ আমি চললুম—

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ যান। কিন্তু শুনে যান, ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তার নাম উচ্চারণ কর্বেন, তিনি যদি, আপনি যতটুকু সময় ডুব দিয়ে থাক্‌বেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাদের এপারে যে দেবতাকে পাব, তৎক্ষণাৎ হত্যা কর্ব তাকে, সে ইন্দ্রই হোন্ আর যেই হোন্! এই আমার প্রতিজ্ঞা, পৌলমী, না—না, ইন্দ্রাণী, এই আমার প্রতিজ্ঞা!···আমারো পরীক্ষা হোক্, তোমারো পরীক্ষা হোক্—যান ঋষি, যান আপনি—

দধীচি ॥ আমি ডুব দেব যত দীর্ঘকাল পারি ডুব দিয়েই রইব।

বৃত্রাসুর ॥ কোন আপত্তি নাই। ঐ সেতু অতি দীর্ঘ। আমি শুদ্ধ দেখতে চাই ঐ কপট ইন্দ্রাণী কার মুক্তি কামনা করেন সর্ব্বাগ্রে!

দধীচি ॥ তুমি যা খুশী দেখো।···কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা,··· সত্য ?

বৃত্রাসুর ॥ প্রতিজ্ঞা হোক্ আর প্রতিজ্ঞা নাই হোক্, অসুর কখনও মিথ্যা বলেনা ঋষি!

দধীচি ॥ উত্তম!···[নদীতীরে গেলেন ও জলে নামিলেন] আমি ডুব দিলাম, শচী, তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, একযুগ পরে সেই এক দেবতার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন কর্ব্বে ·· সেই আশাতে,··· সেই আশাতে আমি ডুব দিলুম!··· আমার জাতি অক্ষয় হোক্, আমার জাতি অমর হোক্, আমার জাতি জয়লাভ করুক! জয় সরস্বতীর জয়! [ডুব দিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ নাম উচ্চারণ কর ইন্দ্রণী—

শচী ॥ [কনিষ্ঠতম দেবতার কাছে গিয়া] তরুণ! তুমি—! অত্যাচারীর ধ্বংসের জন্য তুমি অমর হও, এই হোক্ তোমারো প্রতিজ্ঞা,—ঐ প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারণ কর্ত্তে কর্ত্তে সেতুর অপর পারে চলে যাও—

দেবতাগণ ॥ এখনো ঋষি ওঠেন নি!

শচী ॥ [একে একে ছোট হইতে ক্রমে ক্রমে বড় বড় দেবতাদিগকে সেতু অতিক্রম করিতে পাঠাইয়া দিলেন] তুমি—তুমি—আপনি—এখন ওঠেননি! [ইত্যাদি—অবশেষে শুদ্ধ অঙ্গুলি সংকেতে দেবতাদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন এবং জলের পানে পরম ব্যাকুলতায় তাকাইতে লাগিলেন। বৃত্রাসুরেও

অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।] ঐ জলে বুদ্‌বুদ উঠছে, তবু মাথা দেখা যাচ্ছে না, এখনো ওঠেন নি, এখনো সময় আছে। [তখন শুধু ইন্দ্রদেব বাকী] —তবে স্বামী, এইবার তুমিও—

[ইন্দ্রদেব সেতুপথে অগ্রসর হইলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ একি মায়া ? না ইন্দ্রজাল ?

শচী ॥ হাঁ, ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ইন্দ্রকে এমনি করেই রক্ষা করে অসুর। প্রথমে জাতি। তারপর স্বামী।

বৃত্রাসুর ॥ কিন্তু, ঐ দধীচি ?—জীবিত, না মৃত ?

[নদীর দিকে অগ্রসর]

ইন্দ্র ॥ [বৃত্রাসুরের কথাতে চমকিয়া উঠিয়া অর্দ্ধপথ হইতেই ফিরিয়া] ঋষিরাজ! ঋষিরাজ!

শচী ॥ বাবা! বাবা!

[ছুটিয়া নদীকূলে গেলেন। ইন্দ্রদেব জলে ঝাঁপ দিলেন।]

ইন্দ্রদেব ॥ [ডুব দিয়া উঠিয়া] পেয়েছি! পেয়েছি! কিন্তু—কিন্তু— [কপালে করাঘাত করিলেন।]

শচী ॥ তবে কি বেঁচে নেই ? তবে কি—বেঁচে নেই ?

ইন্দ্র ॥ তীরের ঐ গাছের শেকড় আকড়ে ধরে রয়েছেন ঋষি! কিন্তু জীবনের কোন সাড়াই যে পাইনে ইন্দ্রাণী!

শচী ॥ তবে কি শেষ ?—তবে কি সব শেষ ?

ইন্দ্র ॥ সব শেষ! হৃদয়ে স্পন্দন নেই। শরীর তুষার শীতল! ঋষি আমার—ঋষিরাজ আমার—দেবতার জীবন রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজের জীবন দান করেছেন!

বৃত্রাসুর ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেলেন]—এ্যাঁ—

শচী ॥ বাবা—[মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন]

ইন্দ্র ॥ আশা নেই, আশা নেই, আজ ঐ ঋষিবিহনে জাতির আশা নেই, দেশের আশা নেই]

বৃত্রাসুর ॥ ভুল! ভুল! ভুল! [কাঁপিতে কাঁপিতে] আশা নেই আমার! আমি বুঝেছি, আমি বুঝলুম—ঐ ঋষি দেবতার হয়ে আজ যে আগুন জেবলে গেল, যুগে যুগে যেখানে যত অসুর—সব—ঐ আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে]

———

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক-উল্লিখিত দৃশ্য

[তন্মধ্যে বৃক্ষতলে বেদী। বেদীর উপর সূর্য্য এবং উভয় পার্শ্বে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় নিদ্রিত। মৃদু অন্ধকার। সেই মৃদু অন্ধকার ভেদ করিয়া দূর হইতে একটি করুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সে সুর উষার। কৃষ্ণ বস্ত্র পরিহিতা উষা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উষার গানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জাগিয়া উঠিলেন।]

আঁধার ধরণী, তিমির বরণী, আঁধারে আকাশ গিয়েছে ছেয়ে !
বিমলিনী উষা হারায়েছে ভূষা, কাঙ্গালিনী আজি জ্যোতির মেয়ে !
দাও দাও ওগো, ফিরে দাও আলো
অরুণ প্রদীপ অন্তরে জ্বালো
ভুবন আমারে বেসে পুনঃ ভাল
এ মুখের পানে দেখুক চেয়ে !
ওগো নাই, নাই, আলো মোর নাই
কোথা গেলে বল আলো ফিরে পাই
কাঁদি কারাগারে হাহাকারে, তাই—
ঝরে বারিধারা দু' আঁখি বেয়ে ॥

দস্র ॥ উষা ! তুমি ?

নাসত্য ॥ একি উষা [তোমার ঐ কালো-রূপ তো আর কখনো দেখিনি] কোথায় আলো ?

দস্র ॥ কোথায় তোমার হাসি ?

উষা ॥ আমায় বাঁচাও ! আমার মাকে বাঁচাও !

দস্র ॥ তোমার কি হ'য়েছে উষা ?

নাসত্য ॥ তোমার মা—কে ? কি হয়েছে তাঁর ?

উষা ॥ তারা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে। ক্ষেতের ধান কেড়ে নিয়েছে, গরু লুট করেছে, গাছের ফল নষ্ট করেছে, নদীর জলে বিষ ঢেলেছে !—তবু—তবু—তোমরা ঘুমিয়ে আছ—তবু—তোমরা জাগো না !

দস্র ॥ যুদ্ধের পর আমরা বিশ্রাম করছি !

নাসত্য ॥ শুধু বিশ্রাম নয়, ইন্দ্রদেব কাল যুদ্ধে বন্দী হয়েছেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে আমরা ইন্দ্রাণীকে এই কুটীরে রেখে রক্ষা কর্ব্বার ভার নিয়েছি !

দস্রু ॥ তোমার কি হয়েছে বল।

নাসত্য ॥ তোমার মা কোথায়? দেখিনি কখনো তাঁকে। কি হয়েছে তাঁর?

দস্রু ॥ ওকি উষা! চুপ করে রইলে যে?

নাসত্য ॥ উষা! তুমি কি কাঁদছ?

দস্রু ॥ কেন কাঁদ? তুমি কেন কাঁদ?

উষা ॥ [কাঁদিয়া] কেন ঘুমিয়ে থাক তোমরা? কেন জাগো না?

দস্রু ॥ রাত্রেও কি ঘুমাবো না উষা?

উষা ॥ দিনের কি আর মুখ দেখেছ যে রাত্রির কথা বলছ ভাই? কোথায় তোমাদের দিন? কোথায় তোমাদের সূর্য্য?—তোমাদের স্বাধীন আকাশ কই? কোথায় তোমাদের স্বাধীন সূর্য্য। কোথায় তোমাদের স্বাধীন আলো!—তোমাদের প্রতিটি ক্ষণ অন্ধকার রাত্রি! ঘুমিয়েছিলে, ঘুমিয়েই রইবে ·· আর সেই রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে মা ভাই বোনদের ওপর অত্যাচার করে, ধান গরু লুট করে নিয়ে, আমাদের সবাইকে কারাগারে ধরে নিয়ে যায় সেই দস্যু—!—ঘুমিয়েছিলে, ঘুমিয়েই থাকো!

দস্রু! ক্ষোভ ক'রোনা উষা। যারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগাও! যারা অচেতন তাদের সচেতন কর! দেবতাদের বুকে আশা দাও, প্রাণে ভরসা দাও! বাহুতে শক্তি দাও!

নাসত্য ॥ সৃষ্টির সেই প্রথম দিনটিতে যেমন তুমি তোমার নুপুরের তালে তালে তুচ্ছতম তৃণটিরও ঘুম ভাঙিয়েছিলে, অন্ধকার দেবভূমিতে আলো এনেছিলে, প্রকৃতিকে ফলে ফুলে ভরে দিয়েছিলে, ওগো দেবতার আদরিণী মেয়ে, আজো তেমনি, রূপে রসে গানে গন্ধে, আশা দাও! ভরসা দাও। শক্তি দাও।

উষা ॥ সে উষা নেই! সে উষা নেই!

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ তবে?

উষা ॥ বাঁচাও! আমায় বাঁচাও! আমার মাকে বাঁচাও!

[এই বলিয়া উষা তাহার বসনান্তরাল হইতে ধীরে ধীরে তাহার হাতদুখানি বাহির করিয়া অশ্বীদ্বয়কে দেখাইলেন। সে হাত দুখানি শৃঙ্খলিত। সেই শৃঙ্খলিত হাত দুখানি দেখাইতে গিয়া উষা বেতসপত্রের মতো কাঁপিতে কাঁপিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। উষার সেই নৃত্য বন্দিনীর মুক্তি-প্রয়াস। নৃত্য যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন উষা নতজানু হইয়া সেই শৃঙ্খলিত হাত দুখানি অশ্বীদ্বয়ের সম্মুখে ভিক্ষাপাত্রের মতো প্রসারিত

ম-১৭৭

করিয়া দিলেন, তাহার অর্থ "আমায় মুক্তি এনে দাও।"
অশ্বীদ্বয় শিহরিয়া উঠিলেন।]

দস্র ॥ তোমার হাতে শেকল? সে কি উষা? সে কি?

উষা ॥ মায়ের হাতের শেকল মেয়ের হাতে উঠেছে!—ছিন্ন কর—চূর্ণ কর! বোনের হাতের এই শেকল চুরমার কর।

নাসত্য ॥ কে তোমায় বন্দী করেছে উষা?

উষা ॥ যে আমার মাকে বন্দী করেছে!

দস্র ॥ কে তোমার মা?

উষা ॥ আমার দেশ। দেবভূমি! পারিনে ভাই, শেকলের ভার আর বইতে পারি নে, এ আঁধার আর সইতে পারি নে, তবু তোমরা ঘুমিয়েই থাকবে? তবু কি জাগবে না? তবু কি শেকল ভাঙবে না?

দস্র ॥ ভাঙব! ঐ পাশ ছিন্ন কর্ব্ব!

নাসত্য ॥ ঐ বন্ধন এমনি করে চূর্ণ কর্ব্ব চুরমার কর্ব্ব!

[উষার শৃঙ্খল টানিয়া খুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এবং দুইজনে উষাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন....উষার মুখে তৃপ্তির আলো ফুটিল।—সঙ্গে সঙ্গে আলোতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া সত্য সত্যই প্রভাতের সূচনা করিল। নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। উষা সেই প্রথম দিনের (প্রথম অঙ্কের) নৃত্যগীতের অবতারণা করিয়া অদৃশ্য হইলেন।]

নাসত্য ॥ কোথায় লুকালো উষা!—তবে কি সত্য সত্যই আমরা স্বপ্ন দেখলাম!

দস্র। স্বপ্ন হোক্, কিম্বা স্বপ্ন নাই হোক্, সব চেয়ে বড় সত্য এই যে আমরা পরাধীন, আমাদের দেশজননী শৃঙ্খলিতা, নির্য্যাতিতা। সেই অধীনতা-পাশ আমরা ছিন্ন কর্ব্ব প্রতিজ্ঞা করে, এই নূতন প্রভাতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব আজ।—ওঠ সূর্য্যা, ওঠ—

[উষা চরিত্রটিকে রূপক বলে মনে হয়, সে মুক্তি বা স্বাধীনতার রূপক।]

নাসত্য। জাগো সূর্য্যা জাগো!

[সূর্য্যার ঘুম ভাঙিল।]

দস্র ॥ সূর্য্যা, আমরা আবার যুদ্ধে চললাম!—কুটীরাভ্যন্তরে ইন্দ্রাণী নিদ্রিতা, তুমি তাঁর কাছে যাও—

সূর্য্যা ॥ যুদ্ধ? আবার যুদ্ধ?

দস্র ॥ হাঁ, যুদ্ধ। দধীচি দেবের আশীর্ব্বাদ স্মরণ কর। জয় চাই, চাই

জয়। তোমার—আমার দেবভূমির সকলের সেই এক কামনা হোক্—"জয়"। "জয়"। "জয়"।

নাসত্য ॥ কিন্তু ওদের নিঃসহায় রেখে আমরা দুজনে কেমন করে যাই ভাই?

দস্র ॥ ঐ দধীচি ঋষির চিতা, এখনো নির্ব্বাপিত হয় নি, এরই মধ্যে তাঁর সকল কথা ভুলে যাওয়া লজ্জার কথা ভাই। যুগে যুগে সেই বাণী সত্য হোক্;—নারী অবলা নয়, কামী পুরুষই তাকে কামিনী নাম দিয়েছে, রমণী করেছে, নইলে সে সকল শক্তির উৎস। এসো ভাই—

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ আসি প্রিয়ে।

[সূর্য্যা বিস্ময় বিহ্বলার মতো কুটীরাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় শরাসন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ব্যাকুলচিত্তে কুটীরাভ্যন্তর হইতে তখনি সূর্য্যা বাহির হইয়া আসিলেন। আসিয়াই ডাকিলেন "রৈভী" "রৈভী"—রৈভী কুটীরের পেছন হইতে সদ্য নিদ্রোত্থিতার মত বাহির হইয়া আসিল।]

রৈভী ॥ কি দিদি?

সূর্য্যা ॥ ইন্দ্রাণী কই রৈভী?

রৈভী ॥ কুটীরে ঘুমিয়ে আছেন—

সূর্য্যা ॥ কুটীরে কেউ নেই—

রৈভী ॥ নেই?

সূর্য্যা ॥ না—

রৈভী ॥ দেখি—

[উভয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে বলাসুরের আবির্ভাব হইল। বলাসুর কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। রৈভী এবং সূর্য্যা বাহির হইয়া আসিলেই বলাসুর আনন্দের উচ্ছ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।]

বলাসুর ॥ "আগুনের মেয়ে! আলোর মেয়ে!!" [এবং তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বলিল] "দাঁড়াও—অমনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি শুধু দেখব, এই চোখ দুটি দিয়ে শুধু চেয়ে দেখব।

রৈভী ॥ অসুর যে—দাঁড়াও—

[চকিতে কুটীর হইতে শরাসন আনিয়া তাহাতে তীর যোজনা করিয়া বলাসুরের প্রতি লক্ষ্য করিল—]

বলাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—ও একটা তীরে আমার কিছু হয় না, দশটা তীরেও আমার কিছু হয় না, যদি—ঐ আলোর মেয়ে আমার দিকে দয়া করে একটিবার ভালোবেসে চায়।

সূর্য্যা ॥ [রৈভীকে] প্রয়োজন নেই। [রৈভী শরাসন নামাইল।]

অসুর ॥ তোমায় আমি চিনেছি! তুমি আমায় সেদিন ফুল দিয়েছিলে। ভারীসুন্দর সে ফুল।—আর আছে?

বলাসুর ॥ [আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল] আছে। আছে····

সূর্য্যা ॥ তবে থাক্। গাছেই থাক্····

বলাসুর ॥ গাছ আমি উপড়ে এনে তোমার পায়ে রাখছি, যদি তুমি চাও, বল ···বল····তুমি কি আমার ফুল চাও?

সূর্য্যা ॥ ফুল কে না চায়?

বলাসুর ॥ আমার হাতের ফুল? এই কালো হাতের ফুল?

সূর্য্যা ॥ কালো বুঝি ভালো নয়? আমার এই চোখের তারা দুটি? এই চুলগুলি?

বলাসুর ॥ কালো! কালো! আমার চাইতেও কালো! তাইতো ওতে এত আলো! আলোর মেয়ে, আমি চললুম=ফুল আনতে চললুম ···

[ছুটিয়া প্রস্থান]

সূর্য্যা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—[হাসিয়া রৈভীর গায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এদিকে বলাসুর পুনরায় প্রবেশ করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।]

রৈভী ॥ ঐ আবার এসেছে!

সূর্য্যা ॥ তাই তো।—[সম্মুখে গিয়া] ফিরে এলে যে?

বলাসুর ॥ [কোন কথা কহিতে পারিল না।]

সূর্য্যা ॥ তুমি কাঁপছ কেন?

বলাসুর ॥ রাজা আমায় আদেশ দিয়েছে—[বলিতে বলিতে তাহার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।] রাজা আমায় আদেশ দিয়েছে—

সূর্য্যা ॥ কি আদেশ দিয়েছে?

বলাসুর ॥ দধীচি ঋষির শবদেহটা লুট করে নিয়ে যেতে। বলেছে সব কাজের আগে ঐ মড়াটা লুটে নিয়ে যেতে হবে, এখনি—। যদি তোমায় ফুল তারপরে এনে দি?—গন্ধ তাতে একটুও কমবে না।—তুমি দেখো—

সূর্য্যা ॥ ও, তুমি আমাদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে এসেছ?—

বলাসুর ॥ লড়াই নয়, চুরি কর্ত্তে এসেছি।

সূর্য্যা ॥ তুমি তো খুব বাহাদুর চোর! চুরি কর্ত্তে এসে চোর বুঝি তার চুরির কথা বলে?

বলাসুর ॥ বলে।—যাকে ভালোবাসে তাকে বলে।

সূর্য্যা ॥ রৈভী, তুইও কি আমায় একটা ফুল এনে দিতে পার্লিনে খোঁপায় আমি পরব কি? কবরীতে আমি বাঁধবো কি?

বলাসুর ॥ [রৈভীকে] ওগো, দাওনা, তুমি এনে দাও না—[বিশেষ মিনতি জানাইল ।]

রৈভী ॥ বনে কি আর ফুল ফোটে? তোমরা যে দেশটা শ্মশান করে, দিয়েছ!

বলাসুর । শ্মশান! শ্মশান! [হঠাৎ ঐ কথাতে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে শ্মশান হইতে শবদেহ চুরি করিয়া—অবিলম্বে লইয়া যাইতে হইবে । মনে পড়িতেই বড় দেরী হয়ে গেল আমার ঐ শ্মশানে যেতে, ঝট্ করে আমি সেখান থেকে মড়াটা নিয়ে ফিরে আসছি—

[চকিতে শ্মশানের দিকে প্রস্থান ।]

রৈভী ॥ সর্বনাশ! এখন উপায়,!

সূর্য্যা ॥ শবদেহে অসুরের কি প্রয়োজন রৈভী?

রৈভী ॥ কেমন করে তা বলব দিদি! কিন্তু যখন ওরা নিতে এসেছে, তখন দেবতার অমঙ্গলের জন্যই নিতে এসেছে ।—ওকে এখন বাধা দেবে কে?

সূর্য্যা ॥ কেউ নেই?

রৈভী ॥ ঋষিরা শবদেহ দাহ কচ্ছেন । কোন দেবসৈন্যকে তো সেখানে দেখি নি দিদি!

সূর্য্যা ॥ [বলাসুরের উদ্দেশে ছুটিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন] বলাসুর! বলাসুর!

রৈভী ॥ সে কি আর শোনে?

সূর্য্যা ॥ [আকুলস্বরে] বলাসুর! বলাসুর!

[ছুটিয়া বলাসুরের প্রবেশ]

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে; আলোর মেয়ে, তুমি আমায় ডাকছ? হাওয়ায় ভেসে তোমার ডাক আমার কাণে গেল সেই শ্মশানে, যায় নি?

সূর্য্যা ॥ গেছে ।·· আজ একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি । তুমি কি আমার ভালো চাও?

বলাসুর ॥ আমি?—আমি চাইব না তোমার ভালো?

সূর্য্যা ॥ চাও?

বলাসুর ॥ [রাগিয়া উঠিয়া] আমি তোমার ভালো চাই না? কে বলেছে?

[রৈভীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইল ।]

সূর্য্যা ॥ তুমি আমার চোখে চোখে চাও, চেয়ে বল, আমায় বল, তুমি আমার ভালো চাও?

বলাসুর ॥ [দৃঢ়স্বরে] চাই। চাই। চাই।

সুর্য্যা ॥ তবে ··· তুমি এখনি তোমার ঘরে ফিরে যাও—

বলাসুর ॥ কিন্তু ঐ মড়াটা—

সুর্য্যা ॥ [দৃঢ়স্বরে, বলাসুরের চোখে চোখে চাহিয়া যাদুকরীর মতো] যা—ও—

[হস্ত নির্দেশ করিলেন।]

বলাসুর ॥ চললুম—

[বৃত্রাসুরের প্রবেশ]

বৃত্রাসুর ॥ দাঁড়াও—[বলাসুর দাঁড়াইল।] দধীচির মৃতদেহ ?

বলাসুর ॥ [সুর্য্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।]

বৃত্রাসুর ॥ দধীচির মৃতদেহ ?

সুর্য্যা ॥ যাও বলাসুর—

[বলাসুর একবার সুর্য্যা, আর একবার বৃত্রাসুরের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।]

বৃত্রাসুর ॥ এর অর্থ ?

সুর্য্যা ॥ এর অর্থ, ও সেই অসুর—যে শুধু অসুরকেই ভালোবাসে না, দেবতাকেও ভালোবাসে !

বৃত্রাসুর ॥ ঐ মৃতদেহ আমি ওকে দিয়েই লুণ্ঠন করাবো। বলাসুর—বলাসুর—

[কোন উত্তর পাইলেন না।]

সুর্য্যা ॥ পরাজয় স্বীকার কর অসুররাজ !

বৃত্রাসুর ॥ ওকে দিয়ে কেন, আমি ঐ মৃতদেহ পৌলমীকে দিয়ে, তোমাদের ইন্দ্রাণীকে দিয়ে ইন্দ্রের সম্মুখে হরণ করাবো।... দেখবে, দেখ। পিপ্রু—কোথায় ইন্দ্র ?

[পিপ্রুর প্রবেশ]

পিপ্রু ॥ ঐ বৃক্ষতলে—

বৃত্রাসুর ॥ নিয়ে এস।

সুর্য্যা ॥ আর শচী ?

বৃত্রাসুর ॥ আমায় কথায় সে শ্মশানে গেছে সেই মৃতদেহ সেখান হতে

এনে আমার হাতে তুলে দিতে—তোমাদের সম্মুখেই তুলে দেবে, দেখ—

সূর্য্যা ॥ [ক্রুদ্ধ হইয়া] বটে ! রৈভী—আয়—

[রৈভীকে লইয়া শ্মশানের দিকে প্রস্থান ।]

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

[রক্ষী পরিবেষ্টিত শৃঙ্খলিত ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র ॥ এ যে দধীচির আশ্রম ! এইখানে ইন্দ্রাণী রয়েছে ।—তারি সম্মুখে কি আমায় অপমান কর্ব্বার জন্য কিম্বা আমার সম্মুখে তার অপমান কর্ব্বার জন্য আমায় এখানে নিয়ে এলে ! কোথায় আমার সেই রুদ্র শক্তি যা দিয়ে আমি শম্বরের শতাধিক পাষাণদুর্গ চূর্ণ করেছিলুম ! কোথায় সেই শক্তি যা দিয়ে শত সহস্র দৈত্য বধ করেছি ! ··· এককণা ! সেই শক্তির এককণা ! [শৃঙ্খল ছেদনের প্রয়াস ।]

বৃত্রাসুর ॥ এককণা কেন, সেই শক্তি পরিপূর্ণভাবে তুমি পুনরায় লাভ কর ·· আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই । বরং আমি তাতে সুখী হব, খুশী হব । তোমার শক্তির শোচনীয় অধঃপতন দেখে আমি সত্যই লজ্জিত হচ্ছি, শুধু এই ভেবে, যে তুমি—তুমিই হচ্ছ আমাদের অসুর কুল-বর-বর্ণিনী পৌলমীর স্বামী ! ·· সে যাক্ । আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনেই এই আশ্রমে এসেছি । কাল সারাটি রাত আমি ঘুমুতে পারি নি ।····আমি একটি গুরুতর অন্যায় করেছি । আমার কর্ত্তব্যের বিশেষ ত্রুটি হয়েছে ।··· আজ আমি আমার সেই অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ কর্ব্ব ।··· দধীচির মৃতদেহ আমি চাই । আমি ঐ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ ·· না—না··· ঐ দুঃসাহসী ঋষির কঙ্কাল আমার প্রাসাদে সযত্নে রক্ষা করব, বিশ্বের বিস্ময় হয়ে রইবে চিরকাল ঐ কঙ্কাল ।····

ইন্দ্রদেব ॥ বটে !

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ····

ইন্দ্রদেব ॥ [সোল্লাসে] আমি বুঝেছি ! আমি বুঝেছি !

বৃত্রাসুর ॥ [ভয়ে] কি বুঝেছ ?

ইন্দ্রদেব ॥ তুমি····তুমি দধীচির মৃত্যু দেখে কেঁপে উঠেছিলে··· ওঠ নি ?

বৃত্রাসুর ॥ চুপ ! চুপ !

ইন্দ্রদেব ॥ তোমার পাষাণ হৃদয়ও যে কাঁপে, সে আমি সেই দিন প্রথম, তোমার জীবনে প্রথম লক্ষ্য করেছি, হাঁ বুঝেছি, আমি বুঝেছি পেয়েছি, আমি পেয়েছি তোমার মৃত্যু-বাণ !

বৃত্রাসুর ॥ সাবধান সাবধান—, যে মরেছে, তাকে আমি ভয় করিনে, [শিহরিয়া উঠিলেন ।] আর তুমি যে বেঁচে আছ, তোমাকেও আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি ! তা নয়··· তা নয়....সেই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ····না····না····সেই দুঃসাহসী ঋষির

স্মৃতি রক্ষা কর্ব আমি ·· তাই তাই [ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।] আর শোন, আমি একেবারে অনুদার বা অকৃতজ্ঞ নই।....পৌলমীকে আমি কি বলেছি জানো ?

ইন্দ্রদেব ॥ কোথায় সে ?

বৃত্রাসুর ॥ তোমার কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে কাঁদছিল। আমি তাকে তোমার মুক্তির উপায় জানিয়েছি। ঋষিদের কাছে আমি তাকে দিয়ে এই বলে পাঠিয়েছি যে তাঁরা যদি তাঁদের দেবরাজের মুক্তি চান, তবে দধীচির মৃতদেহ আমাকে দিতে হবে।

ইন্দ্রদেব ॥ অসুর ! সে মৃতদেহে তোমার প্রয়োজন ?

বৃত্রাসুর ॥ আমি আগে বুঝিনি।··রাত্রে বুঝলাম।··· যখন স্বপ্ন দেখলাম—তখন বুঝলাম।··· আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলাম····না—না—না—আমার আর কোন উদ্দেশ্য নয়, আমি ঐ মৃতদেহ চাই···শুধু ঐ দুঃসাহসী ঋষির স্মৃতি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা কর্ব বলে। আমি সম্রাট···তা আমারি কর্ত্তব্য !·· জীবিত দধীচির হস্তপদ লৌহ-কীলকে বিদ্ধ করে দেখেছি, সে বিন্দুমাত্র কাতর হয়নি····আমি বিস্মিত হয়েছি—

ইন্দ্রদেব ॥ আর মৃত দধীচিকে দেখে ভীত হয়েছ। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি। জীবিত দধীচি অপেক্ষা মৃত দধীচি অসুরের পক্ষে সহস্রগুণ দুর্দ্ধর্ষ !··· দধীচির দগ্ধীকৃত মৃতদেহের প্রতি ভস্ম-বিন্দু সহস্র দধীচি সৃষ্টি কর্বে।··· পাবে না পাবে না তুমি তার মৃতদেহ। আমাদের ঋষিরা তা পুড়িয়ে তার ভস্ম দেবতার ঘরে ঘরে বিতরণ কর্বে····

বৃত্রাসুর ॥ দেব না, আমি তা দেব না। আমি কেড়ে নিয়ে যাব সেই মৃতদেহ। পৌলমী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, স্বয়ং এনে তুলে দেবেন সেই মৃতদেহ আমার হাতে।·· দেখ স্বচক্ষে দেখ—

ইন্দ্রদেব ॥ শচী !—কখনো না—কখনো না—

বৃত্রাসুর ॥ দেবে—দেবে সে দেবে। নিশ্চয় দেবে। নবপরিণীতা সে—সে যদি তোমায় ভালোবেসে থাকে, তোমাকে মুক্ত কর্ত্তে সেই মৃতদেহ সে আমায় অবশ্য ডালি দেবে—আর হোক্ সে দেবতার বন্দিনী, হোক্ সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তবু—তবু সে অসুরের নন্দিনী—মাতৃকুলকে সে অবশ্য রক্ষা করবে।

ইন্দ্রদেব ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন।] কখনো না শচী। শচী। কখনো না—

[দূর হইতে শচীর আকুল স্বর ভাসিয়া আসিল "দেবরাজ। দেবরাজ !"]

বৃত্রাসুর ॥ [রুদ্র উল্লাসে] হাঃ হাঃ হাঃ অবশ্য দেবে।—ঐ—সে এসেছে। ঋষিরা নিশ্চয় মৃতদেহ দিয়েছে। ঋষিরা নিশ্চয় তাদের ইন্দ্রদেবের মুক্তি চায়।

ইন্দ্রদেব ॥ না—না—না—আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই, তারা তোমার মৃত্যু চায়!

[ছুটিয়া শচীর প্রবেশ]

শচী ॥ [সোজা বৃত্রের সম্মুখে গিয়া] মুক্তি চাই, আমি ও'র মুক্তি চাই!

বৃত্রাসুর ॥ মৃতদেহ? মৃতদেহ?

শচী ॥ মৃতদেহ সৎকার হচ্ছিল। আমি ছুটে গিয়ে সব বললাম। তখনি ঋষিরা সম্মত হলেন। চিতা নিভিয়ে দিলেন।

বৃত্রাসুর ॥ মৃতদেহ? কংকাল?

শচী ॥ ঐ—

[ঋষিগণ দধীচির সম্পূর্ণ কংকাল সহ উপস্থিত হইলেন।]

ইন্দ্রদেব ॥ শচী! ঋষিগণ! দিয়োনা—দিয়োনা—ঐ কংকাল ঐ অসুরের হাতে দিয়োনা—ঐ দেখ ঐ কংকালের দর্শনমাত্র দেবজয়ী বৃত্রাসুর আতংকে শিউরে উঠছে!

বৃত্রাসুর ॥ [শচীকে] স্বামীর মুক্তি? স্বামীর মুক্তি?—স্বামীর মুক্তি?

ইন্দ্রদেব ।—স্বামীর আদেশ—!!!

শচী ॥ [বৃত্রের সম্মুখে স্বামীপরায়ণা দেবীর মতো সগর্বে দাঁড়াইয়া] —তবে দেব না।

বৃত্রাসুর ॥ দাও! দাও! ওগো দেবতার বন্দিনী; অসুরের নন্দিনী, দাও! ভিক্ষা দাও!

ইন্দ্রদেব ॥ কখনো না—

শচী ॥ কখনো না।—অসুরের নন্দিনী হলেও সে যখন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তখন সে পোলমী নয়, সে ইন্দ্রাণী।—আমি দেব না, পার তো আমায় বধ করে নাও—!

বৃত্রাসুর ॥ [জোর করিয়া ইন্দ্রাণীকে সরাইয়া দিয়া] আমি নেব—আমি নেব—

[কিন্তু কংকালের সম্মুখীন হইয়াই ভয়ে আতংকে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিলেন]

ইন্দ্রদেব ॥ [আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।] হাঃ হাঃ হাঃ দেবগণ! ঋষিগণ! ত্যাগীশ্রেষ্ঠের ঐ অস্থিই বৃত্রাসুরের মৃত্যুবাণ। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আজ আমি কারাবরণ করলাম। দেবগণ! ঋষিগণ, ইন্দ্রাণী, প্রস্তুত কর ঐ

নরকঙ্কাল দিয়ে সেই অস্ত্র যা—অসুরের হৃদয় বিদীর্ণ করে, যা আমার দেব-ভূমির ঐ নীল আকাশের কালো মেঘ ছিন্নভিন্ন করে, যা এমন এক আলো জ্বালে, যা যুগে যুগে সৃষ্টির চোখ ঝলসে দেয়!—ত্যাগীর সেই ত্যাগ অস্ত্রে আমার কারাগার চূর্ণ হবে, কারাবন্ধন ছিন্ন হবে, আমার স্বর্গ আমারই হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

দেব শিল্পী ত্বষ্টার শিল্প-শালা।*

[ত্বষ্টা পর্ব্বতের সানুদেশে এই শিল্প-শালা গড়িয়া তুলিয়াছেন। দেবশিল্পীর এই শিল্পশালায় নানাবিধ অস্ত্রাদি, নানারূপ পোষাক পরিচ্ছদ এবং বহুবিধ চারুশিল্প সম্পূর্ণ, অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রহিয়াছে। শিল্পশালাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। অন্তরতম কক্ষে ত্বষ্টা গোপনে এবং নির্জ্জনে শিল্পসাধনা করেন। সেই কক্ষের বিশাল দরজা খুলিয়া তবে শিল্পশালার মধ্যভাগে আসিতে হয়। এই মধ্য-ভাগই দেবশিল্পের প্রদর্শনী। তাহার সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি জল-নির্ঝর (ফোয়ারা) এবং সম্পূর্ণ অঙ্গনটি লতাপাতা ফুলেফলে সুসজ্জিত। জল-নির্ঝরের পশ্চাতেই একটি বিশাল সোমপাত্র (চমস) একটি বেদীর উপর রক্ষিত।

*   *   *

[সোমকলসকক্ষে ঋভুবালাগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত।]

কোন্ পাহাড়ের কোন্ গহনে
লুকিয়ে থাকো কোন খানে।

---

* ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনিই ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করেন। (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৩২ সূক্ত)।

ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য। (সায়ন)।

Wilson বলেন—ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি।

রমেশদত্তও তাহাই বলেন।

ত্বষ্টার কন্যা সরন্যুর সহিত বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যের বিবাহ হয়।

"সোম" পর্ব্বতজাত মাদকগুণবিশিষ্ট লতাবিশেষ। (মহেন্দ্ররায়)

সোমলতা পেষণ করিলে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ অম্লরস নির্গত হয়। তাহাই মাদক অবস্থায় পরিণত করিয়া পূর্ব্বকালে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। (রমেশদত্ত)

আমরা তোমায় বেড়াই খুঁজে
তাকিয়ে থাকি বন পানে ॥
আঁখির তারা, নিমেষহারা,
পড়েনা তায় পল্লব গো।
নয়ন জলে, হই যে সারা,
তোমার আসে বল্লভ গো ॥
তবু নিঠুর! নেই কি দয়া;
লুকিয়ে থাকো কোন প্রাণে।
এসো এসো দাও দেখা দাও,
তোমার দ্বারে আজ ডেকে নাও,
শুষ্ক তালু তৃষ্ণার্ত্তদের,
তৃপ্ত কর সোম দানে ॥

সোমরসের পিপাসায় আকুল ত্বষ্টা পানপাত্র হস্তে ব্যাকুলভাবে তাঁহার অন্তরতম কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঋভুবালাদের সম্মুখে আসিয়া পানপাত্র ধরিলেন। ত্বষ্টা বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁহার দেহ বিরাট বলবীর্য্যের পরিচায়ক।

ত্বষ্টা ॥ দাও! দাও! একফোঁটা দাও!

ঋভুবালাগণ ॥ কি?—জল?

ত্বষ্টা ॥ জল নয়, জল নয়।

ঋভুবালাগণ ॥ তবে?

ত্বষ্টা ॥ রস! রস! সোমরস।

ঋভুবালাগণ ॥ [একে একে সোমকলস সমূহ সেই চমসের উপর উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেখাইলেন।·· শূন্যকলস।]····

[নবমমণ্ডলের ১১৪টি স্থক্ত সমস্ত সোমস্তুতিপূর্ণ। ইহাতে সোমলতার, সোম-পীড়ন প্রস্তুত সোমরস ছাঁকনি মেষলোম ও প্রস্তুতকারীর অঙ্গুলী সকল, সোমাধার কলস সোমরসের গুণাবলী প্রভৃতি নানারূপে চিত্রিত হইয়াছে। যথা নবমমণ্ডল ১৮ স্থক্ত দেখ।

সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মহেন্দ্ররায় কৃত ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলস্থ ২৮ স্থক্তের টীকা দেখ। (শুনঃ শেপ ঋষি, ইন্দ্র এবং উদূখল দেবতা)। "স্থূল নিম্নভাগ বিশিষ্ট উদূখলে মুষলদ্বারা সোমলতার কণ্ডন করা হইত। তৎপর দুই অভিষবন পাত্রে উহা স্থাপিত হইত। যজমান পত্নী রজ্জুদ্বারা মন্থনদণ্ড সংযত করিয়া সোম-মন্থন করিতেন। সোমরস চালনি দ্বারা ছাঁকা হইলে চমস পাত্রে স্থাপনকরা হইত। তৎপর উহা গোচর্ম্মের উপর রাখা হইত।]

ত্বষ্টা ॥ তবে ? তবে ?

ঋভুবালাগণ ॥ [নিরাশার ভঙ্গী করিলেন।]

ত্বষ্টা ॥ [ছটফট্ করিতে লাগিলেন।]

১ম বালা ॥ ওগো বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুর !....আমার গলার হার তৈরী করে দেবে বলেছিলে,.. হয়েছে ?

২য় বালা ॥ আমার সেই সোনার বালা ?....খুব দিলে !

৩য় বালা ॥ আমার চরণ-পদ্ম ?

৪র্থ বালা ॥ আমার মালা ?

৫ম বালা ॥ কেয়ূর ? কেয়ূর ? আমার কেয়ূর ?

ত্বষ্টা ॥ [রাগিয়া উঠিতেছিলেন।] দূর হ....দূর হ...

ঋভুবালাগণ ॥ "পালারে পালা !" [বলিয়া দূরে পলাইলেন।]

ত্বষ্টা ॥ একফোঁটা সোমরস পাইনে আজ কতদিন ! সেদিকে কারো নজর নেই, নজর আছে গয়নার বেলা !....

[ঋভুগণের প্রবেশ]

ঋভুগণ ॥ কি বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুর ! কি হয়েছে ?

ত্বষ্টা ॥ মেয়েগুলোর কথা শোন।...বিয়ে দাও.. বিয়ে দাও... নইলে আমি আর ওদের জ্বালাতন সইতে পারি না। আজ কত কাল একফোঁটা সোমরস না পেয়ে জড়থব হয়ে বসে আছি,. তবু ওদের জ্বালাতন দেখ ! এটা দাও সেটা দাও... আমি একা....বুড়োমানুষ... কেমন করে অতগুলি সামলাই !...

ঋভুবালাগণ ॥ মর বুড়ো মর....

[সোমকলস লইয়া প্রস্থান]

ঋভুগণ ॥ সোমরস নেই, কিন্তু, সোমাধার ঐ চমসটি গড়েছেন খুব ! ওটায় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন নাকি ?

ত্বষ্টা ॥ আবার তোমরা লাগলে !....ওরে, আমি না তোদের গুরু ?.... এই বুঝি তোদের শিক্ষা ?....দে বেটা... দক্ষিণা দে... এই যে এত করে সব শেখালাম—এক একজন তো বিখ্যাত কারিগর হয়েছিস্ খুব—এইবার দক্ষিণা দে—

ঋভুগণ ॥ কি দক্ষিণা দেব ?

ত্বষ্টা ॥ ঠাট্টা নয়।—আমার গলা শুকিয়ে আসছে, ঠাট্টা নয়। আজ আমি তোদের দক্ষিণা চাই।

ঋভুগণ ॥ কি দক্ষিণা বলুন—

ত্বষ্টা ॥ দিতে হবে কিন্তু, আজই, এক্ষণি—নইলে—

ঋভুগণ ॥ নইলে ?

ত্বষ্টা ॥ আমি গিয়ে বৃত্রাসুরের কারিগর হব। প্রাসাদ বানাচ্ছে সে। নতুন প্রাসাদ। দেব আমি তা এমন করে গড়ে—যে ইন্দ্রের প্রাসাদ লজ্জায় মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবে। আরে—সে যে আমায় রোজ সাধাসাধি করবার জন্য একটা অসুর পাঠাচ্ছে।—জানিস ?

১ম ঋভু ॥ তা যান না কেন ?

ত্বষ্টা ॥ সোমরস ! সোমরস ! সোমরস !—এখানেই পাইনে, সেখানে গেলে তো খেতে হবে শুধু জল !—আরে, জলে কি মাথা খোলে ?—খুলে যায় ঐ একফোঁটা সোমরসে !—দাও একবাটি সোমরস—দেখ—আমি কি কর্ত্তে পারি—[যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।]

২য় ঋভু ॥ সোমরস তো আমরাও আর পাই নে। ইন্দ্রদেবের দয়া না হলে তা পাওয়া যায় না। ইন্দ্রদেব রয়েছেন বন্দী হয়ে।—সোমরসের আশা মিটে গেছে !

ত্বষ্টা ॥ আশা মিটেছে তোদের, যত অকর্ম্মা এসে জুটেছে আমার শিষ্য হয়ে !—ওরে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে কোন আশাই মেটে না।—অশ্বীরা দুটি ভাই—সূর্য্যের মেয়ে বিয়ে করে বৌ এনেছিল আমায় দেখাতে, আটকে রেখেছি বৌ, বলেছি বাপুহে, সোমরস এনে দাও, বৌ খালাস করে নিয়ে যাও—

ঋভুগণ ॥ সত্যি ?

ত্বষ্টা ॥ সত্যি নয় তো কি ঠাট্টা ?—ভারী ভালো ভাই দুটি।—তখনি ছুটে বের হয়ে গেল—

ঋভুগণ ॥ আর সূর্য্যা দেবী ?

ত্বষ্টা ॥ আরে সে যে সম্পর্কে আমার নাতনী ! আমার পাকাচুল তুলে দিতে এসেছিল, আমি দেইনি ! বল্লাম "চুল কি আমার পেকেছে ?" ছুঁড়ি হেসেই খুন।—গান গেয়ে গেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।—আরে তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?—দেখনা অশ্বীরা দুটি ভাই কতদূরে ?—আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।—হাতে কাজ রয়েছে বিস্তর, কিন্তু, সোমরস পেটে না গেলে বুদ্ধি খেলছে না, হাত এগোয় না, পা চলে না।

১ম ঋভু ॥ যাচ্ছি।—আমাদেরও যে তাই, বুদ্ধি খুলছে না।

২য় ঋভু ॥ হাত এগোয় না !

৩য় ঋভু ॥ পা চলে না।

তিনজন একত্রে ॥ আমরা ভাগ পাব তো ?

ত্বষ্টা ॥ তোদের ভাগ আমায় দক্ষিণা দিবি। ব্যস্।—যা—এইবার যা—

[ঋভুগণের মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান]

ত্বষ্টা নিজের কক্ষের দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ এমন সময় দুজন অসুর চোরের মত
সেখানে প্রবেশ করিয়া হাততালি দিল। ত্বষ্টা ফিরিয়া তাকাইয়া দেখেন
তাহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি হাত দ্বারা
তাহাদিগকে বুঝাইলেন 'না—না—", এবং চলিয়া
যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা
গেল না। এবং সম্মুখে আসিয়া
তাহাদের প্রস্তাব নিবেদন করিল।

১ম অসুর॥ আপনাকে যেতে হবে। আমাদের প্রকাণ্ড সেই রাজা আপনাকে এক হাজার প্রকাণ্ড গরু দেবেন। আপনি তাঁর জন্য প্রকাণ্ড একটা বাড়ী তৈরী করে দেবেন, যা ছোট্ট রাজা সেই ইন্দ্রের ঐ ইঁদুরের মতো ন্যাংটা বাড়ীকে হার মানায়।

ত্বষ্টা॥ কতবার বলব আমি যাব না? আমি যাব না।

২য় অসুর॥ তিনি বলে পাঠালেন যে জোর করেও আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তা তিনি নেন না কেবল এই জন্য যে জোর কর্লে নাকি ভালো জিনিষ তৈরী হয় না। ভালো জিনিষ তৈরী কর্ত্তে হলে খুশী মন চাই। তাই তাঁর এত অনুরোধ। আপনি চলুন। আপনাকে তিনি খুব খাতির করেন।

ত্বষ্টা॥ আমি যাব না।

১ম অসুর॥ তবে তাঁর আর এক কথা শুনুন। সেই প্রকাণ্ড রাজার জয় হোক্। তিনি বললেন যে আপনি দয়া করে যদি দেবতাদের আর কোন অস্ত্র তৈরী করে না দেন, তবে, আমাদের সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রকাণ্ড রাজা, অবশ্য তার চাইতে একটু কম প্রকাণ্ড, একটা রাজ্য দেবেন। আমাদের প্রকাণ্ড রাজার জয় হোক্।

ত্বষ্টা॥ না—না—না—।

অসুরদ্বয়॥ না?

ত্বষ্টা॥ [বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতেছিলেন।]

অসুরদ্বয়॥ শুনুন।

ত্বষ্টা॥ [সম্মুখস্থ বিরাট সেই সোমপাত্র চমসটি উঠাইয়া তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপোদ্যত হইলেন।]

অসুরদ্বয়॥ [পলাইয়া গেল, কিন্তু, একেবারে চলিয়া গেল না। অদৃশ্য হইয়া রহিল।]

সদ্যনিদ্রোত্থিতা সূর্য্যার ছুটিয়া প্রবেশ। তখন অসুরদ্বয় অদৃশ্য, কিন্তু ত্বষ্টা সেই সোমপাত্র শূন্যে তুলিয়াই রহিয়াছেন। এদিকে অন্যের দ্বারা পরিলক্ষিত না হইয়া অসুরদ্বয় সূর্য্যাকে উঁকি দিয়া দেখিয়াই তাহাকে হরণের মতলব আঁটিতে লাগিল।

সূর্য্যা ॥…সোমরস বুঝি এসেছে ?

ত্বষ্টা ॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন] ঘুম বুঝি ভেঙেছে ?

সূর্য্যা ॥ ঘুম আর হয় কই ?… সোমরস আসে কি…না আসে ‥ এলো… কি এল না তুমিও যেমন ভাবছ, আমিও তেমনি ভেবে মরছি !

ত্বষ্টা ॥ পিপাসায় গলা বুঝি শুকিয়ে গেছে, না নাতনী ?

সূর্য্যা ॥ গেছেই তো !… যাবে না ?

ত্বষ্টা ॥ বটে !…[সোমপাত্র যথাস্থানে রক্ষা করিয়া] জলের পিপাসা নিজেই বুঝেছি ; সোমরসের তেষ্টা, সে তো এখনও বুঝছি ; কিন্তু তোর যে পিপাসা ‥ জলের না সোমরসের…অর্থাৎ ‥ মনের মানুষের…ঐ পিপাসার কথাটাই ভুলে গেছি, বল দেখি একবার… দেখি মনে পড়ে কিনা !

—গান—

এ কি প্রণয় পিপাসা,
মরি মিলন দুরাশ
ব্যাকুল আজি এ বুকে।
দাও বার বার
অধর সুধাসার
তৃষিত এ মুখে।
পরশ রস আশে
আকুল হৃদি মম,
বাঁধিয়া বাহুপাশে
লহগো প্রিয়তম
তোমারে বুকে নিয়া
ভুলিয়া র'বে হিয়া
সকল দুখে ॥

ত্বষ্টা ॥ [সোল্লাসে]…মনে পড়েছে ! মনে পড়েছে !…ওরে, গলা শুকিয়ে গেছে…গলা শুকিয়ে গেছে—[সূর্য্যার দিকে অগ্রসর হইলেন]

সূর্য্যা ॥ তা আমি কি কর্ব্ব ?

ত্বষ্টা ॥ খাব⋯আমি খাব⋯

সূর্য্যা ॥ কি খাবে ?

ত্বষ্টা ॥ সেই বুড়ীকে যা খেতাম ⋯

সূর্য্যা ॥ দাঁড়াও⋯তোমায় মজা দেখাচ্ছি !

[ছুটিয়া ত্বষ্টার কক্ষের পাশ্বর্বর্ত্তী এক কক্ষে প্রস্থান]

ত্বষ্টা বসিয়া পড়িয়া আপন মনে রসিকতার হাসি হাসিতে লাগিলেন। এই অবসরে অসুরদ্বয় তাঁহার পশ্চাদভাগে আসিয়া সূর্য্যার খোজে অন্যত্র চলিয়া গেল। অপর দিকে; শচীকে সম্মুখে রাখিয়া দধীচির নরকঙ্কালসহ ঋষিগণের প্রবেশ। তাহাদের গতি অতি লঘু অতি সাবধান। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া ত্বষ্টার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ত্বষ্টা চমকিয়া উঠিলেন। ঋষিগণ কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। ইঙ্গিতে ত্বষ্টার অন্তরতম কক্ষ দেখাইলেন, উদ্দেশ্য সকলে সেইখানে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করেন॥ ত্বষ্টা সম্মত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার অন্তরতম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ঋষিদের অনুসরণ করিয়াছিল বলাসুর। সে এই সুযোগে অন্তরতম কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য বৃত্রাসুরের আদেশে দধীচির নরকঙ্কাল অপহরণ। বলাসুর দুয়ারে কাণ পাতিয়া ভিতরের কথাবার্ত্ত। শুনিবার চেষ্টা করিল এবং তাহাতে সুবিধা না হওয়ায়, ভিতরে ঢোকা যায় কিনা দেখিবার জন্য, পূর্ব্ববর্ণিত অসুরদ্বয় যেদিকে গিয়াছিল, দৈবাৎ সেই দিকে গেল, এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই হাততালিতে তাহাদিগকে ডাকিল। তিনজনে রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে আসিল। বলাসুর তাহাদের কাণে কাণে দধীচির নরকঙ্কাল অপহরণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সে কক্ষের অপর দিকে গেল, অপর অসুরদ্বয় নিজেদের যায়গায় ফিরিয়া গেল। এদিকে সূর্য্যা একটি পিচকারিতে জল ভরিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

সূর্য্যা ॥ পিপাসার জল এনেছি, নাও—[পিচকারি ছুঁড়লেন।] কই গো দাদামশাই, কই ?⋯তাই তো !⋯ পালিয়েছ বুঝি ! বসো, পিচকারি দিয়ে শুধু তোমার পিপাসা মেটাচ্ছি না, স্নান করিয়ে দিচ্ছি—

অনুসন্ধান করিতে করিতে সূর্য্যা সেই পূর্ব্ববর্ণিত অসুরদ্বয়ের লুক্কায়িত স্থানের দিকে গিয়াছেন, বলাসুর অমনি বাহির হইয়া আনন্দে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আলোর মেয়ে !',

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে ! [আনন্দে হাততালি !] আগুনের মেয়ে ! [আনন্দে হাততালি !] সোনার মেয়ে ! [আনন্দে হাততালি !]

সূর্য্যা সেই শব্দ শুনিয়া যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি পূর্ব্ববর্ণিত অসুরদ্বয় উঠিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ কাপড়দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং একজন তাহাকে ঘাড়ে ফেলিয়া পলাইল। অপরজন তাহার অনুসরণ করিতে গেলেই বলাসুর ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

বলাসুর ॥ ওকে কেন ? ওকে কেন ?

২য় অসুর ॥ ওকেই···ওকেই···

বলাসুর ॥ ও যে আগুনের ফুলকি ! আলোর চকমকি ! ওকে কেন ? ও যে সাদা ! আমরা যে কালো, ওকে কেন ?···ওকে শুধু চেয়ে দেখতে হয়,

২য় অসুর ॥ আমরা চেয়েই দেখব !

বলাসুর ॥ তা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাও কেন ?

২য় অসুর ॥—রাজার আদেশ !

বলাসুর ॥—রাজার আদেশ [হতাশ হইয়া পড়িল ।] ··উপায় ! উপায় ! তবে উপায় !···[সহসা মনে পড়িল ।] আছে উপায় ।···ঐ নরকঙ্কাল যদি আমি লুট করে নিয়ে যেতে পারি···রাজা বলেছে রাজা আমায় পুরস্কার দেবে···নেব ···নেব লুটে নেব ··চুরি করে নেব···যেমন করে পারি নিয়ে যাব···ঐ নরকঙ্কাল ···আর তারি পুরস্কার নেবার সময় বলব "দাও ··দাও···ওকে ছেড়ে দাও !"··· যাও—আলোর মেয়ে যাও !···আমিও যাচ্ছি, তোমায় এখানে ফিরিয়ে আনতেই যাচ্ছি ! ··কেঁদো না···তুমি কেঁদো না···আনবো···তোমায় ফিরিয়ে আনবো ! [অসুরের প্রতি] ·· যাও·· ·তুমি যাও—

হাত ছাড়িয়া দিলেন। অসুর ছুটিয়া পলাইতেছিল—বলাসুর তাহাকে আবার ডাক দিল।

বলাসুর ॥ শোন—ওকে কাঁদিয়ো না কিন্তু—

২য় অসুর ॥ [জিভ কাটিল] তাই কি পারি ?

বলাসুর ॥ যাও—

বিচলিত চিত্তে নিতান্ত অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল—কিন্তু তখনি তাহার নিজের কর্তব্যের কথা মনে হইল। সে দ্বারে কান পাতিয়া বুঝিল লোক এখনি বাহির হইবে। সে অন্তরালে চলিয়া গেল।

দ্বার খুলিয়া ত্বষ্টা, শচী এবং নরকঙ্কাল সহ ঋষিগণ প্রবেশ করিলেন।

ত্বষ্টা ॥ দেব, দেব, আমি ঐ অস্থি দিয়ে এমন এক অস্ত্র তৈরী করে দেব যাতে পাহাড় চূর্ণ হয়, আকাশ বিদীর্ণ হয়, সৃষ্টি ধ্বংস হয় !···পার্ব ! আমি পার্ব !

ঋষিগণ ॥ অস্ত্রের নাম ?

ত্বষ্টা ॥ "বজ্র।"

ঋষিগণ ॥ বজ্র ?

ত্বষ্টা ॥ বজ্র।

ঋষিগণ ॥ জয় বজ্র! জয় বজ্র! জয় বজ্র।

ত্বষ্টা ॥ সে আমাকে প্রলোভন দেখায়!...জানেনা আমি বজ্রের মতো কঠোর! বজ্রের মতো কঠিন! এইবার জানবে! এইবার বুঝবে।

ঋষিগণ ॥ জয় দেবশিল্পী ত্বষ্টার জয়!

ত্বষ্টা ॥ আমার জয় নয়। জয় দধীচির। জয় তার...যার ত্যাগ। জয় দধীচির জয়!

ঋষিগণ ॥ জয় দধীচির জয়!

ত্বষ্টা ॥...কিন্তু...সোমরস চাই! সোমরস চাই!...সোমরস না পেলে আমার হাত ওঠে না, পা চলে না!

ঋষিগণ ॥ কোথায় সোমরস? কোথায় সোমরস?

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রবেশ।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥...আমাদের হাতে। [অজস্র সোমলতা ত্বষ্টার সম্মুখে ধরিলেন।]...এইবার কোথায় "সে?

ত্বষ্টা ॥ ভেতরে। ভেতরে চল সব। [অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া ত্বষ্টার কক্ষে গেলেন।] ঋষিগণ, শীঘ্র সোমরস প্রস্তুত কর...এস—

দমন ॥ নরকঙ্কাল?

ত্বষ্টা ॥ ওর আর প্রয়োজন নেই। আমি বাহুর অস্থি কেটে রেখেছি!...এইবার শুধু সোমরস চাই! সোমরস চাই!

[কক্ষাভিমুখে প্রস্থান। ঋষিগণ সোমলতাগুলি কুড়াইরা শচীকে কহিলেন আসুন দেবী]

শচী ॥ [নরকঙ্কালটি একটি স্তম্ভগাত্রে বিন্যস্ত ছিল। শচী তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলেন। ঐ অস্থিতে যে বজ্র প্রস্তুত হইবে তদ্দ্বারা তাহার পিতৃকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, বোধ করি এই বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। নরকঙ্কালের কপাল ধরিয়া আবেগে বলিয়া উঠিলেন] বাবা! বাবা! তুমি কি সত্যই এতই কঠোর এতই কঠিন?...তবে আমাকে এত ভালোবেসেছিলে কেমন করে? আমিও তো অসুরের নন্দিনী আমাকে দিলে ভালোবাসা, আর অসুরকে দিচ্ছ মৃত্যু...কেন...?...কেন? তাকে কেন ভালোবেসে জয় কর্লে না... তাকে কেন ভালোবেসে জয় কর্লে না!

ঋষিগণ ॥ [এই কথা শুনিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহাদের ভালো লাগিল না। একটু বিরক্তই হইলেন।] আসুন দেবী!

শচী নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। সকলে ত্বষ্টার কক্ষ-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বলাসুর নরকঙ্কালের
পাশে ছুটিয়া আসিল। নরকঙ্কালটি তুলিয়া লইল।
এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলাইল।]

* * *

এদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাহারা সূর্য্যাকে
খুঁজিয়া পান নাই, আকুলভাবে ডাকিতে লাগিলেন "সূর্য্যা!
সূর্য্যা!" কোন উত্তর মিলিল না।

দস্র ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

নাসত্য ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

আশে পাশে খুঁজিয়াও যখন পাইলেন না, তখন দুইজনে বক্ষে কপালে করাঘাত
করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে, উঠিয়া পাহাড়ের দিকে গেলেন।
এবং "সূর্য্যা" "সূর্য্যা" রূপে গগনভেদী চীৎকারে ডাকিতে ডাকিতে
পাহাড়ের বুকে অদৃশ্য হইলেন]

* * *

হঠাৎ বৃত্রাসুরে প্রবেশ।

বৃত্রাসুর ॥ নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত আমি, আজ আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ঋষিগণ দেবগণ! এইবার কোথায় তোমাদের সেই নরকঙ্কাল? হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাস্য]।

দ্বার খুলিয়া শচীর প্রবেশ।

শচী ॥ [নরকঙ্কাল উদ্দেশে] বাবা!

ছুটিয়া সেই স্তম্ভের সম্মুখে গেলেন, গিয়া দেখেন নরকঙ্কাল নাই। সম্মুখে তাকাইয়া
দেখেন বৃত্রাসুর, তাহার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া রহিয়াছেন।
তাহাকে দেখিয়াই শচী শিহরিয়া উঠিয়া
দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

বৃত্রাসুর ॥ [নির্ভয়ে শচীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন] পৌলমী!

শচী ॥ [নীরব রহিলেন]

বৃত্রাসুর ॥ উত্তম!···ইন্দ্রাণী?

শচী ॥ পালাও! পালাও!

বৃত্রাসুর ॥ পালাতে আসিনি।···শুধু জানতে এসেছি, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাস কিনা।

শচী ॥ জানা নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্রাসুর ॥ কেন?

শচী ॥ স্ত্রী মাত্রেই স্বামীকে ভালোবাসে।

বৃত্রাসুর ॥ শুনে সুখী হলুম···তুমি অসুরের নন্দিনী। অসুরনন্দিনীর যোগ্য কথাই তোমার মুখে শুনলুম। শুনে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠল।··· কিন্তু, আর একটি প্রশ্ন। আর তার ছোট্ট একটি উত্তর···শুধু হাঁ·· কি ·· না ·· । বলবে? অতি সামান্য প্রশ্ন···অতি সাধারণ প্রশ্ন···শুধু এই ·· যে পৌলমী, তুমি কি তোমার পিতৃকুল মাতৃকুল ·· এতটুকু ভালোবাসো না?··· বল·· বল···

শচী ॥ বাসি।

বৃত্রাসুর ॥ সত্য বটে আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি জগতের সব চাইতে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছি, কিন্তু, পৌলমী, অপরাধ করেছি সত্য কিন্তু অপরাধ করেছি আমার জাতির সম্মান অটুট্ রাখবার জন্য, অসুরের কন্যা দেবতার স্পর্শে কলঙ্কিত না হয় সেই জন্য,···শুধু তাও নয়, এই বুকে হাত দিয়েই বলছি, শুধু তাও নয়, তোমায় পাগল হয়ে ভালোবেসেছিলাম সেইজন্য। জানি, জানি পৌলমী, জানি··· তোমার পিতৃহত্যা করে তোমার নিকট সব চাইতে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী আমি। ···কিন্তু সে শুধু আমি-ই।··· আর কেউ নয়। লক্ষ লক্ষ অসুরের আর কেউ নয়। আমার অপরাধে লক্ষ লক্ষ অসুরকেও তুমি ঘৃণা কর, এ কথা অসুরের রক্ত যার শিরায় রয়েছে, সেই তুমি···বলবে না, বলতে পার না, আমি জানি।···পার?

শচী ॥ না।

বৃত্রাসুর ॥ তবে এস।···এস তোমার পিতার প্রাসাদে।···আমি তাতে প্রবেশও করি নি।···একটি দিন তুমি তোমার···পিতৃভবনে এস। আমি তোমার রাজ্য তোমার হাতে তুলে দি, আমি তোমার স্বামীকে তোমার হাতে তুলে দি তারপর তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, সমগ্র অসুরকুল তাদের রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুক,···উৎসব হোক্, প্রীতির ডোরে দেবতা বাধা পড়ুক।··· তারপর···তুমি অসুরকুল বর-বর্ণিনী···জগতের কল্যাণীর মতো তোমার স্বামিগৃহে আবার ফিরে এস! পৌলমী! পৌলমী! পারি না···আমি আর পারি না··· তোমার পিতার রক্তে রঞ্জিত তোমার পিতৃরাজ্যের ভার বইতে!· নিশিদিন, প্রতিক্ষণে প্রতি

মুহূর্ত্তে কি যে মর্ম্মবেদনার তুষানলে আমি জ্বলে মর্ছি, যদি বুঝতে···যদি বুঝতে····

[কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই ক্রন্দনে শচী বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া ঋষিগণ কখন যে বাহির হইয়াছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। নরককাল ওখানে নাই তাহা ঋষিগণ লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিজেরা পরামর্শ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই শব্দে শচী চমকিত হইয়া উঠিলেন।]

শচী ॥ [বৃত্রকে] তুমি যাও—তুমি যাও—। আমি ভেবে দেখি।···আমি ঋষিদের বলে দেখি—[ছুটিয়া দ্বারে আসিলেন। দ্বারে করাঘাত করিলেন। দ্বার খুলিল না। শেষে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন] দ্বার খো !দ্বার খোল ! [একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল। সেই বাতায়ন সম্মুখে কয়েক জন ঋষি উপস্থিত হইলেন]

শচী ॥ খোল দ্বার ·· দ্বার খোল—

ঋষিগণ ॥ স্বয়ং ইন্দ্রদেব এসে দ্বার খুলবেন। আমরা পার্ব্ব না।

শচী ॥ পার্ব্বে না ?

ঋষিগণ ॥ না।

শচী ॥ না ?

ঋষিগণ ॥ না। [বাতায়নও বন্ধ করিলেন]

শচী ॥ হায় ! হায় ! ঋষিগণ আমায় ত্যাগ করলেন ! আমি তবে কোথায় যাব ? স্বামীও কারাগারে ! কোথায় যাব ? আমি কোথায় যাব ?

সোপান শ্রেণীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

বৃত্রাসুর ॥ [সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া]—আমার সঙ্গে।···এসো ··· এসো···· !

শচী ॥ না · না···না····তাও পারি না···তাও পার্ব্ব না !

বৃত্রাসুর ॥ পৌলমী ! পৌলমী ! তবে আমায় তুমি বিশ্বাস কর্লে না ? [স্তম্ভিত হইলেন] অসুরের মেয়ে হয়ে অসুরকে বিশ্বাস করতে পারলে !···না তবে আর আমার দোষ নেই।····আমার— ···যদি আমার সঙ্গে আস····স্বামীকে ফিরে পাবে, আর যদি না আস····স্বামীকে জন্মের মতো হারাবে। [শচী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] কার মুখ চেয়ে অসুরের পরম শত্রু ঐ ইন্দ্রকে আমি আজো হত্যা করিনি ?····সে তুমি।····কিন্তু অসুর-নন্দিনী ! অসুর নন্দিনী হয়েও যদি তুমি অসুরের ব্যথা, অসুরের মর্ম্মবেদনা না বোঝ····কেন····কেন

আমি দেবতাকে ক্ষমা কর্ব ?....সে আমার কে ? তুমি....তুমি....তুমিই যখন কেউ হলে না,... দেবতা আমার কে ? [বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল] তুমি.... তুমি....তুমি....অসুরের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা অসুরের স্বপ্ন....অসুরের আলো....অসুরের মণি....অসুরের মাণিক... ফিরেও তাকালে না তুমি অসুরের পানে তবে....তবে [সহসা রুদ্রমূর্তিতে] আমি কেন ইন্দ্রের তপ্তরক্তধারা আনন্দ উল্লাসে,....আকণ্ঠপুরে পান কর্ব না ?....করব... করব... অবশ্য....। আমি অসুর... আমি দস্যু....আমি রাক্ষস ! [প্রস্থান]

শচী ॥ [স্বামীর জীবনের আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে আকুল আবেগে] আমি যাব ! আমি যাব ! মেরো না....আমার স্বামীকে মেরো না ...আমি যাব ! [বৃত্রাসুরের পথ অনুসরণ করিলেন]

* * *

ঋষিগণ দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং সকলেই শচীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাকে না পাইয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "অনুমান মিথ্যা নয়।"

দমন ॥ বৃত্রাসুর তবে শুধু কঙ্কাল নিতে আসে নি....

মেধাতিথি ॥ কঙ্কাল ঐ ইন্দ্রাণীই দিয়েছে সেই অসুরকে...., অসুরবধ হবে শুনে শোননি ইন্দ্রাণীর বিলাপ ?

দমন ॥ কিন্তু ইন্দ্রাণীই বা গেলেন কোথায় ?

মেধাতিথি ॥—বৃত্রাসুর নিয়ে গেছে।

শঙ্খ ॥—অসুর কেড়ে নিয়ে গেছে অসুরের মেয়ে।

দমন ॥ তবে অসুরের পাপ এইবার যোলকলায় পূর্ণ হ'ল !... হতে পারেন ইন্দ্রাণী অসুর-নন্দিনী, কিন্তু তিনি দেবতার ঘরণী ! দেবতার রাজরাণী আমাদের মা ! এবার অসুর আমাদের সেই মাকে হরণ করেছে !

নেপথ্যে ইন্দ্রের স্বর শ্রুত হইল—শচী ! শচী !

ঋষিগণ ॥ কার ঐ আকুল কণ্ঠস্বর ! কে ডাকে... ইন্দ্রাণীকে কে ডাকে ?

বৃত্রের বিপরীত পথে ইন্দ্রদেবের প্রবেশ।
দেখা গেল তাঁহার শৃঙ্খল ছিন্ন।

ঋষিগণ ॥ দেবরাজ ! দেবরাজ !

ইন্দ্র ॥ শচী কই ? শচী কোথায় ?

ঋষিগণ ॥ নাই—নাই—নাই—

ইন্দ্র ॥ কোথায় ? কোথায় ? কোথায় ইন্দ্রাণী ?

ঋষিগণ ॥ বৃত্রাসুর লুণ্ঠন করেছে !

ইন্দ্র ॥ করেছে ? করেছে ? ও—হো—হো—হো ! তবে আমার দুঃস্বপ্নই সত্য হল ! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার জন্য ব্যাকুল তার মুখখানি ! শেষে দেখলাম সে ভয়ে কাঁপছে ! তারপর দেখলাম পাশে বৃত্রাসুর। সে ইন্দ্রাণীকে আকর্ষণ করছে ! শচী আর্ত্তনাদ করে উঠল ! আমার দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ্ করে ফুটে উঠল ! কি সাধ্য শৃঙ্খলের যে আমায় বেঁধে রাখে···যখন আমার শচী আর্ত্তস্বরে আমায় ডাকে ! আমি ভেঙে ফেললাম চূর্ণ করলাম লৌহশৃঙ্খল···ছুটে এলাম এখানে···কিন্তু··· এখানে এসে কি দেখছি ! নাই ··নাই ·· সে আমার নাই ·· এতদিন অসুর শুধু দেবগণের ওপরই অত্যাচার করেছে। এবার সে দেবীর, নারীর···উপর অত্যাচার সূচনা কর্ল ! এইবারই তার পাপ পরিপূর্ণ হল ! দেবভূমি কেড়ে নিয়েছে সহ্য করেছি, দেবতার রক্তে মাটি ভাসিয়ে দিয়েছে, সহ্য করেছি, কিন্তু নারীর ওপর অত্যাচার—[সহসা রুদ্রমূর্ত্তিতে] কোথায় ঋষি দধীচির নরকঙ্কাল, ত্যাগীর ত্যাগ-অস্ত্র, বৃত্রাসুরের মৃত্যু-বান ?

ত্বষ্টার বজ্রহস্তে প্রবেশ।

ত্বষ্টা ॥ বাণ নয়,·· বজ্র।···নাও দেবরাজ !

ইন্দ্রদেব ॥ এই অস্ত্র ?

ত্বষ্টা ॥ হাঁ, এই অস্ত্র। বজ্র ! জগতের শ্রেষ্ঠ···অত্যাচারীর যম।··· বিশ্বকর্ম্মার দান নয় ···ত্যাগীর দান···জগতের অত্যাচার দমনার্থ ত্যাগীর দান !

ইন্দ্রদেব ॥ [অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া] বৃত্রাসুর ! দেবতার ভাগ্য-আকাশের জ্বালাময় কালো মেঘ ! ·· চূর্ণ···দীর্ণ···বিদীর্ণ কর্ব্ব আজ তোমায় আমি ! [প্রস্থান]

ঋষিগণ ॥ জয় দধীচির জয় ! জয় ইন্দ্রদেবের জয় !

পাহাড়ের উপর হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া সেখানে নামিয়া আসিলেন।

দস্র ॥ জয় নয়, জয় নয়।

নাসত্য ॥ পরাজয় ! পরাজয় !

ঋষিগণ ॥ সে কি ? সে কি ?

দস্র ॥ কোথায় সূর্য্যা ? কোথায় আমাদের সূর্য্যা ?

নাসত্য ॥ অসুরে আবার তাকে হরণ করেছে !

ঋষিগণ ॥ সর্ব্বনাশ! [বিষম চাঞ্চল্য]

ত্বষ্টা ॥ [আকুল ভাবে অনুসন্ধান] সূর্য্যা! সূর্য্যা!

দস্র ॥ নাই! নাই! সূর্য্যা নাই!

নাসত্য ॥ প্রতি কক্ষে খুঁজেছি, পাহাড়ে খুঁজেছি, বনে খুঁজেছি, সে নাই···নাই···!

ত্বষ্টা ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা! [গগনভেদী স্বরে ডাকিতে লাগিলেন]

নেপথ্য হইতে সূর্য্যা উত্তর দিল—আমি এসেছি! আমি এসেছি!

সকলে ॥ ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

রক্তাক্ত-দেহ মুমূর্ষু বলাসুর সূর্য্যাকে বহন করিয়া আনিয়া নামাইল।

সূর্য্যা ॥ আমি এসেছি—

বলাসুর ॥ এনেছি···আলোর মেয়ে···আমি··ফিরিয়ে এনেছি! [নামাইয়া দিয়াই মাটিতে পড়িয়া গেল। আবার উঠিল] আমি দুই অসুরকেই বধ করেছি···বলেনি···রাজা তাদের বলেনি··ওকে ধরে নিয়ে যেতে তবু মিথ্যা ব'লে আমায় ফাঁকি দিয়ে ওকে তারা নিয়ে গিয়েছিল আমি তাদের শির নিয়েছি ···আমিও মর্ত্তে বসেছি··কিন্তু তবু···তবু তো—ফিরিয়ে এনেছি আমার আলোর মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি!

মাটিতে পড়িয়া যাইতেই সূর্য্যা তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিলেন।

সূর্য্যা ॥ একি হোল!—ও বুঝি আর বাঁচে না!···[সকলের প্রতি বাঁচাও ···বাঁচাও···ওকে বাঁচাও···আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ও মরছে—ওকে বাঁচাও—

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে! আগুনের মেয়ে! বাঁচব না আমি বাঁচব না! আমার হয়ে এসেছে। দুঃখ নাই··তাতে দুঃখ নাই··দেখি··তোমায় আমি আর একটিবার দেখে নি—[উঠিতে চেষ্টা করিল]···সুন্দর! কি সুন্দর তুমি!—আর আমি! [নিজের দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিতেই পড়িয়া গেল] কালো! উঃ কি কালো!···তোমার জন্য এত রক্ত মাখলাম···তবু··· তবু—সেই কালো! এখনও—এখনও কি তুমি আমায় ঘেন্না কর?

সূর্য্যা ॥ তোমায় ঘৃণা?···তুমি আমায় পিতার মত রক্ষা করেছ··ভাইএর মতো স্নেহ করেছ···অসহায়া নারীকে দেবতার মতো রক্ষা কর্ত্তে প্রাণ দিয়েছ!··· অসুর নও···তুমি অসুর নও···তুমি দেবতা···দেবতারও দেবতা!

বলাসুর ॥—না···না···আমি অসুর—সেই অসুর—যে দেবতাকে ভালো—বা—সে—! সেই অসুর যে দেবতার ভালোবাসা পায়!—আজ দেখছি আ—লো! আ—লো! আঃ [মৃত্যু]

সূর্য্যা চোখ মুছিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে পাথরের মত নিষ্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

বৃত্রাসুরের রাজপ্রাসাদমধ্যস্থ "বিলাস ভবন"।

বিলাস-ভবনের পশ্চাতে একটি অতিবিস্তৃত দরজা। সেই দরজা খুলিলে আকাশ দেখা যায়, সে আকাশ আজ ঘনকৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন। দরজার ওপারে অলিন্দ, এপারে বর্ত্তমান দৃশ্যের বিলাসভবন। দরজা পার হইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলেই এই বিলাসভবনে প্রবেশ করা যায়। বিলাসভবনের কারুকার্য্য অতুলনীয়। দেবশিল্প এবং অসুরশিল্পের সমন্বয়ে এই বিলাসভবন রূপ পাইয়াছে। বৃত্রাসুরের তিনজন বিশ্বস্ততম অনুচর ছিল, তাহাদের নাম পিপ্রু, উরণ এবং কুষব। তাহারা একটি অদ্ভুত আকৃতি পানপাত্র সহ পূর্ব্বোল্লিখিত দরজাপথে বিলাসভবনে প্রবেশ করিল, এবং তিনজন একত্র হইয়া সেই পানপাত্রটি অতি যত্নে, কিন্তু নীরবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পানপাত্রটি রৌপ্যপাতে মণ্ডিত। পরীক্ষার পর যখন তাহারা বুঝিল যে হাঁ, জিনিষটি বেশ ভালই হইয়াছে, তখন সেটি তাহারা মদ্যাধারের পার্শ্বে অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিল। তাহার পরই তিনজনে উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল, অমনি অসুরবালাগণ নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

অসুরত্রয় ॥ নাচো··· গাও····স্ফূর্ত্তি কর! মদে আজ মেদিনী ভাসিয়ে দাও! সাঁতরাও··· ডুব দাও··· হাঃ হাঃ হাঃ [ইত্যাদি প্রকার চটুলতা।]

অসুরবালাগণের নৃত্যগীত। অসুরগণের মদ্যপান।

—গান—

নাচে মহুয়া নাচে প্রাণ,
কথা নীরবে নয়নে নয়ান
আকুল অধরে করিতে চুম্বন দান।
শোণিতে আগুন ছুটে,
সঞ্চিত সুধা যত তোমারি তরে।
নাও গো লুটে ওগো নাও গো লুটে ॥
বৃথা কি ফুটে, (ফুল) বৃথা কি ফুটে।
পিও পিও তুমি পিও কেন এত অভিমান ॥

নৃত্যগীত শেষে অসুরবালাগণ যখন অন্তর্হিতা, তখন ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া
গেল। দেখা গেল দরজা-পথে বৃত্রাসুর দণ্ডায়মান। অসুরগণ ছুটিয়া
গিয়া সোপানপ্রান্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল।
বৃত্রাসুর বিলাসভবনে নামিয়া আসিলেন।

বৃত্রাসুর ॥ প্রস্তুত? [অসুরত্রয় ইঙ্গিতে জানাইল "হা", কোন কথা না বলিয়া সেই পানপাত্রটি বৃত্রাসুরের সম্মুখে ধরিল। বৃত্রাসুর নির্নিমেষনেত্রে পানপাত্রটি তাকাইয়া দেখিলেন। অসুরত্রয় উহা তাঁহার হাতে দিতে গেলেন। বৃত্রাসুর সভয়ে একটু পশ্চাদ পদ হইয়া বলিলেন] না··না···না থাক্···ঐখানেই থাক্।··আর··শোন··শোন···[অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, শুধু অসুরত্রয়ই তাহা বুঝিল···তাহারা পার্শ্বস্থ কক্ষের একটি পরদা সরাইয়া দিল··দেখা গেল সেখানে দধীচির সেই নরকঙ্কাল, বলাসুর, যাহা অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল. দধীচির সেই কঙ্কাল দাঁড় করানো রহিয়াছে, কিন্তু, তাহাতে নরকপাল নাই। বৃত্রাসুর নিজে অগ্রসর হইয়া তাহা দেখিয়াই আবার পরদা টানিয়া দিলেন এবং সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। অসুরত্রয়কে বলিলেম···] ইন্দ্র পালিয়েছে. পালাক্, আমাদের পৌলমী এসেছে। অসুরের ঘরে আজ অসুরের মেয়ে এসেছে। তার যেন কোন অসম্মান না হয়···অসুর-নন্দিনীকে অসুরের আজ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন কর, সে না গ্রহণ করে, ক্ষতি নাই, কিন্তু তার চোখ ঝলসে দাও—অসুরের ঐশ্বর্য্যে, অসুরের শৌর্য্যে, অসুরের মহত্ত্বে। কোথায় সে

অসুরত্রয় ॥ সম্রাট-জননীর কাছে।

বৃত্রাসুর ॥ সে এখন কি বলে?

পিপ্রু ॥ অতি দাম্ভিকা ঐ পৌলমী। যে মুহূর্ত্তে শুনেছেন ইন্দ্র লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করে পলায়ন করেছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি বলেছেন তবে আর ভয় নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।

বৃত্রাসুর ॥ বটে!—ফিরে যেতে চায় নি?

পিপ্রু ॥ না। বলেছেন রাত্রি প্রভাতে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করে তবে যাবেন—

বৃত্রাসুর ॥ প্রভাতের আর কত বিলম্ব?

পিপ্রু ॥ আর অতি সামান্য।

বৃত্রাসুর ॥ আমি আজ সারাটি রাত ঘুমুতে পারিনি। যখনি ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠেছি, নিদারুণ বিভীষিকায় আর্ত্তনাদ করেছি!···কাল প্রভাতেই ইন্দ্রকে পুনরায় বন্দী করা চাই, তারপর চাই তার ছিন্নশিরের তপ্ত রক্ত···তখন দেখে নেব কোথায় থাকে ঐ পৌলমীর দর্প!···ঐ দর্পিতার দর্প যতক্ষণ না চূর্ণ করতে পাচ্ছি···ততক্ষণ··ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম নাই। দাও মহুয়া—

পিপ্রু ॥ মহুয়া কেন? সোমরসই তো আছে আজ!

বৃত্রাসুর ॥ মূর্খ!...সোমরস অসুরে পান করে না...সোমরস অসুরের অস্পৃশ্য...তার ধর্ম্মের নিষেধ। * ধর্ম্মও কি ভুলে গেছ অসুর?...সোমরস পান করে দেবতা।

পিপ্রু ॥ [একটি সোমকলসে সোমরস রক্ষিত ছিল। সেই কলস দূরে নিক্ষেপে উদ্যত হইল—]

বৃত্রাসুর ॥ [বৃত্রাসুর হস্তের ইঙ্গিতে নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন।] ....না—। আজ ওর প্রয়োজন আছে বলেই আমি ঐ সোমরস সংগ্রহের আদেশ দিয়েছি।—ঐ সোমরসেই পরীক্ষা হবে পৌলমীর দেহে সত্যসত্যই কি অসুরের রক্ত...না সে রক্ত মিথ্যা!....তুমি দাও পিপ্রু আমার মহুয়া দাও।....আজ কি রাত্রি আর প্রভাত হবে না?—আমার চোখে যে ঘুম আসে না। ঘুম আসে না! [আসনে যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িলেন।] পিপ্রু! দেবতার নারী ... এসে নাচুক... দেখব!

পিপ্রুর ইঙ্গিত। সমুজ্জ্বলবেশে দেবনর্ত্তকীগণ আলোর বন্যার মত প্রবেশ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বৃত্রাসুর ঘন ঘন মহুয়া পান করিতে করিতে বুঝি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* * *

[সম্রাট নিদ্রামগ্ন বুঝিয়া নর্ত্তকীরা ও অসুররা ধীরে অতি ধীরে চলিয়া গেল]

বৃত্রাসুর ॥ [ঠিক ঘুমান নাই, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলেনে মাত্র। এমন সময় কি একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন] ওকি? [চিৎকার করিয়া উঠিলেন] ওকি?

ছুটিয়া পিপ্রুর প্রবেশ

বৃত্রাসুর ॥ ও কিসের শব্দ?

পিপ্রু ॥ ঝড় উঠেছে।—বিষম ঝড়।

বৃত্রাসুর ॥ সত্যি?—[ইঙ্গিতে দরজা খুলিতে আদেশ দিলেন।] দেখি [দরজা খুলিলে] আকাশে মেঘ—! কি কালো! কি নিবিড় কালো।—হাঃ হাঃ হাঃ ও যে আমি! আমারি বুকের ঝড়—ঐ ওখানে—ঐ আকাশে—!

---

* অসুরদের নিকট সোমরসের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের টীকা দ্রষ্টব্য।

[ইঙ্গিতে দরজা বন্ধের আদেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া পিপ্রু অতি ধীরে চলিয়া গেল। বৃত্রাসুর অর্দ্ধশয়ান ভাবে আবার চোখ বুজিলেন। * * * * * * * * * * * এবার দরজায় এক ঝলক শুভ্র আলোক পড়িল। সেই দরজায় ছায়া পড়িল। সে ছায়া দধীচি ঋষির। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত দধীচির হস্তদ্বয় লৌহকীলকে বিদ্ধ করার দৃশ্য। বৃত্রাসুর চমকিয়া উঠিলেন। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—] কে ও? —ও কি? ও কি? দধীচি?—লৌহকীলক? রক্ত-উৎস? কিন্তু তবু তার মুখে চীৎকার কই—আর্ত্তনাদ কই?—উঃ উঃ উঃ [দুই হাতে মুখ চোখ ঢাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।] বলাসুর—[ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন ঐ দধীচিকে ওখান হইতে সরাইয়া ফেলিতে। পরে চোখ মেলিয়া] গেছে। আঃ [স্বস্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়াই আবার দেখেন সেই দৃশ্য যে দৃশ্যে —দধীচি জলে ডুব দিয়া গাছের শিকড় সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। জলে ডুবিয়া মরার সেই দৃশ্য দেখিয়া বৃত্রাসুর আর থাকিতে পারিলেন না— প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিলেন "পিপ্রু"। পিপ্রু ছুটিয়া আসিল। ছায়া মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।]—সেই মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি। সেই দধীচি। জলে ডুব দিয়ে দুই হাতে গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরে আমার উদ্দেশে হাসছে! ও হো-হো! আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও! [লুটাইয়া পড়িলেন।]

পিপ্রু ॥ কোথায় কি দেখলেন সম্রাট!

বৃত্রাসুর ॥ [শুধু, ইঙ্গিতে দরজা দেখাইয়া দিলেন।]

পিপ্রু ॥ [দরজা খুলিয়া দেখিল] কই? এখানে তো কিছু নেই! হাঁ, বাইরে ঝড় উঠেছে বটে! উঃ কি বিষম ঝড়! [দরজা বন্ধ করিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ সে আমি বুঝছি—পিপ্রু—পিপ্রু—সে আমি আমার এই বুকে হাত দিয়েই বুঝছি!—কিন্তু—তবে আমি কি দেখলাম?

পিপ্রু ॥ হয়ত স্বপ্ন দেখেছেন!

বৃত্রাসুর ॥ স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়—[ধীরে অতি ধীরে সেই কঙ্কালের কক্ষের সম্মুখে গেলেন। কিন্তু পর্দ্দা সরাইতে সাহস হইল না, সরিয়া আসিয়া পিপ্রুর মুখের দিকে চাহিতেই পিপ্রু ঐ কক্ষের সম্মুখে যাইয়া পর্দ্দা সরাইল— বৃত্র দূরে সরিয়া মুখ ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]—আছে?

পিপ্রু ॥ আছে।

বৃত্রাসুর ॥ ঢাকো। কাল ঐ কঙ্কাল চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রো—না—না—সমুদ্র হতে তবে উঠে আসবে—মাটিতে পুঁতে ফেলো—না— না—তাও না—কি কর্ব্ব! আমি ঐ কঙ্কাল নিয়ে কি কর্ব্ব? [হতাশ হইয়া পড়িলেন]

পিপ্রু ॥ আপনি একটু ঘুমাতে চেষ্টা করুন সম্রাট!

বৃত্রাসুর ॥ ঘুম! হাঃ হাঃ হাঃ ঘুম? [অতি করুণ ভাবে] কতকাল

ঘুমুইনে—ঘুমুতে পারিনে!—রাত্রি কি আজ শেষ হবে না?—শেষ হবে না কি আজ এই কালরাত্রি?

পিপ্রু ॥ রাত্রি ভোর হয়েছে। কিন্তু ঝড় উঠেছে।

বৃত্রাসুর ॥ [আশান্বিত হইয়া] ভোর হয়েছে? রাত্রি ভোর হয়েছে? [ত্বরিৎপদে দরজার কাছে গিয়া প্রথমে দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে—একেবারে সম্পূর্ণ উম্মুক্ত করিলেন। ভোরের আলো বিলাসভবনে প্রবেশ করিল। বৃত্রাসুর ত্বরিৎপদেই আবার কক্ষমধ্যে আসিলেন।] পিপ্রু—রাত্রি প্রভাত হয়েছে। নিয়ে এস দেবতার রাণী পৌলমী [পিপ্রু চলিয়া গেল। বৃত্রাসুর ইঙ্গিতে আর একজন অনুচরকে আহ্বান করিলেন। এবার "উরণ" আসিল।]—দেবতার রাণীকে সমুচিত অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত কর উরণ! [উরণ চলিয়া গেল। বৃত্রাসুর আবার আর এক ইঙ্গিতে অনুচর "কুষব"কে আহ্বান করিলেন। কুষব আসিলে]—মহুয়া! [কুষব চলিয়া গেল। বাদ্য মৃদুভাবে বাজিয়া উঠিল। একে একে এক এক নর্ত্তকী সুরাপাত্র সহ নাচিতে নাচিতে আসিল। বৃত্রাসুর সুরাপান করিতে লাগিলেন। সকল নর্ত্তকী আসিলে—] অসুরের নৃত্যে অসুরের মেয়েকে বরণ কর—দেখি তার রক্ত তার তালে তালে নাচে —কি বিদ্রোহ করে!—আজ আমি দেখব—শুধু দেখব—তার শিরায় ধমনীতে কার রক্ত?··অসুরের না দেবতার!

দ্বারপথে শচী আসিয়া দাঁড়াইলেন। নর্ত্তকীরা নৃত্য আরম্ভ করিল। এ নৃত্য অসুরের জাতীয় নৃত্য।···সেই সঙ্গে অসুরের মেয়েকে অসুরের ঘরে বরণ করিবার গান গাহিল।

এ নব নবীন নূতন পাত্রে
ঢালো আজি সুধা ঢালো।
শ্রান্ত ক্লান্ত অন্তর পুরে
আনন্দ দীপ জ্বালো ॥
দূরে করে দাও সব সন্তাপ,
ধুয়ে মুছে দাও মলিনতা পাপ।
যাক থেমে যাক রোদন বিলাপ
ফুটাও হাসির আলো ॥
প্রণয় উদাসী যেবা উন্মনা,
মিলন মেলায় মিলুক সে জনা
বিসরি বিষাদ বিরহ বেদনা
সবারে বাসগো ভাল ॥

নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীরা শচীকে বরণ করিল। শচী ও বৃত্রাসুর পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। শচীকে দেখিয়া মনে হইল

মহামহিমান্বিতা স্বামী-গর্ব্বে-গর্ব্বিতা সম্রাজ্ঞীর মতো। চোখেমুখে তাহার দৃঢ়তা বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।...সে তুলনায় বৃত্রাসুরকে বিশেষ দুর্ব্বল মনে হইতে লাগিল। বৃত্রাসুর মুখ নামাইলেন। অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। শচী, ধীরে ধীরে, কক্ষমধ্যস্থ সিংহাসনে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। নৃত্যগীত শেষ হইল।

বৃত্রাসুর ॥ পৌলমীর জয় হোক্‌।

শচী ॥ ইন্দ্রের জয় হোক্‌।

বৃত্রাসুর ॥ তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমার মৃত্যু কামনা কর পৌলমী! বল! বল!

বৃত্রাসুর শিহরিয়া উঠিলেন।

শচী ॥ আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি অসুর-সম্রাট!—

বৃত্রাসুর ॥ তার অর্থ?

শচী ॥ তার অর্থ এই...তুমি দেবভূমি দেবতার হাতে ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার দেশে যাও—

বৃত্রাসুর ॥ সে দেশ কি শুধু আমারি? তোমার নয়?

শচী ॥ হাঁ, সে দেশ আমার।...আমার পিতার।...কিন্তু...আমি তো আমার পিতার রাজ্য ফিরে চাই নি!...আমি তার সকল দাবী সেই দিনই তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, যেদিন দেখেছি তুমি আমার দেশের আমার জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে... গুণে...তেজে... মহত্ত্বে!

বৃত্রাসুর ॥ বৃথা এ তর্ক পৌলমী! দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চিরকাল চলেছে... চিরকার চলবে...তর্কে তার মীমাংসা হবে না...মীমাংসা হবে অস্ত্রে,... আবেদনে নয়, নিবেদনে নয়, মীমাংসা হবে শ্রেষ্ঠতর শক্তি-সাধনায়। ও কথা থাক্‌। অসুরের মেয়ে তুমি অসুরের গৃহে এসেছ... অসুরের আজ পরম ভাগ্য, চরম আনন্দ!—যদি সত্য সত্যই অসুরকন্যা বলে নিজের জন্মের উপর তোমার ঘৃণা না এসে থাকে...তবে অসুরের অভ্যর্থনা সাদরে গ্রহণ কর্ত্তে পারবে বলেই মনে করি।

তাহার ইঙ্গিতে এক অসুরকন্যা একপাত্র সুরা ঢালিয়া শচীর সম্মুখে ধরিল।

শচী ॥ আমি এখানে মাতাল হতে আসিনি সম্রাট!

বৃত্রাসুর ॥ মহুয়ার মধু—

শচী ॥ ঘৃণা করি!

বৃত্রাসুর ॥ বটে! সত্যি?

শচী ॥ [ঘৃণায় নির্ব্বাক রহিলেন]

বৃত্রাসুর ॥ অসুর কন্যা !···মহুয়ার মধু···অপমান করো না ওকে···

শচী ॥ তুমি আমায় অপমান করো না সম্রাট !

বৃত্রাসুর ॥ উত্তম –[তাঁহার ইঙ্গিতে এক দেবদাসী সোমরসের কলস হইতে সোমরস এক সুরাপাত্রে ঢালিতে গেলেই—] ও পাত্র নয়···ও পুরানো পাত্র নয়, [ইঙ্গিতে, দৃশ্যের প্রথমেই বর্ণিত সেই অদ্ভুত সুরাপাত্র দেখাইয়া দিলেন] ঐ নূতন—[দেবদাসী সেই নূতন পাত্রে সোমরস ঢালিয়া শচীর সম্মুখে ধরিল]···

শচী ॥ [প্রচণ্ড বিরক্তিতে] না –না—না—

বৃত্রাসুর ॥ কেন ?

শচী ॥ মহুয়া আমি পান করিনা···এ কথা আমাকে কতবার বলতে হবে সম্রাট ?

বৃত্রাসুর ॥ ও মহুয়া নয় ! মহুয়া নয়···!

শচী ॥ তবে ?

বৃত্রাসুর ॥ সোমরস। দেখছ না ও লাল নয়, দুগ্ধ শুভ্র !

শচী ॥ হোক্···

বৃত্রাসুর ॥ সোমরস দেবরমণীদের অতি পরম প্রিয় পানীয়, অসুর হলেও আমি তা জানি—অসুর-সম্রাট ইন্দ্রাণীকে সেই সোমরস দিয়েই অভ্যর্থনা করেছে। –তবে কি সোমরস পান না করে তোমার দেবত্বের দাবী পরিত্যাগ কর্লে পৌলমী ?

শচী ॥ কখনো নয়।···[দেবাদাসীর হাত হইতে পানপাত্র লইয়া পান করিতে যাইয়াই পানপাত্রটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া পান স্থগিত রাখিয়া উহার বিশেষত্বই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ কি দেখছ পৌলমী ?

শচী ॥ কিন্তু এ তো দেবতার পানপাত্র নয় !

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ দেবতার ! দেবতার !···ঐ পানপাত্রটির প্রতিটি রেণু-পরমাণু দেবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে প্রস্তুত।···তোমার অভ্যর্থনায় আজ ঐ পানপাত্রটিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য !

শচী ॥ বটে ! বেশ। [সোমপান।]

বৃত্রাসুর ॥ [তিনিও মহুয়া পান করিলেন।] এত অতি চমৎকার ব্যাপার।···দেবতা পান করে সোমরস, অসুর পান করে মহুয়া।···কোনটি বেশী মিষ্টি কেউ বলতে পারে না। কারণ দেবতা কখনো মহুয়া পান করে না, আর অসুরের রক্ত যার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত সে কখনো সোমরস পান করে না···করে ?

শচী ॥ [এই ব্যঙ্গে একেবারে ছাই এর মতো সাদা হইয়া গেলেন।]

বৃত্রাসুর ॥—করে ?

* বেদে সোম দেবতা রূপে পূজিত হইত।

শচী ॥ [তথাপি নীরব রহিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ [উত্তেজিত ভাবে]···বল অসুর-নন্দিনী! অসুরের রক্ত যার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত, সে কি কখনো সোমরস পান করে?···করে? করে?

শচী ॥ [চেষ্টা করিয়া উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ সোমরসেও মাদকতা আছে শুনেছি, এখন দেখছি, সত্য সত্যই আছে। তুমি মাতালের মতো একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছ যে পৌলমী!···আমার প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে পাচ্ছ না! অদ্ভুত!

শচী ॥ কি বলব আজ আমার স্বামী এখানে উপস্থিত নাই।···যদি থাকতেন—

বৃত্রাসুর ॥ [ব্যঙ্গময় তীব্র দৃষ্টিতে] হাঁ, নাই-ই বটে···সত্যই তো বড়ই দুঃখের বিষয়!···আমি ভেবেছিলাম তিনি যে আমার কারাগার হতে পলায়ন করেছেন, সে তোমার বিশেষ আনন্দেরই কারণ হয়েছে···কিন্তু সে কি তবে আমার ভুল?···যাক্···সে কথাও যাক্।···তা···তিনি কি করতেন, যদি এখানে বন্দী হয়েই হাজির থাকতেন?

শচী ॥···উত্তর দিতেন।···সেই আর্য্য তোমার ঐ অনার্য্য প্রশ্নের উত্তর দিতেন।···কিন্তু যখন তিনি নাই, তাঁর সহধর্ম্মিণীই ওর উত্তর দেবে। আর্য্যের বিবাহ পতিপত্নীর এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। সে বিবাহে পতির ধর্ম্মে পত্নীর ধর্ম ডুবে যায়, পতির কুলাচারে পত্নীর কুলাচার লুপ্ত হয়, পতির অস্তিত্বের মাঝে পত্নীর অস্তিত্ব আত্মবিসর্জ্জন দেয়।···হই না কেন আমি অসুর-নন্দিনী, তবু··· যখন আমি আর্য্যপত্নী, তখন আমার ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম। আমার শিক্ষা, আর্য্যের শিক্ষা আমার দীক্ষা আর্য্যের দীক্ষা।···আর আজ তাই ঐ··· ঐ সুরা আমার অস্পৃশ্য···এই সোম আমার দেবতা! * কই সোমরস? দাও সোমরস? [সোমপান]

বৃত্রাসুর ॥ স্তম্ভিত হলাম, তোমার উত্তর শুনে আজ স্তম্ভিত হলাম। [ক্ষণকাল থামিয়া] তবে তোমায় সত্য সত্যই আমরা হারিয়েছি পৌলমী?— না, মূর্খ আমি···তাই আবার এ প্রশ্ন করছি।···যে উত্তর এর মধ্যেই পেয়েছি, তা অতি বিশদ অতি প্রাঞ্জল।···তোমার আর্য্য এখানে উপস্থিত থাকলে ওর চাইতে কখনই ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না। তিনি শুধু এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ···সে—পলায়নে, হাঃ হাঃ হাঃ!

শচী ॥ পলায়নে?—[সগর্ব্বে] শুষ্ণ দৈত্যকে বধ করেছে কে? নমুচিকে বধ করেছে কে? শম্বরের নবনবতি দুর্গ ধ্বংস করেছে কে?

বৃত্রাসুর ॥ ইন্দ্র।···হাঁ সেই···ইন্দ্র....যিনি কৃষ্ণাসুরকে বধ করে, যাতে

---

* এ সম্বন্ধে ১ম মণ্ডল ১০১ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

তার আর পুত্র না হয়, এই জন্য তার গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকেও হত্যা করে-ছিলেন। * বীর বটে!—

শচী ॥ শতবার [সহস্রবার!....অত্যাচারী যে....মদগর্ব্বিত যে.. .তিনি তাকে সবংশে নিধন করেছেন।....কিন্তু তিনি নিজের পিতৃতুল্য
বৃদ্ধ রাজাকে তার কন্যার লোভে হত্যা করেন নি....সেই কাপুরুষোচিত হত্যার গর্ব্ব.. সেই লালসাপ্রণোদিত হত্যার গৌরব শুধু তোমার আর কারো নয়! শুধু তোমার!

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ, আমার।...চিরকাল এই গৌরব আমার অক্ষয় হয়ে থাক্। যুগে যুগে লোকে জানুক পৌলমী নামে অসুরের ঘরে ছিল এক নীলমাণিক। ....সেই নীলমাণিকে দেবতারও চোখ ঝলসে যেত। সেই নীলমাণিক ছিল অসুরের কুলপ্রদীপ।....পুলোমন নামে একজন রাজা অসুরের ঘর আঁধার করে অসুরের সেই মাণিক দেবতার মুকুটে বসিয়ে দিতে গিয়েছিল অসুরের শাণিত ছুরিকা ক্ষেপে উঠ্ল—পুলোমন শির দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ল।—সেই পুলোমন পৌলমীর পিতা। আর কুলকলঙ্ক সেই পুলোমনের হত্যাকারী অসুর....আমি।...লজ্জা কার? তোমার পিতার না আমার?....আর লালসা? লালসা? লালসাই বটে!....লালসাই যদি হ'ত [বলিতে বলিতে বৃত্রাসুর বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন] তাহলে দধীচির সাধ্য ছিল না তোমায় আমার গ্রাস হতে রক্ষা করে, দধীচির সাধ্য ছিল না ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেয়, ইন্দ্রের সাধ্য ছিল না তোমায় রক্ষা করে, তোমার সাধ্য ছিল না আজো সীমন্তে তুমি সিন্দুর পর, দেবতার—ঋষির....সাধ্য ছিল না...আমায় বাধা দেয় আজ যদি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করি!....এতদিন কে তোমায় রক্ষা করেছে? কে তোমার স্বামীকে রক্ষা করেছে?....[গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল....] সে আমার.. সে আমার প্রেম—তোমার প্রতি আমার অক্ষয় অনন্ত প্রেম! আমি তোমায় চেয়েছিলাম....চিরদিন চেয়েছি....আজো চাই....

শচী ॥ আজো চাও?

বৃত্রাসুর ॥ আজো চাই, চিরকাল চাইব, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে চেয়েছি, মরণের শেষ মুহূর্ত্তেও চাইব....কেন চাইব না?....কেন তুমি অসুরের ঘরে এসে-ছিলে? আমার শৌর্য্য আছে, শক্তি আছে, প্রতিভা আছে, আর সে ছিল প্রথম যৌবন,... তাই তোমায় জীবনের সাথীরূপে পত্নীরূপে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি, ... বান্ধবীরূপে চেয়েছিলাম, শত্রুতা পেয়েছি, কেন...কেন তুমি অসুরের ঘরে এসেছিলে... যদি এসেছিলে কেন তুমি আমার স্ত্রী হও নি, বান্ধবী হও নি.... ভালোবাস নি। কোন ভাবেই যখন আমায় ধরা দিলিনে, তখন তুই আমার মা হয়ে জন্মালি না কেন পাষাণী? তোর স্নেহ পেতাম তোর শাসন পেতাম তোর আদর পেতাম,—জীবন ধন্য হোত, সার্থক হোত!

ম-২০৯

শচী ॥ আজ এই ক্রন্দন ···এই প্রলাপবচন নিরর্থক····আজ যদি কোন কাম্য থাকে সে সর্ব্বলোকের মঙ্গল,····দেবতার অসুরের উভয়ের। আর সে মঙ্গল নির্ভর কর্ছে তোমার ওপর। তুমি দেব ভূমি দেবতার হাতে ফিরিয়ে দাও····ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার নিজের দেশে যাও—

বৃত্রাসুর ॥ চাই না মঙ্গল পৌলমী! আমি কোন মঙ্গল চাই না!····এই যদি তোমার কথা হয়, সে কথা থাক্। তুমি সানন্দে সোমপান কর, আমি সানন্দে মহুয়া পান করি!

শচী ॥ আজ তবে তোমার মৃত্যু····বৃত্রাসুর! অসুর সম্রাট! আজ তবে তোমার মৃত্যু····! তোমার সেই দুর্নিবার নিয়তি আমার চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠ্ছে! [যেন স্বপ্ন দেখিয়া] সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাস্য]

শচী ॥ [বৃত্রের পরিণাম ভাবিয়া তখনি তাহার সম্মুখে নতজানু হইলেন] দাও! দাও! দেবভূমি দেবতাকে ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও!

বৃত্রাসুর ॥ সে হবে আমার পরাজয়।··· বৃত্রাসুর চায় জয়, জয়ের পর জয়! চিরকাল জয়!····আর মৃত্যু ?··· হাঃ হাঃ হাঃ ঐ দেখ—[ছুটিয়া গিয়া পর্দ্দা সরাইলেন]····নরকঙ্কাল দেখা গেল]····মৃত্যুবাণ হরণ করেছি। মৃত্যুবাণ হরণ করেছি!.. করি নি?

শচী ॥ তবে তুমিই সেদিন চুরি করে এনেছ সেই নরকঙ্কাল?

বৃত্রাসুর ॥ চুরি নয়, ওর নাম আত্মরক্ষা! হাঃ হাঃ হাঃ—

শচী ॥ বৃত্রাসুর! বৃত্রাসুর! সত্যই কি এ দধীচি ঋষির কঙ্কাল?

বৃত্রাসুর ॥ [চাপা আনন্দে] হাঁ—

শচী ॥ তবে ওতে নরকপাল কই?

বৃত্রাসুর ॥—মস্তক? মুণ্ড?

শচী ॥ হাঁ—

বৃত্রাসুর ॥ তাও আছে। তবে প্রচ্ছন্ন!

শচী ॥ কোথায়? কোথায়? দাও! আমায় দাও! আমি পূজা কর্ব্ব। ঐ ঋষি আমার গুরু আমার অভিভাবক····আমার পিতা!··জীবনের শিক্ষা ও'র হাতে, দীক্ষা ও'র হাতে··· ও'র কাছেই মানুষ হয়েছি, অসুরের কন্যা হলেও নিজের কন্যার মতো আমায় লালন করেছেন পালন করেছেন ভালোবেসেছেন!··· দাও! দাও! সেটি আমায় দাও!

বৃত্রাসুর ॥ দেব·· কিন্তু····তার জন্য তুমি অত অস্থির হচ্ছ কেন পৌলমী?

শচী ॥ আমি দেখব! আমি দেখব! যখন তিনি বেঁচেছিলেন, তাঁর সেই শান্ত সৌম্য মুখখানি দেখে আশ মিটত না।····দেবতার জীবন রক্ষার্থে

যখন প্রাণবলি দিলেন, তখনো তাঁর মুখে সেই যে ত্যাগের মহিমময় জ্যোতি দেখেছিলাম, তা অপূর্ব্ব !....ঐ নরকঙ্কাল তাঁর সেই পুণ্যমহিমার শেষ স্মৃতি ! ....আমি দেখব ! আমি পূজো কর্ব্ব !

বৃত্রাসুর ॥ [দেবদাসীকে ইঙ্গিত....দেবদাসী সেই অদ্ভুত সোমপাত্রে সোমরস ঢালিয়া পৌলমীর সম্মুখে ধরিল] সোমরস পান কর তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হয়েছ মনে হচ্ছে....সোমরস পান করে সুস্থির হও তারপর দেখ—

শচী ॥ [দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই অদ্ভুত সোমপাত্রে সোমপান করিয়া] ... দেখাও !

বৃত্রাসুর ॥ [কঙ্কাল দেখাইয়া] ঐ তার কঙ্কাল—ঐ যে সেই পাঁজরার হাড় ! সবকটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে !....ঐ যে—তাই তো বাম হস্ত কই ? [চমকিয়া উঠিলেন !]

শচী ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—] ও-হো-হো !

বৃত্রাসুর ॥ ওকি ? আর্ত্তনাদ কচ্ছ কেন পৌলমী ?

শচী ॥ বামহস্ত কোথায় আমি জানি !...কিন্তু মস্তক কই ?

বৃত্রাসুর ॥ জানো ? তুমি জনো ? কোথায় ? তাই তো....দেখছি না তো ! কোথায় ? কোথায় ? বামহস্ত কোথায় ?

শচী ॥ বামহস্ত কোথায় আমি জানি—কিন্তু মস্তক কই ?

বৃত্রাসুর ॥ [সেই অদ্ভুত সোমপাত্রটির রৌপ্যাবরণ উন্মোচন করিয়া] এই যে !

শচী ॥ দস্যু ! রাক্ষস !....আমার পরম পূজ্য পিতৃপ্রতিম ঋষির মস্তকের ঐ অবমাননা ?

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ—! শুধু তাই নয়....অসুর-কন্যা যখন সোমরস পান করে, তখন সে পিতার মুণ্ডু-পাত্রেই পান করে ইন্দ্রাণী !—হাঃ হাঃ হাঃ....

শচী ॥ ও—হো—হো—!

সিংহাসনে লুটাইয়া পড়িলেন।

বৃত্রাসুর ॥ পিপ্রু !—বামহস্ত অনুসন্ধান কর—দেখ—দেখ—বাম হস্ত কোথায় ?

শচী ॥ আমি জানি....আমি জানি !

বৃত্রাসুর ॥ বল—বল—

আকাশে মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল।

শচী ॥ আমি বলব না—

বৃত্রাসুর ॥ তোমাকে বলতেই হবে—

দৃঢ় মুষ্টিতে শচীর হাত ধরিলেন।

শচী ॥ আমি ! ওগো ইন্দ্রদেব। কোথায় তুমি। দেখে যাও ত্যাগী-শ্রেষ্ঠ ঋষিবরের অবমাননা....দেখে যাও ইন্দ্রাণীর অবমাননা—

বৃত্রাসুর ॥ [পাগলের মতো] বামহস্ত কই ? বামহস্ত কোথায় ?

দরজায় ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব। হাতে বজ্র।

বৃত্রাসুর ॥ [শচীকে] বল....বল নারী দধীচি ঋষির বামহস্তের অস্থি কই ?

ইন্দ্র ॥ আমার হাতে।....চাও ?

বৃত্রাসুর ॥ [উন্মাদের মতো] চাই—চাই—[শিহরিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে] না—না—না !

ইন্দ্রদেব ॥ না বললে শোনে না—এর নাম বজ্র ! অত্যাচারী "না" বললে "বজ্র" শোনে না—ত্যাগী শ্রেষ্ঠের ত্যাগসাধনায় লব্ধ এই অস্ত্র তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে জগতে মেঘগর্জ্জনে ঘোষণা করুক অত্যাচারী ! সাবধান !—

বজ্র নিক্ষেপ। নিক্ষেপ মাত্র বৃত্রাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ হইল। আকাশের মেঘও বিদীর্ণ হইয়া বিদ্যুৎঝলক প্রকাশ পাইল।

—য ব নি কা—

সতী

পৌরাণিক নাটক

উৎসর্গ পত্র

শ্রীমতী চিত্রলেখা রায় ।

কল্যাণীয়েষু ।

উদ্বোধন রজনী

"নাট্যনিকেতন"—ক্যালকাটা থিয়েটার্স

২৮শে এপ্রিল ১৯৩৭, ১৫ই বৈশাখ ১৩৪৪, বুধবার রাত্রি ৭॥০ টা

লেখকের কথা

ক্যালকাটা থিয়েটার্স কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩৭ (দোল-যাত্রা) হইতে ১০ই এপ্রিল ১৯৩৭ এই ষোল দিনে "সতী" রচনা করি। গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৭ বুধবার রাত্রি ৭॥০ টায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স নাট্যনিকেতনে উহার উদ্বোধন করেন।

রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ প্রণীত "সতী" আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই নাটক রচনায় ডাঃ সেনের ঐ আখ্যায়িকা হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য ডাঃ সেনের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। দশমহাবিদ্যার আখ্যান তিনি তাঁহার পুস্তকে যে জন্য বাদ দিয়াছেন, ভূমিকায় তিনি তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি।

বন্ধুবর কাজী নজরুল ইসলাম সতীর জন্য গীত রচনা ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায় দৃশ্য পরিকল্পনা করিয়াছেন, কলালক্ষ্মীকল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা নৃত্যপরিকল্পনা করিয়াছেন, নাট্যচার্য্য শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র নাটকখানির প্রযোজনা করিয়াছেন, এবং ক্যালকাটা থিয়েটার্স স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যশোদারঞ্জন ঘোষ এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ নাটকখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। নটতিলক বন্ধু ভূমেন রায় ও নটকুশল শ্রীযুক্ত মণিঘোষ আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
বরদা ভবন, বালুর ঘাট
(দিনাজপুর)

মন্মথ রায়

সতী নাটকের সংগঠনকারিগণ

পরিচালক	....	ক্যালকাটা থিয়েটার্স
প্রযোজক	....	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
সুরশিল্পী	....	কাজি নজরুল ইসলাম
সঙ্গীত শিক্ষক	....	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
দৃশ্য পরিকল্পনা	....	শ্রীচারু রায়
নৃত্য পরিকল্পনা	...	শ্রীমতী নীহারবালা
হারমোনিয়ম বাদক	....	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
পিয়ানো বাদক	....	শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
বংশীবাদক	....	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ
বেহালাবাদক	....	শ্রীসন্তোষ দে ও সেখ মমতাজ উদ্দিন
চেলো বাদক	....	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী
স্মারক	....	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	....	শ্রীমণিগোপাল মুখোপাধ্যায়
আলোকসম্পাতকারী	...	শ্রীসুধীর সুর ও শ্রীশৈলেন দত্ত
এম্প্লিফায়ার মিউজিক	....	ডি, এন, মল্লিক
আহার্য্যসংগ্রাহক	....	শ্রীসত্যচরণ মুখার্জী ও শ্যামসুন্দর কর
বেশকারিগণ	....	শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীমন্মথ ধর ও শ্রীননীলাল গাঙ্গুলী

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পী-পরিচয়

—ঃ পুরুষ / স্ত্রী চরিত্র ঃ—

ব্রহ্মা	....	শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণু	....	শ্রীগিরিজা মিত্র
মহাদেব	....	শ্রীভূমেন রায়
অগ্নি	....	শ্রীদেবেন ভৌমিক
নন্দী	....	শ্রীমণি ঘোষ
ভৃঙ্গী	....	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষ	....	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
ভৃগু	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
নারদ	....	শ্রীসন্তোষ দাস
পিঙ্গলাক্ষ	....	শ্রীপবিত্র ভট্টাচার্য্য
তাল	....	শ্রীঅমূল্য হালদার
বেতাল	..	শ্রীখগেন দাস
প্রমথ	....	শ্রীবিল্বমঙ্গল দাস ও সুবল ঘোষ
বীরভদ্র	...	শ্রীপূর্ণ দাস
কথক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
দেবগণ	...	শ্রীসুবল ঘোষ, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীসত্য সরকার, শ্রীআদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীব্রজেন দত্ত
প্রসূতি	...	শ্রীমতী মনোরমা
সতী	....	শ্রীমতী রাণীবালা
জয়া	....	শ্রীমতী নিরুপমা
বিজয়া	....	শ্রীমতী দুর্গারাণী
স্বাহা	....	শ্রীমতী সুবাসিনী (আহ্লাদী)
অশ্লেষা	....	শ্রীমতী স্নেহলতা
মঘা	....	শ্রীমতী বীণা (মীনা)
রোহিণী	....	শ্রীমতী সরসী
জবা	....	শ্রীমতী রাণী
জয়ন্তী	....	শ্রীমতী বীণা দাস
পদ্মা	....	শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া
ছোট মেয়ে	....	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও আরো কয়েক জন

সতী

প্রথম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

সতীর খেলাঘর। শিবের পটমূর্তি অঙ্কনরতা সতী। মূর্ত্তি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সতীর সখীগণ বিবাহের মাঙ্গলিক গান গায়িতে গায়িতে আসিতেছিল দেখিয়া সতী পটমূর্ত্তি আবৃত করিয়া রাখিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। নানাবিধ মাঙ্গলিক লইয়া সখীরা সতীর মঙ্গলাচরণ করিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল।

—গান—

দেব আশীর্ব্বাদ—লহ সতী পুণ্যবতী।
লহ ত্রিলোকের আশিস্ বাণী ;—লহ লহ আয়ুষ্মতী ॥
ধর পূজা আরতির শুভ বরণ ডালা,
পর স্বর্গের মন্দার পারিজাত মালা,
রবি দিল কুণ্ডল, সাগর মুক্তা দল
চাঁদ দিল চন্দন স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ॥
মঙ্গল ঘট দিল দেবী মেদিনী—
পুণ্য সলিল দিল মন্দাকিনী ;
অগ্নি দিলেন দীপ—শুকতারা দিল টীপ
দিল ধান্য দূর্ব্বা মুনি ঋষি তপতী ॥
বিষ্ণু দিলেন তাঁর লীলা-কমল
ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু-জল,—
সিঁথির সিন্দুর ভূষা দিলেন অরুণা উষা
(চির) এয়োতির নোয়া দিল অরুন্ধতী ॥

সতী পুনরায় ছবি আঁকিতে লাগিলেন। সতীর সখী বিজয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়া ॥ ও কার ছবি আঁকছ সতী ?

সতী নীরবে ছবিই আঁকিতে লাগিলেন।

বিজয়া ॥ ও মা ! এ যে দেখছি সাপুড়ে ! শেষে কি সাপুড়ের বাঁশীই তোমার মন হরণ করল সখি !

সতী ॥ বাঁশী নয়, বিষাণ। দেখছ না ?

বিজয়া ॥ সাপুড়ের পরণে কি একখানা কাপড়ও জুটল না ?

সতী ॥ না। দেখছ না পরণে বাঘছাল ? লোকে বলে দিগম্বর। যা কিছু শ্রেষ্ঠ সকলকে বিতরণ করে—যা কেউ নেয় না—যা সকলের অস্পৃশ্য তাই নিয়েই ওঁর আনন্দ। লোকে ভাবে এ আবার কি ! বলে পাগলা ভোলা —বলে ক্ষ্যাপা—আমি সইতে পারি না—আমি সইতে পারি না। কিন্তু যখন ভেবে দেখি—তখন এত ভালো লাগে !

বিজয়া ॥ ভালো ! স্বয়ম্বরের দিন ! শেষটায় ওরই গলে মালা দেবে নাকি তুমি ?

সতী ॥ সে দেখতেই পাবে !

বিজয়া ॥ ও মা ! বলে কিগো !

—গান—

বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয় পটে,
চাঁদের পাশে আগুন জ্বলে যাহার ললাট তটে ॥
সে সোনার অঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে
বেড়িয়ে বেড়ায় সাপ নাচিয়ে ;
এই ভবঘুরে বেদে নিয়ে তোর কলঙ্ক না রটে ॥
ঘটে ইহার বুদ্ধি হ'তে সিদ্ধি অনেক বেশী,
বিষ খেয়ে এঁর প্রশান্ত মুখ লীলা এ কোন্ দেশী ;—
আপনারে যে করে হেলা
তার সনে তোর একি খেলা,
তুই দেখলি কোথায় আত্মভোলা
এই সে তরুণ নটে ॥

বিজয়া গাহিতে লাগিল। সতী মৃদুহাস্যে ছবি আঁকিয়া চলিলেন। গান শেষ হইলে

বিজয়া ॥ না, জয়া না থাকলে তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। তোমার ধ্যানই আমি ভাঙতে পারলাম না। কোথায় গেল জয়া ?

সতী ॥ তাকে আমি ফুল আন্‌তে পাঠিয়েছি বিজয়া !

বিজয়া ॥ আজ আবার ফুল দিয়ে কি হবে ? তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে দেবতারা যে নন্দন কানন উজাড় করে ফুল পাঠিয়েছেন ! দেখলেনা পারিজাতের ছড়াছড়ি ! মণিমাণিক্য উপহারই বা এসেছে কত ! ভাণ্ডার যে ভরে গেছে ! আর তুমি কিনা বসে সাপুড়ের ছবি আঁকছ।

সতী ॥ যে ফুল নন্দন কাননে নেই আমি সেই ফুল আনতে পাঠিয়েছি বিজয়া !

বিজয়া ॥ যে ফুল নন্দন কাননে নেই সে আবার ফুল ! ······ ওমা ! ওরা যে দেখছি এখানেও আসছে !

সতী ॥ কারা ?

বিজয়া ॥ জান না ! তোমার স্বয়ম্বরের আমোদ। আমাদের ছেলেমেয়েরা সমুদ্র-মন্থনের পালা বেঁধেছে··· ! ওমা, সবাই আসছে।

সতী চিত্রপটখানি ঢাকিয়া রাখিলেন। সমুদ্র-মন্থনের সং আসিল। সঙ্গে আসিল পুরবাসী পুরবাসিনীগণ ক্রমে নারদ, ভৃগু এবং প্রজাপতি দক্ষও আসিলেন। সকলেই মহানন্দে সং উপভোগ করিতে লাগিলেন।

একজন কথক দোয়ারগণ সহ সঙের ছড়া গায়িতে লাগিল। একটি মেয়ে মন্দার পর্ব্বত সাজিয়াছে—তাহার একদিকে এক মেয়ে দেবতা সাজিয়াছে—আর একদিকে আর এক মেয়ে অসুর সাজিয়াছে, ইহারা দুইজনে মন্দারের দুই হাত ধরিয়া সুশৃঙ্খলভাবে টানাটানি করিতেছে। নীচে এক মেয়ে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু সাজিয়া বসিয়া হামা দিয়া রহিয়াছে। আর এক মেয়ে মহাদেব সাজিয়াছে। আর এক মেয়ে সাজিয়াছে মোহিনী। ছড়াগানের মাঝে মাঝে ইহারা পুতুলনাচের মতো নাচিতেছে—

কথক ॥ মা সতী ! তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে আমরা সমুদ্রমন্থনের পালা বেঁধেছি। ইনি হচ্ছেন মন্দার পর্ব্বত, ইনি দেবতা—ইনি অসুর—ইনি কূর্ম্ম-রূপী শ্রীবিষ্ণু। ইনি মহাদেব—ইনি মোহিনী।

> একদা সব সুরাসুরের খেয়াল হল দাদা।
> সমুদ্রেরে ঘেঁটে ঘুঁটে করতে হবে দধিকাদা ॥
> দেখেছ তো গয়লানিরা যে ভাবে দই মথে।
> (তেমনি) সাগরকে সব ঘুঁটে ছিলেন মন্দার পর্ব্বতে ॥
> (অর্থাৎ) মন্দার গিরি হয়েছিল দই ঘুঁটবার কাঠি।
> আর কূর্ম্ম হলেন সমুদ্ররূপ দই রাখবার বাটি ॥

কাঠি এল বাটি এল দড়া কোথায় পান।
(সবে) বাসুকীর শ্রী লেজুড় ধরে মারেন হেঁটকা টান ॥
বাসুকী কয় ল্যাজ ছাড়ো বাপ গ্যাজ উঠল মুখে।
বাসুকীকে করল দড়া দেবতারা সব রুখে ॥
ল্যাজ ধরল দেবতা, অসুর দানব ধরে মুড়ো।
সাগর বলে আস্তে বাবা একি প্রলয় হুড়ো ॥
যা আছে মোর বের করছি—ঘাঁটিসনে আর পেট।
উচ্চৈঃশ্রবা চন্দ্র লক্ষ্মী সব দিচ্ছি ভেট ॥
(ক্রমে) অমৃত যেই উঠল অমনি লাগলো গুঁতোগুঁতি।
দৈত্যেরা সব কোপ্নি আঁটে দেবতা কসেন ধুতি ॥
মাঝে থেকে শ্রীবিষ্ণু মোহিনী রূপ ধরে।
ছোঁ মেরে সেই সুধার ভাণ্ড নিয়ে পড়লেন সরে ॥
অমৃত খান দেবতারা সব অসুর মাটি চাটে।
(যেমন) দোহন শেষে দুগ্ধ খোঁজে বাছুর শুকনো বাটে ॥
(ক্রমে) ঘটর ঘটর ঘোঁটার ঠেলায় উঠলো হলাহল।
ত্রাহি ত্রাহি বলে ত্রিলোক করে কোলাহল ॥
বিষের জ্বালায় সৃষ্টি বুঝি পটল তোলে ওই।
সিদ্ধিখোর শ্রীপিশাচপতি কয় ডেকে মাভৈঃ ॥
ছুটে এসে পাগলা ভাঙোড় এক সমুদ্দুর বিষ।
ঢক ঢকিয়ে ফেললে গিলে গা করে নিস্পিস ॥
বলদে যে বেড়ায় চড়ে ছাই পাঁশ গায়ে মাখে।
তাকে ছাড়া চতুর দেবতা বিষ দেবে বল কাকে ॥
ফুলের মধ্যে ধুতরো নিলেন মশান যাহার ঘর।
(পোড়া) কপালে তার আগুন জ্বলে—জয় ন্যাংটেশ্বর ॥

কথকদলের প্রস্থান

দক্ষ ॥ ভাঙোড়ের কি বুদ্ধি! সবাই নিল অমৃত, উনি নিলেন বিষ! খেয়েই কি উল্লাস! (হাস্য)

ভৃগু ॥ পাগলের আনন্দ! (প্রচুর হাস্য)

দক্ষ ॥ কি মা সতী তোমার কেমন লাগল?

নারদ ॥ বিষবৎ! সত্য বলেছি কিনা বলতো মা?

দক্ষ ॥ বিষবৎ! কেন?

সতী ॥ না পিতা, আমার ভালোই লেগেছে। আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

নারদ ॥ তবে তোমার মুখে হাসি নেই কেন মা ?

ভৃগু ॥ ভাঙোড়টার কীর্ত্তি দেখে আমিতো হেসেই অস্থির !

সতী ॥ শিবের ব্যবহারে হাসবার কি আছে দেব ? অমৃত যখন বণ্টন হল, শিবের কথা তখন কারো স্মরণ হল না। যখন উঠল বিষ, ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। সৃষ্টি ধ্বংস হয়! দেবতা ও অসুরের মিলিত কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে ধ্বনিত হল "কোথায় শিব! রক্ষা কর! রক্ষা কর!" মহানন্দে ছুটে এলেন মহাদেব ...... মহানন্দে পান করলেন সেই বিষ!........ভাঙ্ খান....সিদ্ধি খান, সবই সত্য.. কিন্তু সব চেয়ে বড় সত্য এ জগতের সকল বিষ, সকল অমঙ্গল তিনিই করেছেন বরণ—তিনি করেছেন হরণ। তাই নয় কি দেব ?

দক্ষ ॥ পাগলি মেয়ে! কে তা অস্বীকার করছে! হ্যাঁ সে বিষ পান করেছে...... সে বিষ দেবতার, গন্ধর্ব্বের, যক্ষ, রক্ষ কিন্নরের অপেয়—! অপেয় পান কে করে !

ভৃগু ॥ নিতান্ত যে বর্ব্বর।

দক্ষ ॥ শিব সেই অনার্য্য বর্ব্বর। তার নাম উচ্চারণ কর্ত্তেও আমার ঘৃণা বোধ হয়! অথচ জানিনা কেন পিতা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে সবাই....তাকেই বলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

নারদ ॥ যাগ বল, যজ্ঞ বল তিনি উপস্থিত না থাকলে চলে না। কেন যে চলেনা....একবার দেখলে হয়।

ভৃগু ॥ ও না দেখাই ভালো ; ঐ ভূত-প্রেতগুলো........বুঝলে নারদ—

দক্ষ ॥ না না, কি আবশ্যক! ওই যজ্ঞভাগই ওর সম্বল। তা থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না।

নারদ ॥ তা তো বটেই।

ভৃগু ॥ তুমি নিতান্ত সদাশয় তাই !

দক্ষ ॥ তার উপর বিরক্তি ও ঘৃণার কারণ যদি কারো থাকে সে শুধু আমার! থাক সে কথা আপাততঃ।—মা সতী! আজ তোমার স্বয়ম্বর। দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর তোমার পাণিগ্রহণ কামনায় স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত হবেন। আজ তোমার এক মহা পরীক্ষার দিন। এই পরীক্ষায় তুমি যদি সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পারো, মনোমত পতিনির্ব্বাচন দ্বারা পিতৃ-গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে পারো—তুমি আমার—নয়নের মণি—তবুও—তবুও তোমার অদর্শন জনিত বিরহ বেদনায় আমি কাতর হব না হাসি মুখেই তোমার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করব মা !

ভৃগু ॥ রূপে গুণে ত্রিভুবনে মার আমার তুলনা নেই। মার সম্মুখে ইন্দ্রাণীও যে ম্লান হয়ে যায় প্রজাপতি !

দক্ষ ॥ তাই তো ভাবছি মার উপযুক্ত বর কে ! আশীর্ব্বাদ করি মা মনোমত পতি লাভ কর। তোমরাও মাকে সেই আশীর্ব্বাদ কর।

সতী তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। বিজয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

দক্ষ ॥ বিজয়া সতীকে স্বয়ম্বর-সাজে সজ্জিত কর। এস নারদ।

দক্ষসহ ভৃগু ও নারদের প্রস্থান

বিজয়া ॥ চল সখি প্রসাধনে চল—

সতী ॥- জয়া ফুল আনতে গেছে বিজয়া ! সে ফুল না পেলে ত আমার প্রসাধন হবে না সখি !

বিজয়া ॥ জয়ারই আজ জয় দেখছি সখি !

বিজয়ার প্রস্থান

সতী এই অবসরে শিবের সমাপ্তপ্রায় রেখামূর্ত্তি চক্ষুদানে
সম্পূর্ণ করিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাস হইয়া
শিব স্তব করিলেন।

শিবস্তোত্র

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা
ন পুত্র ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা
ন জায়া না বিত্তং ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্ব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি শাস্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসজালং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
ন জানামি তীর্থং ন জানামি পুণ্যং
ন জানামি ভক্তিং লয়ং বা কিমন্যৎ
ন জানামি মুক্তিং ন জানামি ভুক্তিং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
প্রজেশং মহেশং রমেশং সুরেশং
গণেশং দীনেশং নিশেশং পরং বা।
ন জানামি চান্যং শরণ্যং ভজামি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

সতী শিবমূর্ত্তি প্রণাম করিয়া উঠিলেন—এমন সময় প্রসূতি আসিলেন।

প্রসূতি ॥ সতী, মা, তুমি—একি—একি মা!

সতী ॥ মা!

প্রসূতি ॥ (গম্ভীর হইয়া) এ মূর্ত্তি কে আঁকল সতী?

সতী ॥ আমি!

প্রসূতি ॥ শিবমূর্ত্তি!

সতী ॥ হ্যাঁ!

প্রসূতি ॥ কিন্তু প্রভু যে ওঁকে শত্রু জ্ঞান করেন।

সতী ॥ কেন মা!

প্রসূতি ॥ তুমি তা বুঝবে না সতী!

সতী ॥ আমি বুঝতে চাই মা!

প্রসূতি ॥ ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু যেমন পালন কর্ত্তা; শিব তেমনি সংহারের দেবতা। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র তোমার পিতা; অষ্টদিকপাল প্রজাপতি-রূপে প্রজা বৃদ্ধি এবং প্রজা রক্ষাই তার ধর্ম্ম। কিন্তু একমাত্র এই সংহারকর্ত্তা শিবের জন্যই আশানুরূপ প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে না তাই তোমার পিতার ধারণা শিব তাঁর শত্রু।

সতী ॥ (কোমলভাবে) পিতার এ ভ্রান্ত ধারণা মা। মৃত্যুর অভাবে প্রজা এত বৃদ্ধি পেত যে ত্রিভুবনে তাদের স্থানই হত না। উচ্ছৃঙ্খলতায়, জীর্ণ-তায়, জরায় সৃষ্টি আচ্ছন্ন হত—বিশ্বের কল্যাণ তাতে হ'ত না মা।

প্রসূতি ॥ শুধু যুক্তি আর তর্কে সংসার চলে না মা! যুক্তি তর্ক দিয়ে যদি দেখ সব সন্তান সমান। অথচ আমার আর আর মেয়েও দেখেছি তোমায়ও দেখছি। তুমি তোমার পিতার যে স্নেহ পেয়েছ তারা সবাই মিলেও তা পায়নি—আমি মা—আমিই বলছি—

সতী ॥ আমি তা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করি মা।

প্রসূতি ॥ তা যদি কর মা, তোমার পিতা যাঁকে মিত্র জ্ঞান করেন না তাঁর মূর্ত্তি তোমার পিতার নয়নগোচর না হওয়াই শ্রেয়ঃ!

সতী ॥ মা!

প্রসূতি ॥ না মা, বাধা দিয়ো না—

শিবমূর্ত্তি মুছিয়া ফেলিলেন।

[নারদসহ দক্ষের প্রবেশ]

দক্ষ ॥ একি সতী! স্বয়ম্বর উৎসবের প্রারম্ভে তোমার চোখে অশ্রু কেন?

সতী ॥ না বাবা।

অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

নারদ ॥ ও অশ্রুকে তুমি ভুল বুঝোনা প্রজাপতি। মনোমত পতিলাভ করবার আশায় মা আমার আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করছে!

দক্ষ ॥ আশীর্ব্বাদের শুভলগ্ন সমাগত—মাকে আদ্যাশক্তি প্রণাম করিয়ে আনো রাণী।

প্রসূতি। চলো মা।

সতীসহ প্রস্থান

দক্ষ ॥ মাকে আজ যতই দেখ্‌ছি ততই আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। আমার অপরাপর কন্যার বিবাহ দিয়েছি. কোন ব্যথা অনুভব করিনি····কিন্তু আজ করছি!

নারদ ॥ রূপে গুণে সতী তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কন্যা, তদুপরি সর্ব্ব কনিষ্ঠা। তোমার এ ব্যথা অস্বাভাবিক নয় প্রজাপতি।

দক্ষ ॥ এত শীঘ্র ওর বিবাহ দেওয়া আমার অভিপ্রেত ছিল না নারদ! কিন্তু ওর গর্ভধারিণীর কাছে শুনলাম, এই বয়সেই ওর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হচ্ছে, তাই আমি ওকে পাত্রস্থ করবার সংকল্প করেছি। এক অজ্ঞাত আশংকায় আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে নারদ!

নারদ ॥ ভোগে অনাশক্তি অনেকেরই দেখা যায় কিন্তু পারিজাত তুচ্ছ করে ধুতরো ফুল··· ····

দক্ষ ॥ ধুতরো ফুল!

নারদ ॥ হ্যাঁ ধুতরো ফুলেই মার সমধিক প্রীতি!

দক্ষ ॥ তুমি কি বলতে চাও নারদ?

নারদ ॥ আমি বলতে চাই—না বলতে অবশ্য আমি কিছুই চাইনে—তবে কি না—

দক্ষ ॥ আমি জানতে চাই নারদ তোমার কি বলবার আছে—

নারদ ॥ সতী কি তার স্বয়ম্বরের মাল্য ধুত্‌রো ফুলেই গেঁথেছে। যে বিষাক্ত মাল্য এক মাত্র নীলকণ্ঠই ধারণ কর্ত্তে সমর্থ?

দক্ষ ॥ (সরোষে) নারদ!

নারদ চমকিত হইলেন মাত্র, উত্তর দিলেন না।

দক্ষ ॥ (কিন্তু তখনই আত্মস্থ হইলেন; ক্রমশঃ মৃদুহাস্যে) তোমার স্বভাবই যে প্রগল্‌ভ আমি তা বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু সতী তার বরমাল্য সেই ভাঙড়ের কণ্ঠে অর্পণ করবে এইরূপ হীন কল্পনা আমার ভ্রাতার মর্য্যাদা-সূচক নয়।

প্রসূতিসহ সতীর প্রবেশ

দক্ষ ॥ এই যে এসেছ মা। আমি তোমায় পুনরায় (নারদের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) হ্যাঁ, পুনরায়, আশীর্ব্বাদ করছি তুমি মনোমত পতি নির্ব্বাচন করে সুখী হও—সার্থক হও মা। দেবগণ তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ উপহার প্রেরণ করেছেন—দেখেছ নিশ্চয় ?

সতী ॥ হ্যাঁ পিতা।

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ

পিঙ্গলাক্ষ ॥ দেবাদিদেব মহাদেব আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেছেন।

নারদ ॥ প্রেরণ করেছেন! এত বিলম্বে! ভোলানাথ কি না!

দক্ষ ॥ শিবের আশীর্ব্বাদ! কি আশীর্ব্বাদ ?

শিবানুচর জনৈক প্রমথ শিবের আশীর্ব্বাদ
সহ প্রবেশ করিল

প্রমথ ॥ এক জোড়া শাঁখা।

দক্ষ ॥ শাঁখা! দক্ষ-কন্যা কখনও তুচ্ছ শাঁখা ব্যবহার করেন না—তাঁর দাসীরাও না।

সকলের উচ্চহাস্য। শিবের আশীর্ব্বাদ প্রত্যাখ্যাত হইল। পিঙ্গলাক্ষের
আদেশ সূচক ইঙ্গিতে প্রমথ প্রস্থান করিল। সতীর চোখে-
মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণা পরিস্ফুট হইল।

নারদ ॥ কি হয়েছে মা ? তোমাকে বড়ই অবসন্ন বোধ হচ্ছে!

প্রসূতি ॥ সারাদিন উপবাসে মা আমার—কাতর হয়ে পড়েছে প্রভু!

দক্ষ ॥ আশীর্ব্বাদ-উৎসব এখন থাক। তুমি মা এখন বিশ্রাম কর।

প্রসূতি ॥ চল মা সতী, বিশ্রাম করবে চল।

সকলে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দক্ষ ॥ প্রস্থান কালে নারদের প্রতি) এক জোড়া শাঁখা উপহার পাঠিয়েছে বিশ্ববরেণ্যা দাক্ষায়ণীকে।—স্পর্দ্ধা! [প্রস্থান]

সকলে চলিয়া গিয়াছেন, নারদও যাইতেছিলেন এমন সময় অন্যদিক
হইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল জয়া। নিঃশব্দে দেবর্ষিকে
স্পর্শ করিল দেবর্ষি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন জয়া।

ম-২২৫

নারদ ॥ জয়া মা যে! কোথায় ছিলে তুমি মা!

জয়া ॥ সে কথা আর কেন ঠাকুর! উৎসব বুঝি শেষ হয়ে গেল? সতী কোথায় গেল? আমার মুণ্ডুপাত করেছে নিশ্চয়ই।

নারদ ॥ কেন! কি হল! তোমার হাতে একি ফুলের মালা? ভারী সুন্দর তো!

জয়া ॥ এই ফুল যদি সুন্দর হয়, তোমার ঢেঁকিও তবে সুন্দর। উঃ কেউ নাকি আবার এই ফুল চায়! সারা সকাল বনে জঙ্গলে যা ঘুরেছি কাঁটায় কাঁটায় আমার পা দুখানি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। বিজয়ার কি—সেজেগুজে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! আমারই যেন সব দায়!

নারদ ॥ তা বটেই তো। তা বটেই তো!

জয়া ॥ (চটিয়া গিয়া) তা বটেই তো?

নারদ ॥ তা নয়ই তো—তা নয়ই তো! তা হঠাৎ তুমি এ ফুলের জন্যে ক্ষেপে উঠলে কেন জয়া?

জয়া ॥ ক্ষেপে কি আর আমি উঠেছি! ক্ষেপেছে তোমাদেরই ক্ষ্যাপা মেয়ে। আজ ঘুম থেকে উঠেই ঐ এক কথা "জয়া—আজ আমার ধুতরো মালা চাই—জয়া আজ আমার ধুতরো ফুলের মালা চাই।" ধুতরো আবার ফুল নাকি! ওতো সদ্য বিষ! আমার হাত এখনো জ্বলছে। যাই দিয়ে আসি। বিলম্ব দেখে আমার শ্রাদ্ধ কচ্ছে!

নারদ ॥ কিন্তু এযে ভারী অলক্ষুণে ফুল; এ ফুল আজ না-ই দিলে।

জয়া ॥ তুমি তো বেশ! এ ফুল না-ই দিলে! সর না ঠাকুর—

নারদ ॥ তা দিতে হয় দিয়ো, কিন্তু প্রজাপতি দক্ষের সামনে দিওনা—কখনো না!

জয়া ॥ তবে আমি তাঁর সামনেই দেব।

নারদ ॥ তা দিতেই যদি হয়, সামনেই দেবে বৈ কি!

জয়া ॥ তবে আমি দেবই না!

ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নারদ ॥ এই শোন—শোন—

পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ধীরে ধীরে সতী সেখানে আসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া সেই পটমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সতী ॥ মহাদেব! মহাদেব! তোমার আশীর্ব্বাদ কি আমি পাবনা?

ধীরে ধীরে পশ্চাতে নারদ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নারদ ॥ মা ! সে শাঁখা কি তুমি পরবে মা ?

সতী ॥ দেবর্ষি—

অশ্রুসিক্ত আকুল দৃষ্টি ।

নারদ ॥ আমি বুঝি মা । (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) এই যে শাঁখারী ! প্রজাপতি দক্ষ তোমার উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু সকল উপহার রেখে ঐ শাঁখাই হোল মার কামনার ধন ! ও শাঁখা আর ফিরিয়ে নিতে হবে না ! তুমি পরিয়ে দাও—উপযুক্ত মূল্যই পাবে ।

শাঁখারীকে ডাকিতেই শিবের প্রবেশ । লুপ্ত পটরেখা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হইয়া শিবমূর্ত্তিরূপে প্রকট হইল । মুগ্ধা বিস্ময়াভিভূতা সতীর হাতে শিব শাঁখা পরাইয়া দিলেন । তদনন্তর শিব ও সতী মুখো-মুখি দাঁড়াইলেন ।

নারদ ॥ (মৃদু হাস্যে) শাঁখারী বেশে শিব ! আমি সাক্ষ্য রইলাম ।

সতী ॥ তুমি ! শাঁখারী ! শিব !

শিব ॥ তোমারি পাণিগ্রহণ কর্ত্তে সতী ! তাইত শাঁখা !

নারদ ॥ আমার সম্মুখেই শাঁখারীকে শাঁখার মূল্য দাও মা ! চক্ষু সার্থক হোক !

সতী একটি মালাই কামনা করিতেছিলেন এমন সময় ধুতরার মালা লইয়া জয়া ছুটিয়া আসিল ।

জয়া ॥ নাও সখি তোমার ধুতরোর মালা !

মালা লইয়া শিবের কণ্ঠে বরমাল্য দিলেন—স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল—শঙ্খধ্বনি হইল ।

নারদ ॥ মাল্যদানই মূল্য হল ! সন্তুষ্ট হয়েছ শাঁখারী ?

শিব ॥ আশাতিরিক্ত মূল্যই পেয়েছি নারদ !···দেবি ! শ্মশানবাসী শিব আজ গৃহবাসী হোল !

নারদ ॥ দেখ্‌ছ কি জয়া ! উলু দাও, শঙ্খ বাজাও ! সতীর স্বয়ম্বর যে হয়ে গেল !

স্বর্গ হইতে পুনরায় পুষ্পবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনি ।

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ।

পিঙ্গলাক্ষ ॥ স্বয়ম্বর সভা বসেছে। দেবর্ষি! প্রজাপতি আপনাকে স্মরণ করেছেন। (সতীকে) দেবি! প্রসূতি তোমার স্বয়ম্বর যাত্রার আয়োজন করে তোমার প্রতীক্ষা করছেন—তুমি আর বিলম্ব করো না মা। [প্রস্থান]

সতী ॥ দেবর্ষি! পিতাকে গিয়ে বলুন স্বয়ম্বর আমার হয়ে গেছে—

নারদ ॥ বরং ঢেঁকি স্কন্ধে আরোহণ করে ত্রিভুবনে আমি এ সুসংবাদ ঘোষণা করে আসছি—কিন্তু তোমার পিতার কাছে আর কাউকে পাঠাও মা।···· আমি বলি স্বয়ম্বর সভা বসেছে—বেশ্ তো! এ স্বয়ম্বরের সাক্ষী আছি শুধু আমি আর ঐ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রা জয়া, ত্রিভুবনকে সাক্ষী রেখেই স্বয়ম্বরটা হোক্ না কেন মা?

শিব ॥ ভারি ভীতু তুমি নারদ!

নারদ ॥ কিন্তু আমার মা ভীত নন। মার মনে হচ্ছে—হ্যাঁ আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি—মা কেবলি ভাবছেন যাকে পতিত্বে বরণ কর্ব—ত্রিভুবন সমক্ষেই করব। তাতে যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হন—রুষ্ট হন—হবেন।

সতী ॥ হ্যাঁ, আমি স্বয়ম্বর সভাতেই যাব দেবর্ষি! প্রভু, স্বয়ম্বর সভায় কেউ তোমায় আমন্ত্রণ না করে—আমি করছি। তুমি এসো—এসে ত্রিভুবন সমক্ষে আমার বরমাল্য গ্রহণ করে দাসীর পুজো নিয়ো—(প্রণাম)

[প্রস্থানোদ্যত]

শিব ॥ তথাস্তু দেবি!

নারদ ॥ দেখো যেন ভুলো না ভোলানাথ!

শিব ॥ (ফিরিয়া) ভুল আমার হয়—অনেক কিছুই ভুল হয়—তাই তোমরা বল ভোলানাথ। কিন্তু জীবনে এই একটি ভুল আমার কিছুতেই হবে না সতি! [প্রস্থান]

জয়া ॥ ঐ প্রজাপতি আসছেন!

[দক্ষের প্রবেশ]

দক্ষ ॥ স্বয়ম্বরের শুভলগ্ন উপস্থিত। এস মা—আশীর্ব্বাদ করি—

সতী ॥ হ্যাঁ বাবা, আশীর্ব্বাদ কর—আশীর্ব্বাদ কর যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়!

দক্ষ ॥ কায়মনোবাক্যে সেই আশীর্ব্বাদই করছি—আজ দ্বিতীয় কোন আশীর্ব্বাদ আমি জানিনা মা।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

দক্ষপুরীর পথ

দেবতাগণ।

১ম দেব ॥ ভেল্‌কি! ভাই একেবারে ভেল্‌কি!

২য় দেব ॥ আচ্ছা কি রকম হোলো বল দেখি! গেলাম স্বয়ম্বরসভায়—তা স্বয়ম্বরই হলো না!

৩য় দেব ॥ আরে স্বয়ম্বর যে হোলো না সে কার দোষ!

৫ম দেব ॥ নয় তো কি? সতী বরমাল্য হাতে সভায় যেই এলেন, তুমিই তো ভায়া গদগদ হয়ে—মা, মা, বলে ডেকে উঠলে সবার আগে।

১ম দেব ॥ কি জানি ভাই কি রকম হয়ে গেল! সতীকে দেখে মা বলে ডাক্‌তে ইচ্ছে হল!

৪র্থ দেব ॥ আরে আমারও যে ডাক্‌তে ইচ্ছে হল!

২য় দেব ॥ আর ভাই আমারও!

৩য় দেব ॥ আমারও, আর শুধু কি আমিই, ব্রহ্মা বিষ্ণু থেকে তেত্রিশ কোটী দেবতা—বাদ শুধু ঐ ভাঙা!

৫ম দেব ॥ ও ভাঙ্‌ই খাক্ আর সিদ্ধিই খাক্—ও তালে ঠিক আছে! যোগ সাজস্—বুঝ্‌লে ভায়া যোগ সাজস্ নইলে সভায়—

৩য় দেব ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়! নইলে সভার—ত্রিসীমানায় তাকে দেখলাম না ....সতী এলেন, আমরা মা মা বলে চীৎকার করে উঠলাম....সতী আকাশ পানে চাইলেন, হে মহাদেব তুমি আমার মালা নাও....এই বলে মালা ছুঁড়লেন....মালা ছুঁড়ে দিতেই মহাশূন্যে মহাদেবের আবির্ভাব!

১ম দেব ॥ অমি মালাও গিয়ে মহাদেবের গলায় ঝুললো! ভেল্‌কি—ভাই, ভেল্‌কি! কিন্তু সব চেয়ে বড় ভেল্‌কি হচ্ছে—

৫ম দেব ॥ আমরা মা বললাম। মা বললে আর গলায় মালা দেব কি করে?

৩য় ॥ বাবা বাবা বলে যে সতী আমাদের আদর করেন নি এই ঢের!

১ম ॥ ভেল্‌কি—ভাই ভেল্‌কি! ভূতনাথ কি না—সব ভৌতিক ব্যাপার—

৫ম দেব ॥ তা ভুগতে ভুগবেন সতী। এমন সব সুপাত্র রেখে—

৩য় দেব ॥ সুপুত্র বল—

৫ম দেব ॥ তা সুপুত্র হয়েই বলছি—মা আমার ঐ ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য কদিন সহ্য করতে পারেন দেখব! দক্ষরাজ তো রেগে টং! অতবড় উঁচু

মাথা হেঁট হোলো তো! ওই—ওই···দেখ—দেখ—দেখ···দেখেছ? বাবা ভূতনাথের চেলাচামুণ্ডারা সব আসছেন। ওঃ—উল্লাসটা দেখেছ?

৩য় ॥ সরে পড়াই ভালো বাবা! কার স্কন্ধে যে কে ভর করবেন তা বলা যায় না!

সকলে ॥ চল—চল—

দেবতাগণের প্রস্থান।

ভূত, প্রেত, প্রমথ স্ত্রী-পুরুষ নিঃশেষে নন্দী ভৃঙ্গী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া নৃত্যগীত সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া আসিল।

বাবার হ'ল বিয়ে—
ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়েরে ভাই
(সাপের) খোলস্ মাথায় দিয়ে ॥
বাবার জটায় ছিলেন গঙ্গা এবার কোঠায় এলেন সতী
প্রাণের-কোঠায় এলেন সতী
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী পেলেন পরম পতি ;
মাকে দেখে রেগে মেগে পেত্নীরা সব গেল ভেগে
(আজ) গৃহীর দীক্ষা নিলেন বাবা দাক্ষায়ণী নিয়ে ॥
মোরা মা আসবার অনেক আগে জন্মে আছি ঘরে
এই অগ্রপথিক ছেলেদের মা চিন্‌বে কেমন ক'রে ;
বাজা রে সব বগল বাজা, আর খাবনা সিদ্ধি গাঁজা—
এই ভূতেরা সব মানুষ হবে (মায়ের) স্নেহ-সুধা পিয়ে॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

দক্ষের কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ। কক্ষ দ্বার রুদ্ধ। দূরে হইতে সানাই-এর করুণ ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। বিবাহের উৎসব তো নাই-ই বরং কেমন একটা আশঙ্কাজনক নিস্তব্ধতা। দেহরক্ষী পিঙ্গলাক্ষ দূরে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান। ধীরে ধীরে প্রসূতি আসিয়া রুদ্ধকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন। স্বামীকে ডাকিতে সাহস নাই—অথচ

প্রসূতি ॥ প্রভু! প্রভু!

দক্ষ ॥ (কক্ষ হইতে) কেন?

প্রসূতি ॥ (নীরব রহিলেন)।

দক্ষ ॥ (দ্বার খুলিয়া) তাদের বিদায় করেছ ?

প্রসূতি ॥ (নীরব রহিলেন)

দক্ষ ॥ এখনও যায়নি তারা ? তুমি কি তবে এই চাও প্রসূতি—আমি নিজে গিয়ে তোমার কন্যাকে বলবো তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

দক্ষ ॥ অনেকক্ষণ থেকে শুনছি।....যাচ্ছে—আমি শুনতে চাইনা রাণী। শুনতে চাই তারা গিয়েছে।

প্রসূতি ॥ সতী তোমায় প্রণাম করে যেতে চায় প্রভু !

দক্ষ ॥ প্রণাম ! হাঃ হাঃ হাঃ।

সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন অব্যক্ত যাতনায় আহত
প্রসূতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

দক্ষ ॥ (কক্ষ মধ্য হইতে) পিঙ্গলাক্ষ !

পিঙ্গলাক্ষ ॥ প্রভু !

দক্ষ ॥ ওরা যাচ্ছে ?

পিঙ্গলাক্ষ ॥ (পথে দৃষ্টিপাত করিয়া) না প্রভু !

দক্ষ ॥ (কক্ষের বাহিরে আসিয়া) ওদের রথ কি এখনও প্রস্তুত হয় নি ? পিঙ্গলাক্ষ রথ ওরা গ্রহণ করেন নি।

দক্ষ ॥ তাহলে কি করে যাবে ? কোনও দিন কোথাও গিয়েছে নাকি ? রৌদ্রে—বর্ষায় সতী যাবে পদব্রজে ! কণ্টকাবৃত অরণ্যে তার পা দুখানি ক্ষত বিক্ষত হবে না ? ওরে, দু'পা যেতে না যেতেই যে সে ভূলুণ্ঠিতা হবে ! অসহ্য পিপাসায় নিদারুণ পথশ্রমে সে যে মূর্ছিতা হয়ে পড়বে ! ওরে, সে কি করে যাবে ! না—না—না তা হবে না। এ তবে তার না যাওয়ার অভিপ্রায়। তুমি যাও—রথ প্রস্তুত করে দাও—(পিঙ্গলাক্ষ যাইতেছিল—দক্ষও কক্ষমধ্যে যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) পিঙ্গলাক্ষ ! ওরা গেলে আমায় সংবাদ দিয়ো। (পিঙ্গলাক্ষ যাইতেছিল।) দাঁড়াও।....গেলে নয়, যখন যাচ্ছে দেখবে—আমায় সংবাদ দেবে। দেখো আবার ঘুমিয়ে থেকো না ! কর্ত্ত্ব্যকার্য্যে অধুনা তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষ্য করেছি। (পিঙ্গলাক্ষ চলিয়া গেল) —পিঙ্গলাক্ষ !

নারদের প্রবেশ

নারদ ॥ প্রজাপতি।

দক্ষ ॥ কে নারদ ! কি সংবাদ এনেছ ? (ব্যগ্রভাবে) বোধ হয় বলবে সতী যেতে চাইছে না ?

নারদ ॥ না, তা আর কি করে বলি! না গিয়ে তার উপায় আছে! তুমি আদেশ দিয়েছ—

দক্ষ ॥ আমার সব আদেশই কি সতী সব সময় পালন করেছে? আমার আদরিণী কন্যা বলে যে তার বড় গর্ব্ব! সেই গর্ব্বে একমাত্র ঐ মেয়েই আমার আদেশও অমান্য করতে সাহস পেয়েছে—একদিন নয়—কতদিন! আজও—আজও হয়তো তাই—(ব্যাকুল দৃষ্টিতে নারদের দিকে চাহিলেন।)

নারদ ॥ না, আজ আর তা নয়। আজ তার সে সাহস নেই।

দক্ষ ॥ দেখেছ নারদ, দেখেছ! আজ আমার ওপর তার কোন মমতা নেই বলেই না আমার ওপর তার সকল দাবী সকল অধিকার সে নির্ম্মম হয়ে ত্যাগ করতে পেরেছে—অবিচলিত চিত্তে আমার সকল আদেশ পালন কর্ছে! যাত্রার পূর্ব্বে একটি বারও তো সে আমার কাছে এল না! এসে ক্ষমাও তো চাইতে পারত!

নারদ ॥ ক্ষমা সে চাইবে না। ভুলে যেয়ো না প্রজাপতি তুমিই তাকে মনোমত পতিনির্ব্বাচন কর্ত্তে বলেছিলে—সে তা করেছে। সে তো কোন অন্যায়ই করে নি প্রজাপতি!

দক্ষ ॥ সে নিজে এসে এ কথা বলে না কেন? তবু বুঝতাম সে একটি-বার এল!

নারদ ॥ কি করে আসবে! তুমি তার মুখদর্শন করবে না বলেছ!

দক্ষ ॥ নারদ! নারদ! আমার মুখের কথাই কি সব? আমার অন্তরের কামনা সে যদি না বোঝে—তবে এ জগতে কে বুঝবে নারদ?

নারদ ॥ আমি এখনি সতীকে তোমার কাছে নিয়ে আসছি প্রজাপতি!

দক্ষ ॥ (ব্যাকুলভাবে) নারদ! নারদ!

নারদ ॥ আমি এখনি যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি—শিব আর সতীকে এখানে নিয়ে আসছি—

দক্ষ ॥ (দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন) নারদ!…শিব! তাকে এখানে কে আসতে বলছে! সাবধান নারদ। তুমি যাও—গিয়ে বল সতী যদি একা আসে—আসতে পারে, নতুবা না।

নারদ ॥ দেখি! হয় ত বিলম্ব হয়ে গেল। হয় ত তারা এতক্ষণ যাত্রাই করেছে— [প্রস্থান]

দক্ষ ॥ পিঙ্গলাক্ষ!

পিঙ্গলাক্ষ ॥ প্রভু।

দক্ষ ॥ তারা যাচ্ছে?

পিঙ্গলাক্ষ ॥ যাত্রার আয়োজন হচ্ছে।

দক্ষ ॥ হচ্ছে ! তুমি এখান থেকে চলে যাও—দূরে যাও—দূরে—দৃষ্টির বাইরে—

পিঙ্গলাক্ষ চলিয়া গেল।

দক্ষ ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেহ তাহাকে দেখিতেছে কিনা। ধীরে ধীরে গিয়া পথপানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে প্রসূতি আসিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখা মাত্র—

প্রসূতি ॥ প্রভু !

দক্ষ ॥ (দক্ষ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া) আমি এখানে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখতে চাই তারা গেল কি না আমার আশঙ্কা হচ্ছে—তাদের তুমি লুকিয়ে রেখে বলবে তারা চলে গেছে।

প্রসূতি ॥ এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চায়না সে। সে তোমার উদ্দেশেই প্রণাম নিবেদন করে বিদায় নিলে—কিন্তু তুমি কি একান্তই যাবেনা ? না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছে তবুত সে তোমারি সতী।

দক্ষ ॥ উদ্দেশে প্রণাম করেছে ! চমৎকার ! চমৎকার তার বুদ্ধি ! এমন বুদ্ধি নইলে কোন রাজরাজেশ্বরকে বরমাল্য না দিয়ে বরণ করে এক কুলহীন গোত্রহীন বৃষবাহন নগ্নকায় ভিক্ষুককে ! উদ্দেশে প্রণাম করেছে !

নারদের প্রবেশ

নারদ ॥ প্রজাপতি পারলাম না ! তারা চলেই যাচ্ছে ! ঐ দেখ···দেবী কাঁদছেন ! তুমি একবার চল প্রজাপতি !

প্রসূতি ॥ প্রভু একবার চল। দাসী ভিক্ষা চাইছে একবার চল—

দক্ষ ॥ কেন যাব প্রণাম করাতো তার হয়েই গেছে !

প্রসূতি ॥ তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ করবে চল !

দক্ষ নীরব রহিলেন।

প্রসূতি ॥ সন্তান যখন ভুল করে—সন্তান যখন অন্যায় করে, আশীর্ব্বাদ যে তখনই সবচেয়ে বেশী আবশ্যক নাথ !

দক্ষ ॥ প্রণাম যদি উদ্দেশে চলে, আশীর্ব্বাদও উদ্দেশে চল্‌তে পারে !

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ।

পিঙ্গলাক্ষ ॥ প্রভু তাঁরা রথ নিলেন না। পদব্রজেই যাত্রা করছেন !

প্রসূতি ॥ যাত্রা করছে ! কিন্তু আমি যে তাকে আশীর্ব্বাদ করলাম না !

সতীর প্রবেশ।

সতী॥ তোমার আশীর্ব্বাদই নিতে এলাম মা ; পিতার আশীর্ব্বাদ আমি পাবনা জানি।

প্রসূতিকে প্রণাম করিয়া দূর হইতে দক্ষকে প্রণাম করিলেন।

দক্ষ॥ তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা। কিন্তু···তোমার স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করতে পারলাম না !

সতী॥ তা যখন পারলে না, তখন আমাকেও তুমি আশীর্ব্বাদ করোনা বাবা।

প্রস্থান করিতেছিলেন।

দক্ষ॥ (আর্ত্তকণ্ঠে) সতী !

সতী॥ (ছুটিয়া আসিয়া) বাবা !

দক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইলেন এবং কক্ষমধ্যে চলিয়া গেলেন।

সতী॥ মা ! মা !

প্রসূতি বুকে টানিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

কৈলাস

সমুচ্চ গিরি-শিখরে উচ্চ দেবদারু বৃক্ষের নিম্নে বেদী, সেখানে শিব যোগাসনে আসীন। নিম্নে হরীতকী বন, নিম্ববৃক্ষের শ্রেণী সেখানেও বসিবার বেদী। পশ্চাতে রজতধারা অলকানন্দা বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে কর্ণিকার পুষ্পতরু, বিল্ববৃক্ষ, ধুস্তুর পুষ্প-রাজি। সর্বনিম্নে সবিস্তৃত প্রাঙ্গণ—সেখানেও বেদী আছে এবং মধ্যস্থলে আছে একটি সুবিশাল সিদ্ধিপাত্র ও সুবৃহৎ ঘোটন দণ্ড। প্রাঙ্গণে ভূতপ্রেত প্রমথ পিশাচ প্রভৃতি শিবানু-চরগণ সতীর সম্মুখে বসিয়া আছে।

ভূত ॥ তোর এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না তো মা ?

সতী ॥ না বাবা, কষ্ট কেন হবে ! এত আনন্দ আমি আর কখনো পাইনি।

প্রেত ॥ আমরা এ-কথা ভাবতেই সাহস পাইনা যে তুই আমাদের মা। আমরা যে বড়ই কদাকার বড়ই কুৎসিত !

সতী ॥ ছিঃ বাবা ! ও-কথা বলতে নাই। সন্তান যত কুৎসিতই হোক, মায়ের চোখে নয়।

পিশাচ ॥ আমাদের ঘৃণা করিসনে মা ! আমরা বড়ই দুঃখী !

সতী ॥ তোমরা আমার সন্তান। সন্তানকে কেউ কখনো ঘৃণা করে বাবা ?

প্রমথ ॥ তোকে মা বলে ডাক্‌লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তাই তো যখন তখন তোর কাছে ছুটে আসি মা !

সতী ॥ না এলে আমারও যে ভালো লাগেনা বাবা !

তাল ॥ বাবার যা কিছু ধনরত্ন সে হচ্ছি আমরা—দেখতেই তো পাচ্ছিস ! এত বড় রাজার মেয়ে তুই, এখানে কি তোর মন টিক্‌বে মা ?

সতী ॥ কিন্তু আমি যে ইচ্ছা করেই তোমাদের মা হয়েছি বাবা—সব জেনে শুনেই তোমাদের ঘরে এসেছি !

বেতাল ॥ থেকে থেকে তোর মুখে কি যেন দুঃখের ছায়া পড়ে। আমাদের বুকের পাঁজরা ফেটে যায়। জানি মা, আমরা তোর অতি তুচ্ছ সন্তান—তবু যদি বলিস তোর কি কষ্ট, কি দুঃখ—

সতী ॥ না বাবা, কিসের আবার দুঃখ-কষ্ট ! মনোমত স্বামী পেয়েছি, তোমাদের মত সন্তান পেয়েছি, কোন দুঃখই আমায় স্পর্শ করতে পারছেনা ।… এখন তবে উঠি—তোমাদের বাবার ধ্যানভঙ্গ হল কিনা দেখে আসি—

সতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল ।

তাল ॥ দাঁড়া মা, একটু দাঁড়া, পায়ের ধুলো দে—

সতী ॥ সারাদিনে কতবার তোরা পায়ের ধুলো নিবি বল ত ?

বেতাল ॥ ভালো লাগে মা !

সকলে ভিড় করিয়া সতীর পদধূলি নিল । সকলের
প্রচণ্ড আনন্দ ও গর্ব । নন্দীর প্রবেশ ।

নন্দী ॥ তাই তো ভাবছিলাম মা গেল কোথায় ! হতভাগারা এখানে মাকে নিয়ে হৈ চৈ করচে—আর আমি কিনা যেখানে সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছি ! ওরে হতচ্ছাড়ারা মাকে যদি তোরা সব সময় এমনি জ্বালাতন করিস, মার একটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়বে যে ।

তাল ॥ তাই বলে আমরা আসবনা নাকি ! তবে আমাদেরও অসুখ বিসুখ হবে, সে তোমায় বলে রাখছি মা !

সতী ॥ না বাবা, নন্দীর এ-কথা তোমরা শুনো না ।

সতীর প্রস্থান ।

সকলে ॥ নন্দী দাদা হেরে গেল ।
পা দুখানি খোঁড়া হল ॥
ভাঙের ভাগ যদি পাই ।
নেচে নেচে চলে যাই ॥

নন্দী ॥ শুনেছ, হতভাগাদের কথা শুনেছ ! "ভাঙের ভাগ যদি পাই! নেচে নেচে চলে যাই ! বেশ দিচ্ছি, মণ খানেক সিদ্ধিই লাগবে দেখচি ! তা লাগে লাগুক, তবু হাড়ে একটু বাতাস লাগুক ! (পাত্রে সিদ্ধি ঢালিয়া) নে, এখন ঘোঁট্—ওরে মহাসিদ্ধির দল—তোরা কোথায় ? তোরাও আয় !

কৈলাসবাসিনীরাও ছুটিয়া আসিল । সিদ্ধি ঘোটা হইতে লাগিল ।
স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গাইতে লাগিল ঃ—

—গীত—

যদি বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি চাও সিদ্ধি খাও—সিদ্ধি খাও !
মোক্ষ মুক্তি ঋদ্ধি চাও, কিম্বা অষ্টসিদ্ধি চাও
সিদ্ধি খাও সিদ্ধি খাও ॥

ওরে স্বর্গের অলম্ভুষ—ওরে মর্ত্ত্যের লেণ্ডুস্
শিব লোকে এই আসার ঘুষ মহাসিদ্ধির মহিমা গাও।
এই কৈলাসী ষাঁড়ের ন্যাদ্, খেয়ে হও দাদা প্রেমোন্মাদ,
পাইয়া ঈষৎ এর প্রসাদ মৃত্যু বুড়োরে বগ্ দেখাও
বড়দিদি ইনি হন্ গঞ্জিকার
খেলে ঘুচে যায় যত ভব বিকার
সব দুঃখ শোক হবে পগার পার—
ছটাক খানিক খেয়ে গলা ভিজাও ॥

মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা
গেল সিদ্ধিপাত্র হাতে ভৃঙ্গী আসিয়া বসিল এবং মহা অনুষ্ঠান
সহকারে সিদ্ধি খাইতে লাগিল।

ভৃঙ্গী ॥ হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী

সিদ্ধিপান।

জয়ার প্রবেশ।

জয়া ॥ ও ভৃঙ্গী ঠাকুর—একটা কাজ করনা—

ভৃঙ্গী ॥ এই যে এস-এস। তা মাণিকজোড়ের কোনটি তুমি ?

জয়া ॥ কি বিপদ নামটাও মনে রাখতে পার না।

ভৃঙ্গী ॥ দাঁড়াও। বিজয়া…না…জয়া !

জয়া ॥ জয়া।

ভৃঙ্গী ॥ জয়া—জয়া—জয়া…কী কটমটে নাম বাবা! কে রেখেছিল বলতে পার ?

জয়া ॥ জয়া নামটা হল কটমটে—আর ভৃঙ্গী নামটা বুঝি খুব—

ভৃঙ্গী ॥ ভারী মিষ্টি! একেবারে যেন একপাত্র টাট্‌কা ভাঙ্গ (সিদ্ধিপান)

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী !

(একপাত্র জয়ার সম্মুখে ধরিয়া) চলবে ?

জয়া ॥ এ কোথায় এসে পড়েছি! কেবল ভাঙ্! কেবল সিদ্ধি! নেশা ছাড়া কথা নেই।…বলি শুনছ ?

ভৃঙ্গী ॥ একটু জোরে বল—ভালো শুনতে পাচ্ছিনা—একটু উর্দ্ধলোকে উঠেছি কিনা—

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী !

জয়া ॥ এই সেরেছে ! বলি বেলপাতাগুলো পাড়বে কে ?

ভৃঙ্গী ॥ (আকারে ইঙ্গিতে জানাইল—শুনিতে পাইতেছে না)

জয়া ॥ (কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে) বেলপাতা—বেলপাতা—

ভৃঙ্গী ॥ (যেন বহু দূর হইতে উত্তর দিতেছে) শুনেছি—এনে দিচ্ছি—

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী !

জয়া ॥ এখানেই এনো—আমি ততক্ষণ ফুল তুলছি ।

ভৃঙ্গী টলিতে টলিতে চলিয়া গেল । জয়াও উদ্যানে চলিয়া গেল ।
...চোরের মত চুপি চুপি তাল ও বেতাল আসিয়া
জয়াকে চুরি করিয়া দেখিতে লাগিল ।

বেতাল ॥ কোনটি ? ছোটটি না বড়টি ?

তাল ॥ আরে ওদের কে যে ছোট সেই নিয়েই তো গোল ! কখনো মনে হয় এ বড় কখনো মনে হয় এই ছোট ।

বেতাল ॥ আর দুজনকে যখন একসঙ্গে দেখি....তখন তো কিছু বোঝবারই যো নেই....

তাল ॥ তা হলে এখন কি করবি বল ভাই বেতাল ! ...বাবা করলেন বিয়ে আর ছেলেরা থাক্‌বে আইবুড়ো ! বাবার মতলবই যে তা নয়, নইলে মার সঙ্গে ওরা আসে কেন ?

বেতাল ॥ বটেই তো ! বাবা তো শুধু মাকেই বিয়ে করেছেন—ওদের তো করেন নি । ওদের যখন এনেছেন—বুঝতে হবে এই তাল বেতালের জন্যই এনেছেন ।

তাল ॥ এখন কথা হচ্ছে একটি হবে তোর বৌ, একটি হবে আমার বৌ । ....এখন কোনটি তোর কোনটি আমার এই নিয়েই তো গোল । তা আমি বলি কি গোলই বা কেন ! বড়টি বড়র আর ছোটটি ছোটর । ঠিক্ কিনা ?

বেতাল ॥ ঠিক্‌ই তো । ওটি আমার ।

তাল ॥ আরে যা ! ও যে ছোট, ও হবে আমার ।

বেতাল ॥ ছোট নয়, ঐটিই বড় । আমি ওর নাক দেখে বুঝছি—দেখছিসনা নাকটা একটু বেশী লম্বা—

তাল ॥ না, লম্বা না ।

বেতাল ॥ আমি দেখেছি লম্বা । তুই না বললেই হবে !

তাল ॥ তুই ভুল দেখছিস। তোর চোখে ছানি পড়েছে।

বেতাল ॥ চটাস্‌নি বলছি...বেশী বাড়াবাড়ি করবি তো...তোকে তাল পাকিয়ে এমনি ছুঁড়ে মারব....যে গাছের তাল গাছে গিয়ে ঝুলবি!

তাল ॥ তবে রে বেতাল...তাল কাকে বলে তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি—

উভয়ের যুদ্ধোদ্যম। তবলার বোল আওড়াইয়া যুদ্ধ

ছুটিয়া জয়ার প্রবেশ

জয়া ॥ কি হ'ল—? কি হ'ল? আরে, হল কি?

তাল ॥ (যুদ্ধ না থামাইয়া বেতালকে) ঐ তো এসেছে। মেপে দেখলেই হয়—

বেতাল ॥ বেশ্ তো।

যুদ্ধ ক্ষান্ত। কিন্তু জয়ার সম্মুখে উভয়েই কেমন ঘাবড়াইয়া গেল।
তথাপি ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—
হাত তুলিয়া জয়ার নাক মাপিবার জন্য।

জয়া ॥ ওমা! এ আবার কি সং!...এ কি হচ্ছে?

বেতাল ॥ আমরা তোমার নাক মাপব।

জয়া ॥ নাক মাপবে কি গো!

তাল ॥ কতখানি লম্বা তাই দেখব।

জয়া ॥ তবে রে হতচ্ছাড়া! ঝাঁটা গাছটা কই? তোমাদের ভূত আমিই ছাড়াচ্ছি—

তাল ॥ বেতাল, এটা তোর—(পলায়ন)

বেতাল ॥ না—না, এইটেই তোর—(পলায়ন)

জয়া ॥ এ কোথায় এসে পড়েছি ভূতের দৌরাত্ম্যে মারা গেলুম যে—রাতদিন গা ছম্‌ছম্ করে!

সতীর প্রবেশ

সতী ॥ কি রে জয়া? বেলপাতা কই? পুজো করব কখন?

জয়া ॥ আগে প্রাণটা তো বাঁচাও, তার পর পুজো—

সতী ॥ কেন, আবার কি হল?

জয়া ॥ ভূতের রাজ্যে এসে পড়েছি—যা হবার হচ্ছে।...যেদিকে তাকাও....দেখবে নেশা-নেশা কেবল নেশা রাতদিন নেশাই করছে—! নেশার ঝোঁকে হয় সব ঝিমুচ্ছে না হয় লাফাচ্ছে...না হয় গড়াচ্ছে। এখানে কে কার কথা শোনে

—। কাজটাজ কিছু নেই। বেলপাতা! তোমার সেই ভৃঙ্গী—আমার নামই মনে রাখতে পারেনা—কখনো ডাকছে জয়া কখনো ডাকছে বিজয়া কখনোবা 'মা! মা!' বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই আকুল। বহু কষ্টে বেলপাতা আনতে পাঠিয়েছি। ভালো করে তা তার কানে ঢুকেছে কিনা তাই বা কে জানে!

সতী ॥ না, ঐ তো আসছে—মিছিমিছি তোরা ওদের দোষ দিসনে জয়া!

ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী ॥ (সতীকে) এই যে বিজয়া!

জয়া ॥ (সতীকে) শুনলে তো? শুনলে? তুমি হলে কিনা বিজয়া?

ভৃঙ্গী ॥ (সতীকে) ও····তুমি তো মা!

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
বামে শোভে সতী—সতী—

মার নাম কখনো ভুলি--তুমি কি ভাব আমাকে—?
(জয়াকে) আর তুমি—তুমি কোনটি? মাণিকজোড়ের
কোনটি তুমি বলতো—?

জয়া ॥ গলায় দড়ি দিয়ে অলকানন্দায় ডুবে মরগে যাও—

সতী ॥ ছিঃ জয়া!

ভৃঙ্গী ॥ বাঁচালে মা! নামটা মনে করিয়ে দিলে। জয়া জয়া জয়া কি কটমটে নাম রেখেছিল তোমার বাপ মা ভুল হবে এক পাত্র ভাঙ্ই মেরে দিলে!—(জয়াকে) তা নাও তোমার দ্রব্য নাও—

জয়া ॥ একি এ যে আল্তা!—

ভৃঙ্গী ॥ আল্তাই তো বলেছিলে, না, চাল্তা বলেছিলে?

জয়া ॥ (সতীকে) শুন্লে! বল্লাম বেলপাতা, শুনলো চাল্তা, আন্লো আল্তা।—যাও সখী, এদের নিয়ে ঘর সংসার করতে পার কর। আমি পারবোনা।

ভৃঙ্গী ॥ আহা রাগ কর কেন।—যাচ্ছি বেলপাতা এখনি এনে দিচ্ছি—বেল্পাতার রাজ্যে বেল্পাতা আনতে কতক্ষণ। তা আল্তা যখন এনে ফেলেছি, মার পায়ে দিয়ে দিন্ বিজয়া। (চলিল)—

জয়া ॥ আবার বিজয়া, আমি আত্মহত্যা করবো সতী!

ভৃঙ্গী ॥ (যাইতে যাইতে) হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বামে শোভে সতী। [প্রস্থান]

সতী ॥ জয়া! আনন্দে আমার দেহ রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌ছে?—ও কি করে জান্‌লো?—

জয়া ॥ কে জান্‌লো?

সতী ॥ ভৃঙ্গী—

জয়া ॥ কি?—

সতী ॥ প্রভু যে কাল আমায় ওই আল্‌তার কথাই বলেছিলেন। বলছিলেন সতী, কেশ কলাপে সুগন্ধি তেল দিয়েছ, বেণীতে দুলিয়েছ স্বর্ণফুল, কপোলে এঁকেছ অলকা, ললাটে এঁকেছ চন্দন লেখা···চরণ দুখানির কথাই শুধু ভুলে গেছ সতি! ও ভুল তুমি আমায় সংশোধন করতে দেবে সতী?

জয়া ॥ ওমা বল কি! শিব বল্‌লেন!

সতী ॥ কি লজ্জা যে পেলাম জয়া তা বলবার নয়।—ঘুম থেকে উঠেই তোমাদের ব'লব ভেবেছিলাম, কিন্তু লজ্জায় পারছিলাম না। আমার ভক্ত সন্তান তা বুঝতে পেরেছিল তাই এনে দিয়ে গেল!

পুষ্প প্রসাধন লইয়া গাহিতে গাহিতে বিজয়ার প্রবেশ

দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণ রাগে,
রাঙা আবির কুঙ্কুম ফাগে।
কি হবে আল্‌তা পরায়ে (যে পায়)
সন্ধ্যা উষা সদা জাগে॥
রাঙা রামধনু হেরিয়া যে পায়
উঠিয়া লুকায় নিমেষে লজ্জায়—
অশোক কিংশুক অঞ্জলি হয়ে, চরণে শরণ মাগে॥
তব চরণ-রাগ নব বসন্তে
জাগে ফুলদলে নারী সীমন্তে,
রবি শশী তারা হ'ল জ্যোতির্ম্ময়—তব চরণ অনুরাগে॥

[বিজয়া গায়িতে লাগিল। জয়া সতীর প্রসাধনে মনোনিবেশ করিল। সতীর খোঁপায় ফুল গুজিয়া দিল, হাতে দিল পুষ্প বলয়। কর্ণিকার পুষ্পের কুণ্ডল গড়িয়া কর্ণে দিল। ধীরে ধীরে অদূরে শিব আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রসন্ন দৃষ্টিতে সতীর প্রসাধন দেখিতে লাগিলেন। বিজয়া ইহা দেখিতে পাইয়াও দেখিতে পায় নাই ভান করিয়া জয়াকেও ইঙ্গিতে দেখাইল। গান শেষ হইল]

বিজয়া ॥ জয়া আমি ঝরণার জল্‌ আন্‌তে যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

জয়া। আমারও যে কি একটা কাজ—চললাম সতী।

সতী ॥ তোমরা দুজনেই যাবে? তবে আমায় আলতা পরিয়ে দেবে কে?

জয়া ॥ সে লোকের অভাব হবেনা সখী! ও চরণ দুটি স্পর্শ করতে পেলে অনেকেই ধন্য হবে!

[প্রস্থান]

শিব ॥ দেবীর যদি অনুমতি হয়—ও-ভুল আমিই সংশোধন করি—

[সতী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখেন শিব; ভারী লজ্জা পাইলেন।
শিব সতীর সম্মুখে আসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সতী তাঁহার
বসন প্রান্ত দিয়া পা দুখানি ঢাকিলেন]

সতী ॥ (শিবের প্রতি, সানুনয়ে) না—না—না—

[অদূরে জয়া বিজয়া লুকাইয়া ছিল। তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

সতী ॥ (তৎক্ষণাৎ সহজভাবে দাঁড়াইয়া) কে?

শিব ॥ জয়া বিজয়ার জয় হোক।

সতী ॥ কী দুষ্টু মেয়ে তোমরা! এই বুঝি ঝরণায় জল আনতে যাওয়া!

[জয়া বিজয়া আত্মপ্রকাশ করিল]

বিজয়া ॥ ভৃঙ্গার ফেলে গিয়েছি যে!

জয়া ॥ এ ভুল আমায় সংশোধন করতে দেবেনা সতী?

[দুষ্ট হাসি হাসিয়া জয়া বিজয়া পলাইল]

শিব ॥ তোমার শুভাগমনে কৈলাসের মহাশ্মশানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে সতী! শ্মশানবাসী শিবকে তুমি গৃহবাসী করেছ! কৈলাসের প্রতি অণুপরমাণুতে আজ প্রাণের স্পন্দন! জীবনে যে এত মাধুর্য্য আছে আমি জানতামনা দেবি!

সতী ॥ আমার জীবনও যে ধন্য হয়েছে প্রভু!

শিব ॥ কিন্তু সত্যি! যখনি ভাবি কি বেদনা বুকে নিয়ে আনন্দময়ী-মূর্ত্তিতে কৈলাসে আনন্দ বিতরণ কচ্ছ···আমার মধুস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়····শুধু মনে হয় সতী সুখী নয়—সতী সুখী নয়।

সতী ॥ না প্রভু, আমি নিশ্চিত জানি কোন ক্ষোভই আমাদের থাকবে না। সন্তানের ওপর পিতার ক্রোধ কতদিন থাকে? আমার মায়ের অশ্রুধারা কি বৃথাই বইছে? সে কথাও না হয় থাক্—আমি যে এখানে কি যত্নে কি সুখে কি গৌরবে আছি তা জেনেও কি বাবা আমার প্রসন্ন হবেন না? তোমার করুণা

সুন্দর দৃষ্টিপাতে জগতের সকল ক্রোধ সকল অশান্তি দূরে চলে যায়, ঐ দৃষ্টি কি ব্যর্থ হবে শুধু আমার পিতার কাছে ?

শিব ॥ ব্যর্থ হবে। শুধু ব্যর্থ হবেনা, তাঁর ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হবে···যদি আমাদের দেখা হয়।···আর তা হবে বলেই, শোন সতী, আজ ভৃগুর গৃহে মহাযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে—কিন্তু আমি তা রক্ষা করবনা স্থির করেছি।

সতী ॥ না—না—কেন ?

শিব ॥ আমাকে দেখা মাত্র তাঁর মনে হবে আমাকে বরমাল্য দিয়েই তাঁর আদরিণী কন্যা আজ ভিখারিণী—যে কন্যা রাজ রাজেন্দ্রাণী হলেও তাঁর তৃপ্তি হতনা ?

সতী ॥ কন্যার বিবাহে পিতার তৃপ্তিই কি সব ? কন্যার তৃপ্তি কি কিছুই নয় ? তবে কি প্রয়োজন ছিল স্বয়ম্বরের আয়োজনে ?—নিমন্ত্রণ তোমাকে রক্ষা করতেই হবে।

শিব ॥ যজ্ঞে আমি উপস্থিত থাক্‌লে তোমার পিতা নিজেকে অপদস্থই মনে করবেন সতী !

সতী ॥ তা যদি করেন তিনি ভ্রান্ত হয়েই করবেন।

শিব ॥ না সতী, থাক্‌। তোমার প্রেমে আমি আচ্ছন্ন অচেতন হয়ে আছি এই ভালো। মান চাইনা, সম্মান চাইনা, পূজা প্রত্যাশা করি না—কিছু চাইনা —শুধু চাই তোমাকে। আমি যাব না।

সতী ॥ ত্রিলোকপূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব তুমি। যজ্ঞে আমন্ত্রিত ত্রিভুবন তোমার দর্শন-পুণ্য কামনা কর্চ্ছে। আমার পিতা তোমাকে দেখে ক্ষিপ্ত হবেন তা শুনে আমি মনে ব্যথা পাব, এই আশংকা করে তুমি যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা না কর—এই মহাসম্মান প্রত্যাখ্যান কর—তবে আমি বুঝবো আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হবার অনুপযুক্ত। ত্রিভুবন তোমায় যে সম্মান দিতে লালায়িত শেষে আমিই তোমার সে সম্মান প্রত্যাখ্যানের কারণ হলাম প্রিয়তম ! এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো—মৃত্যু ভালো।

শিব ॥ নন্দী !

[নন্দীর প্রবেশ]

শিব ॥ ভৃগুগৃহে মহাযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। যাত্রার আয়োজন কর।

নন্দীর প্রস্থান

সতী ॥ প্রভু ! প্রভু !—

শিব ॥ প্রিয়া !··· আমি শুধু এই চাই তুমি সুখী হও সুখী হও। কিন্তু কি কর্লে যে তুমি সুখী হবে, আমি ভেবে পাইনা প্রিয়া।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

দক্ষের কক্ষের অলিন্দ

[দক্ষ ও নারদ]

নারদ ॥ ভৃগুযজ্ঞে তুমি যাবে না, তুমি বল্‌ছ কি প্রজাপতি !

দক্ষ ॥ সব যজ্ঞেই যে যেতে হবে, তোমার নারদ সংহিতায় কি এমন কোন বিধান আছে ?

নারদ ॥ কিন্তু যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে চল্‌বে কেন ? তুমি হচ্ছ গিয়ে প্রজাপতি—

দক্ষ ॥ নারদ ! তুমি ভৃগুকে গিয়ে ব'লো আমি অসুস্থ—

নারদ ॥ মিথ্যা কথাটা আমায় দিয়ে নাই ব'লালে। আর কাউকে পাঠাও—

দক্ষ ॥ মিথ্যা ! মিথ্যা বলছি আমি দক্ষ ! (সকরুণ দৃষ্টিতে) আমি ঘুমুতে পারি না—নারদ ! সারারাত কত চেষ্টা করি আমি ঘুমুতে পারি না !

নারদ ॥ কী সর্ব্বনাশ ! তবে তো অসুখই বটে। কিন্তু প্রজাপতি ! অনেক দুরারোগ্য রোগও যজ্ঞের ধূম স্পর্শে শান্তি হয়।

দক্ষ ॥ আমার হবে বৃদ্ধি।—

নারদ ॥ তা যদি হয় তবে এ অবস্থায় না যাওয়াই ভালো ভৃগুভায়া যজ্ঞটা খুব ঘটা করেই করছেন। মহাযজ্ঞই বলা যায়। রাত্রে চন্দ্রদেব দিনে সূর্য্যদেব দ্বার রক্ষা করছেন। দেবরাজ ইন্দ্র অভ্যর্থনার ভার নিয়েছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা বৃহস্পতির সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করছেন। রন্ধনশালায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী। ভুজ্যতাং দীয়তাং শব্দ যজ্ঞের মন্ত্রকেও ডুবিয়ে দিয়েছে।

দক্ষ ॥ তুমি চলে এলে কেন ?—

নারদ ॥ তোমাকে না দেখে মন্‌টা ভারী খারাপ হয়ে গেল। ভৃগুও বার্ বার্ তোমারই অনুসন্ধান করতে লাগ্‌লেন। দেবতারাও তোমার কথা বল্‌-ছিলেন।

দক্ষ ॥ তা তো বল্‌বেনই আমি জানি। একমাত্র আমিই এখন তাদের আলোচ্য বিষয়। ত্রিলোকের সম্মুখে সম্মান হারিয়ে কি অবস্থায় কাল যাপন

করছি,—দেবতাদের দেখ্‌তে ইচ্ছা হবে না ?—নিশ্চয়ই হবে সে বর্ব্বরটাও তো এসেছে ?—আসেনি ?

নারদ ॥ কার কথা বলছ ? ওঃ মহাদেব ? (দক্ষ মুখবিকৃত করিলেন) না, তাঁকে দেখিনি। তবে তাঁর বাহনটা সিংহদ্বারে বাঁধা আছে দেখলাম।

দক্ষ ॥ তাহ'লে এসেছে।....রন্ধনশালায় লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ কেন!—তিনি আবার রন্ধনশালার ভার কবে নিয়ে থাকেন?....ভাণ্ডারের ভারই তো তিনি গ্রহণ ক'রে থাকেন! আর কাউকে পাওয়া গেল না বুঝি? কেন ভৃগু তো যাগ্‌-যজ্ঞ ব্যাপারে আমার গৃহে রন্ধনশালায় কে থাকেন দেখেছে! তবে এ ভুল করলো কেন।

নারদ ॥ কার কথা বল্‌ছ ?

দক্ষ ॥ মনে নেই ? তোমার মনে নেই ? গেলবার সেই—আঃ—তোমার তবে কি মনে থাকে নারদ ?

নারদ ॥ ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—কার কথা বল্‌ছো ?

দক্ষ ॥ কি জানি কার কথা। আমার তো কাজ নয় যে মনে করে রাখব। অপযশ হবে ভৃগুর—যখন সবাই বলবে যে, হ্যাঁ, খেয়েছিলাম দক্ষ পুরীতে ... তার কাছে এ কিছুই নয়!—

নারদ ॥ প্রজাপতি চল—যদি সে এসে থাকে!

দক্ষ ॥ (পরম আগ্রহ সহকারে) এসেছে ?—এসেছে ?—

নারদ ॥ আমি কিন্তু সতীর কথা বল্‌ছি প্রজাপতি।....

দক্ষ ॥ (লজ্জা পাইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিলেন) কে শুন্‌তে চেয়েছে তার কথা ? কে শুন্‌তে চেয়েছে ? আমার সঙ্গে এ রহস্য তোমাকে কে করতে বলেছে নারদ ? তুমি যাও—তুমি চলে যাও এখান থেকে এখনি!—

[দ্বারের পাশে প্রসূতি ছিলেন নারদ গিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন]

প্রসূতি। প্রভু—!

দক্ষ ॥ বল—

প্রসূতি ॥ শেষে তোমার এই অপমান।

দক্ষ ॥ অপমান! আমার!—

প্রসূতি ॥ হ্যাঁ তোমার।...ভৃগুযজ্ঞে দেবতাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, দেবী-দেরও হয়েছে !...শিবের হয়েছে কিন্তু সতীর নিমন্ত্রণ হল না কেন ?—

দক্ষ ॥ কে বলেছে তার নিমন্ত্রণ হয়নি ?—

নারদ ॥ আমি। ভারী অপমান বোধ হল প্রজাপতি। শিবের যদি নিমন্ত্রণ না হ'ত আমাদের ক্ষোভের কিছুই ছিল না। কিন্তু স্বামীর নিমন্ত্রণ হল, আর সতীর নিমন্ত্রণ হল না—কেন ?—তোমার কন্যা ব'লে ?—

প্রসূতি॥ না-ই বা হল আমার কন্যা রাজরাজেশ্বরী তবু সে তোমারি মেয়ে প্রভু! ভৃগুর এত স্পর্দ্ধা যে তোমার কন্যাকে অসম্মান করে!

দক্ষ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়! ভুল করুক, দোষ করুক আমি তার বিচার করবো; আমি তার শাস্তিবিধান করবো—তাই বলে অপরে যে তাকে অসম্মান করবে এতো আমি সহ্য করতে পারব না নারদ। নারদ, আমি যাব। আমি এখনি গিয়ে সর্ব্বসমক্ষে ভৃগুকে তিরস্কার করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব, আমার কন্যা যাকেই পতিত্বে বরণ করে থাক—আমার কন্যাকে তুচ্ছ করবার অধিকার কারও নেই,—আর শুধু তাই বা কেন। যাকে সে পতিত্বে বরণ করেছে তিনিও কারও তুচ্ছ নন—ত্রিলোকের পূজ্য তিনি—দেবাদিদেব মহাদেব তিনি।

[প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[ভৃগুগৃহে যজ্ঞশালার বহির্ভাগ]

নানাবিধ আসন

[নেপথ্যে যজ্ঞ মন্ত্র। কয়েকজন দেবতা]

১ম॥ অভ্যর্থনাগৃহে আর কতক্ষণ বসে থাকবে হে। চল, যজ্ঞ দেখে আসি—

২য়। দক্ষ না আসাতে যজ্ঞটা তেমন সরস হল না। গিয়ে কোন লাভ নেই; এই বেশ আছি।

১ম। দক্ষ এলে বেশ হতো। এসেই তো শিবকে ভাঙাড় বলে গাল দিত—অমনি যুদ্ধং দেহি—বুঝলে ভায়া—কি মজাটাই হ'তো! নাঃ আজ সব পন্ড হলো।

৩য়। বাইরে দেখলাম নন্দী তো শূল উঁচিয়েই আছে। একবার পেলে হয়—এই ভাবটা।—

৪র্থ॥ কিন্তু দক্ষের কি দম্ভ দেখেছ! এলই না!

১ম॥ আমার স্ত্রী আজ পিত্রালয়ে যাবেন। মাথার দিব্য দিলেন যেয়ো না—তাও শুনলাম না। সব দিকেই নষ্ট হলো।

২য়॥ যুদ্ধের সাধটা বাড়ীতেই মিটবে এখন!

[পঞ্চম ছুটিয়া আসিল]

৫ম ॥ ওহে শুনেছ ?—শুনেছ ? ভারী সু-খবর।

১ম। কি ?—কি ?—

২য় ॥ কি হে কি ?

৫ম ॥ "নারদ-নারদ" বল—"নারদ-নারদ" বল। বেধে গেল আর কি!—

১ম ॥ কি হল ? কি হল ?

৫ম ॥ নারদ থাকতে আবার আমাদের ভাবনা।—গিয়েছিল।

২য় ॥ কোথায় ?—

৫ম ॥ দক্ষালয়ে।

৩য় ॥ কেন ?

৫ম ॥ ধরে আনতে।

সকলে ॥ এনেছে ?—এনেছে ?—

৫ম ॥ না আনতে পারলে ওর নাম কি নারদ হত! গিয়ে হাতে পায়ে ধরে রওনা করেছে। প্রজাপতি আসছেন রথে—আর নারদ এসেছেন ঢেঁকিতে ....তা ঢেঁকিই আগে এসেছে।

৩য় ॥ দক্ষ আসছে! তাহলে তো সিংহদ্বারেই লেগে যাবে। স্বয়ং নন্দী সেখানে শূল উঁচিয়ে রয়েছে—চল হে চল—এতক্ষণে মনে হচ্ছে—হ্যাঁ যজ্ঞটা জমবে—

সকলে ॥ চল—চল—চল—

[সকলের প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়া শিবসহ নারদের প্রবেশ]

শিব ॥ তুমি বলছ কি নারদ! প্রজাপতি আমার উপর প্রসন্ন!

নারদ ॥ মহাপ্রসন্ন বলুন।

শিব ॥ তুমি সত্য বলছ নারদ ?

নারদ ॥ দেবাদিদেব মহাদেব আমার রহস্যের পাত্র নন।

শিব ॥ নন্দী!—না, থাক্।

নারদ ॥ নন্দীকে কেন ?

শিব ॥ প্রজাপতি প্রসন্ন হয়েছেন—অথচ সতী আমার এখনো এ কথা জানে না! ভাবছি নন্দীকে দিয়ে সতীকে এখনি এ সংবাদ দি—ইচ্ছা হচ্ছে আমি নিজে যাই....আমার বিশ্বাস হচ্ছে না নারদ!

নারদ ॥ তিনি এই এলেন বলে। এলেই কি কাণ্ড হয় দেখুন। যজ্ঞের

মত যজ্ঞ রইবে পড়ে—আপনাকে রথে তুলে নিয়েই তিনি ছুটবেন কৈলাসে—কৈলাসে গিয়ে সতীমাকে বুকে টেনে নিয়ে আপনাকে পাশে বসিয়ে রথে ছুটবেন কনখলে। কনখলে তো সবাই নাচছে! প্রসূতিমা এমন উৎসবের ব্যবস্থা করছেন যে আমার তো মনে হল ওরা বুঝি আপনাদের আবার নূতন করে বিয়ে দেবে!

শিব ॥ নারদ! নারদ! তবে এতদিন পর—এতদিন পর সতী আমার সুখী হবে!

নারদ ॥ সতী সুখী নয়! তুমি বলছ কি মহাদেব?

শিব ॥ সে বলে সুখী, তুমি দেখবে সুখী—কিন্তু নারদ, আমি তো জানি, আমি তো বুঝি কোন্ বেদনার গুপ্তধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো তার অন্তরতম অন্তরে নিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে!....নারদ! নারদ! তোমার মহাদেবের একমাত্র তপস্যা সতী সুখী হোক—সতী সুখী হোক্! তোমার মহাদেবের আজ একমাত্র কামনা যোগ নয়—যাগ নয়—যজ্ঞ নয়—শুধু সতী—সতী—সতী—

নারদ ॥ মোহমুগ্ধ ভগবান! কি সুন্দর!....কিন্তু পরিণাম? (শিহরিয়া উঠিয়া) জানি না।

[নেপথ্যে রথের ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। জয়বাদ্য, জয়ধ্বনি উঠিল :—
"প্রজাপতি দক্ষের জয়! প্রজাপতি দক্ষের জয়!
প্রজাপতি দক্ষের জয়!"]

নারদ ॥ ঐ প্রজাপতি আসছেন।

[দেবতারা আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ভৃগু প্রভৃতি যজ্ঞশালা হইতে আসিলেন]

শ্বশুরকে প্রণাম করতে ভুলোনা ভোলানাথ!

শিব ॥ প্রণাম!—আমি!

নারদ ॥ হ্যাঁ, উনি যে শ্বশুর—

শিব ॥ কিন্তু আমি যে—

[নন্দীর হাত ধরিয়া দক্ষের প্রবেশ]

দক্ষ ॥ কোথায়—কোথায় মহাদেব?

[ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

১ম দেবতা ॥ (জনান্তিকে) শিব উঠে দাঁড়াননি!

২য় দেবতা ॥ শ্বশুরকে শিব প্রণাম করলেনা!

৩য় দেবতা ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুও ওঠেননি !

৪র্থ দেবতা ॥ ব্রহ্মা দক্ষের পিতা—উনি কেন উঠ্‌বেন ?

৫ম দেবতা ॥ বিষ্ণু পিতৃসখা—দক্ষের নমস্য।

১ম দেবতা ॥ কিন্তু শিব তো জামাতা !⋯আর দেখতে হবে না—

দক্ষ ॥ ভৃগু, এসেছিলাম তিরস্কার করতে তোমাকে। কিন্তু আর তার প্রয়োজন নেই। অথবা প্রয়োজন আছে। কেন তুমি ঐ জাতিহীন গোত্রহীন, বৃষবাহন অর্দ্ধোলঙ্গ ক্ষিপ্ত ভিক্ষুককে নিমন্ত্রণ করেছ ?—আচার জানেনা—শীলতা নাই শ্বশুরকে প্রণাম করবার সামান্য কর্ত্তব্যবুদ্ধিটুকুও নেই !

[নন্দীর শিবনিন্দা অসহ্য বোধ হইল। আক্রমনোদ্দেশ্যে শিবের অনুমতি পাইবার জন্য—]

নন্দী ॥ প্রভু ! প্রভু !—

[শিব নির্বিকারচিত্তে শান্ত সৌম্য ভাবে হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন]

ভৃগু ॥ (শ্মশ্রু দোলাইয়া) কি করে থাক্‌বে ! ভূত প্রেত পিশাচ নিয়ে যার সমাজ,⋯সিদ্ধি আর গঞ্জিকা সেবনে যার মস্তিষ্ক বিকৃত, বৃষ যার বাহন⋯ সে তো অসভ্য বর্ব্বর। ওকে এ-যজ্ঞে আহ্বান করবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মার বিধান আমি কি করে লঙ্ঘন করি ! ধিক্‌ তোমার কন্যাকে—সে কি না মালা দিল এরই গলে !

দক্ষ ॥ হয়তো সেইজন্যই ওর আজ এত দম্ভ ! ব্রহ্মা পিতা—আমার নমস্য। বিষ্ণু পিতৃসখা—আমার নমস্য। কিন্তু ও না আমার জামাতা ? তোমার অহঙ্কার আমি চূর্ণ করছি—আমি দক্ষ প্রজাপতি—আমি আজ বিধান দিচ্ছি—আজ থেকে জগতে যজ্ঞ হবে শিবহীন।

নন্দী ॥ প্রজাপতি ! প্রজাপতি ! উনি কেন প্রণাম করেন নি সে তুমি বুঝবে না—আমি তোমার পদধারণ কর্চ্ছি—তুমি প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও—

দক্ষ ॥ (তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া) আমার বিধান আজ থেকে যজ্ঞ হবে শিবহীন। (শিবের প্রতি) বর্ব্বর ! আজ থেকে যজ্ঞভাগে আর তোমার কোন অধিকার নাই। শুধু তাই নয়, আজ থেকে দেবসমাজে তুমি অপাংক্তেয় —জাতিচ্যুত !

নন্দী ॥ প্রভু ! প্রভু ! অনুমতি দাও—আমায় অনুমতি দাও এ ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দি—

শিব ॥ কাকে তুমি আঘাত করবে নন্দী ? উনি যে তোমারই জননীর জনক।⋯ হ্যাঁ ওঁকে আমি প্রণাম করি নি—প্রণাম যদি করতাম ওঁরই অমঙ্গল

হত···সৃষ্টি ধ্বংস হত। আমি জাতিহীন গোত্রহীন বৃষবাহন—অর্দ্ধোলঙ্গ ক্ষিপ্ত ভিক্ষুক,—সত্য,···অতি সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য আমি মহাদেব; আমি মহাকাল—আমার প্রণম্য শুধু একমাত্র আদ্যাশক্তির মহাশক্তি।—

—·—

তৃতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

দক্ষালয়—অলিন্দ

[দূরে সানাই নহবৎ বাজিতেছে—মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য, পতাকা দ্বারা সতীর সহচরীরা গৃহ সাজাইতেছে। কেহ কেহ বা আলিপনা দিতেছে। নৃত্যগীত উৎসব]

গান

বাজো বাঁশরী বাজো বাঁশরী বাজো বাঁশরী
বাজো বাজো বাজো
আসে নন্দন-নন্দিনী আনন্দিনী
সবে উৎসব সাজে সাজো ॥
পুষ্প মাল্য আনো, আনো হেম ঝারি
মঙ্গল ঘটে আনো তীর্থ বারি ;
লাজ অঞ্জলি লয়ে পুরাঙ্গনা নগর ভবনে ভবনে বিরাজো ॥
হংস-মিথুন আঁকা নীলাম্বরী
পরি এস তরুণী নাগরী কিশোরী,
চলো পথে পথে গাহি আগমনী
ঘরে আলসে বসিয়া কে আছিস্ আজো ॥

[প্রসূতির প্রবেশ]

প্রসূতি॥ ওরে, তোরা সব এখানে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছিস্ সতীর শোবার ঘর সাজাবিনে ?

[কতিপয় মেয়ে চলিয়া গেল]

পদ্মা ॥ তাদের আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন মা ?

প্রসূতি ॥ ভৃগুগৃহে যজ্ঞ শেষ হলে তবে যাবেন শিবকে নিয়ে প্রভু কৈলাসে। সেখান থেকে সতীকে সঙ্গে নিয়ে তবে তো আসবেন এখানে! বিলম্ব হবে বৈকি মা। তা মনে মনে আমি বুঝে দেখিছি··আর বিলম্ব নেই —এসে পড়লেন বলে।

জয়া ॥ কোথায় যাচ্ছ মা ?

প্রসূতি ॥ সতী আমার হাতের পরমান্ন খেতে ভালোবাসে তাই রাঁধতে যাচ্ছি।

পদ্মা ॥ জামাইএর জন্য কি রাঁধছ মা ?

প্রসূতি ॥ যা' জানি সবই হচ্ছে।

জয়ন্তী ॥ বেলপাতা সেদ্ধ আর নিমপাতার ঝোল—ভুলোনা মা।

পদ্মা ॥ আর সেই সঙ্গে ভাঙের বড়া আর গঞ্জিকার ডালনা,···তুমি না রাধ আমরা রাঁধব।

প্রসূতি ॥ তোরা থাম। (দ্বারের কাছে গিয়া) পিঙ্গলাক্ষ—

[পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ]

পিঙ্গ ॥ মা!

প্রসূতি ॥ ভৃগুগৃহ থেকে কৈলাস—কদিনের পথ বাবা ?

পিঙ্গ ॥ দু'দিন।

প্রসূতি ॥ কৈলাস থেকে আমাদের কন্‌খল— কদিনের পথ ?

পিঙ্গ ॥ একদিন।

প্রসূতি ॥ আচ্ছা তুমি যাও।

[পিঙ্গলাক্ষের প্রস্থান]

সবাই তাই বলছে। তা হলে তো আজই আসবার কথা। বিলম্ব হচ্ছে কেন বুঝছি না।

জয়ন্তী। সতী হয়তো বাবাকে পেয়ে মায়ের কথাটি ভুলেই গেছে!

প্রসূতি ॥ তা সে পারে। এখানেই তো দেখেছি—বাপকে পেলে মাকে সে চায় না। তা ·· আমার ভালোই লাগে। যে ভাবে মাকে বিদায় দিয়েছি কোন মা তা পারে না। যতক্ষণ না তাকে আবার বুকে ধরছি প্রাণ আমার শীতল হবে না।

জয়া ॥ তুমি মা শুধু মেয়ের কথাই ভাবছ, জামাই বুঝি, তোমার পর ?

প্রসূতি ॥ প্রভুর ভয়ে তার কথা এদ্দিন মুখে আনতে পারিনি। প্রভুর ক্রোধ এখন শান্ত হয়ে গেছে। হবে না ? জামাইএর আমার কি সুন্দর মূর্ত্তি

যেন শান্ত-সমুদ্র। দেখলেই মায়া হয়, স্নেহ হয়। গরীব হোক্ তাতে কি! সতী তো সুখী হয়েছে! তাতেই আমাদের সুখ!···না—মা! কথায় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে.···সতীর জন্য পরমান্ন রাঁধতে হবে—আমি নিজে রাঁধব,—নিজে তাকে খাইয়ে দেব (প্রস্থানোদ্যতা ও ফিরিয়া) তোরা সব কাণ পেতে শোন, রথের ঘর্ঘর শুনলেই ছুটে গিয়ে আমায় খবর দিবি—শাঁখ বাজাবি,—খই ছিটুবি—উলু দিবি—(পদ্মাকে) ওরে শোন তুই গিয়ে এই বাতায়নে দাঁড়িয়ে থাক—রথ দেখলেই ছুটবি—আমার কাছে, বুঝলি—

পদ্মা ॥ হ্যাঁ, মা!

প্রসূতি ॥ মেয়ে তো নয়, শত্রু, না হলে এত দেরী করে!

[প্রস্থান]

জয়ন্তী ॥ মা আমাদের পাগল হয়ে গেছে।

পদ্মা ॥ রথ আসছে! রথ আসছে!

[সকলে বাতায়নের কাছে ছুটিল]

প্রসূতি ॥ সতী আসছে—আমার সতী আসছে—আমার শিব আসছে! ওরে তোরা জয়ধ্বনি দে—ওরে তোরা উলুধ্বনি কর—সতী আসছে! শিব আসছে!

[দক্ষ ও নারদের প্রবেশ]

তারা এলো না!···তুমি কৈলাসে যাওনি? সতীর কুশল তো?··· তারা এলোনা কেন?···শিব কি সতীকে আসতে দিল না?···শিব কি বলল?

দক্ষ ॥ সে কি বলল পরে শুনো। তার উত্তরে আমি কি বলেছি শোন। আমি ঘোষণা করেছি, আজ থেকে যজ্ঞ হবে শিবহীন—যজ্ঞভাগে শিবের কোন অধিকার নেই—দেব-সমাজেও তার আর স্থান নাই—আজ থেকে শিব জাতিচ্যুত—

প্রসূতি ॥ প্রভু! প্রভু!

দক্ষ ॥ এবং বিশ্বে প্রথম শিবহীন যজ্ঞের প্রবর্ত্তক হব আমি, দক্ষ। নারদ, তুমি আর বিলম্ব করোনা—আমি বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করব। সে যজ্ঞে তুমি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করবে—অনিমন্ত্রিত থাকবে শুধু কৈলাস।

প্রসূতি ॥ তুমি বলছ কি প্রভু!··আমার সতী—আমার সতী—

দক্ষ ॥ তোমার সতী! তোমার সতী। বলতে লজ্জা হচ্ছে না? কন্যাই যদি সে তোমার—কি গুণবতী কন্যাই তুমি গর্ভে ধরেছিলে! সাবধান

প্রসূতি ! আজ থেকে এ গৃহে তার নাম যেন উচ্চারিত না হয়। সতী নামে আমার কোন কন্যা নেই—আমরা যাকে সতী বলতাম—আজ সে মরেছে।

প্রসূতি ॥ ওঃ—

[প্রস্থান

[মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[দক্ষপুরীর পথ]

[বৈতালিক গাহিতেছিল—]

গান

পাষাণী মেয়ে ! আয়, আয় বুকে আয় !
জগতজননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায় ॥
রাজার দুলালী কোন্ অভিমানে
ভিখারিণী হ'য়ে বেড়াস্ শ্মশানে
ত্রিলোকের যত পতিত অধমে ঠাঁই দিয়েছিস্ পায় ॥
তোর সোনার বরণ হইয়াছে কালি বলে এসে কত লোকে,
কুস্বপন দেখে জেগে উঠি প্রাতে ধারা বহে মাগো চোখে—
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধরে ডাকি—
তোরে যে মাগো খোঁজে মোর আঁখি
প্রতি—রূপ—প্রতিমায় ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[কৈলাস]

[ভৃঙ্গী সিদ্ধিপান করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে বলিতেছিল—অথবা গাহিতে চেষ্টা করিতেছিল "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বামে শোভে সতী—সতী—সতী—তী ঈ ঈ"]

[বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া ॥ একি ! তুমি যাওনি ! এখনো বসে বসে সেই নেশাই করছ !

ভৃঙ্গী ॥ নেশা করছি ! ছি ! ছি ! তুমি ও-কথা বলো না ! ওতে পাপ হবে। তোমার পাপ হবে জয়া।

বিজয়া ॥ আবার জয়া! নাঃ আর তো এদের নিয়ে পারিনা দেখছি।

ভৃঙ্গী ॥ এ নেশা নয়রে ভাই! এ নেশা নয়। এর নাম সাধনা—সিদ্ধি-লাভের সাধনা! হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বামে শোভে সতী।

[সিদ্ধিপান]

বিজয়া ॥ কই আর শোভে? সতী যে একাই বসে বসে...চোখের জল ফেলচেন।

ভৃঙ্গী ॥ (চমকিয়া) অ্যাঁ! মা আমার কাঁদছেন! মা আমার কাঁদছেন! কেন?

বিজয়া ॥ প্রভু এখানে ফিরলেন না দেখে। তোমায় কত সাধ্য সাধনা করে বললাম—একবার শিখর চূড়ায় উঠে দেখো—তারা আসচেন কিনা, তা তুমি কিনা বসে বসে সিদ্ধিই খাচ্ছ আর সিদ্ধিই খাচ্ছ!

ভৃঙ্গী ॥ আরে তুই তো তাই দেখছিস্....আমি যে এদিকে কত ঊর্দ্ধে উঠেছি—তা তুই কি করে জানবি ভাই! কৈলাসের শিখর কি বলছিস! আমি যে এখন মহাব্যোমে বিচরণ কচ্ছি! কি না দেখচি বল। হ্যাঁ—ঐতো... ঐতো ..আমাদের ষাঁড়...পিঠে প্রভু ধ্যানে বসে আছেন—পিছনে নন্দীদা' ঝিমুতে ঝিমুতে আসছে। বড় নেশাখোর আমাদের ঐ নন্দীদা', বুঝলে ভাই জয়া! অন্যদিকে সব ভালো, বাবার সেবা-যত্ন দিন রাত করে—কিন্তু নেশা না হলে একপা' চলতে পারে না। তা তুমি কিছু ভেবনা ভাই আমি এখান থেকেই আকর্ষণ কচ্চি ওদের। তুমি লক্ষ্মীছেলেটীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ। ওরে মা কাঁদছেন, আমি তাঁর অবোধ ছেলে আমি কি স্থির থাকতে পারি জয়া।

[একটু ক্রন্দন করিল]

বিজয়া ৷ কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন? ওদের আকর্ষণ করবে বল্‌লে যে!

ভৃঙ্গী ॥ কেঁদে প্রাণটা একটু হালকা করে নিচ্ছি জয়া!

বিজয়া। তা বেশ, এইবার ওদের চট করে এনে দাও দেখি, বুঝবো তোমার কেমন শক্তি।

ভৃঙ্গী ॥ ওরে ভাই! আমাদের মা'র পায়ের এক একটী ধুলোকণা থেকে যে শক্তি জন্মাচ্ছে, তাতে যে কত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, তাতো দেখতে পাচ্ছিস্‌নে তোরা...আমরা সিদ্ধি খাই আর সেই ধুলো গায়ে মাখি। তোরা সিদ্ধিও খাস্‌নে...পায়ের ধুলোর মর্ম্মও বুঝিস্‌নে—শক্তি পাবি কেন!.. তুইও বাবাকে হিড় হিড় করে টেনে আনতে পারতিস্। বড় দুঃখ জয়া তোরা মার দেশের মেয়ে হয়েও মাকে চিন্‌লিনে।

[পাত্র হইতে সিদ্ধিপান]

বিজয়া ॥ তুমি তা হলে সিদ্ধিই খাও আমি তোমার মাকে গিয়ে বলি, ভৃঙ্গীকে বললাম একটু এগিয়ে দেখ, তা ও গ্রাহ্যই করলো না—বসে বসে শুধু সিদ্ধিই খাচ্ছে !

ভৃঙ্গী ॥ শিব—শিব—শিব—তুমি ভাই ভারি দুষ্টু মেয়ে। দাঁড়াও.... আমি দেখছি। (চোখ বুজিল) ঐযে, ঐযে, গুটী গুটী পা'-পা' করে আসছেন আমাদের বৃষভ মহারাজ ! নাঃ নন্দীদা ষাঁড়টাকেও সিদ্ধি খাইয়েছে ! চোখ দুটো বুজে বাবার ষাঁড় হাঁট্‌ছেন ! আর বাবা তো ষাঁড়ের পিঠে ধ্যানস্থ ! আমাকেই উঠতে হলো দেখছি। (উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত) একটু জোরে চল বাবা ষাঁড় ! হট্‌—হট্‌—হট্‌—হাঁ ডাইন—ডাইন—হুরর—হট—নন্দীদা তুমি কর্চ্ছ কি···ল্যাজটা একটু মুচড়ে দাওনা—সিদ্ধি ঘুটে আমার হাতটা ব্যথা হয়েছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হট্‌—হট্‌—হট্‌।

[বিজয়াকে ষাঁড় মনে করিয়া তাহাকেই তাড়া করিলেন]

বিজয়া ॥ আঃ এ কি ! একি হচ্ছে ! আমি বিজয়া !

ভৃঙ্গী ॥ নন্দীদা, মা কাঁদছেন ! মা কাঁদছেন ! তাড়া কর, না হয় আমিই তাড়াচ্চি—তুমি ল্যাজটা মুচড়ে দাও ! হাঁ, হাঁ হট্‌—হট্‌ (বিজয়াকে তাড়া করিল)

বিজয়া ॥ (ভয়ে শিহরিয়া উঠিল) আমি বিজয়া—আমি বিজয়া ওমা গো ! বাবা গো ! (বিজয়ার পলায়ন)

ভৃঙ্গী ॥ হরবর—হট্‌—হট্‌—ডাইন—ডাইন—বাঁয়—বাঁয়।

[বিজয়ার পশ্চাদ্ধাবন]

[অন্য দিক দিয়া তাল ও বেতালের প্রবেশ]

বেতাল ॥ ভাই তাল ! ও যে শেষটায় ভৃঙ্গীর সঙ্গে খেলছে ! ঐ নেশাখোর আদ্দিকালের বদ্দি বুড়ো—শেষে তার সঙ্গে ! এ দুঃখ যে মলেও যাবে না।

তাল ॥ ওটী কোনটী ? ছোটটী না বড়টী ?

বেতাল ॥ মনে হচ্ছে বড়টী—

তাল ॥ না না চেহারায় হয়তো একটু বড়—কিন্তু বয়সে এইটীই ছোট—

বেতাল ॥ কখনো না—দেখছিস্‌ নাক—

তাল ॥ না—না—আর নাক নয় !···আজ একবার সামনা সামনি শুধু জিজ্ঞাসা···দেবি ! আপনার বয়স কত ? কি বলে তাই শোনা যাক না।

আমি জিজ্ঞাসা করছি একে—তুই গিয়ে জিজ্ঞেস কর তাকে—যদি দ্‌জনেই এক বলে—তা হলেই সত্যি। সব গোলই গেল চুকে!

বেতাল ॥ কি করে চুকল?

তাল ॥ বড়টা বড়র—ছোটটা ছোটর....

বেতাল ॥ বড়টা বড়র আর ছোটটা ছোটর! তাইতো! এই সোজা জিনিসটা কিছুতেই মনে থাকছে না, কী বোকা তুই তাল। আমি এখনই যাচ্ছি—

[ছ্‌টিয়া প্রস্থান]

তাল ॥ এই যে আবার এই দিকেই আসছে—ছ্‌টে আসছে! কি ভাগ্য কি ভাগ্য!..হাত জোড় করে বলব...হাঁটু গেড়ে বসে বলব (ফুল লইয়া)...পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বলব—

[যুক্তকরে নতজান্‌ পুষ্পাঞ্জলি লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল]

[ছুটিয়া বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া ॥ পালিয়ে খুব বেঁচেছি যা হোক্ (তালকে দেখিয়া) ওমা এ আবার কি!

তাল ॥ দেবি! অধমের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর!

[বিজয়ার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ]

বিজয়া ॥ কেন? ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নেব কেন?

তাল ॥ একটা প্রশ্ন করবো—আপনি কৃপা করে—

বিজয়া ॥ কি প্রশ্ন?

তাল ॥ (উঠিয়া) দেবি! আপনার বয়স কত?

বিজয়া ॥ আপনার নাম কি?

তাল ॥ শ্রীতাল—মহাতাল।

বিজয়া ॥ ও তাল বেতালের তাল তুমি! (হাসিয়া উঠিল) বুঝেছি বুঝেছি!

[নেপথ্যে ভৃঙ্গি]

ভৃঙ্গী ॥ হট্—হট্—হট্—ডাইন্-ডাইন—বাঁয়-বাঁয়—হট্—হট্—

বিজয়া ॥ আবার আসছে যে।

তাল ॥ কে আসছে? ও কেন আসছে?

বিজয়া ॥ ভৃঙ্গী।

তাল ॥ তা আসুক—মা ভৈঃ—আমরা ওকে ভয় করিনা। (তাল ঠুকিল) —কিন্তু আপনার বয়স ?

বিজয়া ॥ বলব, যদি আপনি আমাকে ভৃঙ্গীর কবল থেকে উদ্ধার করেন।

তাল ॥ কি ভাগ্যি—আমার কি ভাগ্যি ! নিশ্চয়ই উদ্ধার করব। তাল ঠুকে উদ্ধার করব—তা আমাকে প্রথমে কি করতে হবে ?

বিজয়া ॥ আপনাকে ষাঁড় হ'তে হবে।

তাল ॥ আমাকে ষাঁড় হ'তে হবে !

বিজয়া ॥ ঐ ভৃঙ্গী আসছে ও চোখে দেখছে না ! শিবঠাকুরের ষাঁড় হারিয়ে গেছে—ও খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি যেন সেই ষাঁড় !

তাল ॥ আমি যেন সেই ষাঁড় ! ভারি মজা ত ! (হাস্য) ওরা খুব সিদ্ধি খেয়েছে বুঝি—ভৃঙ্গী বুড়ো ! ও খুব বুড়ো আদ্দি কালের বদ্দি বুড়ো —ওর কাছে আপনি যাবেন না দেবী।

বিজয়া ॥ আচ্ছা—এবার চলুন। ঐ যে এই দিকেই আসছে আপনি এগিয়ে গিয়ে বসুন—আমি এইখানেই আছি ওর কাছ থেকে অব্যাহতি পেলেই আপনি যে প্রশ্ন করবেন উত্তর দেবো !

তাল ॥ দেবীর অনুকম্পা ! আমি যাচ্ছি ওর কাছে ! ওকে আমি আদৌ ভয় করি না।

[বিজয়ার অন্তরালে গমন]

নেপথ্যে ভৃঙ্গী ॥ হট্—এই—হট্—হট্—

বিজয়া ॥ (অন্তরাল হইতে) যান্—ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বসুন—

[তালের তথাকরণ]

হট্ হট্ করিতে করিতে ভৃঙ্গীর প্রবেশ ও তালের সহিত সংস্পর্শ

ভৃঙ্গী ॥ কে বাবা তুমি ! পথের মাঝখানে বসে আছ ?

তাল ॥ (বৃষের রব করিয়া)

আমি বাবার ষাঁড়—

ভৃঙ্গী ॥ বাবা ষাঁড় বসে পড়লে কেন ? আর তো চালাকি চলবে না। (তালকে ধাক্কা মারিল)

তাল ॥ উঃ—আস্তে—আস্তে—

ভৃঙ্গী ॥ আস্তে কিরে বেটা—মা কাঁদছেন। বাঁ—বাঁ—প্রভু এই, এলেন বলে—কাঁদিস্নি মা—কাঁদিস্নি—এই হট্-হট্—

[তালের চুল ধরিয়া আকর্ষণ]

তাল ॥ উঃ—গেলুম—গেলুম—এ আমার কেশ, লেজ নয়—দোহাই ভৃঙ্গীদা—আমাকে ছেড়ে দাও বাবা—দেবি! আপনার বয়স জানতে চাই না—আমাকে বাঁচান!

বিজয়া। (হাসিয়া) যাই জয়াকে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

ভৃঙ্গী ॥ এই হট্—হট্ প্রভু এই এলেন বলে মা, প্রভু এই এলেন বলে। কাঁদিস্‌নি মা—কাঁদিস্‌নি—হট্ হট্—

[তালকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান]

[অন্য দিক দিয়া ধীরে ধীরে সতীর প্রবেশ। পথ পানে সতী তাকাইয়া রহিলেন। পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল জয়া]

জয়া ॥ পথের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটি যে তোমার গেল সখি! চল—ঘরে চল—

সতী ॥ তিনি না এলে আর আমি ঘরে যাব না সখি। তিনি যেতে চাই-ছিলেন না—আমিই জোর করে তাঁকে পাঠিয়েছি। সেখানে যদি তিনি অপমানিত হন—এ দেহ আমি আর রাখব না—রাখব না জয়া।

[প্রস্থান]

[ভৃঙ্গীর প্রবেশ]

ভৃঙ্গী ॥ এই যে মা। প্রভুকে আমি এনেছি মা। ঐ তিনি আসছেন—

সতী ॥ সত্য সত্য? কই?

ভৃঙ্গী ॥ আসছেন মা, আসছেন—আমি বেলপাতা আনছি—তুই পুজো করবি—

[ছুটিয়া বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া ॥ প্রভু এসেছেন! প্রভু এসেছেন!

সতী ॥ (অগ্রসর হইয়া) প্রভু! প্রিয়তম!

[শিবের প্রবেশ]

শিব। প্রিয়া।

সতী ॥ কুশল?

শিব ॥ তোমার প্রেমে সবই কুশল প্রিয়া !
সতী ॥ সেখানে কি হল তুমি আমাকে বল প্রভু !
শিব ॥ সে এক বিরাট যজ্ঞ প্রিয়া।
সতী ॥ পিতা এসেছিলেন ?
শিব ॥ এসেছিলেন দেবি !

[সতী শিবকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাঁহার মুখ পানে তাকাইলেন,
কিন্তু না জানি কি শুনিতে হয় এই ভয়ে তখনই মুখ নামাইলেন]

শিব ॥ না প্রিয়া, যে আশীর্ব্বাদ আমি চেয়েছিলাম, সেই আশীর্ব্বাদই তিনি করেছেন ! যাগ যজ্ঞে যেতে আমায় নিষেধ করেছেন—

সতী ॥ (কি বলিলেন বুঝিলেন না)

শিব ॥ আমার অন্তরের অন্তরতম কামনাই তিনি পূর্ণ করেছেন। যাগ-যজ্ঞ আমি চাইনা—আমি চাই একান্ত ভাবে তোমায় ! প্রিয়া ! প্রিয়া ! সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে শুধু হলাহলই বরণ করেছি। বিষে আমার দেহ জর্জ্জরিত। সকাতরে আজ শুধু তোমারি কাছে ভিক্ষা চাইছি অনন্ত অমৃত। অমৃতময়ী তুমিও কি বলবে 'না' ?

সতী ॥ হে আমার স্বামী ! হে আমার দেবতা ! বিশ্বজগৎ যে আমার কাছে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু আমি দেখছি তোমাকে। শুধু তুমি আর আমি ! আমার দেহ মন, আমার আত্মা, আমার অনুভূতি, আমার সকল সত্তা তোমাকেই যে আমি নিবেদন করেছি ! আমি যে একান্ত তোমারই !

[সতী শিবের কণ্ঠলগ্না হইলেন]

[নন্দীর প্রবেশ]

নন্দী ॥ না প্রভু, আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি ভ্রান্ত তাই বুঝেও বুঝতে পারি না নিন্দা-স্তুতি সবই যে তোমার কাছে সমান। এই যুগল মূর্ত্তি যদি চিরদিন দেখতে পাই—যাগ যজ্ঞ রসাতলে যাক্ ! কি প্রয়োজন সেখানে যাবার। ওরে কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয় নয়ন মন সার্থক কর !

[কিরাত কিরাতিনী ভূত প্রেত প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া আসিল]

গান

ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখ্‌রে দেখ্ চেয়ে।
পাহাড়ী বাবার পাশে রাজদুলালী মেয়ে।
দেব্‌তা মোদের হর পরম মনোহর,

হরমনোহারিণী তার চেয়ে সুন্দর—
যেন ঝরে রূপের পাগল ঝোরা ধবল গিরি বেয়ে ॥
বরফের পাহাড় ঘিরে ভোরের সোনার আলো
আছে থির হ'য়ে যেন দেখে চোখ্ জুড়াল ;
চাঁদ যেন লো লতা হয়ে
(আছে) চন্দ্রচূড়ে ছেয়ে ॥

[সূর্য্যাস্তের পর দেখা গেল—ধ্যানস্থ শিব—এবং তাঁহারই সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণতা সতী। সতী শিবকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন]

[নিম্নে ত্রিশূল হস্তে নন্দী বিল্ববৃক্ষতলে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান]

[বীণাবাদ্য করিতে করিতে নারদের প্রবেশ]

নারদ ॥ নন্দী! সব কুশল তো ?

নন্দী ॥ পিতা যার মহেশ্বর মাতা যার মহাশক্তি—তাদের কি কখনো অকুশল হতে পারে দেবর্ষি !

নারদ ॥ প্রভু ?

নন্দী ॥ ধ্যানস্থ।

নারদ ॥ মা ?

নন্দী ॥ অন্তঃপুরে।

নারদ ॥ থাক্ তবে। আমি বড় ব্যস্ত। মহাদেবীকে এখান থেকেই প্রণাম করে আমি প্রস্থান করলাম নন্দী।

প্রস্থানোদ্যত

শিব ॥ কে ও ? নারদ ! এস····

[শঙ্কাকুলচিত্তে নারদ কাছে আসিলেন]

কি সংবাদ ?

নারদ ॥ ত্রিভুবন পরিক্রমণ কর্ত্তে বের হয়েছি। পথে কৈলাস। ভাবলাম মহাদেব মহাদেবীর দর্শন-পুণ্য হতে বঞ্চিত হই কেন ! তাই এলাম।

শিব ॥ ত্রিভুবন পরিক্রমণ ! কেন ?

নারদ ॥ আমি আশুতোষের ক্ষমা চাইতেই কৈলাসে এসেছি।

শিব। ক্ষমা ! কেন ?

নারদ ॥ প্রজাপতি দক্ষ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। এই মহাযজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণের গুরুভার আমারই উপর অর্পিত হয়েছে।

শিব ॥ এ আনন্দেরই কথা নারদ।

নারদ ॥ কিন্তু এ যজ্ঞ শিবহীন। ত্রিভুবন এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ···অনিমন্ত্রিত শুধু কৈলাস।

শিব ॥ আমি এইরূপই অনুমান করছিলাম নারদ!

নারদ ॥ তথাপি বললেন আনন্দের কথা! আনন্দ! না মহাপাপ! আমার যে উভয় সংকট! প্রভু মহাপাপ হলেও নিবারণ করবার উপায় নেই।—যেহেতু আমি কনিষ্ঠ তিনি জ্যেষ্ঠ!

শিব ॥ যজ্ঞ হলেই জগতের মঙ্গল—আমাদের নিমন্ত্রণ নাইবা হল নারদ! ··· আমার শিবত্ব না হয় গেলই তাতেই বা কি ক্ষতি?

নারদ ॥ প্রভু!

শিব ॥ সতীকে এ সংবাদ না দিলে হয় না? দিলে তিনি ব্যথা পাবেন—

নারদ ॥ আপনার ক্ষমা যখন পেলাম তখন আর কেন! আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত না করেই বরং চলে যাই। সেই হবে পরম নিরাপদ।

শিব ॥ না নারদ ·· তোমার আগমনবার্ত্তা তিনি হয়ত এতক্ষণ পেয়েছেন। এখন দেখা না করে চলে গেলেই অধিকতর আশঙ্কার কথা। ঐ যে তিনি আসছেন। আমার অসাক্ষাতেই বরং তোমাদের আলাপ সহজ হবে।

[প্রস্থান]

[সতীর প্রবেশ]

নারদ ॥ জানামিধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

সতী ॥ দেবর্ষি!

নারদ ॥ হ্যাঁ মা!

সতী ॥ আমার পিত্রালয়ের সংবাদ কি? পিতা-মাতা—কুশলে আছেন?

নারদ ॥ হ্যাঁ মা, সকলে কুশলেই আছেন।

সতী ॥ আমাকে তাঁরা ভুলেই গেছেন—না দেবর্ষি?

নারদ ॥ তুমি কি তাঁদের ভুলতে পেরেছ? তবে একথা কেন জিজ্ঞেস করছ মা? তোমাকে কি কেউ ভুলতে পারে মা?

সতী ॥ ভোলবার কথা নয় জানি, কিন্তু ভুলেছেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে অন্ততঃ একটী বারও কি তাঁরা আমার সংবাদ নিয়েছেন? তোমাকেও যে

তাঁরা আমারই সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন তা'তো মনে কর্ত্তে পারছি না দেবর্ষি !

নারদ ॥ না মা, আমায় সে উদ্দেশ্যে তাঁরা পাঠান নি।

সতী ॥ তবে কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন দেবর্ষি ?

নারদ ॥ আমাকে এখানে আসতে তাঁরা নিষেধই করেছিলেন মা !

সতী ॥ নিষেধ করেছিলেন ! কেন ?

নারদ ॥ (নিরুত্তর)

সতী ॥ কে নিষেধ করেছিলেন ?

নারদ ॥ (নিরুত্তর)

সতী ॥ মা ?

নারদ ॥ না, না সতী, তাঁর উপর এ অবিচার তুমি করোনা।

সতী ॥ তবে পিতা ?

নারদ ॥ ক্ষমা কর··· আমায় তুমি ক্ষমা কর, তোমার পিত্রালয়-প্রসঙ্গে আর আমি কোন কথাই বলতে পারব না। তবে যদি মা তুমি অভয় দাও—

সতী ॥ দেবর্ষি। যত দুঃসংবাদই হোক্ না কেন, তুমি আমায় বল। আমি তোমায় বলছি কোন আঘাতই আর আমায় বিচলিত কর্ত্তে পারবে না—

নারদ ॥ মা ! প্রজাপতি দক্ষ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। ত্রিভুবন তাতে নিমন্ত্রিত—অনিমন্ত্রিত শুধু কৈলাস !

সতী ॥ অনিমন্ত্রিত ! তবে তুমি এখানে কেন এসেছিলে ?

নারদ ॥ কেন এসেছিলাম তাও জানি না। নিয়তি পরিচালিত হয়েই হয়ত এসেছিলাম ! হয়ত কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ আগমনের আবশ্যক ছিল—কিন্তু সে কথা থাক্। চিরকাল মনে হয়েছে ; আমি মহাকালের মহাপাষাণ—জগতের হাসি-কান্নার ধারা সে পাষানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে—কোন রেখাপাত কর্ত্তে পারেনি—কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমি পরাজিত হলাম। আজ এই প্রথম অনুতাপ হচ্ছে, কেন কৈলাসে এসেছিলাম। নারদের চির শুষ্ক চক্ষু আজ এই প্রথম অশ্রুসিক্ত হল ! বিদায় মা ! বিদায় !

[নারদের প্রস্থান]

[অন্য দিক হইতে বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া ॥ সতী ! ব্যাপার কি ? সারা আকাশ বিচিত্র করে রাজহংসের ঝাঁকের মত সারি সারি রথ চলছিল একই দিকে ; —তারি দু'খানি রথ কৈলাসে নামল, একখানা চন্দ্রদেবের কলহংস ; আর খানা অগ্নিদেবের ধূপশিখা—

[ছুটিয়া জয়ার প্রবেশ]

জয়া ॥ সখি ! দেখ কারা এলেন !

[স্বাহা, রোহিণী, অশ্লেষার প্রবেশ]

স্বাহা। এই যে সতী! কি ছিলি কি হয়েছিস্! তোকে যে চেনাই দায়!

রোহিণী॥ ওমা, এই নাকি সতী! পোড়া কপাল আমার! মায়ের পেটের বোনকেও চিনতে পারিনা! আমি ভেবেছিলাম সতীরই কোন দাসী!

অশ্লেষা॥ তা বোন, যার যেমন তপস্যা! যে যেমন তপস্যা করেছে তেমনি ঘরে সে পড়েছে! সকলেরই কি বড় ঘরে বিয়ে হয়!

[সতী সকলকে প্রণাম করিলেন]

সতী॥ জয়া! আসন এনে দাও!

স্বাহা॥ না—না—আসন আবার কেন! এখনি তো যাব। তুই যাবিনে? বাবা যে বিরাট এক যজ্ঞ করছেন। তোকে নিতে পাঠান নি?

সতী॥ না।

রোহিণী॥ যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ হয়নি জানি। কিন্তু তুই হ'লি বাবা মার সবচেয়ে আদরের মেয়ে! তোকে তারা নিতে পাঠালেন না। বলিস্ কি সতী?

সতী॥ কি বলব বল!

অশ্লেষা॥ কি আশ্চর্য্য! অথচ আমাদের উপর কি দৌরাত্ম্য হয়েছে বলত! দেহ ভাল ছিল না! ভাবলাম যাব না—নারদ-ঠাকুর গিয়ে এমন ধর্ণাই দিলেন যে না এসে রক্ষা আছে।

স্বাহা॥ নারে সতী, হয়ত লোক এসে ফিরে গেছে। ভূত প্রেতের যা দৌরাত্ম্য এখানে—আমরাই নামতে ভয় পাচ্ছিলাম—

সতী॥ দেবর্ষি এখানেও এসেছিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণ করেননি। আমি বুঝেছি এ যজ্ঞে পিতা আমাদের নিমন্ত্রণ করেননি—ইচ্ছা করে—

অশ্লেষা॥ সে তো আমরা জানি। তা ভূতনাথের যা বেশভূষা আর যে সব সঙ্গী সাথী—বাবা বুঝে সুজেই নেমন্তন্ন করেননি। যদিই বা কর্ত্তেন, তুইই বা কি করে যেতে দিতিস্ ঐ দেব-সভায়! লজ্জায় মাথা কাটা যেত যে!

সতী॥ তোমার পায়ে পড়ি তুমি ক্ষান্ত হও!

স্বাহা॥ তা বাবা না হয় নিমন্ত্রণ করেননি—মাও কি কিছু বলে পাঠাননি?

সতী॥ না!

অশ্লেষা॥ অথচ মা নাকি তোর জন্য আহার ছেড়েছেন, নিদ্রা ছেড়েছেন পাগল হয়েছেন বলেই শুনেছি—

সতী ॥ সত্য বল্ছ ?

অশ্লেষা ॥ চোখে দেখিনি বোন—শুনেছি ! তা তুই চলনা ! আমাদের সঙ্গে, মাকে দেখে আসবি ! যজ্ঞে না হয় নাই বা গেলি।

রোহিণী ॥ ডাকেননি বলেননি—যায়ই বা কি করে !

স্বাহা ॥ এ তুমি কি বলছ বোন ! যাবে তো মার কাছে, তার আবার নিমন্ত্রণ কি ? তার আবার মান-অপমান কি ?

সতী ॥ আমি ভেবে দেখবো ! যদি যাই পরে যাব। তোমরা এসো।

অশ্লেষা ॥ পরে কেন বল্তো ? সাজ-গোজ ? গয়না পত্র ? তা নেই—নেই। ষাট জন আছি—এক একখানা খুলে দিলে মাথা থেকে পা ঢেকে যাবে—ভারে তুই চলতে পারবি না। দেব—?

সতী ॥ না—তোমরা এসো।

রোহিণী ॥ আর তো দেরীও করা যায়না স্বাহা !

স্বাহা ॥ তা হ'লে আমরা আসি। তুই কিন্তু আসবি—

সতী ॥ বলে দেখি—

অশ্লেষা ॥ কাকে আবার বলবি ? ওঃ, তাই তো কর্ত্তাকে ? তা—কই ! তাকে তো দেখছি না। হ্যাঁরে দিবারাত্রি বুঝি নেশা ভাঙ্ করে ? মারধর করে না ত ?

রোহিণী ॥ কেন ও-সব কথা তুলছ অশ্লেষা !

স্বাহা ॥ সে যে কি কান্ড করে সে তো আমাদের জানাই আছে। আহা বড় দুখ হয়, মার পেটের বোন তো হাজার হ'ক।

সতী ॥ উঃ, মাগো ?

স্বাহা ॥ আচ্ছা, তা হ'লে আসি সতী—পারিস্ তো যাস্, দুদিন থাকলে শরীরটা সেরে আসতে পারবি।

তিনজনে। (যাইতে যাইতে) যাস কিন্তু—

[বিজয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গেল]

সতী ॥ জয়া !

জয়া ॥ সখি !

সতী ॥ (একটু পরে) প্রভু কোথায় ?

[শিবের প্রবেশ]

শিব ॥ (সস্নেহে) কেন সতী ?

[জয়ার প্রস্থান]

সতী ॥ পিতা যজ্ঞ করছেন—ত্রিভুবনের নিমন্ত্রণ হয়েছে বাদ আমরা।

শিব ॥ জানি সতী—

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধ]

শিব ॥ দুঃখ হচ্ছে !

সতী ॥ দুঃখের কথা থাক। আমি তোমার স্ত্রী ব'লেই না আজ তোমার এই অপমান।

শিব ॥ ছিঃ প্রিয়া ! তুমি তো জানো তোমার ও-কথা কত মিথ্যা। প্রেমের যে মহাস্বর্গ আমরা রচনা ক'রেছি—সে মহাস্বর্গ—তুচ্ছ এ মান-অপমানের বহু ঊর্দ্ধে, নয় কি প্রিয়া ? (সতী নীরব) প্রিয়া ! (সতী নীরব) কি ভাবছ প্রিয়া ?

সতী ॥ ভাবছি আমার ভাগ্য। অথচ আমিই ছিলাম পিতা-মাতার প্রিয়তমা কন্যা—তাদের চোখের মণি—বুকের ধন।

শিব ॥ তবে কি পিত্রালয়ে তুমি যেতে চাও সতী ?

সতী ॥ আমি যেতে চাই না। যাবে তুমি।

শিব ॥ আমি ?

সতী ॥ হ্যাঁ, তুমি। রবাহুতের ন্যায় নয়, ভিক্ষা পাত্র হাতে নয়—শান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে নয়, ক্ষমা সুন্দর চোখেও নয়, যাবে রণসাজে—রুদ্র রূপে—সংহার মূর্ত্তিতে। ঐশ্বর্য্যের আজ এত স্পর্দ্ধা যে সে স্বেচ্ছাবৃত বৈরাগ্যকে এমনি করে অপমান করে। তোমার বৈরাগ্যকে এই মহা আদর্শকে এমনি করে উপহাস করে !—প্রভু ! প্রভু ! তারা ভুলে গেছে যে তুমি মহারুদ্র মহাকাল —তারা শুধু মনে রেখেছে তুমি শুধু শুভংকর ক্ষেমংকর শঙ্কর। তারা ভুলে গেছে যে মেঘ শুধু করুণার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে না—বজ্র ক্ষেপণও করে। হে ভৈরব ! হে মহাকাল ! হে মহারুদ্র ! জাগৃহি ! জাগৃহি ! জাগৃহি !

শিব ॥ শান্ত হও—শান্ত হও—শান্ত হও দেবি ! কাকে আমি আঘাত করব ! তাদের আঘাত করলে যে তোমাকেই আঘাত করা হবে প্রিয়া ! তারা যে তোমারি প্রিয়জন—তোমারি আত্মীয় স্বজন !

সতী ॥ আত্মীয় স্বজন ! প্রিয়জন ! তবে তাদের কাছেই আমায় পাঠিয়ে দাও !

শিব ॥ সতি !

সতী ॥ হ্যাঁ, আমি পিত্রালয়ে যেতে চাই।

শিব ॥ যেতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তাই তো ভাবছিলাম কি করে সতী আমার এমন নির্ম্মম হতে পারে ! কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে আমি কি করে বলি তুমি যাও—

সতী ॥ পিতৃগৃহে যেতে কন্যার নিমন্ত্রণের আবশ্যক হয় না প্রভু।

শিব ॥ হ্যাঁ, তা হয় না বটে সতী নিতান্তই কি তুমি যেতে চাও! তাঁরা যে ইচ্ছা করেই তোমায় স্মরণ করেননি সতী!

সতী ॥ সে করেননি পিতা—মাতা নয়। স্মরণ তাঁরা করেননি বলেই আমি যেতে চাই প্রভু! করলে হয়ত যেতাম না।

শিব ॥ দেবি! ইচ্ছা ছিল না তুমি যাও। কিন্তু তোমার মনে ব্যথা দেবো আমি কোন্ প্রাণে! তোমার দীর্ঘশ্বাসে অলকানন্দার আনন্দ-উৎস স্তব্ধ হয়েছে—পাখীরা তাদের কূজন ভুলেছে—কৈলাসের কুসুম অকালে ঝরে পড়েছে! আমি তোমায় ধ'রে রাখতে চাই না দেবি! কিন্তু দেবি! আমার অন্তরাত্মা বার বার শুধু এই বলেই কাঁদছে, তুমি যেয়ো না! তুমি যেয়ো না!

সতী ॥ কিন্তু, পিত্রালয়ে কি কন্যা কখনো যায় না প্রভু?

শিব ॥ হ্যা, পিত্রালয়! পিত্রালয়! না দেবী আর আমি তোমায় বাধা দোব না—নন্দী!

সতী ॥ তবে আর বিলম্ব নয় আমি আসি—

[সতীর প্রস্থান]

[নন্দীর প্রবেশ]

শিব ॥ নন্দী!

নন্দী ॥ প্রভু!

শিব ॥ দেবী পিত্রালয়ে যাবেন।

নন্দী ॥ বিনা নিমন্ত্রণে!

শিব ॥ পিত্রালয়ে যেতে কন্যার নিমন্ত্রণ আবশ্যক হয়না নন্দী। তুমি যাবে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকবে। আমার কেবলি আশঙ্কা হচ্ছে নন্দী, পিত্রালয়ে স্বামীনিন্দা সইতে না পেরে সতী আমার—সতী আমার—

[জয়া বিজয়ার সতীসহ প্রবেশ]

এই যে সতী! পিত্রালয়ের জন্য এমন ব্যাকুলতা তোমার কখনো দেখিনি সতী!

সতী ॥ এ কথা সত্য প্রভু!

শিব ॥ সঙ্গে যাবে নন্দী। নন্দী! বৎস! সম্মুখের অনন্ত অন্ধকারে মনে হচ্ছে যদি কোনও ভরসা থাকে সে তুমি।

[সতী জয়া বিজয়ার শিরশ্চুম্বন করিয়া শিবের সম্মুখে আসিলেন]

সতী ॥ প্রভু (সতী প্রণাম করিয়া) চল নন্দী !

নন্দী ॥ নিতান্তই কি না গেলে চলে না মা। বিশেষ বিনা আমন্ত্রণে ?

সতী ॥ পিত্রালয়ে যেতে কন্যার নিমন্ত্রণ আবশ্যক হয় না নন্দী !

নন্দী ॥ কিন্তু যে পিত্রালয়ে স্বামীর নিমন্ত্রণ নাই।

সতী ॥ স্বামীর নিমন্ত্রণ নাই বলেই তো আমি যাচ্ছি ; জানতে যাচ্ছি কেন তাঁর নিমন্ত্রণ নাই ; দেখতে যাচ্ছি কি ক'রে শিবহীন যজ্ঞ হয় ; এবং বলতে যাচ্ছি ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বধূ আমি—আমার স্বামী ত্রিলোকের স্বামী !

শিব ॥ নন্দী ! নন্দী ! (নন্দী ও সতী দাঁড়াইলেন) না—না না—পিছু ডাকব না ; তোমরা এসো—

[নন্দী ও সতী চলিয়া গেল]

শিব ॥ জয়া ! বিজয়া ! দেখছিস কি ? ওকে আমি হারালাম।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[দক্ষালয়]

দক্ষকন্যাগণ বসিয়া জবা ও জয়ন্তীর নৃত্য দেখিতেছিলেন

স্বাহা ॥ (নৃত্যশেষে) চমৎকার নেচেছ জবা। খুসী হ'য়ে তোমায় উপহার দিচ্ছি। (একটী হার দিল)

অশ্লেষা ॥ চমৎকার নেচেছিস জয়ন্তী ! ভারী খুসী হয়েছি ! এই এক জোড়া হারই তুই নে। (স্বাহার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া) আমার যেন কেমন – হাতে দুই ভিন্ন এক ওঠেনা।

স্বাহা ॥ পছন্দ হ'ল ত জবা ? আমি যা দিয়েছি তা মেকি জিনিস নয়। আজকাল মেকির এত চল্ হয়েছে, যে লোক দেখানো ঢং করা ভারী সোজা। কিন্তু সে তো আর আমাদের কাছে চলবে না। আমাদের হচ্ছে অগ্নি পরীক্ষা।

অশ্লেষা ॥ (রাগান্বিত হইয়া) স্বাহা !

স্বাহা ॥ (রাগান্বিত হইয়া) অশ্লেষা !

রোহিণী ॥ কি হল ? ব্যাপার কি ?

অশ্লেষা ও স্বাহা উভয়েই নিরস্ত হইলেন

স্বাহা ॥ কি আবার হল !

অশ্লেষা ॥ আমরা একটু আলাপ কচ্ছিলাম—

রোহিণী ॥ কি আলাপ হচ্ছিল বোন, আমরা কি শুনতে পাই না ?

অশ্লেষা ॥ ঐ যেন কেমন আমি চেঁচিয়ে কথা কইতে পারি না। (জয়ন্তীকে) চমৎকার নেচেছ ! চমৎকার !

স্বাহা ॥ এ নাচ কার কাছে শিখেছিলে তোমরা ?

জবা ॥ সতী শিখিয়ে গিয়েছিলেন।

অশ্লেষা ॥ সতী ?

জবা ॥ হ্যাঁ সতী।

[প্রসূতির প্রবেশ]

প্রসূতি ॥ সতী কই ? সে কি এসেছে ?

অশ্লেষা ॥ কই না ! তুমি স্বপ্ন দেখছ মা !

প্রসূতি ॥ কে যেন বলল সে আসছে। আমার মন বলছে সে আসছে !

স্বাহা॥ এলেও তো সে বলদের রথে আসছে ; দেরী একটু হবে বৈ কি মা।

মঘা ॥ বলদের রথে, তবেই হয়েছে, যজ্ঞ শেষে আমরা যখন বাড়ী ফিরব, তখন পথে দেখা হবে।

সকলের হাস্য

রোহিণী ॥ তা' তা'র আসারই যখন ঠিক নেই, তখন আর তা' নিয়ে হাসা-হাসি কেন ?

প্রসূতি। সে আজ না এলেই ভালো।

রোহিণী ॥ হ্যাঁ মা, সে আজ না এলেই ভালো। তাকে তুমি মা এনো যজ্ঞশেষে ; যখন আমরা কেউ থাকবো না। তখন একলা ঘরে তাকে বুকে নিয়ো, দুজনেরই প্রাণ জুড়োবে।

মঘা। কেন ? আমরা কি তার শত্রুর—যে আমরা থাকতে তার আসা চলবে না ?

অশ্লেষা ॥ বাপের উঁচু মাথা যদি হেঁট করাতে পারতে তবে একলা ঘরে মায়ের বুকে ঠাঁই পেতে ,বুঝেছ বোন। না মা ?

প্রসূতি ॥ ওরে সে আসবে না—সে আসবে না ! আমি তাকে জন্মের মত হারিয়েছি —এলেও হারিয়েছি না এলেও হারিয়েছি !

নেপথ্যে সতী ॥ মা ! আমি এসেছি—

প্রসূতি ॥ কে রে ! সতি ! সতি !

[সতীর প্রবেশ]

সতী ॥ মা ! মা !

প্রসূতির বুকে গিয়া পড়িলেন

স্বাহা ॥ কিসে এলে সতী ? বলদের রথে ?

অশ্লেষা ॥ সিঁথিতে শুধু সিন্দুর, আর হাতে দেখছি বালা—কিসের ? রুদ্রাক্ষ নাকি ?

স্বাহা ॥ ও আমি দেখলেই বুঝি। মন্দ কি। নকল সোনার চেয়ে ভালো।

মঘা ॥ শিবঠাকুরের কাণ্ড দেখ ; বাকল পরিয়ে আমাদের সোনার চাঁদ বোনটিকে পাঠিয়েছে। লজ্জা হ'ল না ?

রোহিণী। শিব বলে পাঠালো না কেন ? একখানা রামধনু রংয়ের শাড়ী, এক জোড়া হীরের বালা, একটা রক্ত মাণিকের হার পাঠিয়ে দিতাম। তাতেই চমৎকার মানাতো—

মঘা ॥ দুটো জবা ফুল আর একটা বেলপাতা দেখছি মাথায় গুজে এসেছে। কেন ? দেবরাজকে বলে পাঠালেই তো পারিজাতের হার পাঠিয়ে দিতেন।

প্রসূতি ॥ তোরা থাম্—ওরে তোরা থাম্।

মঘা ॥ মায়ের পেটের বোন কষ্ট হচ্ছে তাই বলছি।

প্রসূতি ॥ ও ইচ্ছে করেই তাপসী সেজেছে। নইলে ওর দুঃখ কি ? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি স্বয়ং কুবের ওর ভাণ্ডারী, চল মা তুই ঘরে চল।

সতী ॥ না মা বাবাকে গিয়ে আগে বল আমি এসেছি ; তিনি নিতে এলে তবে আমি যাব ! এটুকু অভিমানও কি আমার হতে পারে না মা ?

[ধীরে ধীরে প্রসূতি চলিয়া গেল]

স্বাহা ॥ কি সতি ! আমাদের সঙ্গে কথা কইবি না নাকি ?

সতী নীরব

রোহিণী ॥ ক'দিন থাক্‌ছ স্বাহা।

স্বাহা ॥ ক'দিন আর আমার কি থাক্‌বার উপায় আছে ; যত রাজ্যে যত যজ্ঞি হ'বে—কর্ত্তার সঙ্গে যেতেই হবে। না গেলে যে যজ্ঞিই হবে না ! তুমি ক'দিন আছ ?

রোহিণী ॥ মা তো আমায় একমাস থাক্‌তে বল্‌ছেন তাকি আর পারবো ?

উনোকোটী তারা আমাদের বাড়ীতে আলো দেয়! এখানে যেন সব আঁধার আঁধার ঠেক্‌ছে।

মঘা। আমার হ'য়েছে আর এক বিপদ! সোমরস এখানে মেলে না! বাড়ীতে রোজ দূতে পাঠিয়ে আন্‌তে হয়। এখানে থাকা কি আমাদের সাজে?

ছোট মেয়ে। সতী মাসী! শিব মেসো কি করে বাঘছাল পরে থাকেন? মা বলছিলেন তোমার ভালো ভালো শাড়ী আর গয়না বেচে তিনি ভাঙ্‌ খেয়েছেন?

রোহিণী॥ দুষ্টু মেয়ে মাসীকে কি এ সব কথা বল্‌তে হয়? সতী তুমি ভাই এই একরত্তি মেয়ের কথায় কান দিও না—

স্বাহা॥ বাবা আস্‌ছেন না কেন?

অশ্লেষা॥ বুঝছ না?

মঘা॥ না জানি কি সব কাণ্ড হ'চ্ছে! আর আমরা বসে আছি চল না কি হ'চ্ছে দেখে আসি!

[সতী ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল]

সতী॥ নন্দী—

নন্দী॥ মা—

সতী॥ এ আমি কোথায় এলাম? কেন এলাম? শিবপূজার আনন্দ ছেড়ে ইচ্ছা করে শিবনিন্দা শুন্‌তে এলাম একি পাপ—আমার যে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে নন্দী!

নন্দী। মা! মা!

সতী॥ যজ্ঞের ধূম দেখ্‌ছি··· আমি সইতে পাচ্ছি না, যজ্ঞের মন্ত্র শুন্‌ছি আমার সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত বোধ হ'চ্ছে! মহাদেব-চরণপদ্ম ছেড়ে এ আমি কোন নরকে এলাম! নন্দী—আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে! শিবপূজার আয়োজন করে দিয়ে আমায় বাঁচাও।—

[অর্দ্ধশায়িত হইয়া অচেতন হইলেন]

নন্দী॥ মা! মা! আমি পূজার আয়োজন কচ্ছি মা!

[ছুটিয়া বাহিরে গেল]

[নিঃশব্দপদসঞ্চারে দক্ষ সতীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্যাকুলচিত্তে কম্পিত বক্ষে সতীকে বুকে তুলিয়া নিতে গেলেন। কিন্তু অদূরে নন্দীর আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল "মহাদেব রক্ষা কর! মহাদেব রক্ষা কর!"

—শুনিয়া দক্ষ কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না—
নন্দীর স্বর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। দক্ষ নিজের
দৌর্ব্বল্যের সাক্ষী রাখিতে চাহেন না—তিনি
ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইয়া আত্মগোপন
করিলেন। নন্দী ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

নন্দী ॥ মা! মা! এই নাও বেলপাতা! এই নাও চম্পক! (সতীর হাতে গুঁজিয়া দিল) মহাদেব! মহাদেব!

[ক্রমে সতীর চেতনা হইল। তিনি ধীরে ধীরে নতজানু
হইয়া বসিয়া শিবস্তোত্র করিলেন। এবং শিবের
উদ্দেশে অঞ্জলি দিলেন]

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথং সদানন্দভাজম
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥
গলে রুদ্রমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম্
জটাজুটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্ব্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[কৈলাসের প্রান্তর]

[বিজয়া গাহিতেছিল]

গান

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো
তুমি ফিরিলেনা ঘরে।
শূন্য ভবনে ভয়ে ভয়ে মরি মা
মন যে কেমন করে ॥

তোমার বিরহে মা গভীর বিষাদে

শ্মশানে মশানে মহাকাল কাঁদে,

সূর্য্যে তেজ নাই জ্যোতিঃ নাই চাঁদে

উঠিয়াছে হাহাকার চরাচরে ॥

ক্ষুধার অন্ন নাই শুধায়না কেহ—

উপবাসী চিত্ত চায় মার স্নেহ ;

মাতৃহারা হয়ে বিশ্বের সন্তান

ফিরে আয় ফিরে আয় ডাকে কাতরে ॥

ভৃঙ্গী ॥ বিজয়া! তোর এত কথা আমি রেখেছি—আজ তুই আমার একটা কথা রাখ্। রাখ্—বিজয়া।

বিজয়া ॥ বিজয়া—না আমি জয়া ?

[ভৃঙ্গীর প্রবেশ]

ভৃঙ্গী ॥ বিজয়া—বিজয়া! ঐ দুঃখেই তো মরছি আমি লোক চিনতে পারছি! আমার ভুল হচ্চে না ; একজালা সিদ্ধিতে আর সিদ্ধি নেই! মহাব্যোমে উঠতে পাচ্ছি না! দেখতে পাচ্ছি না মা আমার কোথায়? আমি সবাইকে বলে দেবো মা কোথায়! কেন বেটী ফিরছে না! তুই শুধু আমায় একটি জিনিস এনে দে!

বিজয়া ॥ কি ?

ভৃঙ্গী ॥ আফিং! আফিং না হ'লে আজ আর হচ্ছে না—

বিজয়া ॥ আফিং যে অহিফেন! সদ্য বিষ!

ভৃঙ্গী ॥ ওরে! ঐ বিষই যে আজ আমি চাই! সিদ্ধিতে আর সিদ্ধি নেই—নেশা হ'চ্চে না, ভুল হ'চ্ছে না! বিজয়াকে বিজয়া বলছি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মা আমার চলে গেছে, শুধুই মনে হ'চ্ছে সে আর ফিরবে না! চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি গৃহবাসী বাবা আমার—আবার হ'য়েছে শ্মশানবাসী! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—কৈলাসের আকাশে বাতাসে তাঁরই বুকের দীর্ঘশ্বাস বাজ্ছে! পশুপক্ষী আর্ত্তনাদ করে উঠছে, ভূতেরা মা মা বলে কাঁদ্ছে, তুইও কাঁদ্ছিস্! ওরে—আমি ভৃঙ্গী—আমার চোখেও জল আসছে! এ সব কি ? দে—আমায় আফিং দে—ওরে তুই বলছিস্ বিষই যে আজ আমি চাই ; বাঁচতে তো আমি চাই না বিজয়া।

নেপথ্য হইতে শিব। ভৃঙ্গী!—বৎস!

ভৃঙ্গী ॥ বাবা! বাবা!

[ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান]

[অন্যদিক্ হইতে জয়ার প্রবেশ হাতে তাহার মঙ্গল ঘট]

জয়া ॥ বিজয়া শিগ্‌গীর তুমি এসো! আমার হয় তো ভুল হ'চ্ছে! আমার হয়তো ভুল হ'চ্ছে!

বিজয়া। মঙ্গলঘট হাতে এখানে ছুটে এলি! তবে কি—?

জয়া ॥ প্রতি মুহূর্ত্ত চেয়ে দেখছি মঙ্গলঘটের জল! চেয়ে চেয়ে চোখ আমার অন্ধ হয়ে আসছে; আমার খালি মনে হচ্ছে জল ক্রমেই লাল হ'য়ে আসছে! হ্যাঁ লাল—লাল রক্তের মত লাল! বিজয়া তুই দেখ—তুই দেখ!

বিজয়া দেখিবে এমন সময় শিবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল!
বিজয়া জয়াকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিল।

[শিবের প্রবেশ]

শিব ॥ সেই জন্যই তো যাচ্ছি—কেন তার নিমন্ত্রণ হ'লো না—দেখতে যাচ্ছি—কি করে শিবহীন যজ্ঞ হয়! বল্‌তে যাচ্ছি—আমি ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বধূ! আমার স্বামী ত্রিলোকের স্বামী—সতী—সতী—না না পিছু ডাক্‌বো না (হঠাৎ যেন চেতনা পাইয়া) জয়া! বিজয়া! ওরে তোরা দেখছিস্ কি? ওকে আমি হারালাম!

জয়া ॥ (আর্ত্তনাদ) প্রভু! প্রভু!—

শিব ॥ কি জয়া তুই অমন করে কেঁদে উঠলি কেন? কাঁদ্‌বি যদি তবে তোরা রইলি কেন? কেন গেলি না সঙ্গে? (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) যে যেতে পারে সে কেন যায় না? যেতে পারলে তো কাঁদ্‌তে হ'তো না!

বিজয়া ॥ সে আমাদের নিয়ে গেল না! তোমার কোন অযত্ন না হয় তাই সে আমাদের রেখে গেলো।

শিব ॥ কিন্তু কাঁদ্‌বার জন্য ত' রেখে যায়নি বিজয়া! কাঁদ্‌তে পারতাম আমি! ইচ্ছা হয় চীৎকার করে কাঁদি! কিন্তু····পারি না বিজয়া!

জয়া ॥ তুমি তাকে নিয়ে এস প্রভু! নিয়ে এস—নিয়ে এস!

শিব ॥ তোর হাতে মঙ্গলঘট দেখ্‌ছি! মঙ্গলঘটের জল দেখে শুভাশুভ নিরূপণ কচ্ছিস্? সতী করতো! কি দেখ্‌ছিস্?

জয়া ॥ প্রভু!

মঙ্গলঘটটী শিবের নিকট লইতেছিল, বিজয়া জয়াকে নীরবে বাধা
দিল কিন্তু ইহা শিবের দৃষ্টি এড়াইল না।

শিব ॥ মঙ্গলঘটের জল কি তবে রক্তবর্ণই হয়েছে জয়া?

ম-২৭০

উভয়ে নীরব

শিব ॥ মঙ্গলঘটের জল কি রক্তবর্ণই হয়েছে জয়া ?

উভয়ে তথাপি নীরব

শিব ঘটটী লইয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন

শিব ॥ রক্তবর্ণ—

জয়া-বিজয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

শিব ॥ (ধীরে ধীরে জয়ার হাতে ঘটটি দিয়া) হোক্ রক্তবর্ণ ! আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ তোমাকে ঘিরে আছে সতী ! কিন্তু তা যদি ব্যর্থ হয়—তবে —হে মহারুদ্র ! আর বুঝি ঘুমিয়ে থাকা চলে না। তুমি জাগো—হে মহারুদ্র তুমি জাগো—রুদ্ধশ্বাসে কাণ পেতে শোন—সতী কি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ! সতী কাঁদছে ! যদি পার তাও সহ্য করো—কিন্তু যদি তার প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়—ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই—কারো তবে ক্ষমা নাই।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

দক্ষযজ্ঞ

ঋষিগণ হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন

—যজ্ঞমন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা,
ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা
ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা, ওঁ সদ সম্পতয়ে স্বাহা, ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা।

১ম দেব ॥ শিবহীন যজ্ঞ—এই প্রথম—আজ একটু গুরুতর কিছু হ'বে।

২য় ॥ অগ্নিদেবও জামাই আর সেই ভাঙড়ও জামাই! আকাশ আর পাতাল। অগ্নিদেবের সাজটা দেখছো ? চোখ ঝলসে যায়।

৩য় ॥ ভাঙড় ত আর জামাই নয়! নয় বলেই ত' নেমন্তন্ন হয়নি।

২য় ॥ জামাই ছিল—এখন পদচ্যুত হয়েছে! পদচ্যুত।

৫ম ॥ দেখ দেখ হোমাগ্নি জ্বলছে না! অগ্নিদেব নিজে আহুতি দিচ্ছেন তবুও না—

৪র্থ ॥ যজ্ঞটা শেষ পর্য্যন্ত হ'লে হয়! নারদ ঠাকুর কোথায়?

১ম ॥ আমিও তাঁকেই খুঁজছি! নারদ, নারদ, নারদ—নারদ—

[প্রস্থান]

২য় ॥ যজ্ঞ যে কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে! জম্‌ছে না। সবাই কেমন চুপচাপ বসে আছে! উৎসবের উ-টি পর্য্যন্ত নেই

৩য় ॥ এ যেন কারো গঙ্গা যাত্রা হ'চ্ছে! বড় বড় দেবতারা বড় বড় ঋষিরা যজ্ঞ ছেড়ে এদিকে ওদিকে বায়ু সেবন ক'রে বেড়াচ্ছেন। কেমন একটা পালাই পালাই ভাব।

৪র্থ ॥ আচ্ছা, শিবের যেন নেমন্তন্ন হয়নি! কিন্তু ব্রহ্মা—বিষ্ণুকেও তো দেখছি না।

৫ম ॥ দক্ষই বা কোথায় গেলেন! নাঃ কি রকম সব গোলমাল ঠেক্‌ছে।

প্রথম দেবের প্রবেশ

১ম ॥ ওহে শুনেছ? শুনেছ?

সকলে ॥ কিহে কি?

১ম ॥ জমে গেল যজ্ঞ আমাদের জমে, গেল।

২য় ॥ আঃ বল না কি?

১ম ॥ সতী এসেছে সতী!

৩য় ॥ তবে শিবও এসেছে?

১ম ॥ তার তো নেমন্তন্ন হয়নি।

২য় ॥ ভাঙড়ের আবার নেমন্তন্ন! এলেই হ'তো।

৩য় ॥ এলে ত হোতই—লেগে যেতো।

২য় ॥ আঃ নারদটা কোথায়? একবার হরি গুণ গান কর্ত্তে কর্ত্তে কৈলাসে গিয়ে ভাঙড়টাকে টেনে আনতে পারে না?

৩য় ॥ তা সতী যখন এসেছে এতেই একটা কিছু হবেই হবে।

৫ম ॥ দক্ষকে দেখছি না? ভিতর বাড়ীতে কিছু যে একটা হ'চ্ছেনা তাই বা কে বলতে পারে?

৩য় ॥ চুপ—চুপ, ঐ দক্ষ আসছেন।

ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।
ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ ॥ (হোমাগ্নি দেখিয়া) কি হে অগ্নি! কই হোমাগ্নি এখনও তো আকাশ স্পর্শ করে নি!

অগ্নি ॥ করবে বই কি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিজে আহুতি দিচ্ছি—

ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা, ও চিত্তিশ্চ স্বাহা, ওঁ অকুতঞ্চ স্বাহা।

নারদের প্রবেশ

নারদ ॥ তুমি ভেবো না প্রজাপতি! ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই যজ্ঞে আসতে ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু আমি তাঁদের সম্মত করে এসেছি। তাঁরা আসছেন। কিন্তু যা শুনছি, তা কি সত্য প্রজাপতি?

দক্ষ ॥ কি?

নারদ ॥ আমার সতী মা না কি একাকিনীই এসেছেন?

দক্ষ ॥ হ্যাঁ।

নারদ ॥ এমন পিতৃভক্ত কন্যা তোমার আর দ্বিতীয় নাই প্রজাপতি! দেখা হয়েছে?

দক্ষ ॥ হ্যাঁ! না দেখা হয়নি। ভৃগু? তোমার মন্ত্রপাঠে উদ্দীপনা নাই মনে হচ্ছে।

ভৃগু ॥ সে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অভাবে।

নারদ ॥ তাঁকেও তো খুব প্রদীপ্ত দেখে এলাম বলে মনে হলো না। তা' তিনি এই এলেন বলে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ

এই যে আসুন।

পিঙ্গলাক্ষর প্রবেশ

পিঙ্গ ॥ সতী দেবী প্রজাপতির সাক্ষাৎ কামনা করছেন।

দক্ষ ॥ কে? কে সাক্ষাৎ কামনা করছেন?

পিঙ্গ ॥ সতী দেবী।

দক্ষ ॥ (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আমার অবসর নাই। (একটু নরম হইয়া) আচ্ছা, দেখা হবে পরে।

পিঙ্গলাক্ষর প্রস্থান

ওঁ মনশ্চ স্বাহা, ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা।

দক্ষ ॥ অগ্নি! তোমার হোমাগ্নি?

অগ্নি ॥ (কাছে আসিয়া) আমার আশঙ্কা হচ্ছে—

হঠাৎ থামিয়া গেলেন

দক্ষ ॥ বলতে গিয়ে থামলে কেন? বল কি আশংকা? (অগ্নি নীরব) বল কি আশংকা?

অগ্নি ॥ কোন অনাচার হয়েছে নিশ্চয়?

দক্ষ ॥ অনাচার! অনাচার! আমার যজ্ঞে অনাচার?

অগ্নি ॥ হ্যাঁ প্রজাপতি. নতুবা আমি অগ্নি—নিজে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করছি অথচ—

দক্ষ ॥ কি অনাচার—তুমি বল—

নারদ ॥ যজ্ঞ শিবহীন, এই কথাই হয়ত অগ্নিদেব চাচ্ছেন—

অগ্নি ॥ না। আমি বরং বিপরীত অনাচারই আশংকা কচ্ছি।

দক্ষ ॥ বিপরীত অনাচার! তার অর্থ?

অগ্নি ॥ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে, অথচ যজ্ঞ শিবহীন আমি মনে করতে পারছি না প্রজাপতি। শিব স্বয়ং অনুপস্থিত কিন্তু তার অর্দ্ধাঙ্গিনী—

নারদ ॥ উপস্থিত। কিন্তু তাতে কি অনাচারটা হ'ল শুনি—

দক্ষ ॥ কিন্তু সে আমারি কন্যা, ভুলে যেয়ো না অগ্নি। সতী যেদিন এই পুরীতে ভূমিষ্ঠ হল, সেদিন সমগ্র বিশ্বের মহামঙ্গলই হ'ল মনে করেছিলাম। আজও অনুরূপ মনে করতে পারছিনা আমি। তবে এ কথাও ঠিক এ যজ্ঞে সে আসুক এ আমি চাইনি—সে যে এসেছে তাতেও আমি সুখী নই।

পিঙ্গলাক্ষর প্রবেশ

পিঙ্গ ॥ সতী মা প্রজাপতির দর্শন কামনায় ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন।—

দক্ষ ॥ হ্যাঁ—কিন্তু আমি ব্যাকুল নই।—

সতী ও নন্দীর প্রবেশ

সতী ॥ তাই আমি নিজেই এলাম পিতা।

সভায় চাঞ্চল্য

অগ্নি ॥ কিন্তু—কিন্তু—

দক্ষের দিকে চাহিলেন

ভৃগু ॥ (মন্ত্র পাঠ ছাড়িয়া আসিয়া) এর পরও কি আমাকে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে! (দক্ষের ইতস্ততঃ) বল প্রজাপতি, বল—

দক্ষ ॥ সতী! যজ্ঞশালা ত্যাগ কর—

নন্দী ॥ মা !

সতী ॥ (নন্দীকে নিবৃত্ত করিয়া) বাবা—বাবা—

দক্ষ ॥ (উভয় পার্শ্বে চাহিয়া পরে সতীকে দেখিয়া) মা !

ভৃগু ॥ এ অভিনয়ের কি আবশ্যক ছিল প্রজাপতি ! এই কি শিবহীন যজ্ঞ !

দক্ষ ॥ তোমার কি বলবার আছে শীঘ্র বল । যজ্ঞের বিঘ্ন হচ্ছে সতী—

সতী ॥ আমি তোমার কন্যা । তোমার মঙ্গল আমি চাই । চাই ব'লেই বিনা নিমন্ত্রণে আমি এসেছি পিতা ! এ শিবহীন যজ্ঞ তুমি করোনা ।

বিষ্ণু ॥ যজ্ঞেশ্বর বলে যদি আমায় সম্মান কর প্রজাপতি আমারও ঐ উপদেশ, শিবহীন যজ্ঞ তুমি করোনা ।

দক্ষ ॥ কেন ? কি ভয় ? ক্ষতিই বা কি ?

ব্রহ্মা ॥ বৎস ! শিব দেবাদিদেব মহাদেব । তিনি মহারুদ্র···মহাকাল । তাঁর প্রীতিতেই সৃষ্টি স্থিতি, অপ্রীতিতে মহাপ্রলয় !

দক্ষ ॥ আমি তা স্বীকার করিনা । বরং তার সম্বন্ধে আমি অতি হীন ধারণাই পোষণ করি । আপনারা আসন-পরিগ্রহ করুন । যজ্ঞ হচ্ছে—যজ্ঞ হবে ।

সতী ॥ বাবা ! আমার কথাও যদি তোমার মনোমত না হয় স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণুর উপদেশ তুমি অবহেলা ক'রোনা—ক'রোনা বাবা । শুধু এই জন্যেই আমি বিনা আহবানে এসেছি । পিতা ! অনুমতি দাও আমি তোমার কন্যা ; তোমার হয়ে নিজে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছি ! অনুমতি দাও—অনুমতি দাও পিতা !

দক্ষের হাত ধরিলেন

অগ্নি ॥ তা হলে আর কেন ! যজ্ঞ স্থগিত রেখে—চল সবাই গললগ্নীকৃতবাসে কৈলাসধামই যাত্রা করি ।—

ভৃগু ॥ চল প্রজাপতি—

সতী ॥ পিতা—আমি তোমার মুখে শুনতে চাই পিতা, তুমি কি তাঁকে নিমন্ত্রণ করবে না ! তুমি বল—তুমি বল পিতা । এ যজ্ঞে কি দেবাদিদেব মহাদেবের আসন শূন্য থাকবে ? তোমার উত্তর আমি শুনতে চাই—তোমার উত্তর ।

দক্ষ ॥ উত্তর আমি বহু পূর্ব্বেই দিয়েছি—আমি প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ দক্ষ—সর্ব্বভূতের ভাগ্যবিধাতা । অথচ আমাকেই কিনা ধুতরসেবী ভাঙড়ে অপমান করেছে । তাকে জামাতা বলে স্বীকার করতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—তার নাম আমার পুরীতে যেন আর কখন উচ্চারিত না হয় । এবং তার গৃহিণী

বলে যে পরিচয় দেয়—আমার কন্যা বলে তার পরিচয় দেওয়ার কোন অধিকার নেই।

দেবগণ হাসিয়া উঠিলেন

সতী ॥ স্তব্ধ হও দেবতামণ্ডল! তাঁর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝবে? মনে কর সমুদ্র মন্থন। ধরিত্রী যখন বিষ-জর্জ্জরিত··সে বিষপান করে সৃষ্টি রক্ষা কে করেছিলেন? আমারি নীলকণ্ঠ। ত্রিলোক যা ঘৃণায় করেছে পরিহার, তাকেই গ্রহণ করেছেন আমার মহাদেব! তোমরা নিয়েছ অগুরু চন্দন, তিনি নিয়েছেন ভস্ম। তোমরা নিয়েছ রত্ন-মাণিক্য তিনি নিয়েছেন শ্মশানের পরিত্যক্ত অস্থি-পঞ্জর। তোমরা নিয়েছ পারিজাত, তিনি নিয়েছেন বিষাক্ত ধুস্তুর। তোমাদের আনন্দ ভোগে, তাঁর আনন্দে ত্যাগে। তাঁর মহিমা তোমরা কি বুঝবে 'স্পর্দ্ধিত, দাম্ভিক দেবতামণ্ডল!

দক্ষ ॥ এক সাপুড়ে! পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি-মধ্যে বাস। জাতি কুল জন্মহীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মহীন। লঘুগুরু জ্ঞান নাই! বৃষস্কন্ধে শ্মশানে মশানে বিচরণ ধুস্তুর সেবন অর্দ্ধোলঙ্গ। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ।

সতী মরণাঘাতে আহত হইলেন, একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদে

সতী ॥ উঃ মহাদেব! মহাদেব! প্রভু!

পতন ও মৃত্যু

অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই সতীর কটিবিলম্বিত বল্কলাগ্র লেহন করিয়া প্রজ্বলিত হইল। যখন নির্ব্বাপিত হইল তখন দেখা গেল সতীর অদগ্ধ মৃতদেহ দিব্যদীপ্তিতে পড়িয়া আছে।

নন্দী ॥ মা! মা!

দক্ষ ॥ সতি! সতি!···মৃত!

নন্দী ॥ মা—মা—মা—মহাদেব! মহাদেব!

ঝড় ঝঞ্ঝা উঠিল। ক্রমে ক্রমে দৃশ্য অন্ধকারে পরিপ্লাবিত হইল হাহাকার শব্দে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হইল

দৃশ্যান্তর—কৈলাসের একাংশ

ধ্যানস্থ শিব,—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র

নেপথ্যে নন্দী ॥ মহাদেব! মহাদেব!

শিব ॥ (ধ্যান ভঙ্গ হইল) এ কি! এ যে মহাপ্রলয়

দূরে হইতে নন্দীর আর্ত্তকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল

নেপথ্যে নন্দী ॥ মহাদেব ! মহাদেব ! মহাদেব !

শিব ॥ কে ! কে আসে ! ঝঞ্ঝাগতিতে আকাশ বাতাস আর্ত্তকণ্ঠে কম্পিত করে কে আসে ?

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী ॥ মহাদেব—মহাদেব—

শিব ॥ কে—নন্দী ! আমার সতী ?

নন্দীর মুখে ভাষা সরিল না

শিব ॥ আমার সতী কোথায় ? আমার সতী ?

নন্দী ॥ মাকে আমি হারিয়েছি—মাকে আমি হারিয়েছি ।

শিব ॥ নন্দী !

নন্দী ॥ যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে—মা আমার—

শিব ॥ সতী নেই ! সতী নেই ! অথচ এখনো আমি আছি ! এখনো সৃষ্টি চলছে ! যজ্ঞ হচ্ছে—সতী—সতী—

শিবের জটা জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল—অট্টহাস্য করিয়া তিনি একগাছি জটা ভূতলে নিঃক্ষেপ করিলেন । সেই জটা পতনে বীরভদ্র নামক ভয়ঙ্কর শিবানুচরের সৃষ্টি হইল ।

তাহার মস্তকের কৃষ্ণ মেঘোপম মুকুট গগণালম্বী হইয়া রহিল এবং হস্তের শূল কৃতান্তনাশক তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া হত্যা-কার্য্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল

বীরভদ্র ॥ আদেশ !

শিব ॥ দক্ষ-যজ্ঞে স্বামী নিন্দা শুনে সতী আমার দেহত্যাগ করেছে—এখনো জিজ্ঞাসা—আদেশ ! সংহার—সংহার—সংহার—

শিবের অট্টহাস্য, সেই অট্টহাস্যের সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া প্রলয় তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিল । ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র

দৃশ্যান্তর — দক্ষ যজ্ঞাগার

পুরী হইতে সতীর মৃত্যুতে হাহাকার ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সেই হাহাকার শব্দতরঙ্গ ডুবাইয়া দিয়া প্রলয়-নিনাদ অগ্রসর হইতে লাগিল। যজ্ঞস্থলস্থ লোকেরা আর্ত্তকণ্ঠে এদিকে ওদিকে ছুটা-ছুটী করিয়া পলায়নপর হইল। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত। প্রলয়-তাণ্ডব নাচিতে নাচিতে শূলহস্তে কৃতান্তবৎ বীরভদ্রের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে ভূত প্রেত প্রভৃতি শিবানুচরগণ।

শিবানুচরগণ ॥ যজ্ঞনাশ! যজ্ঞনাশ! (অট্টহাস্য)

পুনরায় নেপথ্যে

দক্ষের শিরশ্ছেদ হল! দক্ষের শিরচ্ছেদ হল! (অট্টহাস্য)

ক্রমে ক্রমে যজ্ঞশালা শ্মশানাকার ধারণ করিল। বিপ্লব শান্ত হইল, রাত্রির অন্ধকারে যজ্ঞশালা আচ্ছন্ন হইল

ক্ষণপরে মহাবাত্যার অন্তে প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে চন্দ্রালোকে দেখা গেল প্রসূতি সতীর মৃতদেহ লইয়া বসিয়া আছেন, নেপথ্য হইতে চাপাকণ্ঠে ভাসিয়া আসিতে লাগিল

নেপথ্যে চাপাকণ্ঠে ॥ মহাদেব—মহাদেব—মহাদেব—মহাদেব—

মহাবাত্যার পর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে শিবের প্রবেশ সতীর মৃত্যুর বেদনা তাহার চোখে মুখে সুপরিস্ফুট

শিব ॥ সতী—সতী—সতী—

প্রসূতি ॥ সতী নেই! সতী নেই! স্বামীর জন্য সতীকে হারিয়েছি—তোমার জন্য স্বামীকে হারিয়েছি। আমার সোনার সংসার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

শিব ॥ সোনার সংসার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। এই ক্ষোভ! আর আমার?

কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল কিন্তু তখনি আত্মসম্বরণ করিয়া

না—না—না দেবি! জগতের যত বিষ,—যত জ্বালা সব আমারি থাক্।

তোমার স্বামী পুনর্জীবিত হোক, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পুনর্জীবিত হোক—যারা ক্ষত-বিক্ষত যারা আহত····সকলে শান্তিলাভ করুক। সুখ চাও—শান্তি চাও, সব তোমরা নাও। যা তোমরা চাওনা—তাই আমায় দাও—দাও আমায় আমার সতীদেহ—সতীদেহ—সতি—সতি—

নেপথ্যে পুনর্জীবিত নরনারী এবং প্রসূতি

সতি! সতি!

শিব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।
আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠিল

সতি! সতি! সতি!

য ব নি কা

জয় বাংলা

॥ লেখকের নিবেদন ॥

জাল মুজিব অবলম্বনে নাটকটির কাহিনী আমার স্বকপোল কল্পিত। সুভাষচন্দ্রের ভারত থেকে অন্তর্ধানের পর আমার অনুরূপ একটি কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে অপূর্ব মিত্রের পরিচালনায় 'ঝড়ের পরে' নামক একটি ফিল্মও প্রযোজিত ও প্রদর্শিত হয়েছিল তৎকালে।

এই নাটকটির রচনাকাল ৩রা জুলাই থেকে ২৬শে জুলাই, ১৯৫১। আমার শ্রুতিলিপিকার ছিলেন কবি ও নাট্যকার শ্রীমান সুনীল রাহা। নাটকটি 'অভিনয়' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশ করলেন শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি উভয়ের নিকটই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম।

টেলিফোন : ৩৫-৯৯৭৭ ২২৯সি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬	বিনীত **মন্মথ রায়**

চরিত্র-লিপি

[প্রবেশ অনুযায়ী]

হেনা—মোটর ড্রাইভার সিরাজের স্ত্রী। **ইয়াকুব**—সিরাজের শ্যালক। **সিরাজ**—মোটর ড্রাইভার। **ওসমান**—মুসলিম লীগপন্থী বড় অফিসার। **মীনা**—ঐ কন্যা। বাবুর্চি। **খানসামা**। ১ম গ্রামবাসী। ২য় গ্রামবাসী। ৩য় গ্রামবাসী। **নীলমণি**—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। **রহমৎ খাঁ**—পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসার। **রাম**—চণ্ডীপুরের গ্রামবাসী। **রহিম**—চণ্ডীপুরের গ্রামবাসী। **মোহন**—আওয়ামী লীগ কর্মী। **আসাবুল হক**—আওয়ামী লীগ যুবক। **হাজী সাহাবুদ্দিন**—মুসলীম লীগপন্থী প্রৌঢ়। **শ্যামসুদ্দীন**—আনসার নেতা। **দুর্গা দেবী**—চণ্ডীপুরের ভূতপূর্ব জমিদারের বিধবা স্ত্রী। **মহম্মদ শা**—চণ্ডীপুরের দারোগা। ১ম কনষ্টেবল। ২য় কনষ্টেবল। ৩য় কনষ্টেবল (**আম্বর**)। হেড কনষ্টেবল (**পীতাম্বর**)।

জয় বাংলা

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

(ঢাকা—২৬শে মার্চ সন্ধ্যারাত্রি। একটি গৃহস্থ পাড়ায় দারিদ্র্য লাঞ্ছিত একটি বস্তীর একখানি ঘর—একফালি বারান্দাও আছে। নিকটস্থ গলিপথে মাঝে মাঝে উত্তেজিত কোলাহল উত্থিত হইতেছে। ঘন ঘন 'জয়বাংলা' ধ্বনিও শোনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে দূরে গুলিগোলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে। একদল লোক 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গাহিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ বন্দুকের গুলিতে আক্রান্ত হওয়ায় সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণকাল নীরবতা এই নীরবতার। মধ্যে দেখা গেল বস্তী ঘরের দরজা অর্ধোন্মুক্ত করিয়া একটি মুসলমান মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক মুখ বাহির করিয়া বাহিরে তাকাইল। পরে সাহসে ভর করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় সেখানে ছুটিয়া আসিল তাহার ভাই—মেয়েটির নাম হেনা, বয়স আনুমানিক ৩৫ তাহার ভাইটির বয়স ৩০, নাম ইয়াকুব।)

হেনা ॥ এই বেয়াকুফ্ তোর কি সাহস দেখি।

ইয়াকুব ॥ বেয়াকুফ্ বেয়াকুফ্ কইরো না দিদি।

হেনা ॥ করুম না ? ঢাকা শহরে গুলির ঢাক বাজতাইছে কোন্ সাহসে তুই বাইরে গেছস্। গুলি চলেতেছে দেখস্ না।

ইয়াকুব ॥ চলুক। কত গুলি চালাইবো। চালাক।

হেনা ॥ গুলিটা চালাইতেছে কে রে এবার ?

ইয়া ॥ এক হালা পাঞ্জাবী পুলিশ। তা হালার পুলিশ ফুলিশ হইয়া গেছে। মটরবাইকে চাইপ্যা আইছিলো। গলিতে ঢুইক্যাই দেখে রাস্তায় খাল কাইট্যা দিছে। গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া ঢেলা খাইতে খাইতে ছুইট্যা পলাইল— হালা।

হেনা ॥ বাইরে যে গেছস্ তা তোর জামাইবাবুর কোন খবর টবর পাইলি ?

ইয়াকুব ॥ আরে রাইখ্যা দাও তোমার জামাইবাবু। সব খবর এখন মুজিব ভাইয়ের।

হেনা ॥ আরে বেয়াকুফ্ আমার জামাইবাবু না। তোরই জামাইবাবু। মুজিব ভায়ের আবার খবর কি। সে তা পলাইছে। কাল রাতেই পলাইছে। সব মিঞাই অখন পলাইব—ওরে বেয়াকুফ্, মরতে মরমু আমরা।

ইয়াকুব ॥ দেখ দিদি এই ইয়াকুবরে বেয়াকুফ কইলে আমিও বইল্যা বেড়াইমু তোমার নাম হেনা নয়—ত্যানা, ছ্যাঁড়া ত্যানা।

হেনা ॥ (হাসিয়া) আহা চটস্ ক্যান। তোর জামাইবাবু যখন তরে বেয়াকুফ্ কয়, তখন তো চটস্ না?

ইয়াকুব ॥ কি যে কও দিদি, ঐ মানুষটার উপর কোন্ লোকটা চটবার পারবো। চেহারায় বাঘ হইলে কি হয় মনডা যে ফুলের মত। কিন্তু আক্কেলটা বড় কম।

হেনা ॥ ক্যান রে, এই কথা কস্ ক্যান। আক্কেলটা কম দেখলি কোথায়?

ইয়াকুব ॥ কম ছাড়া কি। আমগো ফকির সাহেব আজ কদ্দিন থিক্যা কইতে আছে না উনিশ শো সত্তর সালের ২৫শে মার্চ মুজিব ভায়ের একটা জবর ফাঁড়া আছে। কথাটা ফললো কিনা কও। কাইল্ গেছে সেই পঁচিশে মার্চ। কাল রাত্রি থিক্যাই তো যত গোলমাল—

হেনা ॥ তাতে তোর জামাইবাবুর বে-আক্কেলটা কি দেখ্লি।

ইয়াকুব ॥ বে-আক্কেল না আমি তো আজ বিহানে কতবার কইছিলাম, মুজিব ভাই এর ফাঁড়া, গোটা দেশের ফাঁড়া জামাইবাবু, আজ গোলমালটা বাড়বো ছাড়া কমবো না। ছিক্ (Sick) রিপোর্ট কইর‍্যা ঘরে বইস্যা থাকেন। তা শুনলো? অত যে হল্লা, তারই মধ্যে তো মুনিবের গাড়ি চালাইতে সাত তাড়াতাড়ি পা চালাইল। আক্কেলটা কি, কও?

হেনা ॥ তুই ঠিকই কইছিস্ ভাই। আমিও মানা করছিলাম। তা কয় কি জানস্—

ইয়াকুব ॥ কি?

হেনা ॥ হেনাবিবি, যামু আর আমু। তা সে কোন সক্কালে গেছে—সারাটা দিন গেল। রাতও কম হইল না। কোথায় গেল, কি খাইল—খাইল কি, খাইল না—কও দেখি কে জানে। যে রকম গুলিগোলা চল্‌তে আছে—আছে কি নেই—তাই বা কে জানে। (পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে রেডিওতে খবর হইতেছে)

ইয়াকুব ॥ চুপ, রেডিও।

হেনা ॥ আওয়াজটা জোর কইরা দেয় না ক্যান্।

ইয়াকুব ॥ আরে কও কি। এটা যে জয় বাংলার রেডিও। পাকিস্তান রেডিও অখন কি আর কেউ শোনে।

হেনা ॥ হ। (উভয়ে রেডিও শুনিতে উদগ্রীব হইল।)

রেডিওর ঘোষণা ॥ বাংলা দেশের ভাই বোনেরা আস্‌লাম আলেকুম্—গত ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বংগবন্ধু শেখ

ম-২৮৬

মুজিবর রহমান বাংলা দেশকে সার্বভৌম স্বাধীন ও লোক তান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেছেন।

(জনতার কণ্ঠস্বর, ভাসিয়া আসিল 'বংগবন্ধু জিন্দাবাদ',)
'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা'।)

রেডিওর ঘোষণা ॥ "আমি মুজিব রহমান বলছি। বৃহস্পতিবার মধ্য-রাত্রে পাক সশস্ত্রবাহিনী ঢাকার পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায় বহু নিরস্ত্র লোক নিহত। ঢাকা শহর এবং ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের সঙ্গে পাক সেনাবাহিনীর প্রচন্ড সংঘর্ষ চলছে। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণ শত্রুর সঙ্গে বীরের মত লড়াই করছে। আমরা কুকুর বেড়ালের মতো মরবো না। যদি মরতে হয়, বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তানের মতোই মরব। আমার ভাই বোনেরা বাংলা দেশের কোনায় কোনায় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনাদের দোয়া দিন, শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা।

(উত্তেজিত জনতার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—
'বংগবন্ধু জিন্দাবাদ। 'জয় বাংলা')

(গুলি মেশিনগানের শব্দ - চীৎকার ও আর্তনাদ ইয়াকুব ও হেনা চকিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। বাহিরের গোলা গুলি এবং কোলাহল বন্ধ হইতে না হইতেই ছুটিয়া আসিল মোটর ড্রাই-ভার সিরাজুল হক বয়েস পঞ্চাশের বেশী নয়। সুগঠিত দেহ। সে রুদ্ধদ্বারে করাঘাতকরিতে লাগিল ক্ষণ-করাঘাতের পর দরজা খুলিয়া দিল ইয়াকুব সিরাজ ঘরে প্রবেশ করিল।)

সিরাজ ॥ দরজা খুলতে এত দেরী ক্যান ?

ইয়াকুব ॥ ফুটা দিয়া দেখমু তবে না খুলমু।

সিরাজ ॥ টোকা শুইন্যা বুঝবার পার না, আচ্ছা বেয়াকুফ্।

হেনা ॥ ব্যাপার কী, বাড়ী ঘরের কথা মনে আছিল না বুঝি ?

সিরাজ ॥ ও কথাটা তোমার এই সিরাজমিঞারে কইয়ো না। যার জন্য করি চুরি সেই কয় চোর। শোন. এখুনি এখান্ থিক্যা পলান্ লাগবো।

হেনা ॥ সে কি—এডা তুমি কি কথা কও।

সিরাজ ॥ পোঁটলাপুটলী যা আছে বাইন্দ্যা লও—মালিকের সঙ্গে সারাদিন। সারা শহর ঘুইরা বেড়াইছি—যা দেখছি যা শুনছি, সাংঘাতিক। হালার পো হালা টিক্কা খাঁ আজ হুকুম দিছে ঢাকার সব বাড়িঘর আজ রাতের মধ্যে আগুন

দিয়া ছারখার করবো—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ঢাকা শহর আজ এই রাতে পুইড়া ছাই হইয়া যাইব। যা পার চট্‌পট্‌ গুছাইয়া লও।

হেনা ॥ কোথায় যামু ?

ইয়াকুব ॥ ঘরবাড়ী ছাইড়্যা কোন্‌ জাহান্নামে যাইবেন বোনাই সাহেব ?

সিরাজ ॥ আরে হালা আচ্ছা বেয়াকুফ তো পুইড়্যা মরণের যদি সখ হয় তবে তুই হালা থাক্‌—তোর বোইনেরে আমি লইয়া যাই—(হেনার হাত চাপিয়া ধরিয়া) দেখতেছ কি, চইল্যা আইস।

হেনা ॥ বারে, যামু যে খামু কী। টাকাপয়সা, গয়নাগাটি বাসন-কোসন, রাত কইরা যাইমু, একটা হারিকেন লণ্ঠন—এই হগ্‌গল লইবার হইব না। (হাত ছাড়াইয়া জিনিসপত্র দুই তিনটি ব্যাগে চটপট গুছাইতে লাগিল)

সিরাজ ॥ এই হালা, চৌকির তলের থিক্যা পেট্রলের টিনটা বাইর কইরা ল

ইয়াকুব ॥ আগুন জ্বালাবার হইব বুঝি ?

সিরাজ ॥ আরে হালার বেয়াকুফ। তুই আবার হবি মোটর মেকানিক। তোরে আমি হালা শিখাইমু মোটর ড্রাইভিং। আই এ পাশ কইরা তোমার এই বুদ্ধি। পেট্রল নিমু গাড়ি চালাইতে, পালাইতে।

ইয়াকুব ॥ কার গাড়ী ?

সিরাজ ॥ তোর বাপের গাড়ী—

ইয়াকুব ॥ কি যে কন বোনাইসাহেব। আমার বাপেরও গাড়ী নাই আপনার বাপেরও গাড়ী নাই।

সিরাজ ॥ তবেই বোঝ, কার গাড়ী। ঐ মালিকের গাড়ী। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আরে বাবা আর দেরী করলে মালিক নিজেই তো তার ফ্যামিলী লইয়া আইস্যা গাড়িতে উইঠ্যা পড়বো। ঐ হালাই তো এই মাথায় বুদ্ধিটা দিছে।

হেনা ॥ তা ভাল বুদ্ধিটাই দিছে। চল চল। খোদা তোমার মনে শেষে এই ছিল। বাইর হও—তালাটা আমি লাগাইয়া যাই। (সকলে বাহির হইল। হেনা দরজায় তালা লাগাইল।)

সিরাজ ॥ (হঠাৎ কি মনে পড়িল) এই রে গোঁফটা চাঁচা হইল না। খোল তালাটা খোল।

হেনা ॥ এ, আবার কি কথা কয়। মোচ চাঁচবা ক্যান ? মোচ চাঁচবার কি হইল ?

সিরাজ ॥ সাধে কি আর লোকে কয়—বারো হাত শাড়ী, মাইয়া-লোকের কাছা হয় না। তোর খসম্‌টা কে জান্‌স। তুইতো জান্‌স সিরাজ মিঞা—মোটর ড্রাইভার—কিন্তু চেহারাটা যে আমার মুজিব ভাইয়ের মতো—সেটা তুই না কইলেও দশজনে কয় মুজিব ভাইতো পালাইছে, পুলিশ মিলিটারী তো

তারে গরুখোঁজা খুঁজতে আছে—আমি যে পালামু—কোন সাহসে পালামু—দেখলেই তো মুজিব বইল্যা ধরবো। তাই ভাবতেছিলাম গোঁফটা চাইছা।

(এমন সময় হঠাৎ অদূরে গুলির শব্দ)

সিরাজ॥ ওরে বাবা, হালার পুঙ্গির পোরা আইয়া পড়লো বুঝি! চল হালারা চল। কপালে যাই থাক চল।

(সকলের পলায়ন)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(২৬শে মার্চ। রাত্রি ৮টা। ধানমণ্ডিতে উচ্চ রাজকর্মচারী ওসমান চৌধুরীর উপবেশন কক্ষ। বাহিরে পূর্ববৎ গুলিগোলার শব্দ, চীৎকার আর্তনাদ। রুদ্ধকক্ষে বেতার ভাষণ শুনিতেছিলেন গৃহস্বামী ক্যাপ্টেন ওসমান চৌধুরী, বয়েস পঞ্চাশ এবং তাহার একমাত্র সন্তান ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রী মীনা খাতুন, বয়েস কুড়ি গোলমালে রেডি ও ভাল শোনা না যাওয়ায় রেডিওটি বন্ধ করে দিলেন ওসমান চৌধুরী।)

ওসমান॥ যা গোলমাল, কিছু শোনা যাচ্ছে না (জানালার কাছে গিয়ে) এদিকেও গোলমাল আবার সুরু হয়েছে মনে হচ্ছে। রাত আটটার এই রেডিওর খবর ভাল শোনা না গেলেও এই প্রথম জানা গেল—প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ ইসলামাবাদ থেকে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে তোমাদের বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আর পাক জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননার অভিযোগ এনেছেন।

মীনা॥ আমি স্পষ্ট শুনেছি আব্বা, জেনারেল ইয়াহিয়া বললেন মুজিবর রহমান আর তার অনুগামীরা পাকিস্থানের শত্রু।

ওসমান॥ হ্যাঁ, জেনারেল ইয়াহিয়া বললেন আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়। এটা গুরুতর অপরাধ—এর শাস্তিও অনিবার্য। আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—এটাও শুনলাম। মীনা খুব সাবধান, হঠাৎ এমনটা হবে বুঝিনি। জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় বসে মুজিবুরের সঙ্গে যেভাবে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন তাতে ২৫শে মার্চও মনে হয়েছে, এই রাজনৈতিক সঙ্কটের একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কোন

ম-২৮৯

সন্দেহ থাকলে আমি তোকে বিলেত পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতাম। তুই আমার এক মাত্র মাতৃহারা সন্তান। তোকে যদি না বাঁচাতে পারি তবে আমি নির্বংশ হয়ে যাব।

মীনা ॥ তোমার চিন্তা কি বাবা। তুমি পাকিস্থানে গবরমেণ্টের এত বড় অফিসার।

ওসমান ॥ হ্যাঁ, তা সত্যি! কিন্তু তবু তো আমি বাঙালী—আজ এইটেই যে সবচেয়ে অপরাধ। জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ রাত্রে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় 'মার্শাল-ল' জারি করে গিয়েছেন, ২৬শে মার্চ আজ রাত আটটায় জাতির উদ্দেশ্যে তার এই বেতার ভাষণে সেটা জানা গেল এই প্রথম। কিন্তু কাল থেকে আজ এই সকালের মধ্যেই টিক্কা খাঁর হুকুমে সৈন্যরা নির্বিচারে মেসিন-গানে, কামানে, ঢাকা শহরে অন্তত: পঞ্চাশ হাজার লোককে মেরে ফেলেছে। অগণ্য বাড়ি ঘর ধ্বংস করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে—আগুন থেকে বেরিয়ে যারা পালাতে চেষ্টা করেছে তাদেরও মেশিনগানের গুলিতে মেরে ফেলা হয়েছে। বাধা দিতে কেউ কোন সুযোগ পায় নি।

মীনা ॥ বাধা দিয়েছে আব্বা বাধা দিচ্ছে।

ওসমান ॥ কে?

মীনা ॥ বাঙালী পুলিশ, ইষ্টার্ণ পাকিস্তান রাইফেলস, মুজাহিদ আর আনসার বাহিনী। এখনো তারা বাধা দিচ্ছে। আমাদের বাবুর্চি খানসামারা দেখে এসেছে।

ওসমান ॥ আরে সে তো আমিও জানি। কিন্তু মিলিটারির কাছে এ বাধা কোন বাধাই নয়।

(বাবুর্চি ও খানসামারা প্রবেশ করে, হাতে পোঁটলা পুঁটলি।)

বাবুর্চি ॥ আমরা যাইতেছি সাব।

খানসামা ॥ গোস্তাফি মাফ্ করবেন হুজুর।

ওসমান ॥ চলে যাচ্ছ! সে কি?

বাবুর্চি ॥ হ হুজুর! আপনি তো এখনো ইয়াহিয়ার চাকরী ছাড়েন নাই।

খানসামা ॥ আপনার কুঠিতে এখনো আওয়ামী লীগের নিশান উড়ান নাই। আপনাগো হগ্‌গলে দুশমন কইতে আছে। আপনাগো নোক্‌রি করলে আমারেও দুশমন কইব।

ওসমান ॥ আমি যে চাকরী ছাড়িনি কি করে জানলে তোমরা? তোমাদের বংগবন্ধু যে হরতাল ডেকেছে আমি কি সেই হরতালে অফিস করেছি?

বাবুর্চি ॥ হুজুর, আপিস কইরবেন কারে লইয়া—বেয়ারাই কন্ আর কেরানীই কন কেউ তো আপিস যায় নাই।

খানসামা ॥ আসল কথা হইল গিয়া, ঐ জয়বাংলা নিশানটা, ওটা এই বাড়িতে আমরা যতবার তুলবার চাইছি আপনি দেন নাই।

বাবুর্চি ॥ যত বোকা আমাগো ভাবেন আমরা তত বোকা নই হুজুর— চল্লাম।

মীনা ॥ আব্বা, আওয়ামী লীগের ফ্ল্যাগ আমিও যতবার তুলতে চেয়েছি তুমি বাধা দিয়েছ। টিক্কা খাঁর অমানুষিক অত্যাচারের কথা তুমি নিজে মুখে বল্লে, এখনও কি তোমার চৈতন্য হল না! তুমি বল, ফ্ল্যাগটা আমরা এখুনি তুলে দিই।

ওসমান ॥ না।

বাবুর্চি ও খান ॥ (একসাথে) হুজুর সেলাম।

ওসমান ॥ যাও, পথে গিয়ে দাঁড়াইলেই গুলি খেয়ে মরবে।

বাবুর্চি ॥ একেবারেই মরুম হুজুর, দুইবার তো মরুম না।

[উভয়ে প্রস্থান]

ওসমান ॥ না মীনা, আমি ওদের রাস্কেল বলব না। ওরা অশিক্ষিত অতি সাধারণ। ভালমন্দ বুঝবার ওদের ক্ষমতা নেই। যখন যা হুজুগ ওঠে তাতেই মেতে ওঠে। ওরা কৃপার পাত্র। ভবিষ্যৎ না বুঝে ঝোঁকের মাথায় ওরা চলে গেল, গুলি খেয়ে এখনই মরবে!

ওসমানের কথা মিথ্যা হইল না। বাইরে গুলির শব্দ ও আর্তনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মীনাও আর্তনাদ করিয়া উঠিল

ওসমান ॥ নাও, ঐ হয়ে গেল। ঘুমন্ত মানুষকে গুলি করে মেরেছে আর এরা তো হল চলন্ত মানুষ।

মীনা ॥ স্বাধীনতা ঘোষণাটা রাজনীতিতে একটা অপরাধ বলে মনে করা যেতে পারে—বহু দেশের ইতিহাসে এটা দেখা গেছে কিন্তু এখন যে গুলি করে মারা হচ্ছে তা কিন্তু সে অপরাধে নয় আব্বা,—এখন মারা হচ্ছে শুধু এইমাত্র অপরাধে যে আমরা বাঙালী। ইতিহাস এর আর একটা নজীর দেখা গেছে, যখন হিটলার ইহুদীদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া হিটলারের চেয়েও বর্বর। ইহুদীদের হাতে অর্থ ছিল, অস্ত্রও ছিল আর বাঙালীরা নিরস্ত্র নির্ধন। আজ তোমার শরম হচ্ছে না আব্বা, তুমি এই ইয়াহিয়ার চাকরী ছাড়তে এখনও ইতস্ততঃ করছো!

ওসমান ॥ শোন মীনা, তুমি আওয়ামী লীগের সমর্থক, আমি মুসলীম লীগের সদস্য একথা না ধরেই বলছি, তোমরা যাকে বংগবন্ধু বল্ছ আমি তাকে বংগশত্রু বল্‌ব। কারণ—

মীনা ॥ কারণ?

ওসমান ॥ কারণ—এতবড় একটা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিকে

অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে গেলে, যে বিরাট প্রস্তুতির আবশ্যক ছিল মুজিবর তা না করেই হঠাৎ এই দেশব্যাপী বিদ্রোহের ডাক দিয়ে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে হঠকারিতা করলেন তাতে সমগ্র বাংলাদেশ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, যাবে। ইতিহাসে এমন আহাম্মুকির আর নজীর নেই। ভারতের ইতিহাসটাই দেখ। গান্ধী সশস্ত্র বিপ্লব চাননি, নেতাজীও সশস্ত্রবাহিনী তৈরী করে তবেই সশস্ত্র অভিযানে নেমেছিলেন।

মীনা॥ তাই বলে তুমি ইয়াহিয়া টিক্কার এই পাশবিক অত্যাচার এই অমানুষিক বর্ব্বরতা সহ্য করে যাবে! উত্তর দাও আব্বা।

ওসমান॥ তুমি কি আমাকে এখনো চেনোনি মীনা? ভাবাবেগে—আমি কখনো চালিত হই না। আমি যুক্তিবাদী, আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবী একমাত্র মুজিবরেরই আছে—কারণ, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর শতকরা আটানব্বুইটি ভোটে মুজিবরের দল আওয়ামী লীগ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু তবু বলব রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক পথে না গিয়ে মুজিবরের আকস্মিক এই স্বাধীনতা ঘোষনা করা যেমন হয়েছে একদিকে দূরদর্শিতার অভাব তেমনি নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন। আমি নিয়মতান্ত্রিকতায় শ্রদ্ধা করি বলেই কোনমতেই এটা সমর্থন করতে পারছি না।

মীনা॥ এক কথায় বল আব্বা, তুমি মিলিটারীর এই অবাধ উচ্ছৃংখল অত্যাচার সমর্থন কর কি না?

ওসমান॥ না। তাও করি না। কিন্তু তাই বলে মুজিবরকেও আমি সমর্থন করি না। মিলিটারীর উচ্ছৃখলতায় হয়তো এক কোটী বাঙালী হতাহত হ'বে, কিন্তু মুজিবরের নির্বুদ্ধিতায় সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর দুঃখ দুর্দশার আর অন্ত থাকবে না।

মীনা॥ একটা জাতির জীবন—একটা জাতির আশা আকাংখা—একটা জাতির স্বপ্ন অঙ্ক কষে বিচার বিবেচনা করে গড়ে ওঠে না, আব্বা। জাতীয় সম্মানের প্রশ্নে, স্বাধীনতার প্রশ্নে চুলচেরা বিচারের কোন স্থান নেই। পাকি-স্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিটারী দাপটে দাবিয়ে রেখে পূর্ব্ববাংলার অফুরন্ত ঐশ্বর্য শোষণ করেছে; এতে পশিচম দিন দিন যত ধনী হচ্ছে পূর্ববাংলা তেমনি হচ্ছে নির্ধন। আজ সমগ্র বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের দাসত্বের উপনিবেশ।

ওসমান॥ অস্বীকার করছি না, মীনা। তার সমাধানও চাই আমি। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সমাধান।

মীনা॥ জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন পিতা মাতার বিরুদ্ধেও যত মানুষকে যেতে হয়। আজ আমার জীবনেও সেই মুহূর্ত এসে পড়েছে। আমার সুবিধা এই যে তোমার মত আব্বা পেয়েছি—সাবালিকা হওয়ার পর

আমি দেখছি তুমি আমার বিচারবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছ, আমার স্বাধীন মতামতের অধিকারকে তুমি সম্মান করেছ। আজ তাই আমার নিজের বিবেকবুদ্ধির মত চলার পথে তুমি কোন অন্তরায় হবে না আমি জানি। আমাকে বিদায় দাও—

ওসমান ॥ বটে।

মীনা ॥ হ্যাঁ আব্বা।

ওসমান ॥ আমাকে ছেড়ে তুই চলে যাবি-মা ?

মীনা ॥ অন্য কোন পথ নেই আব্বা।

ওসমান ॥ এই অন্ধকার রাতে, ঐ গুলিগোলার মাঝে—ঐ নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ?

মীনা ॥ উপায় নেই আব্বা।

ওসমান ॥ বেশ, চল, আমি তোমাকে—

মীনা ॥ দরকার নেই আব্বা। আমি একলা যাচ্ছি না। আমার সাথী আছে।

ওসমান ॥ সাথী কে ?

দুর্গা দেবী ॥ বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের একজন—যার কাছে দেশের ডাক দুর্লঙ্ঘ্য, স্বাধীনতার সংকল্প দুর্নিবার।

(পাশের ঘরে মৃদু করাঘাত, দরজা খুলিয়া বাহিরে
আসিল নীলমণি চৌধুরী।)

মীনা ॥ তুমি তো একে জান আব্বা। আমার সহপাঠি আওয়ামী লীগ ছাত্রনেতা, নীলমণি চৌধুরী।

(নীলমণি ধীরে ধীরে মীনার কাছে আসিয়া দাড়ায়
ওসমান মাথা নীচু করিলেন)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[২৭শে মার্চ। ভোরবেলা। পাখীর কলরব। ঢাকা হইতে ৫০/৬০
মাইল দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলের একটি পথ। পথের ধারে, একটি
ভগ্ন মন্দির। সিরাজ মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে হাই
তুলিতে তুলিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল]

সিরাজ ॥ এই হালার বেয়াকুফ মোটর মেরামত করতে রাত ভোর কইরা ফেলালি, যে, তুই হালা আবার মোটর মেরামতির কারখানা করবি।

(পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল হেনা।)

হেনা ॥ চিল্লাও ক্যান, আর সাত সকালে আমার ভাইটারে গাইল মন্দই বা করতেছ ক্যান ?

সিরাজ ॥ করমু না—এ্যাদ্দিন যে মোটর মেরামতি শিখাইলাম তা হালায় শিখলটা কী। যাই ঐ হালারে আগে মেরামত কইরা আসি।

বাহির হইতে ইয়াকুবের প্রবেশ।

ইয়াকুব ॥ মুজিব সাহেবের ঘুম ভাঙছে দেখতেছি। দুইবার আইস্যা নাসিকা গর্জন শুইন্যা ফিরয়্যা গেছি।

সিরাজ ॥ থাম থাম। কোন হালায় এই জংলী মশার কামড়ে ঘুমাইতে পারে।

হেনা ॥ কাজের কথা কও আগে! মোটরনি মেরামত হইল ?

ইয়াকুব ॥ জংলী মশার কামড়ে মোটর মেরামতি কইরবার পারে কোন মনিষ্যি।

সিরাজ ॥ শুনলানি। তোমার এই অকালকুষ্মাণ্ড ভাইটা আমাগো ডুবাইল। কইছিলাম না গোঁফটা চাঁচবার হইব—কেউ আমার কথাটায় তখন কান দিলা না। দিনের বেলায় লোকজন আইব যাইব আর এই শেখ সাহেবরে দেখব বুঝবা ঠেলা—

হেনা ॥ কও কী। শেখ সাহেবরে ধরাইয়া দিলে ইনাম মিলব—বলাবলি করতাছিলা না তোমরা ?

ইয়াকুব ॥ মোটর মেরামত করতে গিয়া মটরের রেডিওতে আজ সকালে আজব সংবাদ শুনলাম। করাচী রেডিওতে কইল আজ ২৭শে মার্চের বিশেষ খবর শেখ মুজিবরকে গ্রেপ্তার করা হইছে। সংবাদ শেষ হইতে না হইতেই এক গোপন বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা হইল বঙ্গবন্ধু মুক্ত আছেন—স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করতাছেন।

সিরাজ ॥ চুপ। ঐ যে কারা যেন এদিকেই আইতেছে।

ইয়াকুব ॥ ওরাও পলাইতেছে, বুঝলেন না শেখ সাহেব, ওরাও পলাইতেছে, চলন আর চেহারায় বোঝা যায়। দিদি, তুই বোনাই সাহেবেরে লইয়া এখুনি ঘরে ঢুইক্যা যা।

হেনা ॥ হু, (সিরাজের হাত ধরিয়া টানিয়া) আইস আইস, কার মনে যে কী আছে কওন যায় না।

[সিরাজকে নিয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং প্রায় সঙ্গে চার পাঁচজন গ্রামবাসী আসিয়া দাঁড়াইল।]

১ম গ্রামবাসী ॥ মোটর গাড়ীটা আপনা গো ?

ইয়াকুব ॥ হ।

২য় গ্রামবাসী ॥ পলাইতেছেন ?

ইয়াকুব ॥ হ।

৩য় গ্রামবাসী ॥ কিছু মনে করবেন না। শেখ সাহেবেরে দেখলাম না ?

ইয়াকুব ॥ অ্যাঁ!

৩য় গ্রামবাসী ॥ হ্যাঁ। দেইখ্যাই চিনছি। পলাইবারই তো কথা। হালার পো হালা খানসেনারা মুজিব ভাইরে গরু খোঁজা খুঁজতে আছে।

১ম গ্রামবাসী ॥ হালারা খোঁজ পায় নাই। আমরা যে পাইলাম আমাগো চক্ষু সার্থক।

২য় গ্রামবাসী ॥ তা ছাড়া কি তামাম্ বাংলাদেশটা ঐ মুজিব ভাইয়ের দিকে চাইয়া আছে। আমাগো বাঁচান যদি উনিই বাঁচাইবেন মারলে উনিই মারবেন।

৩য় গ্রামবাসী ॥ কইবেন, তেনার লাইগ্যা আমাগো জানপ্রাণ কবুল করছি।

১ম গ্রামবাসী ॥ সকাল হইয়া গেছে, পথের মাঝে দেরী করতেছেন ক্যান—মোটর লইয়া যেখানে যাইবার চইল্যা যান—বেলা যত বাড়ব, মানুষজনের আনা-গোনা বাড়ব, কার মনে যে কী আছে কওন যায় না।

ইয়াকুব ॥ হ্যাঁ। একটু চা-টা খাইয়া আবার পাড়ি দিমু। এদিকটায় মিলিটারী এখনো আইসে নাই।

২য় গ্রামবাসী ॥ ঐ কথা কইবেন না কর্ত্তা। আইতে আর কতক্ষণ। ওগো না আছে কী। মোটর আছে, ট্রাক আছে, হালিকপটোর আছে। সাড়ে সাত কোটী বাঙালীরে শুইষ্যা খাইয়া হালারা নবাবী কইরতে আছে।

১ম গ্রামবাসী ॥ হাড় খাইছে মাংস খাইছে চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজাইতে আছে।

৩য় গ্রামবাসী ॥ আমরা হালাদের দেইখ্যা লমু।

২য় গ্রামবাসী ॥ কি দিয়া দেইখ্যা লইবা। ঢাল নাই তরোয়াল নাই—আমরা তো সব নিধিরাম সরদার। রাখ রাখ, শেখ সাহেব যদি খোদার দোয়ায় বাইচ্যা থাকেন আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তার কথায় উঠমু বসমু। ঐ হাজার পঞ্চাশ খানেক খান সেনারে পিষ্যা মারমু।

১ম গ্রামবাসী ॥ তাছাড়া কি। বাঙালী পুলিশ ইষ্টার্ণ পাকিস্তান রাইফেল আনসার, মুজাহিদ ওরাও তো শেখ সাহেবের কথায় ঘুইর্যা দাড়াইছে আমাগো পক্ষে—হোক্ না লড়াই ঐ বিদেশী কুত্তাগুলারে খতম করতে কদ্দিন লাগে।

২য় গ্রামবাসী ॥ খালি একটা কথা। শেখ সাহেব বাইচ্যা থাকুন, নজরুল ইসলাম বাইচ্যা থাকুন—আমাগো আওয়ামী লীগ বাইচ্যা থাকু্।

৩য় গ্রামবাসী ॥ হ্যাঁ, বাইচ্যা থাক্, আমাগো বন্দুক দিক্—হালাগো দেইখ্যা লমু—হালাগো দেইখ্যা লমু। জয় বাংলা জয়।

ইয়াকুব ॥ চুপ। আপনারা চইল্যা যান। আমাগো জন্য ভাববেন না—আমাগো মোটর আছে। চা খাইয়াই আমরা ছুটুম।

১ম গ্রামবাসী ॥ কোথায় যাইবেন কর্তা।

ইয়াকুব ॥ সেটা আর জিগাইবেন না।

২য় গ্রামবাসী ॥ না না। ও সব গুপ্তকথা। ও আমরা শুনবার চাই না। মুজিবভাইরে আমাগো আদাব দিবেন, কইবেন, তিনি আমাগো কইলজার ধন।

৩য় গ্রামবাসী ॥ আচ্ছা কর্তা, এখন আমরা চলি।

ইয়াকুব ॥ আপনারা কোথায় যাইতেছেন।

১ম গ্রামবাসী ॥ মুজিবভাই-এরই মুক্তি ফৌজে যোগ দিতে। আরো অনেকে গেছে। কইবেন তাঁরে, আমরা জান দিমু—দেশের মান খোয়ামু না।

২য় গ্রামবাসী ॥ (থলি হইতে একটি ফল বাহির করিয়া) আমার গাছের এই ফলটা শেখ সাহেবেরে দিবেন।

৩য় গ্রামবাসী ॥ (অনুরূপভাবে) এই লন কর্ত্তা, এগুলোও লন।

ইয়াকুব ॥ কিন্তু ভাই তোমরা কি খাইবা। না না এসব লইয়া যাও শেখ সাহেব শুনলে আমারে বকাবকি করব।

১ম গ্রামবাসী ॥ না না। তিনি খাইলেই আমাগো খাওয়া হইব।

২য় গ্রামবাসী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি না খাইলেই, মনে বড় দুঃখ হইব।

৩য় গ্রামবাসী ॥ তাঁরে যে আজ দেখলাম, তাঁরে যে একটা গাছের ফল দিতে পারলাম—এই ভাগ্য কজনের হয়!—মরতে গিয়াও এই আনন্দ আমাগো থাকব। চলি কর্ত্তা—

১ম গ্রামবাসী ॥ কথায় কথায় অনেক দেরী হইয়া গেল। মিলিটারী—টহল দিয়া ঘুরতে আছে। আমরাও চলি আর আপনারাও কর্ত্তা কালবিলম্ব কইরবেন না জয় মুজিব, জয় বাংলা।

গ্রামবাসীরা ॥ (সমস্বরে) জয় বাংলা, জয় মুজিবর।

ইয়াকুব ॥ আরে মশাই, চিল্লাইবেন না। বিপদ বাড়াইবেন না। সময় আসুক তারপর চিল্লাইবেন।

১ম গ্রামবাসী ॥ হ কর্তা, ঠিকই কইছেন। এরই নামই হইল গিয়া রাজবুদ্ধি। আইস ভাই আইস।

[সকলের প্রস্থান]

(মন্দিরের ভিতর হইতে সিরাজ এবং হেনা এতক্ষণ ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল। গ্রামবাসীরা চলিয়া যাইতেই উভয়ে ত্বরিত পদে বাহিরে আসিল এবং সিরাজ কিছু ফল লইয়া গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল—দেখাদেখি ইয়াকুবও খাওয়া স্বরু করিয়া দিল)

ইয়াকুব ॥ দিদিভাই, খাইয়া লও। খোদা যখন দেন তখন এমনি কইরাই দেন।

হেনা ॥ আমি ওসব খামু না। কোন পীরের মানত কোন বান্দরে খায়। অধর্ম হইতেছে।

সিরাজ ॥ আরে খাইয়া লও, খাইয়া লও। এত আদর কইরা কেউ কখনো আমাগো খাইতে দিছে! এতকাল খাইছি, সকলের লাথি ঝাঁটাই খাইছি। এমন দিন আর পাই নাই, আর পামুও না। আরে, বেয়াকুফ্ তুই যে হাবাতের মতন খাইবার লাগছস্। তোর নি খেয়াল আছে। গাড়িটা এখনো কেরামতি হয় নাই। আরে হালা, ভাল চাস্ তো এখুনি যা, তড়িঘড়ি গাড়িটা সারাইয়া ল। পথের উপর বেশীক্ষণ থাকলে নির্ঘাৎ মিলিটারীর গুলিতে অক্কা পাইবি।

ইয়াকুব ॥ বোনাই সাহেব, মেরামত তো মুখের কথা নয়, সময় লাগ্‌বো। আপনি ভাবনা করবেন না। আপনি তো এখন হগ্‌গলের লীডার মুজিবর রহমান। আপনারে এখন পায় কে। আমি তো কই লোকজন যত আপনারে দেখে, ততই আমাগো বল বাড়বো।

সিরাজ ॥ ভাগ্যিস মোচটা ছাইছ্যা ফালাই নাই।

হেনা ॥ মোচ দেখাইয়া মুজিবর সাজা যায় না। মুজিবরের চেহারা পাইলেই মুজিব হঅন যায় না। মুজিব ভাই দ্যাশের মানুষেরে কি কইছেন, কি করতে বলছেন তুমি তো তাও সব জান না। নেতাগিরি করতে যাইতেছেন, প্যাটে একটা টোকা মারলেই তো সব বিদ্যা বাইর হইয়া যাইব। মিলিটারীর হাতে মরবার হইব না। দ্যাশের মানুষরাই এই জালিয়াত গো শ্যাষ কইরা দিব।

সিরাজ ॥ অ্যাঁ, তাইতো। আমার হেনা বিবি তো ঠিক কথাই কইছে। আমি বোবা বইনা যামু। তোমরা কইবা, শেখ সাহেব এখন কি করবার হইব তাই একমনে ভাবতে আছেন। কথা কইবেন না। বুঝলা না, কইবা গুরুতর চিন্তায় ডুইবা আছেন।

হেনা ॥ বোবা সাইজবেন! কওন সোজা, করন সোজা নয়। লোকজনের পাল্লায় পড়লে তখন বুঝবার পারবা কি আগুন লইয়া তুমি খেলতে আছ।

ইয়াকুব। বোনাই সাহেব, দিদিভাই ঠিক কথাই কইছে। তা আপনি ভাবতে আছেন ক্যান্। আমার কাছে তো মুজিবরের ছয় দফার পুস্তক আছে। পুস্তকের সার সার কথা দশ লাইনে লেখা আছে। এই লন এটা পইড়া লন, মুখস্থ কইরা ফ্যালেন। আমি ততক্ষণে গাড়িটা সারাইয়া ফেলি।

[পকেট হইতে একটি পুস্তিকা বাহির করিয়া সিরাজের হাতে দিল]

দিদিভাই, তুমি তোমার ময়নারে পড়াও।

[হেনা হাসিয়া ফেলিল। ইয়াকুব মোটরের দিকে চলিয়া গেল]

সিরাজ ॥ আরে বেয়াকুব, আমি যদি পড়াশুনাই করমু, তবে, মোটর ড্রাই-ভার হইলাম ক্যান্।

হেনা ॥ এখন প্রাণের দায়ে পড়বার হইব। খালি পড়লেও হইব না, মুখস্থ করন লাগ্‌ব। কও (বই পড়িতে লাগিল) "বাংলা দেশের সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য"।

সিরাজ ॥ কী মুক্তির জন্য ?

হেনা ॥ সার্বিক মুক্তির জন্য।

সিরাজ ॥ সেটা আবার কী, সেটা কারে কয় ? কওনা—বুঝমু তুমি কেমন ম্যাট্রিক ফেল মাইয়া !

হেনা ॥ মানে, হগ্‌গল রকমের মুক্তি। রোদ উঠছে। চল ভেতরে যাই। ঐ খানেই গিয়া তোমারে পড়াইমু।

সিরাজ ॥ কি ঝকমারী রে বাবা। নেতা হওন এমন ঝকমারী। বলে কিনা—কি মুক্তি ?

হেনা ॥ সার্বিক মুক্তি—

সিরাজ ॥ সার্বিক মুক্তি। দাঁত ভাইঙ্গা যাওনের যোগাড় !

[মন্দিরের ভিতরে উভয়ের প্রস্থান। ক্ষনকাল পরেই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল শ্রান্ত ক্লান্ত নীলমণি চৌধুরী ও মীনা খাতুন]

মীনা ॥ এখানে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের চাতাল দেখছি। চল্‌তে চল্‌তে কথা বলা যায় না, এখানে একটু বস্‌তে হবে। আমার কিছু বলবার আছে।

নীলমণি ॥ বস্‌লেই তো তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। কাল সারারাত পথ চলেছি। বসতে পেলেই শুতে ইচ্ছে হবে।

মীনা ॥ না, তা হবে না। এস বসি (উভয়ে বসিল) নীলমণি কাল রাতে পথ চলতে চলতে দু একজনকে বর্ডারে যাবার পথের খোঁজ নিচ্ছিলে। তোমার বাড়ী না গিয়ে বর্ডারের পথের খোঁজে নিচ্ছিলে কেন ? দেশ ছেড়ে পালাবার মতলব নাকি ?

নীলমণি ॥ না, নিচ্ছিলাম, মানে কোলকাতায় আমার মামার বাড়ী কিনা।

মীনা ॥ মামার বাড়ী—তাতে কি হয়েছে।

নীলমণি ॥ না, মানে, আমি আমার একমাত্র ভাগ্নে, ভারি ভালবাসেন আমাকে। অনেকেই ওপার বাংলায় পালাচ্ছে কিনা তাই মনে হল। তাই সব জিজ্ঞাসা করছিলাম।

মীনা ॥ নীলমণি, আমার যেন কেন মনে হচ্ছে তুমি ওপার বাংলায় পালাতে চাইছ।

নীলমণি ॥ হ্যাঁ, না, তা ঠিক নয়—তবে কিনা—

মীনা ॥ আমি স্পষ্ট তোমার কাছে জানতে চাই, তোমার মতলবটা কি।

নীলমণি ॥ সে আবার বলতে—আমি বাড়ী যাব। বাড়ীতে আমার ঠাকুমা আছেন। এই নীলমণি তাঁর সবে ধন নীলমণি। আমি ছাড়া বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই তাঁর। গেল 'রায়টে' গাঁয়ের মুসলমানরা আমাদের বাড়ীর সবাইকে কচুকাটা করেছিল। অতবড় বিষয় সম্পত্তি—সব লুঠ হল। ভাগ্যিস্ ঠাকুমা তখন আমাকে নিয়ে ভায়ের বাড়ীতে ঐ কোলকাতায় ছিলেন, তাই না আমরা বেঁচে গেছি। কয়েক মাস পরে সব শান্ত হলে বাড়ী ফিরে ঠাকুমা দেখেন তিনি সর্বস্বান্ত—নাই বলতে কিছু নেই—কেউ নেই। গ্রামে পড়ে রয়েছে অতবড় বাড়িটা আর তাঁর কোলে রয়েছি আমি। ঐ ঠাকুমাই আমাকে মানুষ করেছেন। আজ সবার আগে তাঁর কাছে যাবনাতো কার কাছে যাব, মীনা!

মীনা ॥ হ্যাঁ, তা যাবে, তাই হয়তো যাচ্ছ, কিন্তু, তারপর—

নীলমণি ॥ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

মীনা ॥ ঠাকুরমার কাছ থেকে কিছু টাকাকড়ি হাতিয়ে, ঠাকুমাকে নিয়ে কিংবা ফেলে রেখে, প্রাণ বাঁচাতে পাড়ি দেবে ওপার বাংলায়—এই তো?

নীলমণি ॥ তুমি বড্ড বেশী এগিয়ে দেখো। এসব কথা এখন ওঠে কি করে, যখন যেকোন মুহূর্তে আমরা গুলি খেয়ে মরতে পারি। এখন সবচেয়ে বড় কথা, কি করে আমরা বাঁচব। (আবেগে) মীনা, আমি যেন আজ পরিপূর্ণতা পেয়েছি। আমার কাছে এক মুঠি চাঁদ তুমি। এই মুঠোয় ধরে রাখতে চাই তোমাকে, চিরদিন চিরকাল—যেখানেই হোক্, যেমন করেই হোক্। (ইয়াকুবের হর্ণ শোনা গেল)

মীনা ॥ রাবিশ্। এসব কথা শুনলে কেন যেন, তোমাকে বড্ড ছোট মনে হয়, বিশেষ এখন—যখন আমাদের মরণ বাঁচনের এই লড়াই চল্ছে, স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে। মুজিব ভাইয়ের শেষ কথাই আজ আমাদের প্রথম কথা—

[পশ্চাতে সিরাজের আবির্ভাব—তাহার পশ্চাতে হেনা]

সিরাজ ॥ "বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম·······

[মীনা এবং নীলমণি দুজনে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল]

মীনা ॥ অ্যাঁ—

সিরাজ ॥ হ্যাঁ—লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ।

হেনা ॥ আমাদের দাবীও ন্যায় সংগত।

সিরাজ ॥ হ্যাঁ, তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। বল জয়বাংলা।

মীনা ও নীলমনি ॥ জয় বাংলা, সেলাম আলেকুম্।

সিরাজ ॥ আলেকুম্ সেলাম।

নীল ॥ আপনি এখানে। (সিরাজ কোন উত্তর দিল না ; হেনার দিকে তাকাইল)

হেনা ॥ হ্যাঁ, এখানে। (পুনরায় হর্ণ শুনিয়া) কিন্তু, এখুনি আবার ছুটতে হবে। ঐ ঐ হর্ণ শুনুলেন—

নীলমনি ॥ আমাদের একটা বাণী দিয়ে যান—(সিরাজ বিপন্নভাবে হেনার দিকে তাকাইল)

হেনা ॥ উনি এখন কথা বলবেন না। ভাবছেন।

নীল ॥ ভাববেনই তো। রাজ্যের ভাবনাচিন্তা এখন ওঁর মাথায়। তবে আসুন শেখ সাহেব—(সিরাজ ও হেনা মোটরের দিকে অগ্রসর হইল)

সিরাজ ॥ জয় বাংলা। (সকলেই প্রতিধ্বনি করিল 'জয় বাংলা' সিরাজ ও হেনা বাহিরে চলিয়া গেল)

মীনা ॥ আমি বলছি, লোকটা মুজিব নয়। মুজিব ভাইকে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানি। লোকটা মুজিব সেজেছে, জাল মুজিব।

নীলমনি ॥ অ্যাঁ, তাই তো, আমারও কিন্তু কেমন মনে হচ্ছিল। আমিও তো সভাসমিতিতে তাঁকে দেখেছি। চেহারায় খুব মিল, কিন্তু স্বর—সে তো মুজিবভাইয়ের মত মনে হল না। লোকটাকে তবে ধরি—

মীনা ॥ না থাক্। মুজিবভাইয়ের বাণী তো প্রচার করছে। যখন ধরা পড়বে—পড়বে। তাতে লোকসান কিছুই নেই। আজ সবচেয়ে বড় কথা মুজিব নয়, মুজিবের বাণী, মুজিবের আদর্শ। আর, সেই আদর্শ পালনের জন্য রয়েছি আমরা। আজ প্রতিটি বাঙালীই মুজিব। কত মুজিবকে ওরা ধরবে।

নীলমনি ॥ না না, অত সহজে জিনিসটা ছেড়ে দিলে চলে না ধর এ যদি ধরা পড়ে বা বুলেটে মারা পড়ে সারা দেশে রটনা হবে মুজিব ধরা পড়েছেন কি

মারা গেছেন। সেই ঘটনায় দেশের লোক মুষড়ে পড়বে। —হয়তো লোকটা খান সেনাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে না-না, এ সাংঘাতিক কথা। ওকে ধরতেই হবে। (মোটরের চলিয়া যাওয়ার শব্দ)

মা ॥ না না, যেতে দাও। মুজিবই বলে গেছেন।

[একখানা সংবাদপত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল]

মীনা ॥ "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জন সমাবেশে শেখ সাহেব বলেন যদি আঘাত আসে, যদি আমি নির্দেশ নাও দিতে পারি, যদি আমার কর্মীদের পক্ষেও পথ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব না হয়, বাংলার মানুষ তোমরা নিজেরাই নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করে নিও। হাতের কাছে যা পাও তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিও। শত্রুকে হাতে মেরো ভাতে মেরো। বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে মুক্তি সৈনিক হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িও।" —তাই বলছিলাম নীলমনি আসলই হোক আর জালই হোক, মুজিব ঘোষিত স্বাধীন, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এক একটি মুজিব, মুজিব মানেই আজ মুক্তিফৌজ। এখন আমি শুধু জানতে চাই আমরা কি সত্যিই মুক্তিকামী ? আমরা কি দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দেব, না প্রাণের ভয়ে ওপার বাংলায় পালাব ? উত্তর চাই, নীলমনি চৌধুরী।

নীলমনি ॥ মীনা, তোমাকে নিয়ে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। পালাবার কথাটা গোপন মনে এক একবার উঁকি দিচ্ছিল।

মীনা ॥ কিন্তু পালাবার জন্য আমি ঘর ছাড়িনি। দেশের জন্য আমরা হাত ধরাধরি করে মরব, ব্যক্তিগত প্রেম দেশপ্রেমে সার্থক হবে, এমনি সব স্বপ্ন দেখি বলেই তোমার হাত ধরে পথে বের হয়েছি। এখনো বল, আমি কি তোমার সঙ্গে আসবো ?

[ইতিমধ্যে রহমৎ খাঁ নামক একটি পাঞ্জাবী অফিসার নিঃশব্দে
আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাইফেল বাগাইয়া ধরিল]

রহমৎ খাঁ ॥ হ্যাণ্ডস্ আপ (কেউ হাত তুলিল না)

রহমৎ ॥ আমি বাংলা বলিতেছি, হাত উঠাও—বাংলা আমি জানি। আমি পাঞ্জাবী, লেকিন্ কলকাতায় আমি মানুষ হইলাম—(চীৎকার করিয়া) হাত উঠাও। (এইবার দুইজনে হাত তুলিল)

রহমৎ ॥ শালে মুজিবর কোন্‌দিকে ভাগ্‌লো, ঠিক্ ঠিক্ বাতাও।

নীলমনি ॥ মুজিবর ! আমরা দেখিনি—

রহমৎ ॥ ঝুট বোলতা হ্যায়। হমারা স্পাই খবর দিয়া মুজিবর ইধার সে গাড়ী মে গিয়া।

মীনা ॥ গাড়ীর চাকার দাগ তো পথেই আছে। দেখ না গিয়ে।

রহমৎ ॥ বহুৎ আচ্ছা, তমি রেখতে যেমন খাপসুরৎ আছে তোমার বাৎ ভী তেমনি খাপসুরৎ আছে। লেকিন বহুৎ শালা তো গাড়ীমে ভাগ গিয়া। মুজিবর শালাকো গাড়ীকা কৌন দাগ হ্যায় ক্যায়সে মালুম হোগা।

মীনা ॥ তোমার যদি মালুম না হয় তবে আমারই বা মালুম কী করে হবে ?

রহমৎ ॥ সোভানাল্লা, বহুৎ আচ্ছা। তুমি বিবি আমার মোটর বাইকে উঠে বস্‌লে আমার বুদ্ধি খুলে যাবে। মুজিব শালা্‌কো হামি পাকড়ায় গা। আও মেরা সাথ্‌।

মীনা ॥ নীলমণি !

নীলমনি ॥ মেহেরবাণি করকে হামলোগ কো ছেড়ে দাও, মেজর সাহেব।

রহমৎ ॥ আচ্ছা বাত্‌, যাও ভাগো। জান কা পরোয়া হ্যায় তো অাভি ভাগো।

নীলমনি ॥ (মীনাকে) চলে এস্‌।

রহমৎ ॥ আরে, ইয়ে হমারা সাথ চলেগা। কুত্তা, তোম ভাগো। নেহি ভাগে গা তো (রাইফেল তুলিয়া নীলমণিকে গুলি করিতে গেল) হাম মেজর রহমৎ খাঁ। তুমহারা মাফিক দোশো কুত্তাকো জান লে লিয়া। ওয়ান্‌, টু—

নীলমণি ॥ মীনা, এর শোধ আমি একদিন নেব। (পলায়ন)

রহমৎ ॥ (উচ্চৈস্বরে হাসি) হাঃ হাঃ। আইয়ে মেরি জান, ডরো মৎ। তুমি হমারা দিল কা রাণী হোব।

মীনা ॥ (আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে) হ্যাঁ চলো, একটা কাপুরুষের হাতে পড়ার চেয়ে একটা শয়তানের হাতে মরা ভাল। চল।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(২৭শে মার্চ অপরাহ্ন। চণ্ডীপুর গ্রাম। গ্রামের ভূতপূর্ব জমিদার বাড়ী। জীর্ণ দালান। সম্মুখে প্রাঙ্গন। দর-দালানে আওয়ামী লীগের অফিসের সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে। মুজিবরের বাণীর পোষ্টার গোটাকতক টাঙানো আছে। যেমন—

(১) ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ'

মুজিবর রহমান

১১। ৩। ৭১

(২) বাংলা দেশের কোণায় কোণায় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। জয় বাংলা।

(৩) 'বাংলাদেশ সার্বভৌম ও স্বাধীন। একদিকে খান্ সৈন্য অন্যদিকে জনগণ। আমরা কুকুর বেড়ালের মত মরব না। যদি মরতে হয় তাহলে মানুষের মতোই মরব।'—

মুজিবর রহমান

আওয়ামি লীগের একটি বালক কর্মী, নাম মোহন, আর একটি পোষ্টার লিখিতেছে। বাহির হইতে এই গ্রামের মধ্যবয়সী রামদাস ও রহিমুদ্দীন এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে সন্তর্পনে এখানে আসিয়া দাঁড়াইল)

রাম ॥ কর্ত্তারা কোথায় ?

মোহন ॥ কি জানি কোথায়।

রহিম ॥ এসব কী লিখতে আছস ছ্যামড়া ?

মোহন ॥ কেন, পড়্তি পার না ? (পোষ্টারটা তুলিয়া দেখাইল)

"বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো—
বাংলা দেশ স্বাধীন করো"।

রাম ॥ দ্যাশ স্বাধীন কর। গুলি খাইয়া মরবা না ?

মোহন ॥ না মরলে দেশ স্বাধীন হয় ? তুমি মরবা যবে তবে তো তোমার পোলা তোমার সম্পত্তির মালিক হইব। না মরলে কি কিছু পাওন যায় ?

রহিম ॥ আইজ কালকার পোলাপান গো মুখে খালি এই সকল বুলি শুনি।

রাম ॥ শুনলা না, বাপরে মাইরা পোলায় সম্পত্তি লইব। কি দিনকালই পড়ল।

(সতর্কদৃষ্টিতে মুসলীম লীগ নেতা হাজী
সাহাবুদ্দীনের প্রবেশ)

রাম, রহিম ॥ হাজী সাহেব যে, সেলাম আলেকুম্—

সাহাবুদ্দিন ॥ আলেকুম সেলাম। তা তোমরা এই আওয়ামী লীগ অফিসে কি মনে কইরা ?

রহিম ॥ আপনি তো মুসলীম লীগের কর্ত্তা, আপনি এই খানে আইছেন ক্যান ?

সাহাবুদ্দিন ॥ আইছি। ব্যাপারটা কি করতে আছে বুঝবার জন্য। দেশের ভাল তো আমরা সবাই চাই। কিন্তু ভুল পথে চললে ভাল না হইয়া সর্বনাশই হয়। তাই ব্যাপারটা বুঝতে আইছি। কথাটা কি জান, রাজা

রাজাই ; প্রজা প্রজাই। প্রজা কখনো রাজা হইবার পারে না, আর রাজা কখনো প্রজা হইবার পারে না। পারে কী, তোমরাই কও ?

রাম ॥ তা কি আর পারে !

সাহাবুদ্দিন ॥ কই রহিম, তুমি তো কিছু কইলা না।

রহিম ॥ আমি আপনার কথার উপর কথা কইমু। আপনি না হজ্ব কইরা আইছেন। আপনি যা কইবেন, আল্লাই কইতে আছেন মনে করমু।

সাহাবুদ্দিন ॥ এই যে মুজিবর রহমান, কে না কে—সে নাকি এখন আওয়ামী লীগের লীডার। কায়দে আজম জিন্নার মুসলীম লীগরে উৎখাত করণের জন্য উইঠ্যা পইড়্যা লাগছে—শুইনা কি মনে হয় জাননি ?

দুজনে ॥ কি ?

সাহাবুদ্দিন ॥ কত হাতী গেল তল—ভেড়া কয় কত জল।

রাম ॥ ঠিকই কইছেন, ঠিকই কইছেন হাজী সাহেব। আমরাও তাই কই।

রহিম ॥ কথায় আছে না, 'বাপদাদার নাম নেই হাস্ত গোদার নাতি।'

সাহাবুদ্দিন ॥ ঠিকই কইছ (মোহনকে) এই ছ্যামড়া আজ এইখানে মিটিং বসবো না ?

মোহন ॥ জানি না কর্ত্তা।

সাহাবুদ্দিন ॥ আজ ফজিরে এইখানে মিটিং হয় নাই।

মোহন ॥ জানি না কর্ত্তা।

সাহাবুদ্দিন ॥ তবে তুই জানিস কি ?

মোহন। এইটা জানি যে আমি কিছুই জানি না।

[রাম রহিম হাসিয়া উঠিল]

সাহাবুদ্দিন ॥ ছ্যামড়াডা ফাজিল আছে। তা এখন যাইবা নাকি তোমরা।

রাম ॥ যাইমু হাজী সাহেব।

সাহাবুদ্দিন ॥ তবে আইস। কিছু শোনবারও আছে, কইবারও আছে।

রহিম ॥ যান্ যান্ কর্তা, আপনি আইগ্যান্ আমরা আইতে আছি।

রাম ॥ এইখানকার বার্ত্তাটা শুইনা আসি।

সাহাবুদ্দিন ॥ অ, তা ভালই। রাইতে দেখা কইরো। [প্রস্থান]

[ভিতরে আওয়ামী লীগ নেতা আসাবুল হক ও
আন্‌সার নেতা শ্যামসুন্দীনের প্রবেশ]

আসাবুল ॥ এই যো তোমরা আইয়া পড়ছ। দ্যাশের হাওয়া কোনদিকে বইতে আছে জানতো।

রাম ॥ জানমু না।

রহিম ॥ ভোট দিবার সময়ই তো জানছি।

শ্যামসুন্দিন ॥ স্বাধীনতার লড়াই বাইন্ধা গেছে জাননি?

রহিম ॥ হ, শুনছি কর্ত্তা।

আসাবুল ॥ দ্যাশ স্বাধীন হইলে বাংলাদেশে প্রজাই হইব রাজা; সেটা কি শুনেছ?

রাম ॥ হ, কর্ত্তা সেটাও শুন্‌ছি।

শ্যামসুন্দিন ॥ দ্যাশের মালিক তো তখন তোমরাই হইবা।

রাম ॥ বলেন কি কর্ত্তা। আমরা চেয়ার টেবিলে বসতে পারুম?

রহিম ॥ খানা খাইতে পারুম?

আসাবুল ॥ আলবাৎ পারবা। কিন্তু সেই জন্য এখন তোমারে লড়াই করতে হবে।

উভয়ে ॥ করমু।

শ্যামসুন্দিন ॥ জান দিতে হইব।

উভয়ে ॥ দিমু।

রাম ॥ না না, জান্ দিলে চেয়ারে বসব কে?

রহিম ॥ খানাই বা খামু ক্যামনে?

আসাবুল ॥ চেয়ারে বসব তোমাগো বংশধরেরা আর খানা খাইব নাতি-পুতিরা।

উভয়ে ॥ ও বটেই তো, বটেই তো।

রাম ॥ আমরা আছি। তা কর্ত্তা আপনাগো সঙ্গেই আছি।

রহিম ॥ এখন তবে যাই। ক্ষেতের কামে যাই।

মোহন ॥ হ, যাও হাজীসাহেব ডাইকা গেল, যাইবা না।

রাম ॥ আরে কি যে কও—

রহিম ॥ জাইনবা, আমরা যখন যেমন—তখন তেমন—

রাম ॥ মানুষটা আমরা খাঁটিই আছি।

রহিম ॥ হ, কর্ত্তা, মানুষটা আমরা ঠিকই আছি। কখনো লুঙ্গি পরি, কখনো ধুতি।

রাম ॥ হ, কর্ত্তা কখনো কাছা দেই কখনো কাছা দেই না।

রহিম ॥ লোকটা খাঁটিই আছি। আদাব—আদাব।

রাম ॥ আদাব—আদাব—

ম-৩০৫

(উভয়ের প্রস্থান। ছুটিয়া যোহন শ্যামসুদ্দিন ও আসাবুলের নিকট
গেল এবং চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল—এমন সময় হাজী
সাহাবুদ্দিন আসিয়া দরজা হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া
ইহাদের দেখিতে লাগিল—হঠাৎ তাহার প্রতি
আসাবুলের চোখ পড়িল)

আসাবুল ॥ আরে আরে হাজি সাহেব যে। আদাব আদাব।

সাহাবুদ্দিন ॥ আদাব।

আসাবুল ॥ ঐখানে চুপচাপ্ দাঁড়াইয়া রইছেন ক্যান্! আপনার জন্য যে আমরা বইসা আছি।

সাহাবুদ্দিন ॥ আমার জন্য বইসা আছ! আমারে আইজ পোছে কে!

শ্যামসুদ্দীন ॥ কন্ কী কর্তা। আমরা হগ্গলে তো আপনার মুখের দিকে চাইয়া আছি। কাইল্ তো করাচীর রেডিওর খবর শুইন্যা আমরা হতভম্ব হইয়া পড়ছি। রাজনীতি কারে কয় দেখাইলেন বটে ইয়াহিয়া খাঁ।

শ্যামসুদ্দীন ॥ কমু না, আওয়ামী লীগের কেমন বোকা বানাইয়া ছাড়ল!

আসাবুল ॥ তা' এই কথাডা কইতে পার। আমরা ভাবলাম মুজিব-ভাইয়ের সংগে ইয়াহিয়া খাঁ কেমন সুন্দর ঢাকায় বইস্যা কথাবার্তা চালাইয়া যাইতেছেন। কেমন বিশ্বাসই হল যে মুজিবভাইয়ের সঙ্গে একটা আপোষ রফা হইবই। বাংলা দেশের হাড় জুড়াইব। তলে তলে যে টিক্কাখাঁর হাতে মিলি-টারীর শাসনের ভার দিয়া ২৫শে মার্চই রাতারাতি করাচীতে উইরা গেলেন আর সংগে সংগে টিক্কাখাঁও ঐ রাত থেইক্যাই গুলিগোলা চালাইয়া গোটা দ্যাশটারে ছারখার কইরা যাইতেছেন। এই খেল্টা আর কেউ খেলবার পারতো? এখন আমরা গাঁয়ের গরীব গুর্বরা কি করি কন্ দেখি।

সাহাবুদ্দিন ॥ হু, আওয়ামী লীগ তো বে—আইনী ঘোষিত হইছে। তোমরা যে এতক্ষণও গ্রেপ্তার হও নাই, বহাল তবিয়তে আছো, এই দেইখাই তো অবাক হইয়া....গেছি। নাকি তোমরা মুজিবরের মুক্তি ফৌজে নাম লিখাইছ। স্বাধীন হইয়া গেছ, লড়াই করবা?

শ্যামসুদ্দিন ॥ কী যে কন। ঢাল নাই তরোয়াল নাই আমরা তো সব নিধিরাম সর্দার। লড়াই করমু কি দিয়া!

সাহাবুদ্দিন ॥ এত যে গরম গরম মিটিং করলা দেখলাম গ্রামের পোলাপান গো লইয়া কুচকাওয়াজ তো করলা কয়েকদিন; কাইলও তো শুনলাম, গোপন রেডিওতে শেখ সাহেবের গলা শুইনা 'জয় বাংলা' চীৎকারে ফাইটা পইড়া গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাইঙা দিলা। রাত ভোর হইতে না হইতে সব বুঝি ঠাণ্ডা হইয়া গেল। দারোগা সাহেবের কাছে তো শুনলাম মিলিটারী আইতেছে।

'তারা আইবার কালে পথের ধারের যত বাড়ি ঘর সব জ্বালাইয়া পোড়াইয়া আইতে আছে। আওয়ামী লীগের লোক খুইজা বাই কইরা পাইকারী হারে খতম্ করতে আছে। তোমরা যে কোন্ সাহসে এখনো এখানে বইসা আছো, আমি তো তাই ভাইবা পাইনা। আইজ না হয় কেউ লীগ,—কেউ আওয়ামী লীগ কেউ আনসার। কিন্তু আমাগো হক্কলের শরীরে তো সেই পবিত্র ইসলামের রক্ত। একজন মুসলমানও মারা গেলে ইসলামের কত বড় ক্ষতি কও দেখি? হজ কইরা ফিরা আইসা এমন একটা দৃশ্য যে দেখন্ লাগব সেটা তো ভাবি নাই। সত্যি, বড় দুঃখ হয়, তোমাগো হগ্গলের জন্য বড় দুঃখ হয়।

শ্যামসুদ্দিন॥ এখন কন্ দেখি, কেমন কইরা বাঁচি?

আসাবুল॥ আপনি এখন আমাগো গতি। রাজনীতি কইরা ফলটা তো হাড়ে হাড়ে বুঝতে আছি। পালামু যে, কোথায় পালামু?

শ্যামসুদ্দিন॥ আরে পালাইয়া যেখানে যামু সেইখানেই বা খামু কি! দোহাই, হাজিসাহেব, আমাগো বাঁচান। বাঁচবার একটা বুদ্ধি দেন।

সাহাবুদ্দিন॥ কথাটা কি মন থিকা কইতে আছো না আমার লগে মস্করা করতে আছ আল্লার কসুম লইয়া কও দেখি।

শ্যামসুদ্দিন॥ আল্লার কসম্ লইয়া কইতে আছি। আমাগো বাঁচান।

আসাবুল॥ হ, আমাগো বাঁচান। আপনি মুস্লীম লীগের পান্ডা, দেখতে আছি তো মুসলীম লীগেরেই খান্সেনারা একমাত্র দোস্ত বইলা মান্তে আছে।

সাহাবুদ্দিন॥ মুস্লীম লীগ হইল খানদানী দল। খানসেনা তারে মান্বো না তো কি। তা আছে—বাঁচবার জন্য পথ আছে।

শ্যামসুদ্দিন ও আসাবুল॥ (সমস্বরে) কন্ কন্। কি কইরা বাঁচান যায়।

সাহাবুদ্দিন॥ কমু?

শ্যামসুদ্দিন ও আসাবুল॥ কন্।

সাহাবুদ্দিন॥ এখনি গাঁয়ের হিন্দু কাফের গুলানুরে পুড়াইয়া মারো। মিলিটারী যদি আইসা পড়ে আমি দেখাইয়া দিমু তোমরা আমাগো ইস্লাম রাষ্ট্রের কতবড় বন্ধু। এই যা পথ বাতলাইয়া দিলাম না, এই বিপদে ঐ হইল একমাত্র মোক্ষম দাওয়াই। লাইগা পড়। আমি চলি দারোগা সাহেব আমারে তলব দিছেন।

(চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় আসাবুল ও হামিদ আলির পরস্পর
দৃষ্টি বিনিময় হইল। হঠাৎ হামিদ আলি পকেট হইতে একটি
হুইসিল্ বাহির করিয়া বাজাইল, সংগে সংগে জনা
ছয়েক মুক্তিফৌজের ইউনিফর্ম পরা যুবক আত্ম-
প্রকাশ করিল। আনসার নেতা হুকুম দিল)

শ্যামসুদ্দিন ॥ শয়তানকে ধরো। বাঁধো। (সংগে সংগে আদেশ পালিত হইল)

সাহাবুদ্দিন ॥ খোদার কসম্ লইয়া আমার সঙ্গে এই চাতুরী করলা!

শ্যামসুদ্দীন ॥ খোদার কসম্ লইয়া ইয়াহিয়া চাতুরী করছে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে।

সাহাবুদ্দিন ॥ কিন্তু, কাজটা ভাল করলা না।

আসাবুদ্দিন ॥ এই হালারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধাইয়া এত-কাল এই সোনার দেশটার সর্বনাশ করছে এখনো করতে আছে।

শ্যামসুদ্দিন ॥ এই হালার হারামজাদারা হইল পশ্চিম পাকিস্থানের আসল দালাল। ঐ কুত্তাটারে এখনই খতম কর—

[পর্দা সারাইয়া দুর্গা এবং তৎসহ নীলমণির আবির্ভাব। তাহাদের
দেখিবামাত্র সাহাবুদ্দিন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

সাহাবুদ্দিন ॥ মা-গো আমারে বাঁচাও—আমারে বাঁচাও।

দুর্গাদেবী ॥ তোমাকে আমি বলে রেখেছিলাম, জীবনে কখনো আমার বাড়ীতে পা দেবে না। এতকাল সে কথা তুমি মেনেও ছিলে। আজ, আবার কেন এসেছিলে আমার বাড়ীতে?

[হাজী সাহাবুদ্দিন মাথা নীচু করিয়া রহিল]

আসাবুল ॥ ও এসেছিল খান সেনাদের গুপ্তচর হয়ে, আমরা কি করছি সেই সব খবরাখবর নিয়ে গোপনে মিলিটারীকে পাচার করতে। মীরজাফর—

দুর্গা ॥ দেখ, সাহাবুদ্দীন, গেল হিন্দু মুসলমানের দাংগার সময় তুমি তোমার দলবল নিয়ে, এই হিন্দু জমিদার বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করেছিলে। বাড়ীর ধনরত্ন সব লুঠ করেছিলে। গৃহ দেবতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলে। একমাত্র নাতি নীলমণিকে নিয়ে আমি কোলকাতায় কালীঘাটে গিয়েছিলাম তীর্থ করতে—তাই আমরা দুটি প্রাণী বেঁচে গিয়েছিলাম। দাংগা থেমে গেলে, কিছুকাল পরে বাড়িতে ফিরে দেখি, এতবড় রাজপুরী শ্মশান হয়ে গেছে। কিন্তু সেও যদি বা সহ্য করতে পেরেছিলাম, সহ্য করতে পারিনি একটি

দস্যু। আমার একমাত্র আদরিনী কন্যা বিনোদিনীকে তুমি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে, তাকে মুসলমান করে, তোমার চতুর্থ পত্নীরূপে ঘরে তুলেছ। আমার সেই হতভাগিনী কন্যা আজ পর্যন্ত আমাকে তার মুখ দেখায় নি। আমিও তোমাকে বলেছিলাম, তুমিও আমাকে তোমার মুখ দেখাবে না। আমি সব কিছু ভুলে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু—

সাহা ॥ আমি মহাদোষ করে ফেলেছি মা ঠাকরুন। আমার কসুর হইছে। কিন্তু তোমার কন্যার কথা ভাইব্যা আমারে মাপ কর।

নীলমনি ॥ না ঠাকুমা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এই সব গুপ্তচরেরা হল পয়লা নম্বরের শত্রু। শেখসাহেব, আমাদের ছাত্রদের মিটিংয়ে বলেছেন, আমরা হাজার জওয়ান মিলে যা জয় করব এক একটা ঘরভেদী বিভীষণ শত্রুপক্ষকে গুপ্ত খবর দিয়ে এক নিমিষে সব কিছু নস্যাৎ করে দেবে। খতম ওকে এখুনিই করতে হবে। আপনারা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন কি— ?

শ্যামসুন্দিন ॥ কি নীলমনি ?

নীলমনি ॥ লোকটা বারবার ওর হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। আমার মনে হয় ঐ ইয়াহিয়ার মত এই শয়তানটাও সময় গুনছে—কখন ওর মিলিটারী এখানে আসবে।

বাহিরে সংগে সংগে পুলিশের হুইসিল শোনা গেল
এবং একটি বন্দুকের গুলির আওয়াজ হইল।
সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। সংগে সংগে
কয়েকজন আর্মড কনষ্টেবল সহ থানার
দারোগা প্রবেশ করিল)

মহম্মদ শা ॥ (রিভলবার উচাইয়া) হ্যান্ডস্ আপ এভরিবডি—

[কিন্তু কেহই হাত তুলিল না]

সাহাবুদ্দিন ॥ সাহসটা দেখুন স্যার। বুকের পাটাটা দেখুন ! সকলে আপনার হুকুম অমান্য করল। এই ডাকাতরা এক্‌খুনি আমারে খুন করতে আছিল। আপনে কইছিলেন, সওয়া নয়টায় আসবেন—সেই ভরসায় আমি কান্নাকাটি কইরা সময় লইতেছিলাম, আর আল্লার নাম জপতে জপতে ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। তা দেখলাম, আল্লার কি দয়া। আপনি পনের মিনিট আগেই চইলা আইলেন—

মহম্মদ শা ॥ কথা ছিল আপনি গিয়ে আমাকে এখানকার রিপোর্ট দেবেন। আপনি না যাওয়ায় বুঝলাম আপনার বিপদ হয়েছে, তাই আগেই চলে এসেছি।

সাহাবুদ্দিন ॥ আর আইয়া পড়ছেন বইলাই আমি বাইচা গেলাম। এখন দেখেন এরা এক একজন কি চীজ্! হালা গো চালাকিটা শুনবেন—

মহম্মদ শা ॥ থামুন। আমাকে কাজ করতে দিন। শুনুন আপনারা—পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করেছে, আওয়ামী লীগ বেআইনী প্রতিষ্ঠান। হুকুম পেয়েছি যারা আওয়ামী লীগের মেম্বার এবং যারা আওয়ামী লীগ সমর্থক, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করার জন্য দেশদ্রোহিতার অপরাধে আপনারা সকলেই অপরাধী।

আসাবুল ॥ দেশদ্রোহী আওয়ামী লীগ, দেশদ্রোহী মুজিবর রহমান—একমাত্র ইয়াহিয়া খাঁ ও তার অনুচরেরাই এ কথা বলবে।

সাহাবুদ্দিন ॥ (দারোগাকে) শুনতে আছেন, শোনেন!

নীলমণি ॥ আজ ২৪ বছর এই পশ্চিম পাকিস্তানী চক্র বাংলা দেশকে শোষণ করছে। দিন দিন পশ্চিম পাকিস্তান ধনে সম্পদে যত বেড়ে উঠেছে—পূর্ব্বাংলা তত নিঃস্ব হচ্ছে। খানদের শোষণে আর দুঃশাসনে সাড়ে সাত-কোটী বাঙালী তাদের এই সুজলা সুফলা সোনার দেশে বাস করেও আজ এক মুঠো অন্নের কাঙালী হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে, ইসলামের জিগির তুলে ঐ পশ্চিম পাকিস্তানী পাপচক্র বাঙালীকে এতদিন দুর্বল করে রেখেছিল এই শয়তানী যারা ধরে ফেলেছে, ধরে ফেলে এই পাপচক্র ধ্বংস করতে যারা জীবন-পণ করেছে, তারা হল দেশদ্রোহী আর দেশপ্রেমিক হলেন ইয়াহিয়া আর তার দাসানুদাস আপনারা?

মহম্মদ শা ॥ আপনাদের লেকচার শুতে আমি আসিনি! আপনাদের সবাইকে আমি গ্রেপ্তার করছি। থানায় চলুন।

দুর্গাদেবী ॥ নীলমণি, তোর মুজিব ভাই কি স্বাধীনতা ঘোষণা করে শত্রুর কাছে আত্মসমর্প করতে বলেছে?

নীলমণি ॥ না ঠাকুমা, তিনি তা বলতে পারেন না, বলবেন না। বরং বলে দিয়েছেন ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ।

শ্যামসুন্দিন ॥ বুলেট—বন্দুক—বেয়নেট দিয়ে বাংলা দেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না।

আসাবুল ॥ মুজিবভাই বলেছেন, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা প্রস্তুত। প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

দুর্গাদেবী ॥ সাবাস্! বাংলা মায়ের সোনার ছেলেরা। সাবাস্!

মহম্মদ শা ॥ (রক্ষীদের প্রতি) তোমরা চেয়ে দেখছ কি এদের হ্যাণ্ডকাপ পরাও। বাধা দিলে লাঠি চার্জ করবে।

[কনষ্টেবলরা নীরব এবং নিশ্চল রহিল]

মহম্মদ শা ॥ আদেশ অমান্য করছ! (রক্ষীদের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। দারোগা ও সাহাবুদ্দিন ব্যতীত আর সকলে 'জয় ধ্বনি দিয়া উঠিল)

মহম্মদ শা ॥ (কনষ্টেবলগণের প্রতি) এর পরিণাম কি এখুনিই বুঝবে! (উদ্যত রিভলবার হস্তে দারোগার প্রস্থান। পশ্চাতে সাহাবুদ্দিনেরও অনুগমন —এইবার উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল)

১ম কনষ্টেবল ॥ হাসবেন না। হাসির সময় এটা নয়। এক ট্রাক ভর্তি পাঠান আরমড্ গারড্ আসছে কাল রাতে ওয়ারলেসে খবর পেয়েছে দারোগা মহম্মদ শা।

২য় কনষ্টেবল ॥ তাই তারা আসবার আগেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

নীলমণি ॥ মুজিবভাই ছাত্রদের সভায় আমাদের বলেছিলেন থানাগুলো দখল করতে।

আসাবুল ॥ এই কনেষ্টবল ভাইদের যখন আমরা দলে পেয়েছি, সে তো আমাদের হাতের মুঠোয়।

শ্যামসুন্দিন ॥ তাহলে আর দেরী নয়। এসো—এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ি—

দুর্গাদেবী ॥ না, এখন নয়। তোমরা আগে এ গাঁয়ে ট্রাক আসবার পথ জটাগংগার সেতুটা উড়িয়ে দাও। তারপর ঝাঁপিয়ে পড় ঐ থানায়।

সকলে ॥ তুমি ঠিক বলেছ মা। 'জয় বাংলা'—'জয় বাংলা'।

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[২৭শে মার্চ অপরাহ্ণ—গ্রামের থানা। থানার অফিস ঘরে থান কয়েক চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম। তাহাতে বসিয়া রহিয়াছেন সিরাজ, হেনা ও ইয়াকুব। সিরাজ ছয়দফা কর্মসূচীর পুস্তিকা মনে মনে পড়িতেছে। একজন কনেষ্টবল সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে]

ইয়াকুব ॥ আপনি এই থানার হেড কনেষ্টবল ?

হেডকনেষ্টবল ॥ হ্যাঁ হুজুর আমার নাম স্যার, পীতাম্বর পাল। শেখ-সাহেব এই থানায় পায়ের ধুলো দেছেন আমাগো জীবন সার্থক হইল।

সিরাজ ॥ কিন্তু দারোগা সাহেব ছোট দারোগা সাহেব। তাঁরা কোথায় ?

পীতাম্বর ॥ অন্ ডিউটি স্যার। কোথায় সব ধর পাকড় করতে গেছেন। আজ কয়দিন আমাগো উপর দিয়া ঝড় বইয়া যাইতেছে। এখন এক হুকুম

আইতেছে পরক্ষনেই সেটা বদল হইয়া আরেক হুকুম আইল। দারোগা সাহেবরা তো চক্ষে সর্ষের ফুল দেখতে আছে!

ইয়াকুব ॥ শেখ সাহেবরে ধরবার পরোয়ানা আসে নাই?

পীতাম্বর ॥ সেটা কইবার পারুম না। তবে আওয়ামী লীগ যে বে-আইনী হইছে সে খবর এ থানায় আইসা গেছে।

ইয়াকুব ॥ এত বড় থানায় আপনি একলা আছেন?

পীতাম্বর ॥ না স্যার, লোক আরও আছে। মাল খানার গার্ড বন্দুক লইয়া মালখানায় পাহারা দিতে আছে! কয়েকজন গেছে বড় দারোগা মহম্মদ শা সাহেবের লগে, আর কয়েকজন গেছে ছোট দারোগা মৈনুদ্দিন মিঞার লগে। আর আমরা রইছি জনাকয়, থানা পাহারা দেওনের লাইগ্যা।

সিরাজ ॥ সবাই বাঙ্গালী?

পীতাম্বর ॥ (উজ্জ্বল চোখে সানন্দে) তা হুজুর, আপনার আশীর্বাদে আমরা সব্বাই বাঙালী। কিন্তু স্যার, একটা কথা না জানাইয়া পারতাছি না।

ইয়াকুব ॥ কি?

পীতাম্বর ॥ এই থানার বড় দারোগা মহম্মদ শা বাঙালী হইয়াও পাক গভরমেণ্টের খয়ের খাঁ। তিনি কন, গভরমেণ্টই আমাগো মালিক, যখন যে গভরমেণ্ট আমরা তারই নফর। এই লইয়া আমাগো লগে কত তর্ক বিতর্ক হইছে। তিনি কন, ওসব আমি শুনুম্ না—মুজিব সাহেবের গভরমেণ্ট হোক্ তখন মুজিবসাহেবেরই নফর হমু, এখন তো পারি না।

সিরাজ ॥ লোকটি খাঁটি। ঠিক কথাই বলেছে। তিনি এলে আমি তাকে বুঝিয়ে দেব বাংলা দেশ ২৫শে মার্চ থেকে স্বাধীন হয়েছে। এখন বাংলা দেশেপাকিস্তানী গবরমেণ্ট নেই, যে গবরমেণ্ট চলছে সেটা বাঙালীদের।

ইয়াকুব ॥ হ্যাঁ, সাড়ে সাতকোটি বাঙালী নিজেরা ভোট দিয়ে যাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করছে আজ বাংলা দেশে তাদেরই গবরমেণ্ট।

পীতাম্বর ॥ ঐ টা তো আমরা বুঝি স্যার, কিন্তু বড়দারোগা মহম্মদ শা তা শুনবার পাত্র নয়! তিনি কন্ ক্ষমতার লড়াই চলেতেছে! দেখা যাক কে হারে কে জেতে। যে জিতব তারই গোলাম আমরা।

হেনা ॥ তা হলে তিনি তো আইসাই শেখসাহেবরে গ্রেপ্তার করবেন।

পীতাম্বর ॥ তা, ব্যাপারটা তো তাই মনে হয় মা। ঐ অর্ডারই আমাগো দিবেন।

ইয়াকুব ॥ আপনারা কী করবেন?

পীতাম্বর ॥ আমাগো সবাই আসুক যা করবার তখনি করমু। শোনেন, শোনেন, আর একটা খবর আছে। কেবল আমরাই নই, দারোগা সাহেব কইয়া

গেছেন এক ট্রাক পাঠান পুলিশও আইতে আছে। ঐ যে স্যার, আপনাগো চা আইছে।

(কনেষ্টবল আকবর আলির একটি ট্রেতে চা ও
জলখাবার লইয়া প্রবেশ)

পীতাম্বর ॥ আইস আকবর আলি, চা, জল খাবার দেও। আমরা হুজুরদের এতটুকু সেবা করতে পারলাম এও আমাগো ভাগ্যি।

[দুই কনস্টেবল চা ও জল খাবার পরিবেশন করিল]

আকবর ॥ হুজুরের মুখ থিকা দুই একটা দেশের কথা শুনবার সাধ আছে, পারুম না ?

পীতাম্বর ॥ যা কইবার হুজুর আমারে কইছেন। আমার মুখ থিকাই শুনবি। এখন চল আমরা বাইরে যাই। হুজুররা আরাম কইরা খানা পিনা করুন। আহা রে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর দেবতা তার আজ কি হাল! আইস ভাই আইস।

[আকবরকে লইয়া যাইতে যাইতে]

আকবর ॥ দেখ পীতাম্বর, আমি ঐ শেখ সাহেবরে ঢাকায় গেল ভোটের সময় মিটিংয়ে দেখছিলাম। সে কী চেহারা দেখছিলাম, আর আজ কী চেহারা দেখতে আছি। আহা সোনার বরণ কালি হইয়া গেছে। কে বলব যে সেই মুজিব এই মুজিব।

পীতাম্বর ॥ পলাইয়া পলাইয়া চলতে হইতে আছে তো। চেহারার একটু অদল বদল হইব, বোঝ না ? আইস।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইয়াকুব ॥ খাতিরটা দেখতে আছনি দিদি ?

হেনা ॥ রাখ তোর খাতির। এঁদিকে যে প্রাণ যাইবার দশা সেটা বুঝি দেখতাছ না। মানুষটার যে কি রোখ হইল থানায় আসবার হইব। মাথার দিব্যি দিয়া কইলাম, অমন কামও কইরো না। সাধ কইরা কেউ বাঘের মুখে যায়। তা ষাঁড়ের গো তো আটকাইবো কে।

সিরাজ ॥ কি ভ্যানর ভ্যানর করতে আছ। ত্যাল ফুরাইয়া গেছিল না ? তোমার ঐ বেয়াকুব ভাই কইলো না পেট্রল না পাইলে গাড়ি অচল হইব ?

ইয়াকুব ॥ তা বইলা আমি থানায় আসবারে কই নাই—খোনাই সাহেব —থানা ছাড়াও তো পেট্রল মিলত। মোটরওলা দু চারজন বড়লোকের বাড়ি

পথেও তো আছিল। কইছিলাম তো ঐ চেহারা লইয়া আপনি সেখানে গিয়া দাঁড়াইলে পেট্রল ক্যান্ বাঘের দুধও মিলত—তা উনি শুনলেন কৈ? চক্ষু লাল কইরা হুকুম দিলেন না, গাড়ী লইয়া সোজা থানায় চল। যা করনের উনিই করছেন, আমি কি করুম।

সিরাজ ॥ হ্যাঁ, আমিই করছি। মুজিবরের এই ছয়দফা বই পইড়া আমি বুইঝা লইছি জন্মের মত বুইঝা লইছি আমাগো কর্ত্তব্যটা কি? বুইঝা লইছি এ দেশের যে লোক দেশ ছাইরা পলাইবে সে বাংলা মায়ের কুসন্তান, বেইমান। আমরাও পলাইতেছিলাম, কিন্তু এখন আর আমরা পলাইমু না। যারা পলাই-তেছে, পলাইতে চাইতেছে তাদেরও যেমন করিয়া পারি আটকামু। আজ তোমারে কইতে আছি হেনা আল্লা আমারে ঐ মুজিব ভাইয়ের চেহারাটা দিছিলেন ক্যান। আজ বুইজতাছি ঐ মুজিবভাইরই কাজ করবার জন্য। ঐ মুজিব ভাইয়েরই দোসর হইবার জন্য! তাতে বাঁচি বাঁচব; মরি মরব। নাও এখন খাও—আর দেখ—আর থানায় আমি কেন আইছি। এ থানায় হয় আমি মরমু, নয় জয় করমু।

[তিনজনে নীরবে কিছু মুখে দিতে লাগিল।]

সিরাজ ॥ দুজনের এক রকমই চেহারা—একজন হইলেন দেবতা, আর একজন হইলেন ছ্যাঁচর—তাছাড়া কি। কয়েকটা প্যাট চালাইবার জন্য কত মিথ্যা কইছি, কত ছলনা করছি—লোকেরে কত রকম ঠকাইছি—শেষে মালিকের পরম বিপদকালে তার গাড়ী চুরি কইরা পলাইছি—দ্যুাঃ দ্যুাঃ! আর একই চেহারা লইয়া সে লোকটি আজ সাড়ে সাতকোটি মানুষের প্রাণের দেবতা হইছে। সেটা বুঝতে আছনা?

হেনা ॥ বুঝুম না ক্যান্। তা না হইলে, লোক পালাইতেছে, সামান্য যা খাবার সংগে লইতে পারছে তার মোটাভাগটাই—দিয়া গেল আমাগো। ক্যান দিল—না মুজিব মনে কইরাই না তোমারে দিল।

ইয়াকুব ॥ আর এই যে খাবার খাইতেছি, এটাই বা কারা দিল—পাকিস্তানী গবরমেণ্টের চাকর হইয়াও চাকুরীর পরোয়া না কইরা আমাগো দিল তো। বোনাই সাহেবরে মুজিব মনে কইরাই দিছে।

সিরাজ ॥ তবেই বোঝ। কি ছিলাম আমি আর কি হইছি আমি। মুজিব ভাইয়ের এই চেহারায় তার মান মর্যাদা আমারে রাখতে হইবই। তাতে জান যায় যাক্—মনে মনে এই কসম লইসি। খালি রসগোল্লা খাইবার জন্য মুজিব নাম লই নাই। দুশমনের সংগে লড়াইকরনের জন্য বন্দুক চাই, গোলাগুলি চাই, মুক্তিফৌজ চাই। রাতারাতি কোথায় পামু বন্দুক গোলা?

কোথায় পামু মুক্তি ফৌজ? তাই মুজিবের বাণী মনে নিয়া ছুইট্যা আইছি এইখানে—এই থানায়—যেখানে মিলব বন্দুক আর অস্ত্র—

[ছুটিয়া পীতাম্বর ও আকবরের প্রবেশ]

পীতাম্বর ॥ হুজুর বড় দারোগা মহম্মদ শা আইতেছেন।

আকবর ॥ তা বইলা, আপনারা খাওয়া থামাইবেন না। না খাইলে মনে বড় দুঃখু পামু। জানবেন হুজুর পীরের দরগায় যেমন আমরা সিন্নি দেই, সিন্নি দিছি আপনাগো। কারো মুরোদ নাই আপনাগো খাওনে বাধা দেয়। এই আমরা এইখানে দাঁড়াইলাম।

ইয়াকুব ॥ (সিরাজকে) বুলেট বন্দুক দিয়ে সুরু করবেন বোনাই সাহেব।

সিরাজ ॥ বলতে হবে না, ওসব এখন আমার মুখস্থ। (আকবর ও পীতাম্বরকে) তোমাদের খাবার খেয়ে নতুন করে বল পাচ্ছি ভাই। খাওয়া হয়ে গেছে (হেনাকে) তুমি পাত্রগুলো—

আকবর ॥ ও কী করেন? আমি তো আছি।

[পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া উভয়ে চলিয়া গেল। ইয়াকুব পকেট হইতে ছয়দফার পুস্তিকা বাহির করিল]

সিরাজ ॥ বাংলা দেশের সাতকোটি মানুষের—কি যেন কথাটা।

ইয়াকুব ॥ 'সার্বিক'—সার্বিক'

সিরাজ ॥ হ হ, সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের আজকের এই সংগ্রাম। অধিকার—কি হওয়া পর্য্যন্ত যেন?

ইয়াকুব ॥ 'বাস্তবায়িত'—

সিরাজ ॥ হ হ, বাস্তবায়িত। অধিকার বাস্তবায়িত না হওয়া পর্য্যন্ত লড়াই চলবে।

ইয়াকুব ॥ আঃ লড়াই না সংগ্রাম এই দেখুন সংগ্রাম—

[বইটা দেখাইল]

সিরাজ ॥ হ হ, লড়াই না সংগ্রাম চলবে।

[ঠিক সেই সময় বড় দারোগা এখানে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—সিরাজ হেনা এবং ইয়াকুবকে দেখিলেন—ধীরে ধীরে সিরাজের কাছে আসিয়া]

মহম্মদ শা ॥ সেলাম আলেকুম।

সিরাজ ॥ আলেকুম সেলাম।

[উভয়ে উভয়ের দিকে ক্ষণ কাল তাকাইয়া রহিল]

সিরাজ ॥ (দারোগার চোখের উপর চোখে রাখিয়া) "বুলেট বন্দুক বেয়নেট দিয়ে বাংলা দেশের মানুষকে আর স্তব্ধ করা যাবে না। কেননা জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।"

মহম্মদ ॥ জানি জনাব। আর তা বিশ্বাসও করি, কারণ আমি বাঙালী ॥

সিরাজ ॥ তবে আর কেন। হাত মেলাও. মুক্তিফৌজে যোগ দাও।

মহম্মদ ॥ ইচ্ছা খুব জনাব, কিন্তু পারছি কৈ। আমি গবরমেণ্টের নেমক্ খাই। নেমকহারামি তো করে পারি না জনাব।

সিরাজ ॥ বহুত আচ্ছা। কিন্তু নেমকহারামি তোমায় করতে বলেছে কে? আমি বলব না। কিন্তু ভেবে দেখ গবরমেণ্ট আজ কার? তা জাননা তুমি? নির্বাচন করিয়েছিল কে? ইয়াহিয়া না?—সেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল কে? আমি না? ইয়াহিয়া কি আমাকে বলে নাই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবো আমি? কাগজে সে কথা পড় নাই? সেই ইয়াহিয়া এই বাংলা দেশে আজ যা করছে—সেটা বে-আইনি নয়? গবরমেণ্ট কি আজ বে-আইনি? গবরমেণ্ট নয়? (হাঁপ্যাইয়া উঠিয়া) হ্যাঁ, এ্যাঁ আর কত কইমু। (ইয়াকুবকে) আমি পারতাছি না—তুমি কও—

ইয়াকুব ॥ তাই মুজিব ভাই বলেন—ইয়াহিয়ার যে কোন অর্ডার বাংলা দেশে বে-আইনি অর্ডার। আর বে-আইনি বলেই কাগজে পড়েন নাই—ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সিদ্দিকী সাহেব ইয়াহিয়া খাঁর অর্ডারেও পূর্ব বাংলার গভরণর টিক্কা খাঁরে হলপ পড়ান নাই।

সিরাজ ॥ আইনটা বেশী বুঝবে কে? দেশের প্রধান বিচারপতি নাকি তুমি?

মহম্মদ ॥ ঠিকই তো কই আছেন, ঠিকই তো—সরকার এখন স্বাধীন বাংলা।

সিরাজ ॥ তাই আমার শেষ কথা—কুকুর বেড়ালের মতো আমরা মরতে পারব না। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর মনের কথা প্রাণের কথা আজ আমরা স্বাধীন। প্রত্যেকটি বাঙালী আজ স্বাধীনতার সৈন্য। শোষণহীণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সৈন্য।—তুমি?

মহম্মদ ॥ আমিও। জনাব আমিও।

সিরাজ। 'জয় বাংলা'।

[এই বলিয়া মহম্মদ শা তার রিভলবারটি খুলিয়া তার পায়ের নিকট রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে ধ্বনি উঠল 'জয় বাংলা',—]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

(২৮শে মার্চ ১৯২১ ভোরবেলা। চণ্ডীপুরে দুর্গাদেবীর বাড়ীর গৃহ দেবতার মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনে খানকতক বেঞ্চি সুবিন্যস্ত। মন্দিরের পুরোহিত পূজায় রত দেখা যাইতেছে এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। মন্দির সংলগ্ন পথে একে একে সিরাজ ও ইয়াকুবের প্রবেশ। তাহাদের হাব-ভাব দেখিয়া বোঝা যায়। তাহারা যেন এই শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনিতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াছে)

সিরাজ ॥ (হেনাকে) কি আশ্চর্য এ যে দেখছি দেব মন্দির।

হেনা ॥ হ্যাঁ, ঐ যে পূজো হচ্ছে।

ইয়াকুব ॥ কি আশ্চর্য্য, কাল আমাদের এই মন্দিরের এক লাগাও ঘরে শুতে দিয়েছিল!

সিরাজ ॥ অত রাতে আর ওই গোলমালে ঠাহর করতে পারি নাই। বলল, এখানকার হিন্দু জমিদার বাড়ী। কিন্তু অত বড় বাড়ি—এতগুলো ঘর—বাইছা বাইছা থাক্‌তে দিসে মন্দিরেরই পাশের ঘরে।

ইয়াকুব ॥ কারোর ভুলে হয়তো এটা হয়ে গেছে।

হেনা ॥ ভুল? আরে জমিদারনী নিজেই তো আমাগো ঐ ঘরে রাইখ্যা গেল!

[পুরোহিত ইতিমধ্যে পূজা সমাপন করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ইহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন]

পুরোহিত ॥ হ, হ, বুঝেছি। গ্রামময় তো রটনা হইয়া গেছে আপনি বঙ্গবন্ধু কাল রাত্রে এ বাড়ী আইছেন। আপনি তো গণ্যমান্য ব্যক্তি কিন্তু, আপনি তো মুসলমান—মন্দিরে আইছেন ক্যান্?

সিরাজ ॥ (ইয়াকুবকে) কও—

ইয়াকুব ॥ আরে আমাগো তো জমিদারণী এই পাশের ঘরেই থাক্‌তে দিছে।

পুরোহিত ॥ আরে, কন কি মশায়। এটা তা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। ঐ যে খোদ কর্ত্রী আইয়া পড়ছেন।

(দুর্গার প্রবেশ। তাহার হাতে একটি ট্রেতে চা ও জলখাবার। পশ্চাতে নীলমণির প্রবেশ। তাহার হাতেও একটা ট্রেতে জলের গেলাস, পানের ডিবা ইত্যাদি। দুর্গা ও নীলমণি ট্রেগুলি বেঞ্চিতে নামাইয়া রাখিল এবং গলবস্ত্রে সিরাজ ও তার সঙ্গীদের নমস্কার জানাইল। সিরাজও ইহাদের প্রতি-নমস্কার জানাইল।)

সিরাজ ॥ কিন্তু মা, আপনারা কেন?

নীলমনি ॥ এ বাড়িতে চাকর আছে, কিন্তু ঠাকুমা বললেন এ পুণ্যটা ছাড়তে উনি রাজী নন্।

দুর্গা ॥ হ্যাঁ বাবা, তোমরা তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে নাও। নইলে এখনইতো কাজের ভীড় জমে যাবে। খাওয়ার আর ফুরসৎই পাবে না!

পুরোহিত ॥ মা, কাইল থিকা অন্য পুজারী ঠিক করবেন; আমাগো দিয়া আর চলব না। উনি যে বঙ্গবন্ধু একথা জাইন্যাও এটা কইলাম। মুসলমানের মেলামেশা আমাগো আছে। কিন্তু তা বইলা দেবতার মন্দিরে ঠাঁই দিলে জাতও যায়, ধর্মও যায়। এ বাড়ীতে এমন অনাচার এতকাল পর আপনার আমলে হইল এইটাই বড় দুঃখের বিষয়। (সিরাজকে) আপনি কিছু মনে কইরবেন না। বঙ্গবন্ধু মশয়, আমি আপনাগো পক্ষেই আছি। কিন্তু, পেটের ভাবনা তো আছে। আর—আর যজমানরা এটা জানলে পরে আমারে ত্যাগ করব। আমি তখন খাইমু কি? চলব কিসে?

সিরাজ ॥ (দুর্গাকে) আপনি ভুলই করেছেন। আপনার বৈঠকখানা ঘরে থাক্‌তে দিলেও পারতেন।

দুর্গা ॥ ভুল আমি করিনি বাবা। বরং বলব ভুল করেছে দেশের হিন্দু সমাজ। হাঁ, একথা আমি চেঁচিয়ে বলতেও রাজি আছি। জানো বঙ্গবন্ধু এ গ্রামে কয়েক বছর আগে হিন্দু মুসলমানেব দাঙ্গায় এ গ্রামের মুসলমানরা এই জমিদার বাড়ীর সবাইকে কুপিয়ে কেটে মেরে ফেলেছে। এই নাতিকে নিয়ে আমি তখন কলকাতায় ছিলাম, তাই আমরা দুজন বেঁচে গিয়েছি। সেই আমি আজ এই কথা বলছি যে, এতকাল একটা চরম ভুল করে এসেছে দেশের সব হিন্দু আর সব মুসলমান। শুধু ভুল করেনি, অন্যায় করেছে, অধর্ম করেছে, যাক্ সে কথা,—তোমরা বাবা খেয়ে নাও। (হেনাকে) তুমি মা কিছু মুখে দাও।

সিরাজ ॥ না মা, আপনার ঐ কথা শোনার পর এ বাড়ীতে কিছু মুখে 'তুলতি পারবনা যতক্ষণ না শোনতাছি দেশের হিন্দু-মুসলমান কি ভুল করছে— যা আপনি কইছেন।

দুর্গা ॥ ভুল করেনি ? আমরা সবাই এতকাল ঐ একই ভুল করে এসেছি। আর সেই পাপে আজ দেশের এই অবস্থা। আমার ঐ মা-কালী কি শুধু হিন্দুর মা, তিনি কী বিশ্বজননী নন ? বিশ্বজননীকে শুধু হিন্দুর মা কালী করে রেখে, শুধু হিন্দুর দেবতা করে রেখে ঐ বিরাটকে কি আমরা খর্ব করিনি, ক্ষুদ্র করিনি, তুচ্ছ করিনি ? এই একই পাপ করেছে মুসলমানরাও। মুসলমানের আল্লা সে কি শুধু মুসলমানেরই আল্লা, বিশ্বপিতা তিনি কি নন ? শুধু মুসলমানের আল্লা বলে তাঁকে কি ছোট করা হয়নি, খাটো করা হয় নি, পাপ করা হয় নি ? ঈশ্বরকে এমনি করে যেমন করেছি আমরা সংকীর্ণ, নিজেরাও হয়েছি আমরা তার চেয়ে আরো বেশী সংকীর্ণ। আর এই পাপেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চল্‌ছে ভায়ে ভায়ে হানাহানি কাটাকাটি—যার ফলে আজ আমার এই হিন্দুপরিবার নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে, এম্‌নি কত মুসলমান পরিবারও ধ্বংস হয়ে গেছে—গোটা দেশটা, গোটা জাতিটা এই পাপেই এগুতে পারছে না—নিজেরা নিজেদের সঙ্গে হানহানি মারামারি কাটাকাটি করে মরছে !

সিরাজ ॥ মা আমি তোমাকে প্রণাম করচি। (সত্য সত্যই সিরাজ, হেনা ও ইয়াকুব সকলেই শত সেলাম করিল)

সিরাজ ॥ এইবার তোমার এই প্রসাদ আমরা পেট ভইরা খামু। তোমার এই প্রসাদ খাইলেই আমাগো জয় হইব।

ইয়াকুব ॥ বংগবন্ধুও এমনি কথাই সবাইরে কইছেন এ্যাদ্দিন।

পুরোহিত ॥ মা, কি সব অপূর্ব কথা শুনলাম আজ। আমি নতুন মন লইয়া, নতুন সংকল্প কইরা পুজোয় গিয়া বস্‌তে আছি।

দুর্গা ॥ আমিও যাচ্ছি ঠাকুরমশায়, চলুন।

[দুর্গা ও পুরোহিতের মন্দিরে প্রস্থান]

নীলমণি ॥ (সিরাজকে) আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

সিরাজ ॥ কি কইবা কও।

নীলমণি ॥ আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন।

সিরাজ ॥ এ কথা কইতেছ ক্যান্‌ ?

নীলমণি ॥ শুনুন্‌, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন। আমি ঢাকায় অন্যান্য ছাত্র নেতাদের সংগে মুজিব ভাইয়ের কাছে অনেকবার গিয়েছি, কথা বলবার সুযোগও পেয়েছি। দেখতে অনেকটা একরকম হলেও আপনি জাল মুজিব।

[নিস্তব্ধতা। সিরাজ মাথা নীচু করিয়া মুহূর্তকাল কী
ভাবিল। নীলমনি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহার
দিকে তাকাইয়া রহিল]

সিরাজ ॥ আমরা চইল্যা যাইতাছি। (মুহূর্তকাল কি ভাবিয়া লইয়া) সত্যিই আমার খুব অন্যায় হইছে। তিনি কে আর আমি কে!

হেনা ॥ (মুজিবকে) তখনি আমি কইছিলাম না?

ইয়াকুব ॥ হ কাজটা একটু দুঃসাহসিক হইছে। বংগবন্ধুর, ছয়দফা কর্মসূচীও মুখস্থ করাইয়া দিছিলাম। কিন্তু তীরে আইসা যে তরী ডুববো সেটা বুঝি নাই।

সিরাজ ॥ (বিরক্ত হইয়া) থামো। সত্যি আমি পাপ করেছি। আর লোকজন আসবার আগেই এই খান থিকা মুখ ঢাইকা চইলা যাইতেছি তবে জাইনা রাখবা, প্রায়শ্চিত্তও আমরা করুম। স্বাধীনতার সৈনিক হইয়া এই লড়াইয়ে আমরা জান দিমু।

আল্লার নামে, মা কালীর এই মন্দিরে এই কসম্ খাইতেছি। (কাতরভাবে) শীগ্গির শীগ্গির আমাগো পথ দেখাও। মা দুর্গা আসবার আগেই আমারে পালাইতে দাও, এ মুখ আর আমি তাঁরে দেখাইতে পারমু না।

নীল ॥ (বজ্রমুষ্টিতে সিরাজের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাঁড়ান, বঙ্গবন্ধু মুজিবভাইয়ের দোহাই, আপনাকে এইখানে থাকতে হবে—জাল মুজিব সেজেই থাকতে হবে—কারণ, স্পষ্ট দেখছি তাতেই মুজিবভাইয়ের কাজ এগিয়ে যাবে। এ গ্রামে মুজিব এসেছেন এটা রটনা হতেই গাঁয়ের যেসব লোক মিলিটারীর ভয়ে পালাচ্ছিল তারা ফিরে দাঁড়িয়েছে; চটপট একটা সংঘবদ্ধ শক্তি গড়ে উঠছে। ঠিক যে শক্তি প্রতি গ্রামে বঙ্গবন্ধুর কাম্য। আপনারা হঠাৎ অদৃশ্য হলে আমাদের এ সংগঠন ভেঙ্গে পড়বে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আমাদের এই গৃহদেবতার মন্দিরে আমি শপথ করছি আপনার পরিচয় কখনো প্রকাশ করব না। মুজিবভাইয়ের দোহাই, আপনারা যাবেন না; বরং এখানে থেকে আমাদের পরিচালিত করুন। মুজিবভাইয়ের যে ব্যক্তিত্ব আপনার চেহারায় রয়েছে তাতে আপনাকে বিশেষ কোন কথাই বলতে হবে না। যা বলবার আমরাই বলব—কিন্তু দেখ্‌বেন, তা'তেই হবে ম্যাজিকের মত কাজ। মিলিটারী আসছে—তাকে রুখতে হবে। শত্রু খতম করতে হবে। বাংলাদেশকে ঐ বর্বরদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। দেশজননীকে উদ্ধার করতে হবে সেইসব বন্দী বন্দিনীদের যাদের মধ্যে রয়েছে মায়েরা বোনেরা এবং—এবং—কতজনের কত প্রিয়তমা, কত প্রিয়া—

সিরাজ ॥ তাই হোক, তবে তাই হোক। মনে হইতাছে মুজিবের নকল করতে করতে আমি যেন মুজিবই হইয়া গেছি। আকাশে উইঠা গেছি।

হেনা ॥ না না, আমি আবার বলছি, ওর এসব কথা শোনার পরও—বলছি ফল এতে ভাল হবে না। জাল জুয়াচুরির ফল কখনো ভাল হয় না! মিথ্যার ফল মিথ্যাই হয়!

সিরাজ ॥ শোন হেনা, মুজিবভায়ের দোহাই দিছে। এর পর আর কোন কথা চলে না। পাপ হোক পুন্য হোক, আমিই মুজিব, কিন্তু তুমি মুজিব-ভায়ের বৌ সাইজো না। তুমি বরং মুজিবের কোন শালী, মুজিবের বৌ তার ছেলে মেয়ে লইয়া কোন খানে আশ্রয় লইছে। একলা আসতেছি দেইখ্যা তুমি তোমার ভাইরে লইয়া আমার সংগে আইছ—আমারে দেখন শোননের জন্য। শালী, বুঝলানা, শালী।

নীলমণি ॥ বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

ইয়াকুব ॥ তবে তো আমাগো ঘরে আর একটা চৌকি দেওয়ন্ লাগব; তিনটা চৌকি চাই এখন।

হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রাম ও রহিমকে
কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লাঠি, দিয়া গুঁতাইতে
গুঁতাইতে আনসার লীডার শ্যামসুন্দীন
এখানে আসিয়া প্রবেশ করিল)

শ্যামসুন্দীন ॥ কান্ড শোনেন, এই দুই শালা বেইমান আজ ধরা পড়ছে।

নীলমণি ॥ কি হয়েছে, ব্যাপার কী?

রাম ॥ আমারে কইতে দেন কর্তা। কাল রাত্রে শুনলাম—আজ ভোরে গ্রাম ছাইড়া সবাই পলাইব। ঘুম থিকা উইঠা দেখি আমার সাইকেলটা নাই। হঠাৎ দেখি এই শালা রহিম আমারই সাইকেল চইড়া আমারই সামনে দিয়া তীর-বেগে ছুইটা যায়—সংগে সংগে শালারে জাইপ্‌টা ধরলাম। শালারে কাবু কইরা পকেট হাতড়াইয়া দেখি একটা চিরকুট। একেবারে তো গোমুর্খ নই—পইড়া দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার। এই গ্রামের হাজী সাহেব ওপারের ফুলবাড়ির মুসলীম লীগের মৈনুদ্দীন মিঞারে চিঠি দিছে, 'শেখ মুজিবর চন্ডীপুরে জমিদার বাড়িতে আস্তানা গাড়ছে। মিলিটারী লইয়া আইস। শালা মুজিবরে ধইরা ফেলাও। বখশিসের ভাগ সমান সমান।'—দেখেন হুজুর ঘর শত্রু বিভীষণের কান্ডটা দেখেন একবার।

[চিঠিখানা নীলমণির হাতে দিল]

রহিম ॥ তবে আমারে এইবার কইতে দেন কর্তা। কথাটা সবই সত্য কিন্তু হাজীসাহেব যে লোকটারে চিরকুট দিয়া গাজীপুরের লীগের চাঁই মৈনুদ্দীন

ম-৩২১

মিঞার কাছে পাঠাইতে গেছিল সে লোকটা আমি নই—এই শালা বেইমান্। হাজী সাহেব কইছিল, চিঠিটা দিয়া উত্তর আনবার পারলে তোমাগো দুইজনের পঞ্চাশ টাকা বখশিস্। তার আগাম অর্ধেক পঁচিশ টাকা দিছিল। তা শালায় কয় সাইকেল যখন ওর, তখন ওই পঁচিশ টাকার কুড়ি টাকাই ও লইব। এই বখরা লইয়া হাতাহাতি হইতে হইতে মারামারি।

শ্যামসুন্দীন ॥ আল্লার মেহেরবানিতে ঠিক ঐ সময় ঐ পথে গিয়া পড়ি আমি। দুই শালারে ধইর‍্যা, বাইন্ধ্যা আন্‌ছি।

নীলমণি ॥ হাজীসাহেব কোথায় ?

শ্যামসুন্দীন ॥ ফেরার। গ্রাম থিকাই। বাড়িতে আমি আগুন লাগাবার হুকুম দিছি। এখন এই দুই শালার কি করি।

নীলমণি ॥ গাঁয়ের চৌরাস্তায় নিয়ে এই বেইমানদের বেত মারা হোক্।

সিরাজ ॥ কও কি তুমি। একটা দেশ, একটা জাত জীবন দিয়া যা গইড়া তোলে এমনি সব মীরজাফরেরা এক লহমায় তা ধ্বংস কইরা ফেলে। এদের দুজনরে মাটিতে পুঁইতা ফেল—মুন্ডুটা থাকবো মাটির উপরে যাতে হা হুতাশ করনের সুযোগ পায়, আর তাই দেইখ্যা লোকে সাবধান হয়। যাও, লইয়া যাও।

নীলমণি ॥ জয়—বঙ্গবন্ধুর জয়।

শ্যামসুন্দীন জয়, বাংলার জয়।

[আনসার শ্যামসুন্দীন রাম ও রহিমকে গুতাইয়া বাহিরে নিয়া গেল]

হেনা ॥ (সিরাজকে) এ কি করলা তুমি এত নিষ্ঠুর তো ছিলে না কোন কালে। না না, ওদের মাপ কর, মাপ কর।

সিরাজ ॥ আরে শালী, থামো তুমি। যা বোঝ না তা নিয়ে কথা কইতে আইস না। আমি দেখছি সব ব্যাপারেই তোমার নাক গলানো স্বভাব। তুমি তোমার ঘরে যাও।

[হেনা সিরাজের মুখের দিকে একবার চাহিল কিন্তু উপায় নাই
দেখিয়া তাহার ঘরে চলিয়া যাইবার সময় বলিল]

হেনা ॥ জানিনা—জানিনা—কোথাকার পানি যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব—আমি জানি না—এক খোদাই ভরসা।

[ঘরে প্রস্থান]

বাহিরে এক বিশাল জনতার জয়ধ্বনি শোনা গেল—'জয় বাংলা জয়' 'মুজিবর রহমান জিন্দাবাদ'—আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ' 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর—বাংলাদেশে স্বাধীন করো'। আওয়ামী লীগ নেতা আসাবুল হক্ এখানে ছুটিয়া আসিল—সিরাজকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করিল।

আসাবুল ॥ জনাব, বড় আনন্দের সংবাদ দিচ্ছি। কাল রাতে এই গাঁয়ের লোকেরা ঠিক করেছিল গ্রাম ছেড়ে সবাই পালাবে—যেই রটনা হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু এসে পড়েছেন এই গাঁয়ে, এক মুসলীম লীগ আর জমাইত ইসলামের লোক ছাড়া সবাই রাতারাতি ঠিক করে ফেলেছে কেউ পালাবে না—লড়াই করবে। যুবকরা মুক্তিফৌজে যোগ দিতে এসেছে। আপনার দোয়া চাইছে।

সিরাজ ॥ এদের কোন হাতিয়ার আছে ?

নীলমণি ॥ সাধারণ মানুষের যা হাতিয়ার তাই আছে আর কি থাকবে—লাঠি বর্শা, বল্লম, দাও কুড়াল, তীর ধনুক আর কিছু বোমাও নাকি তৈরী আছে।

আসাবুল ॥ তাছাড়া থানার দারোগা মহম্মদ শার এক্তিয়ারে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আছে। গোটা পনের রাইফেল আর কিছু রিভলবার। কাল রাতে তিনি ওয়ারলেসে খবর পেয়েছেন মিলিটারী এদিকে আসছে। দারোগাকে ওয়ারলেসে হুকুম দেওয়া হয়েছে এ গাঁয়ের পাকা বাড়ীগুলো পুলিশ যেন দখল করে রাখে। মিলিটারীর কাজে লাগবে।

সিরাজ ॥ মিলিটারী এদিকে আসছে! এ খবর এসে গেছে ?

আসাবুল ॥ হ্যাঁ, দারোগা সাহেব তো তাই বল্লেন তিনি তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধের জন্য তৈরী হচ্ছেন।

[বাহিরে সমবেত জনতার প্রবলতর জয়ধ্বনি শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন দুর্গা দেবী ও হেনা বিবি]

সিরাজ ॥ মা আপনি শুনেছেন ? মিলিটারী এ গাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। আশীর্ব্বাদ করুন মা যেন বাংলা দেশের মুখ রক্ষা করতে পারি।

দুর্গা ॥ এত সহজে কি করে মিলিটারী আসবে। জটা গঙ্গার খালের উপর সেতুটা কাল গাঁয়ের লোক তো ভেঙ্গে দিয়েছে। পথও মাঝে মাঝে কেটে দিয়েছে। এত বাধা পেরিয়ে মিলিটারী এ গাঁয়ে আসবেই বা কেন বাবা। এ গাঁয়ে কি আছে ?

হেনা ॥ এই গাঁয়ে কাল এ লোকটিকে মোটরে আসতে পথের লোক দ্যাখছে! মিলিটারী আজ এই লোকটারেই ধরতে চায়—তাই তারা এত তোড়জোড় কইরা এই গাঁয়ে—ছুইট্যা আসতেছে। আমি তখনি কইছিলাম এইটা হইতেছে আগুন লইয়া খেলা। আমার বুকটা কাঁপতাছে মা।

সিরাজ ॥ তুমি থাম। দেখতাছ না এই মায়েরে ?

দুর্গা ॥ না মা ভয় পাবে কেন ? একদিন তো মরতে হবেই।

আসাবুল ॥ ঢাকার পাকিস্তানী বেতার কেন্দ্র থেকে আজ ঘোষণা হইছে—

শ্যামসুন্দর ॥ পাকিস্তানী বেতারের কথা আমারে কইও না। সাতাশে মার্চ করাচী থিকা ঘোষণা হইছিল যে মুজিবর রহমানরে গ্রেপ্তার করা হইছে।

নীলমণি ॥ তার কিছু পরেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই মুজিবর স্বয়ং ঘোষণা করেন যে, তিনি মুক্ত আছেন আর এই সংগ্রাম পরিচালনা করছেন।

সিরাজ ॥ এ্যা? হ্যাঁ তা করছি। মা, আপনি আমারে দোয়া দেন আমি গিয়া ঐ জনতার সামিল হই।

দুর্গা দেবী ॥ ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়েই তুমি বাংলাদেশের পরিত্রাণের জন্য জন্মেছো মুজিবর। বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষ মনুষ্যত্বের এক নতুন ধর্মের সন্ধান পেয়েছে তোমারই মধ্যে। হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্ সবারই আদর্শ মনুষ্যত্ব। এ আদর্শের দীক্ষাগুরু তুমি মুজিবর। তোমার জয় হোক্।

সিরাজ ॥ আমি ধন্য মা, আমি ধন্য। পশুরা মানুষ মারছে আমরা মারবো পশু। [বাহিরে পুনরায় প্রবলতর জয়ধ্বনি—'বংগবন্ধু মুজিবর রহমান—জিন্দাবাদ'। সিরাজ বাহিরে যাইতে উদ্যত, এমন সময় বাহির হইতে ছুটিয়া আসিলেন দারোগা মহম্মদ শা এবং সিরাজকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিয়া কহিলেন]

মহম্মদ ॥ দাঁড়ান জনাব। মিলিটারী জটাগংগার খাল পার হতে পেরেছে। খালে জল ছিল না বল্লেই চলে, তাই ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হলেও তাদের পথ রোধ করা যায় নি। এখন আমাদের কি কর্তব্য? অস্ত্রের মধ্যে তো থানার পনেরটি রাইফেল আর দুটো রিভলবার।

আসা ॥ মিলিটারীর যে বাহিনী এদিকে আসছে তাতে কত সৈন্য, আর তাদের সাজসরঞ্জাম কি জানতে পেরেছেন কিছু?

মহম্মদ ॥ আজ আমার এ, এস, আই ঢাকার পাকিস্তানী ওয়্যারলেসের একটা খবর ধরতে পেরেছে।

সকলে ॥ কি?

মহম্মদ ॥ ঢাকার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর মূল ঘাঁটি থেকে করাচীতে পাঠানো এক 'এস্-ও-এস্' বার্তা—বার্তাটা পাঠিয়েছে আজম্ খান্। তিনি ব্যাকুল হয়ে বলেছেন, চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিফৌজ ঢাকার দিকে আসছে—আরো সৈন্য না পাঠালে ঢাকার পতন অনিবার্য। আর একটা ভাল খবর আছে—

সকলে ॥ কি?

মহম্মদ শাহ ॥ ওর কিছু পরেই স্বাধীন বাংলা দেশের বেতার থেকে ঘোষণা হয়েছে যে, মুক্তিফৌজ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিযানে অগ্রসর হচ্ছে, শুধু তাই

নয়—কুষ্ঠিয়া মহকুমা সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের দখলে—সেখান থেকেও একদল মুক্তিফৌজ ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে—কুমিল্লা থেকেও একদল মুক্তি-ফৌজ ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাক সেনাবাহিনী বিপদটা বুঝতে পেরে আকাশ থেকে বিমান আর হেলিকপ্টার যোগে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর বোমা ও গুলি বর্ষন করে তাদের শক্তি জাহির করছে।

সিরাজ ॥ বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে রোজগার করা টাকায় পাকিস্তান গভরমেণ্ট যে অস্ত্র কিনেছে এবং যাদের টাকায় ইয়াহিয়া খানের এই দস্যু বাহিনী বেতন পায়—আজ তাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ওরা এ দেশের মানুষ মারছে, আমরাও ঐ পশুদের মারবো। ভাই সব যার হাতে যা আছে আমরা তাই নিয়ে লড়াই করব! চল সব চল, ঝাঁপিয়ে পড়—স্বাধীনতার যুদ্ধে।

দুর্গা দেবী ॥ আমি তোমাদের মা, আমার এক টা কথা তোমাদের রাখতেই হবে।

সকলে ॥ বলুন মা।

দুর্গা দেবী ॥ স্বাধীনতার লড়াইয়ে আজ আমরা সবাই জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু,—

সকলে ॥ কিন্তু কি—বলুন মা।

দুর্গা দেবী ॥ একটি জীবন—মাত্র একটি জীবন রক্ষা করতেই হবে। আজ আমাদের এই স্বাধীনতার সংগ্রামে লক্ষ লোক প্রাণ দিলেও আর এক লক্ষ লোক এগিয়ে আসবে। কিন্তু এই মুজিবর রহমান প্রাণ দিলে আর এক মুজিবর রহমান আমরা পাব না। এ যুগে পাব না, যুগে যুগেও পাব না। সবাই আমরা লড়াইয়ে ঝাঁপ দিচ্ছি—কিন্তু এঁকে এখনই সদলবলে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে কোন নিরাপদ অঞ্চলে, সেখান থেকে ইনি বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে পরিত্রাণ করতে পারবেন, জয়যুক্ত করতে পারবেন।

সকলে ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। 'বংগবন্ধু—জিন্দাবাদ।

[বাহিরেও এই জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল]

দারোগা ॥ আসুন জনাব, আমার জীপে আপনাদের এখুনি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মা, আপনি বংগবন্ধুর জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। আসুন জনাব, আর দেরী নয়। [বাহিরে মর্টারের আওয়াজ শুনিয়া] ঐ শুনুন হানাদাররা এসে পড়েছে (চীৎকার করিয়া) আসুন, আসুন জনাব।

দুর্গা দেবী ॥ (মুজিবের কাছে গিয়া দুখানি হাত ধরিয়া) এস বৎস, জানবে এ আমার আদেশ নয় বাংলামায়ের এই আদেশ।

সিরাজ ॥ তবে শোন মা, শোন সকলে। আমি মুজিবর রহমান নই। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই বিশ্বাস কর, আমি জাল মুজিব।

হেনা ॥ মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা কথা কইতাছেন আপনি!

নীলমণি ॥ এ ছলনায় আমাদের ভোলাতে পারবেন না, বংগবন্ধু মুজিব ভাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিতে আপনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন তাই নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে অসম্মত বলেই মহিয়সী দুর্গাদেবীকে আপনি এই ছলনা করছেন। কিন্তু মুজিবভাই—বংগবন্ধু মুজিবভাই—ঢাকার বহু ছাত্র সভায় আপনার সংগে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, তা জেনেও আজ এই ছলনা আপনার শোভা পায় না,—অন্ততঃ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আসা ॥ শুনুন জনাব, আপনি জীবিত থাকলে সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর মনোবল অটুট থাকবে, দ্বিগুণ উৎসাহে তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আজ এই চণ্ডীপুরে আপনার মৃত্যু হলে দেশ ও জাতির সে যে কি নিদারুণ ক্ষতি তা ভাবতেও শিউরে উঠছি।

[খুব কাছেই একটি কামানের গোলার শব্দ হইল]

সকলে ॥ (চীৎকার করিয়া) আর সময় নেই। দুষমণ এসে পড়েছে।

দারোগা ॥ এখনও এলে আমি আপনার অমূল্য জীবন রক্ষা করতে পারবো। আসুন জনাব, আসুন।

সিরাজ ॥ আমি যাব না। আমি প্রাণ দেব। কারও কোন অনুরোধ আমি শুনব না। আমি প্রাণ দেব। আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। হ্যাঁ, আমি প্রাণ দেব।

[উন্মত্তবৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সকলে তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে জয়ধ্বনি করিল—'বংগবন্ধু মুজিবর রহমান'— 'জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ'—]

হেনা ॥ হায় আল্লা—একি করলা।

[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[২৮শে মার্চ। অপরাহ্ন। দুর্গাদেবীর বাড়ির দরদালান নানাস্থানে সশস্ত্র পাঠান প্রহরী মোতায়েন তক্তপোষ পাতিয়া একটি মঞ্চ নির্মিত, তাহার উপর চেয়ার টেবিল সজ্জিত। ব্রিগেডিয়ার রহমৎ খাঁ মিলিটারী কায়দায় বাহির হইতে আসিয়া মঞ্চোপরি চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার সংগে তাহার সেক্রেটারী, মিলিটারী ইউনিফর্ম পরিহিতা মীনা, এবং তাহাদের পশ্চাতে আসিল লীগ নেতা হাজী সাহাবুদ্দিন। সাহাবুদ্দিনের চেহারার এবং পোষাকের জৌলুষ বাড়িয়া গিয়াছে। রহমৎ খাঁ তাহাদিগকে তাহার পার্শ্বে দুই চেয়ারে উপবেশন করিতে বলিলেন]

ব্রি র খাঁ ॥ (হাতে রিস্টওয়াচ দেখিয়া) বিচার হামি করব। কুছ না বলে খুন করলে ভাল দেখাবে না, তাই হামি এই 'শো'টা করছি। (আবার ঘড়ি দেখিয়া) পনের মিনিটের মধ্যে সব কুছ খতম্ করতে হোবে।

সাহাবুদ্দিন ॥ হাঁ হুজুর ঐ শালাদেরই আর এক দল করিমপুর থেকে এই চণ্ডীপুরের দিকে ধেয়ে আসছে।

রহমৎ খাঁ ॥ চোপ্ রও—বুর্বাক্।

সাহাবুদ্দিন ॥ (আভূমি সেলাম করিয়া) জী হুজুর।

রহমৎ খাঁ ॥ আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, মাই ডিয়ার মিস্ মীনা—

মীনা ॥ ইয়েস্ স্যার।

রহমৎ খাঁ ॥ যা কিছু হবে সব নোট রাখবে।

মীনা ॥ ইয়েস্ স্যার।

রহমৎ খাঁ ॥ চার্জশীট দেখো। চার পাঁচটা দুশমন্ এক এক করকে হাজির ক'র।

মীনা ॥ (ফাইল দেখিয়া) আওয়ামী লীগ লীডার আসাবুল হক।

[একজন রক্ষী বাহিরে চলিয়া গেল]

সাহাবুদ্দিন ॥ হুজুর মা বাপ। আমার বখশিসের কথাটা মনে রাখবেন।

রহমৎ খাঁ ॥ মেরা ইয়াদ হ্যায়—করাচীমে তুমহারা নাম ভেজ দেগা।

সাহাবুদ্দিন ॥ ওরে বাবা! করাচী! তার আগেই করিমপুর এসে যাচ্ছে হুজুর।

রহমৎ খাঁ ॥ চোপ রও বেল্লিক।

সাহাবুদ্দিন ॥ জী হুজুর।

[হ্যাণ্ডকাপে বদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা আসাবুল
হক্‌কে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ]

আসাবুল ॥ এ বিচারের প্রহসন কেন? গুলি করে মারবে মার। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি, শোষকশ্রেণী ও রক্তপিপাসু পশুশক্তির মুখপাত্র ইয়াহিয়া—হামিদ—টিক্কাখান গণতন্ত্রকে উৎখাত করতে বাঙালীর পাট বেচা টাকায় গড়ে তোলা সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই সোনার বাংলার ওপর।

রহমৎ খাঁ ॥ এই উল্লুক মৎ চিল্লাও।

আসাবুদ্দিন ॥ এ্যাই উল্লুক, মৎ চিল্লাও। ভায়েরা আমার আশেপাশে যারা আছ আমার শেষ কথা শোন—আমার নেতা, তোমার নেতা, বাংলাদেশের নেতা শেখ্ মুজিব। এই হানাদারদের বধ কর, দূর কর। বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ মুক্ত করো। বেইমানদের খতম কর।

রহমৎ খাঁ ॥ (চীৎকার করিয়া) খামোশ। লে যাও।—গুলি কর। মার ডালো।

[রক্ষীরা আসাবুল হককে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু যাইতে যাইতেও
আসাবুল হক তাহার শেষ বাণী বলিয়া যাইতে লাগিল]

রহমৎ খাঁ ॥ (মীনার দিকে তাকাইয়া) নেক্‌স্‌ট?

মীনা ॥ (চার্জশীট দেখিয়া) দুর্গা দেবী—

[একজন রক্ষী বাহির হইয়া গেল]

রহমৎ খাঁ ॥ ইয়ে কৌন হ্যায়।

সাহাবুদ্দিন ॥ হিন্দু জমিদারণী। কাফের।

রহমৎ খাঁ ॥ উমর।

সাহাবুদ্দিন ॥ বুঢ্‌ঢি হ্যায় হুজুর।

রহমৎ খাঁ ॥ হমারা ক্যাম্পমে বুঢ্‌ঢা খানসামা বাবুর্চি ভী হ্যায়।

সাহাবুদ্দিন ॥ জী হুজুর। বহুৎ সোনেদানাকে মালিক ওহি বুঢ্‌ঢি।

মীনা ॥ (সাহাবুদ্দিনকে) বুঝে সুঝে কথা বল্‌বে। রিপোর্ট দেখছি এ অঞ্চলে এর খুব ইনফ্লুয়েন্স্‌। নামটা যেন আমি কোথায় শুনেছি।

রহমৎ খাঁ ॥ অলরাইট লেট্ মি সী।

[হ্যাণ্ডকাপ পরিহিতা আলুলায়িত কুন্তলা দুর্গাদেবী
আসিতে আসিতে বলিলেন—]

দুর্গা দেবী ॥ আমরা ছেলেরা, আমার মেয়েরা যে যেখানে আছ শোন, আর হয়তো আমি কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই আমার শেষ কথা শোন —বাংলা দেশের আজ যে লড়াই সুরু হয়েছে, তা মুক্তির লড়াই। মুক্তি সর্বাঙ্গীন পরবশ্যতা থেকে, মুক্তি সুগভীর শোষণ থেকে, মুক্তি বৈদেশিক শাসন থেকে—লড়াই চলছে—দুটি অসম শক্তির মধ্যে—একদিকে শস্ত্র বলে হাজার-গুণে বলীয়ান পাকিস্তানী মিলিটারী আর একদিকে প্রায় নিরস্ত্র বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজ। একদিকে লুণ্ঠনকারী শোষক দল, আরেক দিকে লুণ্ঠিত শোষিত নিরন্ন বাংলার জন সাধারণ। একদিকে পশুশক্তি অন্যদিকে মনুষ্যত্ব। কিন্তু, কিন্তু তবু জানবে পরিণামে মনুষ্যত্বেরই হবে জয়।

রহমৎ খাঁ ॥ আই সি, শী ইজ এ গুড্ এ্যাকট্রেস।

মীনা ॥ বাট্ লুকস্ কোয়াইট লাইক এ মাদার। এর নাম দুর্গাদেবী। এ নাম আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু, ইনিই কি তিনি।

রহমৎ খাঁ ॥ (দুর্গাকে) আমার মীনা বল্ছে, তুমি ভাল একটি মা আছ। হাজী সাহেব বল্ছে, তোমার অনেক সোনাদানা আছে। তোমার বিচার পরে হবে। (রক্ষীর প্রতি) গার্ড, ইন্‌কো একঠো কুর্সি দেও।

[গার্ড সংগে সংগে একটা টুল আনিয়া দিল—দুর্গাদেবী তাহা পায়ে ঠেলিয়া দিয়া দৃপ্তভাবে দাড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় অদূরে কামান গর্জন শোনা গেল। রহমৎ খাঁ উঠিয়া দাড়াইল]

সাহাবুদ্দিন ॥ (ভয় পাইয়া) হুজুর করিমপুরের দিক থেকেই আওয়াজটা আসছে—

রহমৎ খাঁ ॥ আমি দেখ্ছি। (মীনাকে) পরের আসামী।

[রহমৎ খাঁ বাহির হইয়া গেল]

মীনা ॥ (কাগজপত্র দেখিয়া চমকিয়া উঠিল) এ কী!

সাহাবুদ্দিন ॥ চটপট বিচার ফিচার সাইরা ফালান্—আকাশে মেঘ জমছে। ঝড় আইতেছে মনে হয়।

দুর্গা দেবী ॥ হ্যাঁ, ঝড় উঠছে। হানাদারদের খড়কুটোর মত নিয়ে যাবে। বেইমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যত পাপ জমেছে সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে সোনার বাংলাকে মুক্ত করবে, শুদ্ধ করবে।

মীনা ॥ আসামী নীলমণি চৌধুরী। না-না থাক।

[রহমৎ খাঁর পুনঃ প্রবেশ]

রহমৎ খাঁ ॥ জলদি কর।

দুর্গা দেবী ॥ (মীনাকে) না-না থাকবে কেন, নীলমণি চৌধুরী আমার নাতি—আমার সবেধন নীলমণি, আমার একমাত্র বংশধর। বিচার তার আমার সামনেই হোক। (মীনাকে) ভয় নেই, ভয় নেই—আমি সব কিছু সহ্য করতে পারব, কারুর দয়া আমি চাই না।

রহমৎ ॥ (মীনাকে) কুইক—কুইক।

দুর্গা দেবী ॥ ডাকো, নীলমণি চৌধুরী—[রক্ষী ভিতরে চলিয়া গেল]

রহমৎ খাঁ ॥ ইয়েস নীলমণি চৌধুরী—

সাহাবুদ্দিন ॥ এ শালা একটা কেউটে সাপ। ঢাকায় কলেজে পড়ে; ইংরাজী জানে। মুজিবের চেলা। (হ্যান্ডকাপ পরিহিত নীলমণিকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ—নীলমণি চুপচাপ আসিয়া দাঁড়াইল। মীনা উহাকে দেখিয়া অস্ফুট আর্তনাদ করিল, নীলমণিও চমকাইয়া উঠিল)

রহমৎ খাঁ ॥ হাঃ হাঃ (হাসি) দ্যাট, ব্লাডি কাওয়ার্ড—আই সী। (মীনাকে) ইয়োর গুড লাভার! হাঃ হাঃ হাঃ

নীলমণি ॥ উঃ আমার মৃত্যু হয়নি কেন!

মীনা ॥ কাওয়ার্ডদেরই এসব দেখতে হয়, বুঝলে নীলমণি চৌধুরী! এসব দৃশ্য কাপুরুষদের দেখার জন্য, দেখ।

নীলমণি ॥ দেখব! চোখ বুজে থুথু ফেলছি তোমার উদ্দেশ্যে—থুঃ থুঃ। শোন ঠাকুমা, ঐ মুসলমান মেয়ে আর আমি ঢাকায় একসঙ্গে এম-এ পড়ছিলাম।

রহমৎ খাঁ ॥ শুধু এম-এ পড়ছিলে, না প্রেমে পড়ছিলে—

দুর্গা দেবী ॥ ও, এই সেই তোমার মীনা চৌধুরী?

নীলমণি ॥ হ্যাঁ, এ সেই মীনা চৌধুরী।

দুর্গা দেবী ॥ দেশের ডাকে জীবন দিতে হাত ধরাধরি করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছিলে—দুজনে।

মীনা ॥ তবে শুনুন ঠাকুমা, আপনার নাতি দেশকে যতনা ভালবেসেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবেসেছিল আমাকে, আমার এই দেহটাকে। তাই দেশের কাজে জীবন না দিয়ে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, ওপার কোলকাতায়—ঘৃণায় এই বেইমানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আজ আমার এই দশা।

দুর্গা দেবী ॥ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাদের দুইজনকেই, তাতেই হবে আত্মশুদ্ধি—তাতেই আসবে মুক্তি। রক্ত দিয়ে হোক সেই প্রায়শ্চিত্ত।

রহমৎ খাঁ ॥ বাঃ। তুমি ঠিক বলেছো বুড়ি! রক্ত দিতে হবে রক্ত আমাদের বড় দরকার আছে। ডাক্তার বলছে রক্তের সব বোতল বিলকুল খালি। মীনা, তুমি তোমার এই লাভারকে নিয়ে যাও মেডিকেল ক্যাম্পে—এন্ড টেক্

হিজ ব্লাড। ও তোমাকে যে অপমান করেছে, থুক দিয়া, এইবার তার বদলা লাও।

[এমন সময় আবার কামান গর্জন শোনা গেল। রহমৎ খাঁ চঞ্চল হইয়া উঠিল—নিজেই অসহিষ্ণু হইয়া আদেশ দিল—'শেখ মুজিব রহমান'—একজন রক্ষী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—অপর রক্ষী নীলমণির কাছে আসিয়া দাড়াইল]

রহমৎ খাঁ ॥ ওয়েট্—ঠারো। মীনা, চার্জশীট—মুজিবরের চার্জশীট্। [মীনা ফাইলটা রহমতের হাতে দিল—হ্যান্ডকাপ পরিহিত সিরাজের প্রবেশ] তুমহারা কুছ কহনা হ্যায় ?

সিরাজ ॥ ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার, কি অন্যায় করেছিলাম আমরা ? আমরা চেয়েছিলাম শোষণ থেকে মুক্তি। সেটা কি কোন অপরাধ ? আমরা চেয়েছিলাম মানুষের মত বাঁচতে, সেটা কী কোন অপরাধ ? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ আমাকে, আওয়ামী লীগকে, শতকরা সাতানব্বুইটি ভোট দেন। ইয়াহিয়া দেখলেন বিপদ—আপোষ রফার ছল করে তলে তলে বাংলাদেশে বিরাট খান সেনা বাহিনী এনে ফেলে তাদের লেলিয়ে দিয়েছেন আমাদের উপর।

—তারা বাংলার মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। —পাইকারী হারে হত্যা করছে। আমার মায়ের কোল খালি করে দিচ্ছে। তোমাদের কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ রহিল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল—তোমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে শত্রুর মোকাবিল কর। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। আর জনতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আওয়াজ তোল 'জয় বাংলা। 'আমার দেশ তোমার দেশ—বাংলা দেশ, বাংলা দেশ'। [নীলমণি ও দুর্গা শ্লোগানের আওয়াজ তুলিল। হাতে রিভলবার লইয়া রহমৎ খাঁ মঞ্চ হইতে ধীরে ধীরে সিরাজের সামনে আসিয়া দাড়াইল—মীনা তাহার অনুগমন করিল]

রহমৎ ॥ [মিলিটারী কায়দায় সিরাজকে অভিবাদন করিয়া] জনাব, আপনাকে ফলো করতে করতে আজ এখানে এসে পড়েছি। আমার ওপর আদেশ ছিল আপনাকে ধরতে পারলে রাজসম্মানে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া। আমার খুব ভাগ্য যে আপনার মৃতদেহ নয়, আপনাকে জীবিতই পাচ্ছি আমি॥ আপনাকে ধরতে পেরেছি এ খবর আমি ঢাকায় ওয়ারলেসে পাঠিয়েছি, এবং এই মাত্র ওয়ারলেসে তার জবাবও পেয়েছি। কি জবাব পেয়েছি শুনবেন, জনাব ?

সিরাজ ॥ কী ? আমাকে গুলি করে মারার অর্ডার তো ?

রহমৎ খাঁ ॥ হাঁ ঠিক তাই। একজাক্টলি। [হঠাৎ সিরাজকে চপেটাঘাত

করিয়া] শালা, তুমি জাল মুজিব। আমার ওয়ারলেসটা বিকল হয়ে গেছল, তাই আমি খবর পাই নি যে শেখ মুজিবর ২৫শে মার্চ রাত্রেই তার বাড়ীতে গ্রেপ্তার হয়েছে। শালা তুমি জাল মুজিব সেজে আমাকে এতদিন হয়রান করেছ। ওয়ারলেসে আমাকে শুনতে হল আমি একটা ফুল, একটা ইডিয়ট! তোমাকে শালা আমি নিজে গুলি করে মারছি। [রহমৎ খাঁ যেই রিভলবার তুলিয়াছে সংগে সংগে মীনা রিভলবার তুলিয়া রহমৎ খাঁকে উপর্যুপরি তিনটি গুলি করিল—সংগে সংগে ছুটিয়া আসিল দারোগা মহম্মদ শা এবং একদল মুক্তিফৌজ—তাহারা 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে আসর মুখরিত করিয়া তুলিল। তাহাদের আবির্ভাব মাত্রই পাঠান রক্ষীরা পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুক্তি-ফৌজের আক্রমণে তাহারা হয় মৃত না হয় বন্দী হইল]

দুর্গা দেবী ॥ এই রক্তপাতেই হচ্ছে যুগযুগান্তরে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমরা ধর্মে হিন্দু হতে পারি, মুসলমান হতে পারি কিন্তু জাতি আমরা একটি—আমরা বাঙালী। সুখে, দুঃখে আশা আকাঙ্ক্ষায়, শিক্ষায় দীক্ষায়, সভ্যতায় সংস্কৃতিতে, এক ভাষাভাষী, এক বাঙালী। এই মহাসত্য আজ যখন বংগবন্ধু মুজিবরের জীবনাদর্শে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত—বাংলাদেশের অগ্রগতি রোধ করবার শক্তি আর কারো নেই। এই মহাশক্তির জয় হোক।

[মীনা ও নীলমণিকে টানিয়া লইয়া] তোমাদের মহামিলনের মধ্য দিয়ে এই মহাসত্যের অভ্যুদয় হোক। 'জয় বাংলা'।

সকলে ॥ 'জয় বাংলা'!

নীলমণি ॥ তোমাকে হারাবার ভয়েই এসেছিল আমার কাপুরুষতা। আবার তোমাকে মুক্ত করবার সাধনাতেই ফিরে এসেছে মনুষ্যত্ব—এবার এসো আমরা মুক্ত করি আমাদের দেশজননীকে।

মীনা ॥ কিন্তু পঙ্কিল আমার জীবন।

দুর্গা দেবী ॥ তবু পংকের মধ্যেই ফুটে উঠেছে আজ এই শ্বেতপদ্ম। [সিরাজের হাত দুখানি ধরিয়া] যেমন এই জাল মুজিবের মধ্যেই ফুটে উঠেছে আসল মুজিবেরই জীবনাদর্শ। আজ মুজিবের আদর্শ যে গ্রহণ করেছে সেই-ই মুজিব। আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে মুজিব। ইয়াহিয়া খান সাবধান, আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীই মুজিব, তাই বাংলার জয় অনিবার্য! 'জয় বাংলা'।

সকলে ॥ 'জয় বাংলা'।

দুর্গাদেবী ॥ জয় বাংলা ভাষার জয়।

সকলে ॥ জয় বাংলা ভাষার জয়।

য ব নি কা

ডাঃ সরকার

উৎসর্গ

শ্রীভুপেন্দ্র নাথ দে

দে-জ মেডিকেল ষ্টোর্স

কলিকাতা।

প্রীতিশ্রদ্ধাভাজনেষু,

ভাই ভুপেনবাবু, রোগযন্ত্রণা হরণে আপনার জীবনব্যাপী সার্থক সাধনা আমাকে আমার জীবনে বহুভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের এই জীবনালেখ্য আপনাকে উৎসর্গ করে তৃপ্তিলাভ করছি জয়োস্তু

প্রীতিমুগ্ধ

মন্মথ রায়

লেখকের কথা

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বাংলার এক স্বনামধন্য মহাপুরুষ একাধারে এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে তো বটেই চারিত্রিক মহত্ত্বে এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে আজও তিনি এক প্রবাদ পুরুষ। এই নাটকটিতে তাঁরই রূপরেখা অঙ্কনই ছিল আমার বহুকালের বাসনা কিন্তু সে সাধনা পূর্ণ হয়েছে কিনা তার বিচারকও এই নাটকের পাঠক ও দর্শকগণ। এত বড় ঐ চরিত্রটিকে নাট্যায়িত করা আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হত না যদি না ডাক্তার সরকারের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ সুখ্যাত নাট্য পরিচালক শ্রীমান অরুণ কুমার সরকারের সঙ্গে আমার এক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটত। মহেন্দ্রলালের মহাজীবনটির প্রতি আমি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আমারই মাতুল বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত মহেন্দ্রলাল সরকার নামক জীবনচরিত গ্রন্থটি পড়ে তারপর শ্রীমান অরুণ কুমার সরকারের সংগৃহীত অন্যান্য পারিবারিক তথ্যও লাভ করি। সর্বোপরি শ্রীমান অরুণ কুমার সরকারের উৎসাহ, আগ্রহ এবং সহযোগিতায় ১৫. ১০. '৫৬ তারিখ হইতে ১৭. ১১. '৫৬ তারিখের মধ্যে এই নাটকটির রচনাকার্য সম্পূর্ণ করেছি। কিন্তু এই দুঃসাহসের পরিণাম কি জানি না। যদিও সর্বজন স্নেহধন্যা নাট্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযূ দেবী বাঙলা নাটক বিশেষজ্ঞ ডঃ শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, শ্রীমান অরুণ কুমার সরকারের পিতৃদেব নাট্য পিপাসু শ্রদ্ধেয় শ্রী হেমেন্দ্র লাল সরকার এবং কন্যাপ্রতিম সংগীত শিল্পী পরম স্নেহের শেফালী ঘোষ এই নাটকটির প্রাথমিক পাঠানুশীলনে উপস্থিত থেকে তৃপ্তি লাভ করেছেন। কিন্তু তবু আমি নিশ্চিন্ত নই। একমাত্র ভরসা—ঐ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কৃপা।

মন্মথ রায়

ডাঃ সরকার

নাটক

নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়

—ঃ পরিচয় ঃ—

শ্রীরামকৃষ্ণ—মহাকালীর উপাসক

শ্রীম—রামকৃষ্ণ কথামৃত স্রষ্টা মহেন্দ্র গুপ্ত

নরেন্দ্র নাথ—ঠাকুরের শিষ্য

গিরিশ ঘোষ—প্রসিদ্ধ নাট্যকার

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—প্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে পরিবর্ত্তিত

ডঃ অমৃতলাল সরকার—ঐ একমাত্র পুত্র

রাজেন্দ্রলাল দত্ত—তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সেবক

ডাঃ ফেরার—মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক

ডাঃ গুডিভ ওরফে সূর্য্য চক্রবর্ত্তী—প্রধান এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক

দেবনারায়ণ চৌধুরী—তেঁতুলতলার জমিদার

দাশরথি সরকার—ডাঃ সরকারের আশ্রিত

সখিয়া— ঐ ভৃত্য

সখারাম— বৈষ্ণব ভিক্ষুক

জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও তাঁহার কিশোর বালক,

ডাঃ সরকারের নবনিযুক্ত ভৃত্য

রাজকুমারী দাসী—ডাঃ সরকারের সহধর্ম্মিনী

বিনোদিনী দাসী—অমৃতর সহধর্ম্মিনী

প্রস্তাবনা

[ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ১৫ নং শাঁখারী টোলার বাটী। মহেন্দ্র ও গুডিভ ওরফে সূর্য্য চক্রবর্তী আলোক আরও]

গুডিভ ॥ It is you Dr. Mahendra Lal Sircar who Chalked out the plan Proceeded boldly, laboured hard, negoiiated with all cminent and prominent medical Personalities,—assembled to gether and we hold the preliminary meeting for the establish —ment of a medical Society as a branch of the British Medical Association—

মহেন্দ্র ॥ Held at the house of ourvastly learned medical practitioner r. Gudive Chakrabarty on 27th May 1863.

গুডিভ ॥ এসব কৃতিত্বের অধিকারী তুমি ডাক্তার সরকার। তোমার মত ইয়ং বোল্ড, স্পিরিটেড, এনারর্জিটিক ম্যান পেয়ে আমরা ধন্য। তোমার মিটিং-এ পড়া আর্টিকেলটা আমার মনে আছে।

মহেন্দ্র ॥ আপনার মনে আছে? "Homoeopathy as one of the various Systems of guackery rohich owed their rise and temporay triumphs to the regular prwession being unmindful.

গুডিভ ॥ সত্যিই এই হোমিওপ্যাথি একটা বুজরুকী, একটা মিথ্যে, একটা ছলনা।

মহেন্দ্র ॥ এটা একটা জোচ্চুরি গাঁজাখুরী ছাড়া কি? এক কাপ জলে দুটো সাবুদানার মত গুলি ফেলে patient-কে খেতে দেয়। ওদের theory নাকি Similia Similibus curentur.

গুডিভ ॥ Is it possible ? Similar disease-এ Similar medicine দিলে তো Violent aggravation-ই হোয়ে থাকে।

মহেন্দ্র ॥ ওদের না আছে Anatomy, physiology-র জ্ঞান, না পড়েছে কোন Pathology, practice of medicine, Surgery বা hygiene। এরা মানুষের বিশ্বাস কেড়ে নিচ্ছে Charitable dispensary করে। ধীরে ধীরে field করে চলেছে চতুর্দিকে। Who is there ?

[গুডিভ চক্রবর্তীর স্থলে রাজেন্দ্রলাল দত্তকে দেখা যায়]

রাজেন্দ্র ॥ আমি এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ জানাতে তুমি আরও, আরও বড় হও। বাংলার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল কর তোমার মেধাদীপ্ত তেজো ধারায়। British Medical Association-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করা কোন একজন বৃটিশেরই প্রাপ্য হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তুমি যে তাদের হাত থেকে সে দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়েছো এটা কি কম বড় কৃতিত্ব। এতে আমরা উদ্বুদ্ধ, আনন্দিত, অভিভূত। এইভাবে একদিন আমরা একে একে ওদের সব দায়িত্বগুলোই অধিকার করে নিতে পারবো।

মহেন্দ্র ॥ এসব revolution-এর কথা।

রাজেন্দ্র ॥ Revolution-এর প্রয়োজন কি এখনও হয়নি মহেন্দ্র ! দেখছ না একশ পঞ্চাশ বছর ধরে রাজত্ব করে ওই বৃটিশ আমাদের কিভাবে দাস করে ফেলেছে। তাই তো খুঁজে বেড়াই সেইসব বিপ্লবীদের যাদের মধ্যে আছে জ্ঞানের বহ্নিশিখা, সাহসের বীর্য। সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরবে তার যথার্থ পাওনা।

মহেন্দ্র ॥ আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানাবেন কি ?

রাজেন্দ্র ॥ তুমি তো জানো আমার একটু হোমিওপ্যাথির hobby আছে। এরজন্যে কিছু খরচও করে থাকি। বাড়ীতে কয়েকটি রুগী রেখে দিয়ে তাদের হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করে থাকি। Anatomy, physiology, Surgery বিষয়ে আমার দখল নেই। অথচ বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওই জ্ঞানগুলো খুব দরকার রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা করতে হোলে। তোমার ওগুলো পুরোপুরি আছে। সেজন্যে আমি চাইছি তুমি আমার Chamber-এ Physician of diagnosis and prognosis হও। তোমার যথাযোগ্য সম্মান ও দক্ষিণা আমি অবশ্যই দোব।

মহেন্দ্র ॥ না না একি বলছেন আপনি ? আমি একজন অ্যালোপ্যাথ। আমি বিশ্বাস করিনা আপনার ওই হোমিওপ্যাথিকে। ওসব বুজরুকি, ওতে রোগ সারেনা। আপনারা যে রোগীদের আরোগ্য করেন বলে গর্ব প্রকাশ করে থাকেন সেটা মিথ্যে গরিমা। প্রত্যেক রোগেরই একটা বাঁধা ভোগকাল থাকে,

ম-৩০৭

সেই সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই রোগী আপনা থেকেই ভালো হোয়ে যায়। আমার বিশ্বাস যদি রোগীদের যথাযথ পথ্য ও সেবার মধ্যে রাখা যায় তবে আরোগ্য আপনা হতেই সম্ভব হয়। আপনাদের হোমিওপ্যাথির ছিঁটে ফোঁটায় নয়। হোমিওপ্যাথি hypnotism বা mesmerism ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজেন্দ্র ॥ আমি তোমার পিতৃতুল্য। আমার একান্ত অনুরোধ তোমার ওই অবিশ্বাস নিয়েই আমার রোগীদের চিকিৎসার ভার নাও। যদি কোন সর্ত্ত করতে চাও তাতেও রাজি। বলো ভার নেবে ?

মহেন্দ্র ॥ [খানিক নিস্তব্ধতা] বেশ। তবে সর্ত্তটা হবে এই, রোগীর diagnosis আমি করবো এবং prognosis আমি বলবো, কিন্তু রোগীকে আপনি কোন ওষুধ দিতে পারবেন না।

রাজেন্দ্র। কিন্তু তাতে তো রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। ভালো পথ্য ও সেবা সত্ত্বেও তো বেশ কিছু রোগী মারা যায়।

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ যায় ঠিকই। সেইজন্যেই তো প্রয়োজন ডাক্তারীজ্ঞান। এর দ্বারাই দৈবজ্ঞের মতো ডাক্তাররা আগেভাগে বলে দিতে পারেন এই রোগের পরিণাম, যাকে আমরা বলি Prognosis।

রাজেন্দ্র ॥ রোগীর Prognosis যদি খুব আশাপ্রদ না হয় ?

মহেন্দ্র ॥ কেবলমাত্র তখনই আপনি রোগীদের ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন আমার অনুমতি নিয়ে।

রাজেন্দ্র ॥ আমি রাজি।

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া আলো পড়িল ডঃ ফেরার ও গুডিভ চক্রবর্ত্তীর উপর]

ফেরার ॥ No no, it is absurd-ab-surd.

গুডিভ ॥ You believe me sir, it is true.

ফেরার ॥ What do you say Chakrabarty ? Medical College-এর genius, কলিকাতার famous Alopath doctor Mahendra Sircar quack রাজেন ডাটের বাটীতে যাটায়াট করে ? Why ? Why ?

গুডিভ ॥ রাজেন দত্তের কিছু Patient-এর diagnosjs ও Prognosis ঠিক করে সে চিকিৎসা করে।

ফেরার। কিন্তু যাহারা homoeopathy-কে সট্য এবং Alopathy মিথ্যা বলিয়া থাকে তাহাদের সহিত Sircar-এর যোগাযোগ হামি মানিয়া লইতে পারিতেছি না। রাজেন ডাট তাহাকে কি ডিটেছে আর হামরা তাহাকে কি ডিই নাই ? He is now the vice president of Medical Association.

গুডিভ ॥ আপনি নিশ্চিন্ত হোন স্যার মহেন্দ্রর মতো brilliant career-এর ছেলে কখনও বিপথে পা বাড়াবে না। Association-এর next Conference-এ

Morgans Homoeopathic Philosophy-র against-এ সে বক্তৃতা করবো। তার জন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছে। আমি আপনার কথা তাকে বলবো স্যার।

ফেরার ॥ ইয়েস ইয়েস, টুমি হামার কথা টাহাকে অবশ্যই বলিবে চক্রবর্তী। He is a rising young doctor and he has a bright future before him. I have my sympathy always with him.

[মঞ্চ অন্ধকার। আলো পড়িল গুডিভ ও মহেন্দ্রর উপর]

মহেন্দ্র। গুডিভদা আমি এখনো হোমিওপ্যাথিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি ওই দেখুন Morgans Homoeopathic Philosophy যা শাণিত তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করতে চাই। কিন্তু রাজেন দত্তর Chamber-এ কয়েকদিন রোগীদের diagnosis and prognosis করতে গিয়ে mainful diagnosis with grade prognosis—সেই Case গুলোও যখন দেখলাম ভালো হয়ে যাচ্ছে—তখনি তো facts হয়ে যাচ্ছে।

গুডিভ ॥ তুমি আর ওখানে যেওনা। উনি তোমার মস্তকটি চর্বন করে ছেড়ে দেবেন।

মহেন্দ্র ॥ আমি তো যাব নাই স্থির করেছি। দশদিন হোল ও মুখো হইনি। ওনার ছেলের টাইফয়েড। আমাকে বার বার ডেকে পাঠাচ্ছেন, ছেলেটির অবস্থা খারাপের দিকে। আমিই diagnosis করে বলেছিলাম টাইফয়েড। অ্যালোপাথি, হোমিওপ্যাথি কবিরাজী সব রকম চিকিৎসকরাই তাঁর ছেলেকে দেখে যাচ্ছেন স্যার উইলিয়ম হাণ্টার, স্যার স্টুয়ার্ট হগ এমন কি ভাইসরয় লর্ড রিপনও তাঁর গৃহে তাঁর পুত্রের রোগশয্যার পাশে এসে সমবেদনা জানিয়ে গেছেন। অথচ উপস্থিত হলোনা তাঁর অতি প্রিয় নিকটতম পুত্রসম প্রখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

গুডিভ ॥ Be steady Dr. Sircar. You are a hard nut to crack. এভাবে ভেঙ্গে পড়া তোমার সাজে না।

মহেন্দ্র ॥ সেদিনের কথা কি করে ভুলবো গুডিভদা, আমার যে খুড়া-মশাইকে আমি তো বটেই কলকাতার আচ্ছা আচ্ছা খ্যাতনামা চিকিৎসকরা তাঁর রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না অথচ দ্যাট কোয়াক রাজেন দত্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশির ছিপি খুলে নাকে ঘ্রাণ শুঁকিয়ে খুড়ামশাইকে সুস্থ করে তুললেন। কে কে ডাকলে ?

নেঃ রাজেন্দ্র ॥ My dear son and father ! কয়েকদিন তুমি আসোনি। তোমার শারীরিক কুশল তো ? উপেন্দ্রর জ্বর তুমি diagnosis করেছিলে টাইফয়েড বলে। জ্বরটা না ছেড়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রলাপ বকছে, মাঝে মাঝে খেঁচুনী হোচ্ছে। আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী।

মহেন্দ্র ॥ কিন্তু কি সাহায্য করবো আমি? আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি—কিন্তু আমি আগে ডাক্তার—রোগীকে সুস্থ করে তোলা আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। আমি যাবো—আমি যাবো—

গুডিভ ॥ মহেন্দ্র! তুমি কি ক্ষেপে গেলে? উন্মাদের মত কোথায় চলেছ?

মহেন্দ্র ॥ গুডিভদা ॥ Truthকে বেছে নেবার জন্যে আমি পৃথিবীর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতে পারি। And truth is my god.

[মঞ্চ অন্ধকার। আলো পড়িল মৃত পুত্রকে আঁকড়াইয়া থাকা রাজেন্দ্রর উপর। পার্শ্বে মর্ম্মাহত, অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান মহেন্দ্রলাল। চোখ তাহার রাজেন্দ্রর মৃত পুত্রের উপর]

রাজেন্দ্র ॥ আর খানিক আগে এলে বেচারী তোমায় দেখতে পেতো। তোমাকে দেখার ওর বড়ো সাধ। বিরাট স্বপ্ন বড় হোয়ে ও মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো ডাক্তার হবে। শেষ দুটো দিন বড্ড যন্ত্রণা পেয়েছে। আজ ওর শান্তি। পৃথিবীর কোন ডাক্তারই ওকে এত শান্ত করতে পারতো না। শেষ সময়ে অনেকে কুইনাইন দিতে সাজেষ্ট করেছিল। মহেন্দ্র! আজ যদি তোমাদের কুইনাইনকে আমি প্রশ্রয় দিতাম তাহলে আমার সারাজীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের করতাম অবমাননা, হোমিওপ্যাথিকে মসীলিপ্ত করে আমিই দিতাম তার সমাধি। আর তোমরা সেইটিই করে নিতে তোমাদের শাণিত অস্ত্র। ফলাও lecture দিয়ে বেড়াতে quack রাজেন দত্ত কুইনাইন দিয়ে তার ছেলের চিকিৎসা করেছে। তুমি নত মস্তকে কেন মহেন্দ্র? তোমার কোন অপরাধ নেই। এ আমার ভবিতব্য। তুমি আরও বড় হও। আশীর্ব্বাদ করি তোমার সত্যকে যেন তুমি খুঁজে নিতে পারো। আমার উপেন সেইদিন তোমার মধ্যে বেঁচে উঠবে।

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা যাইবে I. M. A. সম্মেলনে Chairman ডক্টর ফেরার বক্তৃতারত। উপস্থিত সহরের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীজন]

ফেরার ॥ Respected gentlemen, my Colleagues and friends! আজিকার সভায় হামাকে Chairman করা হইয়াছে বলিয়া হামি আপনাদের অভিনন্দন জানাইটেছি। এই Scientific Seminar-এ বিভিন্ন চিকিৎসকগণ ঢাহাদিগের চিকিৎসা জীবনে যাহা দেখিয়াছেন বা শিখিয়াছেন এবং উহাটে হামরা নুটন করিয়া কি শিক্ষা করিব টাহাই জানিতে পারিবেন। আজ

হামাদের Scientific Seminar-এর first lecturer হইবেন ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার এম ডি। আশা করি তাহার পরিচয় হাপনাদের নিকট নুটন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। হামি টাহাকে টাহারি বক্তব্য রাখিতে অনুরোধ জানাইটেছি।

[চতুর্দিকের করতালির মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার উঠিয়া দাঁড়াইল]

মহেন্দ্র ॥ My respected professor, the Chairman of to-days meeting, my Colleagues and respected gentlemen! এই বিজ্ঞানসভায় আমার প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হোল চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা এবং রোগ ও ঔষধের সম্পর্ক। আপনারা সবাই জানেন ১৮৬৩ সালের ১৭ই মে ছিল আমাদের এই সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সেই সভায় আমিই প্রথম সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সেই সময়ে আমি একটা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম যার শিরোনাম ছিল অ্যালোপ্যাথিক প্রথার অসামান্য সাফল্য ও অন্যান্য প্রথার অসারত্ব। প্রথমেই স্বীকার করে নিই তখন আমি ছিলাম একজন নবীন চিকিৎসক, অভিজ্ঞতার ছাপ তখনো বিশেষ পড়েনি বললেই হয় আমার জীবনে। তখনকার অনভিজ্ঞতার মূদু রূপটা ধীরে ধীরে দৃঢ় ছাপে পরিণত হয়েছে। তখন আপনারা আমাকে দেখেছেন একজন গোঁড়া অ্যালোপ্যাথ। হোমিওপ্যাথি ছিল আমার প্রধান শত্রু। ভাষার ক্ষুরধার ব্যঙ্গের খোঁচায় হোমিওপ্যাথিকে আমি ছিন্নভিন্ন করে ছেড়েছি। সেই আমার ওপর দায়িত্ব দিলেন আমার একজন reporter বন্ধু Morgans Homoeopathy পুস্তকটি দিয়ে হোমিওপ্যাথিকে আরও কড়া সমালোচনা করার জন্যে। এই পুস্তকের চাই বিরূপ সমালোচনা। যার প্রতিক্রিয়ায় ওদের নীতি স্তব্ধ হয়ে যাবে—ওরা চুপসে নিষ্ক্রিয় হোয়ে পড়বে। সমালোচনার চোখ নিয়ে পুস্তকটি পড়ে নিলাম একবার। কিন্তু একবার পড়ে বিরূপ সমালোচনার দুর্বল স্থান খুঁজে না পাওয়ায় কয়েকবার পড়ে সমালোচনার বদলে লিপ্ত হলাম আত্মসমালোচনায়। দেখলাম বহু রোগী আমরা সারাতে পারিনা। আর পারিনা বলেই সেগুলো সবই অসাধ্যরোগ নয়। বহু রোগীকে আমাদের এই কড়া ভেষজরাজ দিয়ে আরও রোগগ্রস্ত করে পঙ্গু করে তুলি। আবার আমরা যে mixture দিয়ে রোগীদের কখনো কখনো সারাই তাতে দেখা যাচ্ছে ওই mixture-এর সমগুণ সম্পন্ন ঔষধটাই রোগীকে সারাচ্ছে এই morgans phylosophy chalange জানাচ্ছে আমাদের অ্যালোপ্যাথিগোষ্ঠীকে এইসব বিষয় নিয়ে এবং সেইসঙ্গে তথ্যের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে ওদের

হোমিওপ্যাথির প্রভাব—আর Similia Similibus curentor-এর প্রাধান্য এবং ক্ষুদ্র মাত্রার অসামান্য সাফল্য।

১ম দর্শক ॥ I protest! Dr. Sircar is going to deliver his lecture in favour of Homoeopathy.

২য় ॥ ডাঃ সরকারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

৩য় ॥ ডাঃ সরকারের Papers ছিনিয়ে নেওয়া হোক।

১ম ॥ Dr. Sircar please take your seat.

সমবেত ॥ ডাক্তার সরকারকে বের করে দিন সভা থেকে।

[ডক্টর ফেরার ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

Order! Order!

ফেরার ॥ Please take your seats. Let chance be given to Dr. Sircar.

মহেন্দ্র ॥ বন্ধুগণ! আপনারা চিকিৎসক। সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল মানব। আমার বক্তব্যের পর আমার যুক্তিকে আগে খণ্ডন করুন তারপর আমার প্রতি মন্তব্য বা কটাক্ষপাত করবেন।

[মহেন্দ্র পুনরায় কাগজগুলি গুছাইয়া পড়িতে উদ্যত হয়]

১ম দর্শক ॥ ওসব হোমিওপ্যাথিক প্রবন্ধ পড়া চলবে না এখানে।

২য় ॥ এটা অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের সভা। তার নিন্দে আমরা কখনো সহ্য করবো না।

সমবেত ॥ Absolutely correct! Please turn him out from the meetng. ওর কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হোক।

[সভায় প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হইয়া গেল। মহেন্দ্র হাত তুলিয়া কাগজগুলি রক্ষা করিতে ব্যস্ত]

ফেরার ॥ Dear members! You are all qualified gentlemen. It is a meeting of the wise men of India. You must show the manner and discipline. You must also respect the ex-Secretary and existing vice Chairman of I. M. A. Dr. Sircar! টুমার ওই article হামার নিকট জমা দিবে।

মহেন্দ্র ॥ No Sir. যে article আমি সম্পূর্ণ পড়তে পারিনি তা আমি জমা দোব না।

ফেরার ॥ Dr. Sircar ! Chairman হিসাবে টুমাকে direct করিটেছি — Please hand over your Papers.

সমবেত ॥ ওর হাত থেকে Papers ছিনিয়ে নেওয়া হোক। ট্রেটার! গুপ্তচর! সভাপতিকে ডাক্তার সরকার অপমান করেছে।

মহেন্দ্র ॥ সভাপতি আমার মাষ্টার মশাই। তাঁকে যদি আমি অবমাননা করে থাকি, আমি অবশ্যই তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো। কিন্তু Paper গুলো জমা না দেওয়ার পেছনে যে যুক্তি আছে তা দয়া করে শুনুন। আমি গত তিন বছর ধরে এই Association-এর সম্পাদক ছিলাম এবং এই সময়ের মধ্যে বহু প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়েছে কিন্তু তার একটি কপিও সম্পাদকের কাছে জমা পড়েনি। আর এটা একটা অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ। সেই দৃষ্টান্ত থেকেই বলছি অনুষ্ঠিত article জমা নিতে চাওয়ার অধিকার Chairman-এরও নেই। জমা দেওয়াটাই বেআইনী।

ফেরার ॥ Dr. Sircar !

সম্পাদক ॥ [উঠিয়া] ডাঃ সরকার! আপনার প্রবন্ধটি আমার হাতে জমা দিয়ে সভাটিকে শান্ত হোতে দিন। আমি আপনার বিশিষ্ট বন্ধু। আপনার কোন ক্ষতি বা অপমান হোক তা আমি চাইনা। এটা আমার বন্ধুত্বের দাবী।

মহেন্দ্র। বন্ধুত্বের অনুরোধে এটা আপনাকে দিতে পারি, Association-এর সম্পাদকের দাবীতে নয়। কথাদিন ওটা আপনারা পড়ে নিয়ে আবার আমাকে ফেরত দেবেন অবিকৃতভাবে।

সম্পাদক ॥ কথা দিচ্ছি ডাঃ সরকার।

[মহেন্দ্র Paper গুলি সম্পাদকের হস্তে জমা দিয়া সভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে ডাঃ ফেরার বাধা দিলেন]

ফেরার ॥ Stop ! Dr. Sircar টুমার future-টা ভাবিয়াছো কি? ভাবিয়াছো কিরূপে টুমার চলিবে ?

মহেন্দ্র ॥ ভেবেছি স্যার। আমি চাষার ছেলে। গোঁ আমার প্রচণ্ড। যখন যেটা সঠিক বলে মনে স্থির করি তা অবশ্যই পালন করি। আপনারা সুখে থাকুন আপনাদের মিথ্যে অ্যালোপ্যাথির গরিমা নিয়ে। আমি চললাম। প্রয়োজন হোলে চাষ করে খাবো কিন্তু সত্যের অবমাননা করবো না।

[মহেন্দ্র প্রস্থানের সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার। আলো পড়ে সখারামের উপর]

সখারাম ॥ ওযে দামাল ছেলে লাফিয়ে ছোটে
ওর সাথে ছুটে পারবি কি ?

ওর দীপ্ত বদন দৃপ্ত চলন
আগুন ঝরে দেখ দেখি।
ওযে সবার থেকে এগিয়ে থাকে
বজ্র হাতে জানিস কি ?
যা করবে বলে করে দেখায়
চমকে দেয় বুঝিস্ কি।
ওযে যশের চূড়া থেকে ভূমে
ঝাঁপ দিলে কেন বুঝলি কি ?
ওযে সবহারাদের জন্যে আকুল
এটা তোরা শিখলি কি ?

[মঞ্চ অন্ধকার। আলো পড়িল ডাঃ সরকার ও সখিয়ার action-
এর উপর। পুঃ ১]

প্রথম অঙ্ক

[ডাঃ সরকারের ১৫নং শাঁখারী টোলার বাটীর দোতলার হলঘর। একটি গোলাকার টেবিল। তাহার উপর পুস্তক, লিখিবার কাগজ, দোয়াতদানী, মাছের অ্যাকুইরিয়াম। চারটি চেয়ার, একটি খাট এবং ঘরের চতুঃপার্শ্বে বিরাট বিরাট আলমারীতে পুস্তক ঠাসা। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কোন একটি প্রাতঃকাল। ডাঃ সরকার চেয়ারে উপবিষ্ট। পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভয়ে কম্পান্বিত ভৃত্য সখিয়া। তাহার হস্তে একটি মাটির হাঁড়ি]

ডাঃ সরকার ॥ সাপটা ঠিক আছে তো ? নড়ছে চড়ছে তো ?
সখিয়া ॥ মাইয়া রে মাইয়া ! কি দাপট !
ডাঃ সরকার ॥ মুখটা সরা দিয়ে ঢেকে দে।

[সখিয়ার তথাকরণ]

এবার ওখানে ঝুলিয়ে রাখ্।

[ইতিমধ্যে রাজকুমারী অন্দর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন]

রাজকুমারী ॥ ওগো তোমার কি হোয়েছে বলোতো ! মাথা খারাপ হয়েছে ? হাঁড়িতে সাপ রেখে ঘরে বসে এ তুমি কি কোরছো ?

ডাঃ সরকার ॥ রাজকুমারী! আমাকে আমার কাজ কোরতে দাও।

রাজকুমারী ॥ কিন্তু এ তুমি কি কোর্ছো? ওই রঙিন মাছ পুষেছো বুঝি, কিন্তু সাপ পুষবে এতো ভাবা যায় না!

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ ভাবা যায় না। জীবনে অনেক কিছু ভাবা যায়না আবার ভাবতেও হয়। একটা কথা জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও। আমি মরছি না, এতো সহজে মরবো না। আমি বাজে কথা বলিনা এ তুমি জানো। এবার তোমার ঘরে তোমার কাজে যাও। হ্যাঁ, আর ভালো কথা, ওই বামুনের ছেলেটি, হরি না কৃষ্ণ কি নাম?

রাজকুমারী ॥ হরেকেষ্ট।

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ হরেকেষ্ট। ও উপোষ করে আছে তো?

রাজকুমারী ॥ হ্যাঁগো তুমি তো উপোষে রাখতে বোলেছো।

ডাঃ সরকার ॥ আর গঙ্গাস্নান?

রাজকুমারী ॥ হ্যাঁ বাপ গঙ্গা নাইয়ে এনেছে। কিন্তু বাপ তো, ছেলে উপোষ করছে বলে নিজেও উপোষে রয়েছে।

ডাঃ সরকার ঠিক আছে। সখিয়া ও্দের দুজনকে নিয়ে আয়। আচ্ছা দাঁড়া, রাজকুমারী! এবার তোমাকে চলে যেতে হবে।

রাজকুমারী ॥ কিন্তু—

ডাঃ সরকার ॥ কোনদিন তুমি আমার কথার অবাধ্য হওনি—

রাজকুমারী ॥ আমি যাচ্ছি। জয় মা মঙ্গলচণ্ডী সব রক্ষে কর, রক্ষে কর।

[যুক্ত করে প্রণাম করিতে করিতে রাজকুমারীর প্রস্থান]

ডাঃ সরকার ॥ এবার ওদের নিয়ে আয়।

[সখিয়া আদেশ পালন করিল। একজন দীনদরিদ্র মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণ ও তাহার কিশোর পুত্রকে লইয়া সখিয়ার পুনঃপ্রবেশ। কিশোরটির নগ্নদেহের নানাস্থানে বিভৎস ঘা এবং সে ক্রমান্বয়ে দেহ চুলকাইয়া যাইতেছে]

এই যে আসুন।

ব্রাহ্মণ ॥ আমার ছেলেটিকে সারাদিন না খাইয়ে রেখেছেন বাবা। ও দাঁড়াতে পারছে না। ওকে বাঁচান বাবা, বাচান। বড়ো আশা করে আপনার কাছে এসেছি।

ডাঃ সরকার ॥ উতলা হবেন না, শুনুন। আমার কথার জবাব দিন। আপনার ছেলের সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ। হাসপাতালে অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন—কবিরাজি চিকিৎসাও করিয়েছেন—

ব্রাহ্মণ ॥ হেকিমীও করিয়েছি। তুক্‌তাক জলপড়া কিছু বাদ রাখিনি। সারেনি বাবা, সারেনি। তাই অগতির গতি আপনার কাছে এসেছি—

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ এসেছেন কিন্তু আমি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করবো না একথা স্পষ্ট করে বলা সত্ত্বেও আপনি আপনার ছেলেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছেন। আপনি একথাও বলেছেন কিনা যে আমার চিকিৎসায় ওই ছেলে যদি মারাও যায় তাতেও আমার কোন দোষ হবে না—দায়িত্বও নেই।

ব্রাহ্মণ ॥ যে কোন চিকিসাতেই বাবা রোগী মারা যেতেও পারে, যায়ও। তাতে চিকিৎসক দায়ী হয়না। আপনি তো কিছু বেশী বলেননি বাবা।

ডাঃ সরকার ॥ বেশ, কথাটি কিন্তু মনে রাখবেন। এবার আমি ওর চিকিৎসা করছি। কি যেন তোমার নাম হ্যাঁ হরেকেষ্ট। হরেকেষ্ট সারাদিন না খেয়ে আছো। ওই হাঁড়িতে মিষ্টি আছে। যাও ঢাকনা তুলে ইচ্ছামত খাও।

[হরেকেষ্ট ধীরে ধীরে হাঁড়িটির নিকট যাইয়া ডালা উন্মোচন করিয়া মিষ্টান্ন লইতে হস্ত প্রবেশ করাইবা মাত্র তাহাকে সর্প দংশন করিল এবং ছেলেটি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল]

হরেকেষ্ট ॥ একি! সাপ! আমাকে সাপে কামড়ালো—

ব্রাহ্মণ ॥ একি হোলো! এ আপনি কি করলেন বাবা? শেষটায় সাপের ছোবল খাইয়ে আমার ছেলেকে মেরে ফেললেন? হায় হায় একি হোলা!

[কপাল চাপড়াইতে লাগিল]

ডাঃ সরকার ॥ চুপ কোন কথা নয়। কান্নাকাটি নয়। আপনার ছেলের দেহে যে বিষ ছিল যার জন্যে সারা গায়ে অতো সব ঘা, সেই বিষ ওই বিষধর সাপ চুষে চুষে টেনে নিয়েছে। এবার ছেলেকে আপনারা দুজনে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিন। বিশ্রামে থাক্। খবরদার জল খেতে দেবেন না। ওই দেখুন সাপটা আপনার ছেলের বিষ খেয়েই নেতিয়ে পড়েছে। মারা যাবে ওই সাপ বেঁচে উঠবে আপনার ছেলে। বিষস্য বিষমৌষধম্। হ্যানিম্যান যাকে বলেন Similia Similibus Curentur! যান নিয়ে যান। এখন আমাকে এখানে কেউ বিরক্ত করবেন না। এ ছেলের খবর আমি পরে নোব। সখিয়া! সাপটাকে হাঁড়ির ভেতর চাপা দিয়ে রেখে যা।

[সখিয়ার তথাকরণ এবং তৎপরে সেও ব্রাহ্মণ কিশোরের অচৈতন্য দেহটিকে অন্দরপথে বহিয়া লইয়া যায়। ডাঃ সরকার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া আরাম কেদারায় উপবেশন করিলেন এবং করজোড়ে ইষ্টের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন। ধীর পদক্ষেপে রাজকুমারীর প্রবেশ]

রাজকুমারী ॥ ওমা ! পেটে পেটে এত ? তাইতো ভাবছিলাম—

ডাঃ সরকার ॥ কি ভাবছিলে আমি জানতে চাইনা রাজকুমারী। আমাকে এখানে এখন একলা থাকতে দাও। মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। এখন কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। দরজায় ওই নতুন চাকরটাকে বসিয়ে রাখ যেন কাউকে আসতে না দেয়।

রাজকুমারী ॥ আচ্ছা আচ্ছা সেই ব্যবস্থাই করছি।

[অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। নেপথ্যে সখারামের গীত ভাসিয়া আসে]

নেঃ সখারাম ॥ হরি তোমার মাতৃরূপসর্বরূপ সার
যাতে সর্বলীলা প্রকাশিলে প্রসবিলে ত্রিসংসার।
মাতৃহীন বালক যারা,
কি দুঃখে কাটায় তারা,
জানেন মাতারা—
ওই বদন ভরা মা কথাটির
তুল্য কথা নাইহে আর।

[একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সবিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও জনৈক মহার্ঘ সাজসজ্জায় ভূষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি ঢুকিয়া পড়িলেন]

ডাঃ সরকার ॥ একি ! কে আপনি ?

জনৈক। আজ্ঞে আমি তেঁতুলতলার জমিদার দেবনারায়ণ চৌধুরী।

ডাঃ সরকার ॥ বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এখানে কেন ? আমার তো এখন কারও সঙ্গে দেখা করার সময় এটা নয়। আমি তো বাড়ীর সবাইকেও তাই বলে রেখেছি।

দেবনারায়ণ ॥ আজ্ঞে আপনার দরজার চাকর তাই বলেছিল কিন্তু আমি নিতান্ত বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

ডাঃ সরকার ॥ [রুক্ষভাবে] কী বলুন।

দেবনারায়ণ ॥ আমার একমাত্র ছেলের টাইফয়েড। আমার প্রার্থনা এ জন্যে পায়ে ধরতেও রাজি আছি। আপনি তার চিকিৎসার ভার নিন।

ডাঃ সরকার ॥ আমি কিন্তু এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ছেড়ে দিয়েছি। একমাত্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই এখন আমি করি।

দেবনারায়ণ ॥ আমি শুনেছি। হোমিওপ্যাথিতে আমাদের কারও বিশ্বাস নেই বিশেষতঃ এমন মারাত্মক ব্যাধিতে। আপনি কলকাতার মহানগরে

সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

ডাঃ সরকার ॥ বলেছিতো এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি পারবো না।

দেবনারায়ণ ॥ আমি আপনাকে দশ হাজার টাকা দোব।

ডাঃ সরকার ॥ লাখ টাকা দিলেও নয়।

দেবনারায়ণ ॥ লাখ টাকাও দিলেও না?

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—বলছি তো, লাখ টাকা দিলেও না। আপনি এখন আসুন।

দেবনারায়ণ ॥ ও আচ্ছা। [প্রস্থান]

ডাঃ সরকার ॥ [ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিবার পর] এই বাইরে কে আছিস—শুনে যা।

[কাঁপিতে কাঁপিতে যুক্ত করে একটি যুবক ভৃত্যের প্রবেশ]

এদিকে আয়—কাছে আয়।

[ভৃত্যটি সভয়ে নিকটে আসে]

দুটো হাত ওপরে তোল্।

[ভৃত্যটির তথাকরণ। ডাঃ সরকার তাহার ট্যাঁকে হাত দিবামাত্র সেখানে গোঁজা বেশ কিছু টাকা মাটিতে পড়ে গেল]

ওই লোকটি দিয়েছিল?

ভৃত্য ॥ [ক্রন্দনের সহিত] আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাঃ সরকার ॥ তবেই ঢুকতে দিয়েছিস্?

ভৃত্য ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাঃ সরকার ॥ টাকা তুলেনে। [উচ্চকণ্ঠে তোল্।

[ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল]

ডাঃ সরকার ॥ এবার ওর টাকা নিয়ে আমার বাড়ী থেকে চিরকালের জন্যে দূর হ। খবরদার এ বাড়ীতে আর ঢুকবি না।

[কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্যটির প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে সখিয়ার প্রবেশ। এতক্ষণ সে অন্দরের দ্বার হইতে সব লক্ষ্য করছিল]

সখিয়া ॥ হুজুর!

ডাঃ সরকার ॥ দরজা ফাঁক করে ওখান থেকে সব দেখছিলি ? তা বেশ। তুই এবার সদর দরজায় বোস। কেউ এলে আমাকে আগে খবর দিবি। আমি বললে তবে আনবি। জানি আমার কপালে ভগবান বিশ্রাম লেখেননি। এই যে বলতে না বলতেই—

[গুডিভ চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ]

একি! দাদা আপনি! এই morningএ স্বয়ং good evening ? বিখ্যাত ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী! অবাক কান্ড!

গুডিভ ॥ I am always good evening. Beit, morning or evening. ওইজন্যে নামটাই তো নিয়েছি গুডিভ।

ডাঃ সরকার ॥ ভালই করেছেন দাদা। এরপর ছেলে হোলে নাম রাখবেন good morning।

[গুডিভ হাসিয়া উঠিল]

গুডিভ ॥ হ্যাঁ good night আর রাখবো না।

[উভয়ের হাসি]

ডাঃ সরকার ॥ তা হঠাৎ কি মনে করে দাদা ?

গুডিভ ॥ সেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। জরুরী এক Call এলো ঠিকানা দেখি তোমার এই বাড়ীরই পাশে। তা আমি বললাম আরে মশায় আপনার বাড়ীর দুয়ারেই তো রয়েছেন দিকপাল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। আমার অসুখ হলে যাকে আমিই দেখাই। তাকে ছেড়ে আপনি আমাকে—তা বলে কিনা তিনি মশাই এ্যালোপ্যাথীকে লাথি মেরে হুমোপ্যাথি নিয়ে মেতে উঠেচেন।

[গুডিভ হাসিতে থাকিল]

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ বুঝেছি। এসেছিল। তাড়িয়ে দিয়েছি।

[গুডিভ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল]

গুডিভ ॥ দেখ মহেন্দ্র, গোটা কলকাতায় এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় তুমি আমি দুজনে একসঙ্গে Top-এ উঠে বসেছিলাম। তুমি এ্যালোপ্যাথি ছেড়ে দিলে আমার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কিন্তু ভাই তুমি এলোপ্যাথি ছেড়ে দাও এটা আমি চাইনা। কারণ দুজনে একসঙ্গে এ্যালোপ্যাথি Practice করলে তাতে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসারই হবে জয়জয়কার—আর সব চিকিৎসা দাঁড়াবার

পথ পাবে না। আর তাতে হোত আমাদের দুজনেরই লাভ। তুমি এ্যালোপ্যাথি কেন ছাড়ছো? আমি তোমায় হাত ধরে অনুরোধ করছি তুমি এ্যালোপ্যাথি ছেড়োনা।

[গুডিভ মহেন্দ্রর হাত দুইখানি আন্তরিক আবেগে চাপিয়া ধরিল। একটি নাটকীয় মুহূর্ত]

ডাঃ সরকার ॥ [ধীরে ধীরে হস্তমুক্ত করিয়া] এ অনুরোধ যদি আপনি আবার আমাকে করেন বন্ধু হিসেবে, দাদা হিসেবে আপনাকেই ত্যাগ করবো আমি।

গুডিভ ॥ ওরে বাবা, এই কান মলছি আর বলবো না। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে কানে কানে একটা কথা বলে যাবো ভাই। যা বলবো সেটা আর কাউকে বলতে পারবে না। যদি বল আর তা আমার কানে আসে তবে আমি কিন্তু ভাই বলবো স্রেফ মিথ্যে কথা—আমি বলিনি। বলবো?

ডাঃ সরকার ॥ বলুন।

গুডিভ ॥ শোন।

[গুডিভ মহেন্দ্রর কানে কানে কি যেন বলিল। তাহা শুনিয়া মহেন্দ্রর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

তুমি এক ডোজই খেতে বলেছিলে—বুঝলে কিনা—তাতেই—আর এক ডোজ খাবো?

ডাঃ সরকার ॥ না।

গুডিভ ॥ অ্যাঁ?

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ।

গুডিভ ॥ [হাস্যবদনে] আচ্ছা চলি ভাই।

ডাঃ সরকার ॥ আসুন দাদা।

[উভয়ের করমর্দন। গুডিভ চলিয়া গেল। ডাঃ সরকার তাহাকে বিদায় জানাইতে আগাইয়া গেলেন। রাজকুমারী কপাটের আড়াল হইতে ইহাদের লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই সময় ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাঃ সরকার ফিরিয়া দেখেন রাজকুমারী হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন]

রাজকুমারী ॥ কিগো! দুজনে কানাকানি কি কথা হোল?

ডাঃ সরকার ॥ বলবো না। বলতে পারবো না। বলতে মানা আছে।

রাজকুমারী ॥ আমি না তোমার অর্দ্ধাংগ। ঘুমোতে গিয়ে কানে কানে এ কথাটা আমাকে কতবার বল মনে করে দেখতো।

[ডাঃ সরকার হাসিয়া ফেলিলেন]

ডাঃ সরকার ॥ নাঃ তোমার সঙ্গে আর পারি না। বলছি বোসো। গুডিভদার গুপ্ত অঙ্গে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। বেচারী সারাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। সারেনি। গুপ্ত অঙ্গের ব্যাপার সকলকে বলতেও পারে না। নিরুপায় হয়ে আমাকে বলেছে। আমি ওর নাম না বলে রাজেন দত্তের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছিলাম। আশ্চর্য্য, অসুখটা একেবারে সেরে গেছে। কানে কানে বলে গেল। জয় হ্যানিম্যানের জয়। সহসা গম্ভীর হইয়া] আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।

রাজকুমারী ॥ এখনই এক গ্লাস গরম দুধ আনছি।

[রাজকুমারীর প্রস্থান]

ডাঃ সরকার ॥ [চীৎকার করিয়া] সখিয়া ! সখিয়া !

[দ্রুত সখিয়ার প্রবেশ]

সখিয়া ॥ হুজুর !

ডাঃ সরকার ॥ [চাপাস্বরে] দেখে আয়তো ওই সাপে খাওয়া ছেলেটা এখন কি করছে ? জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা ? জ্ঞানে আছে কি অজ্ঞানে ? যা—

[সখিয়া ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। ঘরে একমিনিট স্তব্ধতা। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ। এক গ্লাস উষ্ণ 'দুধ' হস্তে রাজকুমারীর প্রবেশ। ডাঃ সরকার ইসারায় তাহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে বলিলেন। রাজকুমারী তদনুযায়ী গ্লাস হস্তে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সখিয়ার প্রবেশ। তাহার চোখ মুখ কপালে উঠিয়াছে। সে ধীর পদে ডাঃ সরকারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল]

ডাঃ সরকার ॥ কি দেখলি ?

সখিয়া ॥ আজব কি বাত !

[ডাঃ সরকার চক্ষু মুছিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন]

ডাঃ সরকার ॥ বেঁচে আছে ?

সখিয়া ॥ হাঁ হুজুর আছে। লেকিন—

ডাঃ সরকার ॥ কি লেকিন ?

সখিয়া ॥ ঘুমোচ্ছে।

ডাঃ সরকার ॥ ঘুমোচ্ছে ?

সখিয়া ॥ নাক ডাকছে।

ডাঃ সরকার ॥ [চীৎকার করিয়া] Done ! জয় হ্যানিম্যান ! Simili Similibus ! দাও দুধ।

[দুধ লইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। রাজকুমারীর সারা মুখ মণ্ডল নীরব হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

সখিয়া ॥ তার কাছে যা।

[সখিয়ার প্রস্থান]

রাজকুমারী ! তুমি গিয়ে দেখ ওই ছেলেটির ঘুম যেন কেউ না ভাঙ্গায়।

[রাজকুমারী গমনোদ্যত]

ডাঃ সরকার ॥ আর শোন, আমি গুরুতর একটা বিষয় ভাবছি কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। তুমি সদর দরজায় খিল দিয়ে দাও।

[রাজকুমারী সদর দরজায় অর্গল লাগাইতে যাইয়া ছুটিয়া স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসেন]

রাজকুমারী ॥ [চোখ বিস্ফারিত] ওমা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন জলজ্যান্ত এক সাহেব।

[ডাঃ সরকার তড়িৎ পদে সদর দরজায় গমন করিলেন। রাজকুমারী দুধের শূন্য গ্লাস লইয়া অন্দর পথে প্রস্থান করিলেন। ডাঃ সরকার ডাঃ ফেরারকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন]

ডাঃ সরকার ॥ [করমর্দন করিয়া] good evening sir.

ডাঃ ফেরার ॥ Good evening my boy. টুমি চিকিৎসাজগৎ ত্যাগ করিয়াছো। কিণ্টু হামি টুমার সহিত সাক্ষাট করিবার জন্য বড় ইচ্ছাপ্রকাশ করি বলিয়া হামি স্বয়ং টুমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে এবং আসিয়াছে।

ডাঃ সরকার ॥ আপনি আমার শিক্ষাগুরু। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন স্বয়ং ঈশ্বরকে লাভ করলাম। আপনি বসুন স্যার।

[ডাঃ ফেরারকে বসাইলেন]

আপনি একটু চা খাবেন ?

ফেরার ॥ হামি দ্‌ইবার চা পান করি আপন গৃহে। অতিরিক্ত চা পান উট্টম না আছে। টুমার গৃহটি দেখিলাম। স্‌ণ্ডর টুমার গৃহ। উট্টম স্‌সজ্জিত। ইহা কি টুমার নির্ম্মাণ না টুমার পিটামহাশয়ের ডান ?

ডাঃ সরকার ॥ শ্‌ন্‌ন স্যার, আমি গ্রামের লোক পিতা মারা গেলে, অনাথ আমি, আমার মাত্‌লালয়ে—

ফেরার ॥ কি বলিলে ? মাটুলালয় ? সেটা কি আছে ? Lunatic as ylum ?

ডাঃ সরকার ॥ No no, মাত্‌লালয় means. My mother's father's house. That was where I was Kindly brought up, until I could earn myself.

ফেরার ॥ I see ! টুমি Selfmade man আছো। টাহা হামি নিজেও ডেখিয়াছে। ইহাও হামি অবগট আছে টুমি খ্‌ব meritorious ছিলে। L. M. S. পরীক্ষায় প্রঠম হইলে। যট marks পাইলে টাহা দেখিয়া হামি চমকিত হইয়াছিলাম। টুমি খ্‌ব বড়ো ডাক্তার হইলে টাহাও দেখিলাম।

ডাঃ সরকার ॥ তখনই এই বাড়ী কিনে নিই। তবে হ্যাঁ আমার maternal uncle-রা আমাকে কলকাতায় এনে মান্‌ষ করেছেন। আমি সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ফেরার ॥ কি বলিলে ? কৃট—কৃট—

ডাঃ সরকার ॥ কৃতজ্ঞ means grateful।

ফেরার ॥ Very good. এইবার হামার আসিবার কারণ বলিটেছি। Indiaতে M. D. পরীক্ষা যখন Start করিল হামি টুমাকে ওই M. D. examinationটাও ডেওয়ার জন্য হামার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। টাহাও টুমি প্‌রণ করিয়াছো। টুমি উহাটে first হইয়াছিলে। এইবার আরেকটি অন্‌রোধ করিটে হামি আসিয়াছে। হামি জানিয়াছে টুমি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ধরিয়াছো। ইহা কি সট্য ?

ডাঃ সরকার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

ফেরার ॥ ও ! কিণ্টু টুমিই টো medical councilএর সভাটে ওই হোমিওপ্যাথির নিণ্ডা করিয়া একটি Paper পাঠ করিয়াছিলে Say about 1863, ইহা কি সট্য নয় ?

ডাঃ সরকার ॥ সত্য স্যার সত্য। কিন্তু ওই Paper পাঠ করার পর আমি অনেক হোমিওপ্যাথি প্‌স্তক পড়ে এবং অনেক রোগীকে ওই চিকিৎসার সময়ে পর্য্যবেক্ষণ করে আমি এই সত্যে উপনীত হয়েছি যে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান

ম-৩৫৩

মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ্যালোপ্যাথির চেয়েও হোমিওপ্যাথি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তাছাড়াও একটা কথা—

ফেরার ॥ বল বল ?

ডাঃ সরকার ॥ আমাদের এদেশ খুব গরীব দেশ স্যার। এদেশের জনসাধারণ এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারেনা। হোমিওপ্যাথির খরচ খুব কম তাই আমি এই decision নিয়েছি।

ফেরার ॥ হামি বলব টুমি অন্যায় decision লইয়াছো। গরীবের চিকিৎসা করিয়া টুমিও গরীব হইয়া যাইবে। টুমার অনেক শট্রু হইবে। Medical Council-এ টুমি এ্যালোপ্যাথির নিন্দা করিয়া হোমিওপ্যাথির প্রশংসা করিলে টাহাটে অপর member-গণ টুমাকে সেখান হইটে টাড়াইয়া দিল টাহাও হামি জানি। টুমি কি হামার অনুরোধে তোমার Present decision change করিবে my dear boy ?

ডাঃ সরকার ॥ Sorry Sir আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি truth খুঁজে পেয়েছি। আর truth is my god। আমার ঈশ্বরের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করিতে পারি।

[ক্ষণকাল নিস্তব্ধতা]

ফেরার ॥ [ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন] টুমি যদি হামার কঠায় টুমার truth—টুমার god পরিত্যাগ করিটে টবে খুসী হইটাম। কিন্তু টাহা পরিত্যাগ করিলে না ডেখিয়া হামি আরও—হামি আরও খুসী হইয়াছি। Dr. Sarkar you—are—an—ideal—man. And I am proud of you. God bless you.

ডাঃ সরকার ॥ আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ? একটা অনুরোধ ?

ফেরার ॥ Well speak out my boy.

ডাঃ সরকার ॥ আপনাকে আমি প্রণাম করব। I will touch your feet. বাধা দেবেন না।

[ডাঃ সরকার ডাঃ ফেরারের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। ফেরার কোন বাধা দিলেন না। উভয়ের চোখে জল। ফেরার দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন]

ফেরার ॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন] I kiss your hand. Good night.

ডাঃ সরকার ॥ Good night.

[কেরার চলিয়া গেলেন। গাড়ী ছাড়িবার শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। রাজ-কুমারী ছুটিয়া সদর দরজায় আসিলেন। ডাঃ সরকারও ফিরিয়া আসেন। রাজকুমারী তাঁহাকে হাত ধরিয়া আরামকেদারায় বসাইয়া চলিয়া গেলেন। ডাঃ সরকার দেহ হেলাইয়া দিয়া বিশ্রামের জন্য ডানহস্তে চোখ মুখ ঢাকিলেন। ক্ষণ মুহূর্তে সখিয়ার সহিত রাজেন্দ্রলাল দত্তের প্রবেশ]

সখিয়া ॥ হুজুর!

[ডাঃ সরকার হাত সরাইয়া দেখিলেন সম্মুখে রাজেন্দ্রলাল দত্ত। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন]

ডাঃ সরকার ॥ কি সৌভাগ্য! আপনি?

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ এলাম। মাথা ধরায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি।

ডাঃ সরকার ॥ সে কি! কোন ওষুধ খাননি?

রাজেন্দ্র ॥ কোন ওষুধে আমার এ মাথাধরা সারবার নয়।

ডাঃ সরকার ॥ সেকি! কেন বলুন তো?

রাজেন্দ্র ॥ দেখ মহেন্দ্র, আমার কথাতে আমার অনুরোধ উপরোধে দস্তুর মত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হোমিওপ্যাথিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার তুমি মহেন্দ্রলাল সরকার এ্যালোপ্যাথি ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় দীক্ষা গ্রহণ করেছো। আমি কিছু ভুল বোলেছি?

ডাঃ সরকার ॥ না।

রাজেন্দ্র ॥ কিন্তু এর ফলে এ্যালোপ্যাথির অতবড় পসার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তোমার সব খবর নিই এবং রাখি। আজ ছ'মাস তোমার কাছে চিকিৎসার জন্য কোন রোগী আসছে না। যারা আসে তারা তোমার এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাই চায় হোমিওপ্যাথি নয়। তুমি তাদের তাড়িয়েই দিচ্ছো জেনেছি। কিছু ভুল বোলেছি?

ডাঃ সরকার ॥ [মাথা নীচু করিয়া] না।

রাজেন্দ্র ॥ এর ফলে তুমি চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হোয়েছো। ভুল বোলেছি?

ডাঃ সরকার ॥ না।

রাজেন্দ্র ॥ আমাকে তোমার একজন পরম বন্ধু বলে মনে কর কি?

ডাঃ সরকার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ করি। প্রকৃতপক্ষে হোমিওপ্যাথিতে আপনি আমার শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু।

রাজেন্দ্র ॥ তাই যদি বল তবে আমি তোমার পিতৃতুল্য?

ডাঃ সরকার ॥ নিশ্চয়।

[পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন]

রাজেন্দ্র ॥ [বাধা দিয়া] থাক বাবা থাক। তুমি স্থির হোয়ে বোসো। আমার আরও কথা আছে।

ডাঃ সরকার ॥ [আদেশ পালন করিয়া] বলুন।

রাজেন্দ্র ॥ তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি লক্ষপতি লোক। বহু টাকা—প্রচুর টাকা আমি নানা সৎকাজে ব্যয় করেছি, করি। তোমাকেও আমার এক পুত্র জ্ঞান করি। পিতা তার পুত্রকে তার আপদে বিপদে সাহায্য করেই থাকে। আমি তোমাকে তোমার এই বিপদে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে চেয়েছি কিন্তু তুমি তা নিতে কোনদিনই সম্মত হওনি। কেমন ঠিক কিনা ?

ডাঃ সরকার ॥ [মাথা নীচু করিয়া] আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজেন্দ্র ॥ তুমি আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত কোরেছো। তোমারই জন্য আজ আমার এই দুরারোগ্য শিরঃপীড়া।

ডাঃ সরকার ॥ [রাজেনদত্তর হাত চাপিয়া ধরেন] আমাকে ক্ষমা করুন।

[রাজেন দত্ত বটুয়া বাহির করিয়া ডাঃ সরকারের সম্মুখে ধরেন]

রাজেন্দ্র ॥ এতে দশ হাজার টাকা আছে। পিতা দিচ্ছেন পুত্রকে। নাও।

ডাঃ সরকার ॥ [ভগ্নস্বরে] আপনার পায়ে পড়ছি আপনি আমার এ সর্বনাশ করবেন না। প্রতিভার উন্মেষ হয় দারিদ্র্যে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যাতে আমি বড় হতে পারি—আবার যাতে আমার লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে পারি—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

[রাজেন দত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

রাজেন্দ্র ॥ বেশ তাই করছি। কিন্তু শিরঃপীড়া আমার রয়েই গেল।

ডাঃ সরকার ॥ এবং তাই আপনার এই ছেলে—আমারও এখন একমাত্র কাজ হবে যত শীঘ্র পারি আপনার ওই শিরঃপীড়া দূর করা। কাল থেকেই আমি রোগীর জন্য বসে থাকবো না নিজে পল্লীতে-পল্লীতে দুয়ারে দুয়ারে দরিদ্র সংসারে খুঁজে বেড়াবো—কে কোথায় রোগী আছো—এসো—আমি মহেন্দ্র লাল সরকার। তোমাদের চিকিৎসা করবো। ভালো করবো দরকার হোলে পথ্য দেবো, আশ্রয় দেবো।

[রাজেন দত্তর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল]

রাজেন্দ্র ॥ মাথা ধরাটা যেন একটু কম মনে হোচ্ছে।

ডাঃ সরকার ॥ ওটা আমি সারিয়ে দোব।

[রাজেনদত্তকে প্রণাম করিলেন তিনি ডাঃ সরকারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত, ব্রাহ্মণটি 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া ক্রন্দনরত অবস্থায় ছুটিয়া আসিলেন ডাঃ সরকারের সম্মুখে]

ব্রাহ্মণ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি না কৃপাময়! আমরা তা ভুলে যাই!

ডাঃ সরকার ॥ কি হোয়েছে, কি হোয়েছে কাঁদছেন কেন?

ব্রাহ্মণ ॥ নারায়ণের অপার কৃপা আর আপনার অপার দয়া। আমার খোকার মুখে হাসি ফুটেছে। শরীরটা নীল হোয়ে গিয়েছিলো এখন আর তা নেই। সে উঠে বসেছে। খেতে চাইছে।

ডাঃ সরকার ॥ [হাসিয়া] কিন্তু সেজন্যে কাঁদছেন কেন?

ব্রাহ্মণ ॥ নারায়ণের কি অপার কৃপা, আপনার কি অপার দয়া। আপনি দেবতা আপনি দেবতা। আপনিই আমাদের দরিদ্র নারায়ণ।

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ ওই আশীর্ব্বাদটি আমি চাই যুদ্ধে যেন আমার জয় হয়।

[ব্রাহ্মণ তাহার দুই হস্ত বাড়াইয়া ডাঃ সরকারের মস্তক স্পর্শ করিলেন। মঞ্চ অন্ধকার]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[পূর্বোক্ত কক্ষ। ১৮৮৫ সালের মধ্যভাগ। সময়-অপরাহ্ন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কিছু পড়িতে পড়িতে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন]

ডাঃ সরকার ॥ দাশু।

[বাহির হইতে দাশু আসিয়া দাঁড়ায়]

দাশু ॥ কি কাকাবাবু?

ডাঃ সরকার ॥ আর কোন রোগী আছে?

দাশু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ কয়েকজন আছেন।

ডাঃ সরকার ॥ কটা বেজেছে?

দাশু ॥ পাঁচটা।

ডাঃ সরকার ॥ রোগী দেখার সময় শেষ হোয়ে গেছে। আজ আর হবে না।

দাশু ॥ আমি বলে দিয়েছি কাকাবাবু, কিন্তু একজন শুনছেন না—এই যা একেবারে এখানে এসে পড়েছেন। [ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে] আমি না বললাম তবু এলেন?

[আগত ভদ্রলোক সোজা ডাঃ সরকারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ভদ্র ॥ নমস্কার।

ডাঃ সরকার ॥ [কিছুটা বিরক্তিভাব প্রকাশ পায়] নমস্কার।

ভদ্র ॥ না এসে পারলাম না, মাপ করবেন! আপনার মনে আছে কিনা জানি না আমি প্রায় আঠারো বছর আগে আমার একমাত্র পুত্রের এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম—আমি সেই তেঁতুল তলার জমিদার—

ডাঃ সরকার ॥ হুঁ্যা মনে পড়ছে কিন্তু আমি—

দেবনারায়ণ ॥ না না আজ আমি এ্যালোপ্যাথির জন্য আসিনি। আজ এসেছি আমার একমাত্র কন্যার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্যই কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আপনার কাছে। লোকে বলছে আপনি নাকি হোমিওপ্যাথিতে সব অসাধ্য সাধন করছেন।

ডাঃ সরকার ॥ আমার রোগী দেখার সময় নির্দিষ্ট আছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। আপনি আরও আগে আসেননি কেন?

দেবনারায়ণ ॥ হ্যাঁ আসতে আমার একটু দেরী হয়েছিল তবুও ভেবেছিলাম দেখা পাবো।

ডাঃ সরকার ॥ দেখুন আমার কাছে জমিদার গরীব সব রোগীই সমান। যিনি আগে আসবেন তাঁকেই আমি আগে দেখাবো এবং আসা অনুযায়ী আমি পর পর দেখে যাবো। এই হোচ্ছে আমার নিয়ম। আপনি কাল আসবেন আপনার—turn এলেই আপনাকে ডাকবো।

দেবনারায়ণ ॥ বেশ তাই হবে। আমার সেই একমাত্র পুত্রটি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বাঁচেনি! এবার একমাত্র মেয়েটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে। লোকে বলছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে আপনি নাকি ভগবান।

ডাঃ সরকার ॥ [তিক্ত কণ্ঠে] ভগবান কিনা ভগবানই জানেন। আপনি এখন আসুন।

দেবনারায়ণ ॥ আপনাকে আমার বাড়ী যেতে হবে।

ডাঃ সরকার ॥ যাওয়ার প্রয়োজন বুঝলে নিশ্চয়ই যাবো। [রাগত কণ্ঠে] Fees না দিলেও আমি যাই প্রয়োজন বুঝি।

দেবনারায়ণ ॥ [ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া] আচ্ছা আচ্ছা নমস্কার।

[দেবনারায়ণের প্রস্থান]

ডাঃ সরকার ॥ দাশু, এইবার রোগীদের prescription অনুযায়ী— রোগীদের ওষুধগুলো দিয়ে দাও।

দাশু ॥ হ্যাঁ তাই দোব। [দাশুর প্রস্থান]

[অমৃতলালের প্রবেশ]

অমৃত ॥ বাবা! খুব ব্যস্ত আছেন?

ডাঃ সরকার ॥ এসো অমৃত, এসো। তুমি কি এখন তোমার সেই রোগীর case টা নিয়ে আলোচনা করতে চাও?

অমৃত ॥ না বাবা, case টা শুনে আপনি যে ওষুধটার কথা বলেছিলেন আপনার সঙ্গে আমার মতে মিল না হলেও আমি সেইটাই prescribe করেছি। তাতে একেবারে magic। রোগী সেরে উঠে চলাফেরা করছে। এখন আমি এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে।

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ কি ব্যাপার বল?

[দাশুর প্রবেশ]

দাশু ॥ মাপ করবেন আপনার এই prescription দেখে রোগীকে ওষুধ দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ে গেছি। এসব কি লিখেছেন? আমি dictionary দেখলাম straw মানে তো খড়।

[Prescription ডাঃ সরকারের হাতে দেয়]

ডাঃ সরকার ॥ [পড়িয়া] Dulcamara—30 twice a day। নীচে লিখেছি—send a cartload of straw।

[নিজেই হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন]

শোনো অমৃত, শোনো। এটা কেন লিখেছি বলোতো?

অমৃত ॥ [দেখিয়া] না বাবা আমি তো কিছু বুঝছি না! straw মানে তো খড়ই জানি। তাও এক গাড়ী। এ আপনার কি prescription বাবা?

ডাঃ সরকার ॥ শোনো, রোগীটি খুবই গরীবের ছেলে। বাপ এসেছিলো অবস্থা বলে ওষুধ নিতে। অবস্থাটা শুনে আমার কাছে খুব peculiar case বলে মনে হোল। আমি নিজে ওর বাড়ী যাবো বললাম। ও আমাকে বাড়ীর fees দিতে পারবে না বলে কিছুতেই বাড়ীতে নিয়ে যাবে না। আমি বললাম আমি নিজে যেতে চাইছি fees নোব কেন? ওর সঙ্গে চলে গেলাম। গিয়ে রোগীকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে আমিও ওর অসুখের কারণ

খুঁজে পাই না। আকাশ পাতাল ভাবতে গিয়ে ওপরে চেয়ে দেখি চালে খড় নেই। আরও জানলাম কয়েকদিন আগেই ওখানে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। জানলাম বৃষ্টি হলেই ঘরে জল পড়ে। ঘর জলে ভেসে যায়। বললাম ছাদ ছাওনি কেন? বাপ বললে হাতে পয়সা নেই। তাই ওই prescription। যে ওষুধ নিতে এসেছে তাকে ওষুধ দাও আর এক গাড়ী খড় কিনে পাঠিয়ে দাও।

দাশু ॥ এবার বুঝেছি।

[সহাস্যে দাশুর প্রস্থান]

অমৃত ॥ আপনাকে একটা প্রণাম করি বাবা।

[প্রণাম করিল]

ডাঃ সরকার ॥ থাক্ বাবা থাক্। গরীবকে দয়া কোরো! হ্যাঁ এইবার বল তোমার কি দরকার?

অমৃত ॥ শুনুন বাবা, 'Dawn' পত্রিকাতে আমার এক বন্ধু আপনার সম্বন্ধে একটা article লিখবেন। উনি আমাকে ধরেছেন আপনি জীবনে যে সব বড় বড় কাজ করেছেন এবং সম্মান পেয়েছেন তারিখ দিয়ে তার একটা বিবরণ যাকে Biodata বলে তাই দিতে। আমি খুবই সংক্ষেপে একটা খাড়া করেছি সেটা আপনি শুনুন ঠিক আছে কিনা বলুন।

ডাঃ সরকার ॥ বল। আমার সম্বন্ধে তুমি নিজে কিছু উল্লেখ বা মন্তব্য কোরনা।

অমৃত ॥ হ্যাঁ বাবা আমি শুধু bare facts ই দিয়েছি, শুনুন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। শৈশবে পিতৃ—মাতৃহীন। কলিকাতার নেবুতলায় মাতুলালয়ে মানুষ। ১৮৫১ খৃঃ শ্রীমতি রাজকুমারী দাসীর সহিত বিবাহ। ১৮৬০ খৃঃ মেডিকেল কলেজ হইতে এল—এম—এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ডাক্তারী পরীক্ষায়—

ডাঃ সরকার ॥ শোনো, তার আগে লেখো ১৮৬০ খৃঃ তাঁর একমাত্র সন্তান অমৃতলালের জন্ম।

অমৃত ॥ আমার নামটাও আপনার সঙ্গেই কাগজে ছাপার অক্ষরে উঠবে বাবা! আমার কি ভাগ্য।

[ডাঃ সরকারের আদেশ মত লিখিতে লাগিল]

ডাঃ সরকার ॥ ঈশ্বরে মতি রেখো সব হবে। তারপর বলে যাও।

অমৃত। ১৮৬৩ খৃঃ ডাক্তারী পরীক্ষায় এম-ডি পাশ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওই বৎসরেই কলিকাতায় বৃটিশ মেডিকেল এসোশিয়েসনের বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হয় এবং ডাঃ সরকার এই সভার সম্পাদক মনোনীত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বৃটিশ মেডিকেল এসোশিয়েসনের বঙ্গীয় শাখার চতুর্থ অধিবেশনে ডাক্তার সরকার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের সমক্ষে প্রচলিত চিকিৎসা—প্রণালীর কতকগুলি দোষ কীর্ত্তন করিয়া, হ্যানিমানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তি যুক্ততা প্রচার করিলেন। তাহাতে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারগণ বিক্ষুব্ধ হন। কেউ কেউ কিছুটা অপমানও করেন।

ডাঃ সরকার॥ আর এটাও লিখে দাও যে ডাঃ সরকার তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

অমৃত॥ নিশ্চয়ই লিখবো। আমি তো ওই অনুমতি চাইবো ভাবছিলাম।

[আদেশ পালন]

১৮৭০ খৃঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ তাঁহারই সবিশেষ চেষ্টায় Indian Association for the cultivation of science প্রতিষ্ঠিত হয় যাহাতে দেশে সুষ্ঠু বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ও প্রধান ব্যবস্থা হই াছে। ইহা ব্যতীত তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হন এবং বিজ্ঞান সেবার জন্য সি—আই—ই উপাধি লাভ করেন।

ডাঃ সরকার॥ সবই ঠিক আছে বাবা। দেশ আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আমার মাথাটা যেন ঠিক থাকে। আর একটা প্রার্থনাও আছে বাবা অমৃত।

অমৃত॥ কি ?

ডাঃ সরকার॥ আমি যেন দীনদুঃখীর সেবা করে যেতে পারি চিরকাল আর তুমি আমার চেয়েও বড় হয়ে ওই দীন দুঃখীর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে পারো। দেশটা বড়ই গরীব বাবা, বড়ই গরীব। বিদেশী শাসন তো। এদেশ থেকে সব লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার জন্যে তেমন একটা লড়াই এখনও জমে উঠলো না।

[রাজকুমারীর প্রবেশ]

রাজকুমারীর॥ বাপ-বেটার কি স্মরণ আছে যে আজকে নারায়ণ পুজো। প্রণাম করতে হবে না, প্রসাদ পেতে হবে না ?

ডাঃ সরকার॥ স্মরণ আছে। শাঁখ ঘণ্টা বাজলেই যাবো!

রাজকুমারী॥ বাঁচলাম। বাপবেটায় একসঙ্গে বসলে তো আমার কথা কারও মনে থাকে না!

অমৃত ॥ কি বোলছো মা ?

রাজকুমারী ॥ হ্যাঁ আমি হয়ে দাঁড়িয়েছি ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

[রাজকুমারীর প্রস্থান। পিতা পুত্র হাসিয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রায় ছুটিয়া দাশুর প্রবেশ]

দাশু ॥ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির থেকে একজন দেখা করতে এসেছেন। কি করবো ?

ডাঃ সরকার ॥ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ! কে এসেছেন ?

অমৃত ॥ আমি আসছি বাবা। বন্ধুটি বসে আছেন।

[অমৃতর অন্দরপথে প্রস্থান]

ডাঃ সরকার ॥ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ! সেই পরমহংস ! যতোসব ভন্ডদের আড্ডা। এনে বসাও। আমি মুখ ধুয়ে আসচি।

[ডাঃ সরকারের অন্দরে গমন এবং সদর পথ হইতে মাষ্টারকে ভিতরে আনিয়া দাশু তাঁহাকে বসাইল]

দাশু ॥ আপনি বসুন উনি আসছেন।

[মাষ্টার চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করেন সার সার আলমারীতে সযত্নে অজস্র গ্রন্থাদি সুরক্ষিত]

মাষ্টার ॥ এটা কি ওনার Library ? এত বই !

দাশু ॥ এখানে আর কটা বই, সারা বাড়ীতে বইয়ের ছড়াছড়ি। শুনেছি খুব কম করে লাখ টাকার বই কিনেছেন।

মাষ্টার ॥ Fantastic !

[উঠিয়া কৌতূহল বশতঃ পুস্তক সম্ভার দেখিতে থাকেন]

এতসব বই ! পড়বার সময় পান ?

দাশু ॥ [মৃদুস্বরে] রাত জেগে পড়েন।

[ডাঃ সরকারের প্রবেশ]

ডাঃ সরকার ॥ নমস্কার। আমি ডাঃ সরকার।

মাষ্টার ॥ নমস্কার। আমি এসেছি শ্যামপুকুর থেকে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গলক্ষতে খুবই অসুস্থ। ভক্তরা বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁকে এনে রেখেছেন শ্যামপুকুরে। ভক্তদের বাসনা আপনি তাঁর চিকিৎসার ভার নিন।

ডাঃ সরকার ॥ সর্ব্বনাশ! ভক্তরা নাকি তাঁকে বলে ভগবান। ভগবানের চিকিৎসা করবো আমি? না মশাই, আমি কাউকে বড় একটা প্রণাম টনামই করি না। আর এতো গিয়ে হোল আপনাদের ভগবান।

মাষ্টার ॥ নানা, ভক্তরা যা খুসী বলুন তিনি নিজে কখনও ভাবেন না তিনি ভগবান। তাঁকে প্রণাম টনাম কেন করবেন আপনি?

ডাঃ সরকার। বেশ আমি যেতে পারি তবে আজ নয়। আজ আমার বাইরে আরও কিছু রোগী দেখার রয়েছে। আর বাইরে গেলে আমার fees কিন্তু বেশী।

মাষ্টার ॥ বলুন কত?

ডাঃ সরকার ॥ ১০০্ টাকা নিই তবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাও করি।

মাষ্টার ॥ আপনি যা বলবেন আমরা তাই দোব।

ডাঃ সরকার ॥ আমরা মানে?

মাষ্টার ॥ তাঁর ভক্তরা।

ডাঃ সরকার ॥ ভক্তরা মানে? ভক্তদের মধ্যে তো শুনি যতসব পাপীতাপীর আড্ডা। নাম করা সেই মাতাল নোটো—কি যেন নাম—হ্যাঁ সেই গিরিশ ঘোষও আছে। আপনিও কি সেই দলে?

মাষ্টার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ তা বলতে পারেন। তবে আমি শুনেছি আপনি পাপ ঘৃণা করলেও পাপীদের ঘৃণা করেন না। সেই সাহসেই আমি আপনার কাছে এসেছি!

ডাঃ সরকার ॥ ওঃ আচ্ছা বেশ, কাল সকাল দশটায় এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আপনার নাম—টাম তো কিছুই জানলাম না।

[অন্দরমহল হইতে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া ডাক্তার সেইদিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করিয়া মুহূর্ত্তে মাষ্টারের উপর দৃষ্টি ফিরাইয়া আনেন]

হ্যাঁ বলুন?

মাষ্টার ॥ আমার নাম শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত। আমি একজন দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। তবে হ্যাঁ ওঁর ভক্তও বটে। আচ্ছা নমস্কার।—না বলে পারছি না। কারও বাড়ীতে আমি এত বই দেখিনি। কি বিরাট Collection! সবই কি ডাক্তারী বই?

ডাঃ সরকার ॥ না তা কেন? জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সব রকম বই-ই আছে। শুধু কিনে থাকি না কিছু কিছু পড়িও। যাক আপনি যে একজন সত্যিকার শিক্ষক সেটা বুঝতে পারছি এই বইয়ের কথা তুললেন বলে। ভক্ত আর ভগবানে আমাদের দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে কমে যাচ্ছে জ্ঞান আর কর্ম্ম। এই যা দুঃখ। আচ্ছা নমস্কার।

[প্রতিনমস্কার জানাইয়া মহেন্দ্র মাষ্টারের প্রস্থান। পরমুহূর্ত্তে
অন্দর হইতে অমৃতর প্রবেশ]

অমৃত ॥ বাবা, একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি পাবো কি ?

ডাঃ সরকার ॥ বিষয়টা না জানলে কি করে বলি ?

অমৃত ॥ [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] আমার বন্ধুটি এসেছেন বলছিলাম, উনি আমাকে বলে গেলেন আজ ষ্টার থিয়েটারে খুব ভাল একটা নাটকের বিশেষ অভিনয় হবে। গিরিশ ঘোষের "চৈতন্য লীলা"। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। উনি বহুকষ্টে টিকিট পেয়েছেন উনি যাবেন। এই বইটা দেখতে মার খুব ইচ্ছে ছিল। মা অনেকদিন আমাকে বলেছে। আজ আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো ?

ডাঃ সরকার ॥ এ দেখছি আশ্চর্য্য যোগাযোগ। না, থিয়েটারে আমি চিঠি দিয়ে রাখবো ওই নাটক আবার যেদিন হবে আমাকে যেন চারটে first class-এর টিকিট পাঠিয়ে দেয়। আমরা সবাই মিলে যাবো। যাও।

[অমৃতর অন্দরে প্রস্থান। ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টতর হয়। অবগুণ্ঠনাবস্থায় পুত্রবধূ বিনোদিনীর প্রবেশ]

[চুড়ীর শব্দ শুনিয়া] ও বাবা! একেবারে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে নিয়ে যেতে।

[বিনোদিনী অবগুণ্ঠনাবস্থায় মাথা নাড়িল এবং হাত বাড়াইয়া দিল]

ডাঃ সরকার ॥ [সস্নেহে তার হাত ধরিয়া] চল মা, চল।

[অন্দরপথে অদৃশ্য হইবেন ইত্যবসরে অমৃতর দ্রুতপদে প্রবেশ]

অমৃত ॥ বাবা দুজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আশ্চর্য্য! একজন নাম বললেন গিরিশ ঘোষ। কি নাকি জরুরী দরকার।

ডাঃ সরকার ॥ ব্যাপার কি ? একি আশ্চর্য্য যোগাযোগ! গিরিশ ঘোষ! যার নাটকের কথা আমরা এখনি বলছিলাম ? নিয়ে এসো।

[অমৃতের প্রস্থান]

তুমি যাও বৌমা, আমি পরে আসছি।

[বিনোদিনী অন্দরে অদৃশ্য হইবামাত্র গিরিশ ও মাষ্টারকে
সঙ্গে লইয়া বহিঃদ্বার দিয়া অমৃতর প্রবেশ]

আপনারই নাম গিরিশ ঘোষ ?

গিরিশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাঃ সরকার ॥ আপনিই কি সেই নাট্যকার যিনি "চৈতন্য লীলা" লিখেছেন ?

গিরিশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাঃ সরকার ॥ [গিরিশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] আপনি কি আপনার সেই ভগবান রামকৃষ্ণের জন্যই এসেছেন ? এই ইনি যাঁর জন্যে এসেছিলেন ?

গিরিশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। করজোড়ে একটা অনুরোধ, অনুরোধটা রাখতেই হবে।

ডাঃ সরকার ॥ আমি ওঁকে বলে দিয়েছি কাল যাবো।

গিরিশ ॥ ইনি ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত পড়া দেখে আসেন নি। আমি গিয়ে তা দেখেছি বলেই ছুটে আসছি। কাল নয় এখনি একবার শ্যামপুকুরে যেতে হবে।

ডাঃ সরকার ॥ কিন্তু এখন তো—

গিরিশ ॥ আমি আপনার পায়ে পড়ছি—ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। আমি সইতে পারছি না—সইতে পারছি না।

ডাঃ সরকার ॥ বলেন কি! আপনি তো আজ থিয়েটারও করছেন, "চৈতন্যলীলা" ?

গিরিশ ॥ দেখুন আমরা অভিনেতা। আমাদের হাসি কান্না যখন যা দরকার করতেই হয়। ওটা আসল বস্তু নয়।

ডাঃ সরকার ॥ তবে এই যে পায়ে পড়তে চাইছেন—এটাও কি তাই ?

গিরিশ ॥ [ক্রন্দনে কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া আসিল] না না তা নয়, তা নয়। ওই শ্রীরামকৃষ্ণ আমার জীবন দেবতা! আমার হয়তো সব কিছু মেকি। কিন্তু আমার জীবনে একটিমাত্র সত্য আমার ওই রামকৃষ্ণ। তাঁর গলায় রক্ত পড়ছে—আপনি যদি এখুনি না যান—তবে আমি—

[উত্তেজিত হইয়া চতুর্দিকে তাকাইয়া টেবিলের উপর রাখা একটি Poison মার্কা বোতল উঠাইয়া লইল]

ডাঃ সরকার ॥ ওটা কিন্তু বিষ—ওই দেখুন গায়ে লেখা।

গিরিশ ॥ ওই লেখাটা দেখেই তবে এটা হাতে নিয়েছি।

ডাঃ সরকার ॥ না না—আমি—আমি কথা দিচ্ছি—আমি এখুনি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

[এক চরম নাট্য মুহূর্তে মঞ্চের আলো নিভিয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

[ডাঃ সরকারের পূর্ব্বোক্ত ঘর। কাল-পৌষ। সময়-অপরাহ্ন। অমৃত ও বিনোদিনীর প্রবেশ]

অমৃত ॥ শোন, বাবা বলে গেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন এই ঘরে এসে বসবেন বলে ঠিক হয়েছে তখন এঘর ঝাড় পোঁছ আমাদের নিজের হাতেই করা উচিত আর সেটা করতে হবে এখনই, বাবা ফিরে এসে দেখবেন সব ঠিকঠাক। এসো লেগে যাই। ঝাড়নটা আমার হাতে দাও। ঝাঁটাটা তুমি নাও।

বিনোদ ॥ হ্যাঁ নিচ্ছি। ওটা আমাদেরই একচেটিয়া হাতিয়ার।

[সম্মার্জ্জনী হাতে তুলিয়া লইল]

অমৃত ॥ বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। নাও শুরু কর।

বিনোদ ॥ তুমি শুরু কর তোমার ওই গান যেটা লিখেছো। তালে তালে আমিও শুরু কোরবো আমার কাজ।

অমৃত ॥ বেশ।

বিনোদ ॥ হ্যাঁ এক ঢিলে দু'পাখী মারা হবে। গানও হবে কাজও হবে।

[অমৃতর গান]

অমৃত ॥ ধন্য হইগো তোমার পরশে ধন্য মোরা ধন্য
শান্তস্নিগ্ধ ও মূরতি হেরি লভি মোরা পুণ্য
নরেন গিরিশ তোমার আলোকে
শানিত ঝলকে গরজে পলকে
নবরত্নের আলোক মালায়
সবে করে তোমারে মান্য
কত দীন অভাজন পাপী দলে
হাত বাড়ায়ে টানিলে কোলে
ধ্রুব,তারার মত জ্বলিবে
তোমার দেয়া "চৈতন্য"।

[গানের মধ্যভাগে লক্ষ্য করা গেল বিনোদিনীও অমৃতর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গানটি গাহিতেছে। তাহাদের অলক্ষ্যে সেখানে মুখে মৃদু হাসি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন রাজকুমারী]

রাজকুমারী ॥ বৌমার গলাটিতো বেশ।

[বিনোদিনী সঙ্গে সঙ্গে একগলা ঘোমটা টানিয়া দেয়। রাজকুমারী সহাস্যে পুত্রবধূকে বক্ষে টানিয়া লইলেন]

শোনো বৌমা, ও তুমি আমার শ্বশুরের সামনে মুখ ঢেকো। [অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিয়া] এমন সুন্দর মুখখানি যখনই ঢাকো তখনই মনে হয়—

অমৃত ॥ চাঁদে যেন গেরোন লাগে।

রাজ ॥ তুই থাম্‌তো!

অমৃত ॥ আমার মুখখানি বুঝি তোমার পছন্দ নয়, না মা?

[রাজকুমারী বিনোদিনীকে এক হাতে ধরিয়া অপরহাতে অমৃতকে কাছে টানিয়া লইলেন]

রাজ ॥ জন্ম হওয়া থেকেই তো আমার স্নেহ আদর খেতে খেতেই এত বড়টি হয়েছিস্। আমার দিনতো ঘনিয়ে এসেছে। আর কদিনই বা আছি।

অমৃত ॥ কি যে বল তুমি মা। বাবার চিকিৎসায় রয়েছো। তাঁর চিকিৎসায় কত রোগী মরতে বসে সেরে উঠেছে আর তুমি ভালো হবেনা?

রাজ ॥ কদ্দিন তো হয়ে গেল, কই আর হোচ্ছি। যেতে তো একদিন হবেই। দুঃখ শুধু এই আমার নিজের হাতের এমন সাজানো বাগান ছেড়ে চলে যেতে হবে।

অমৃত ॥ মা তুমি থামবে নইলে আমি চলে যাচ্ছি।

রাজ ॥ না না শোন—দেখি আজ তো শুনেছি ঠাকুর আসবেন। তাঁর যদি কৃপা হয়।

বিনোদ ॥ না মা আপনি চলে গেলে—

[ফুপাইয়া উঠিয়া শ্বাশুড়ীর বক্ষে মুখ লুকায়]

অমৃত ॥ এসব কি হোচ্ছে বলতো? তোমরা এমন সব ভেঙ্গে পড়ছো কেন? মা ভালো হোয়ে যাবেন। এই যে গাড়ীর শব্দ পাচ্ছি। বাবা বোধ হয় ফিরে এলেন।

রাজ ॥ সেকি! ঠাকুরকে নিয়ে?

অমৃত ॥ না না ঠাকুরের আসতে এখনও বিলম্ব আছে। বাবার সব কান্ড!

কাল রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে এক রোগীকে ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছেন। আজ ভোরে উঠেই আমাকে ডেকে বললেন সঠিক ওষুধ নিয়ে সেই রোগীর বাড়ী চললেন—সারারাত নাকি ঘুমোতে পারেন নি। ওই আসছেন।

[বিনোদিনী অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়। ডাঃ সরকারের প্রবেশ]

ডাঃ সরকার ॥ এই যে অমৃত, না বাবা খুব রক্ষে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে রোগীটিকে আমার দেওয়া সেই ভুল ওষুধটা খাওয়ানোই হয়নি। ভুল ওষুধটা ফেরত নিয়ে আসল ওষুধটা দিয়ে এলাম। ফেরার সময় এক মজার ব্যাপার। রোগীর বাপ আমাকে fees দিতে এসেছিল, যেখানে আমি আমার ভুল শোধরাতে গিয়েছিলাম সেখানে আমি fees নেবো কেন?

অমৃত ॥ নেননি?

ডাঃ সরকার ॥ শুধু নিইনি না, বলে এলাম এই case-এ আর আমি কোনদিন fees নোবোনা। ওষুধের দামটাও না। রোগীটি যদি সেরে যায় তাতে আমার যে আনন্দ হবে টাকা দিয়ে মাপা যায় তা? ডাক্তার হয়েছিস্ আমার এ কথাটি মনে রাখবি বাবা।

অমৃত ॥ নিশ্চয়ই বাবা। শেখবার যা তাতো আপনার কাছেই শিখছি।

রাজ ॥ তুমি বরং ওকে আশীর্ব্বাদ কর যেন ও তোমার মনের মতো হতে পারে।

[ডাঃ সরকার অমৃতকে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন]

ডাঃ সরকার ॥ তা হোয়েছে।

[হঠাৎ বিনোদিনী অবগুণ্ঠনাবস্থায় ডাঃ সরকারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিও মা, তুমিও।

রাজ ॥ আমার সাজানো বাগান। [বিনোদিনীকে নিকটে টানিয়ালইলেন] সাজানো বাগান।

ডাঃ সরকার ॥ কিন্তু আমাদের শুধু দেখতে হবে এই সাজানো বাগান শুকিয়ে না যায়।

রাজ ॥ মন তো তাই চায়—কিন্তু ভরসা পাচ্ছিনা। [স্বামীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া] আমার এই Heart-এর যা অসুখ চলছে তাতে এক এক সময় মনে হয় এ আর চলছে না শুকিয়ে গেছে। কতোদিন তো তোমায় বলেছি কতো তো ওষুধ খাওয়ালেও কিন্তু কই কিছুই তো হোলোনা। এক এক সময় মনে হয় আমি আর নেই, আমি আর নেই।

ডাঃ সরকার ॥ আমি হাল ছাড়িনি গো, হাল ছাড়িনি। তুমি দেখনি রাতে আমি ঘুমোতে পারিনা। শুয়ে আছি হঠাৎ উঠে বসছি। ছুটে গিয়ে আলমারী থেকে বই টেনে আনছি। বই পড়ছি। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি।

অমৃত ॥ তোমার এই অসুখের জন্যে আমিও বিদেশ থেকে ডাক্তারী বই আনিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কিছু কম করছি না। বাবা সব জানেন। তুমি ভেবোনা মা আজ স্বয়ং রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। আমরা সবাই তাঁর পায়ে পড়ে তোমার জন্যে কাঁদবো।

ডাঃ সরকার ॥ আমি তোমার মাকে আগেও বলেছি আজও বলছি ওইটি আমি পারবো না।

[এই কথাটি একটি দারুণ চমক সৃষ্টি করিল। উপস্থিত সকলে চমকাইয়া উঠিল। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা। রাজকুমারী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া চক্ষে অঞ্চল চাপা দিয়া অন্দর পথে চলিয়া গেল। বিনোদিনী তাঁহাকে অনুসরণ করিল]

অমৃত ॥ [সার্তনাদে] বাবা!

ডাঃ সরকার ॥ না বাবা, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে দেখেছি। ভেতরে কেবল কামনা—আমার চাকরী করে দাও, আমার রোগ ভালো করে দাও—এই সব। ঠাকুর দেবতা ঈশ্বর এ সব আমি মানি ঠিকই কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি কেনা বেচার ব্যবসা চালাতে পারবো না।

অমৃত ॥ আমি জানি, আমি আপনাকে জানি বাবা। কিন্তু মা যেভাবে চলে গেল মনে হোলো খুবই আঘাত পেয়েছে।

[রাজকুমারীর পুনঃ প্রবেশ। সংযত ও সংহতভাব। ব্যথা বেদনা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া গৃহবধূর কর্তব্যবোধে ফিরিয়া আসিয়াছেন]

রাজ ॥ শোন, আমার বুকের ব্যাথাটা আর তেমন টের পাচ্ছি না। তুমি ঠিকই বলেছো কেউ আমাদের বাড়ীতে এলে তার কাছে কি কিছু ভিক্ষে চাওয়া যায়? যায় না। আমি কিচ্ছু চাইবো না, তুমি ভেবোনা। আমি সব গোছগাছ করে রেখেছি। জল খাবার তৈরী। আর যদি কিছু করবার থাকে তো বল।

ম-৩৬৯

তোমার সেই মাতাল বন্ধু সেই যে গো তোমার নাটুকে বন্ধু গিরিশ ঘোষ তাঁর জন্যে এক বোতল হুইস্কিও আনিয়ে রেখেছি অমৃতকে দিয়ে—

ডাঃ সরকার ॥ না না না—গিরিশ আমাকে বলে রেখেছে, কারো বাড়ীতে গিয়ে সে মাতলামি ক'রে না সে তখন অন্য মানুষ। খবরদার ও মদ-টদের ব্যাপার কিছু রেখোনা তাতে চটেই যাবে।

রাজ ॥ আশ্চর্য! তাঁকে নিয়ে সত্যিই আমার ভয় ছিল। কি করতে কি করে বসেন।

ডাঃ সরকার ॥ রাত্রে কিন্তু ঠাকুর থাকবেন বলেছেন সে সব ব্যবস্থা—

রাজ ॥ আমি এর পাশের ঘরে সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুমি গিয়ে একবার দেখনা।

ডাঃ সরকার ॥ আমি কাকে কি ওষুধ দোব সেটা ঠিক হোচ্ছে কিনা তা কি তোমাকে দেখতে বলি তবে তুমি আমায় কেন তোমার কাজ দেখতে বলছো? আমি জানি তুমি যা করেছো, আমার সংসারে তার চেয়ে আর কিছু ভালো হোতে পারেনা।

অমৃত ॥ তা যা বলেছেন বাবা। মা ঘরটাকে একটিমন্দিরের মতো সাজিয়েছে

ডাঃ সরকার ॥ আমি জানি, আমি জানি। তোর মাকে তো শুধু আজ জানি না, আজ কত কাল জানি। এই যে এসে বললেন বুকের ব্যথাটা আর বুঝছেন না ওটা বললেন কেন তাও জানি। আমার বুকে যাতে ব্যথা না পাই সেটা আটকাতে।

[নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিল গিরিশ ঘোষের কণ্ঠ—"কইহে

গেছি!" শশব্যস্ত হইয়া দাশুর প্রবেশ]

দাশু ॥ ঠাকুর এসে গেছেন, ঠাকুর এসে গেছেন!

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে গিরিশ ও মাষ্টার ধরিয়া লইয়া আসেন।
তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া তাঁহাকে সকলে প্রণাম
করিলেন। বিনোদিনী শঙ্খধ্বনি দিতে থাকিল।
অন্দরমহলে ঘণ্টা-বাদ্যধ্বনিতে পরিবেশ
মুখরিত হইয়া উঠিল]

গিরিশ ॥ আমি একটা ফাউ পেন্নাম রাখছি।

[ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

ডাঃ সরকার ॥ কিন্তু নরেন কই? তারও তো আসবার কথা ছিল।

মাষ্টার ॥ কি একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছে। বলে দিয়েছে আসতেও পারে।

গিরিশ ॥ ঠাকুর যখন এসে গেছেন ধরে নিন সেও এসে গেছে। ঠাকুর ছাড়া নরেন Hamlet without Hamlet।

ঠাকুর ॥ [রাজকুমারীকে] এসো গো মা করুণাময়ী। জানি অসুখে ভুগছো। মাকে বলো না গো। তাঁরই কোলে আছো তাঁকে ব্যারামের কথা বলবে নাতো কাকে বলবে? ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবে। যা করবার মা-ই করবেন। তোমার মঙ্গলে কত লোকের মঙ্গল!

[করজোড়ে] সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী
নমোঽস্তুতে॥

রাজ ॥ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী
ত্রাহি মাং শরণাগতং॥

[রাজকুমারী ভাবাবেগে রুদ্ধক্রন্দনে স্তোত্রটি আবৃত্তি করিলেন]

ঠাকুর ॥ এই তো হোয়েছে! চৈতন্য এসে গেছে।

ডাঃ সরকার ॥ অমৃত! বাবা তোমার মাকে নিয়ে এবার এঁদের জল যোগের ব্যবস্থা কর।

[রাজকুমারী, অমৃত ও বিনোদিনীর অন্দরে গমন]

গিরিশ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ কি যেন সেই শ্লোকটা ওই ইতরলোকেরা—

মাষ্টার ॥ মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।

গিরিশ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তো বাবা সেই ইতর লোক। মিষ্টি খাবো, মিষ্টি খাবো। কিন্তু বাবা সবচেয়ে বড়ো মিষ্টি যাকে সবাই বলি অমৃত সে হোচ্ছে তোমার গান। গাওনা বাবা একটু প্রসাদ গাওনা একটা গান।

[ঠাকুর গান শুরু করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন
মধু ঝরিতে লাগিল]

ঠাকুর ॥ এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে,
শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি ॥

গিরিশ ॥ (আমি) দেহ বেকে ভবের হাটে
শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।
আহা কি কথা গো!

ডাঃ সরকার ॥ দেহ তত্ত্ব থেকে কি উচ্চ ভাবতত্ত্ব দেখ দেহের অসুখ কার না আছে। আমি যে ডাক্তার আমারও তো রয়েছে। হাপানীতে এক এক সময় মনে হয় প্রাণপাখী বুঝি খাঁচা ছাড়া হোলো! সবারই তো তোমার মতো সইবার শক্তি নয়।—হাঁ করো তো জিবটা একবার দেখে নিই আজ। না না টানা-টানি করবো না। সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ধরবো না। শুধু একবার দেখবো। জিবটা বের করে একবার তোমার মা কালী হও দেখি।

[ঠাকুরের তথাকরণ]

মা কালী হোতে খুব আনন্দ-খুব সাধ। ঠিক আছে দেখে নিয়েছি।

গিরিশ ॥ জিব অনেক নোটিশ দেয় না ডাক্তার? একটা গল্প মনে পড়ছে।

মাষ্টার ॥ তা বেশ তো বলুন না।

গিরিশ ॥ এক মদখোর মহাজনের খুবই বাধ্য অনুগত এক ভৃত্য ছিল। মনিবের কথায় সে না করতে পারতো এমন কাজ ছিল না।

ডাঃ সরকার ॥ এই ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে আর কি।

গিরিশ ॥ যা বলেছেন। কাউকে দু-ঘা মারতে বললে মেরেই ফেলবে তাকে এমন যে ভৃত্য সে অসুখে মরতে বসলো। মনিবের মনে খুব দুঃখ কিন্তু কি ভেবে খুসীও হলেন খুব।

ডাঃ সরকার ॥ বটে খুসী হলেন?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ খুসী হলেন মুমূর্ষু ভৃত্যকে মহাজন বললেন—দেখ বাপু, সারা জীবন আমার হুকুম তামিল করেছিস। এবার আমার শেষ হুকুমটা শোন্। তুই তো যাচ্ছিস যমের বাড়ী। চিত্রগুপ্তের খাতার দিকে একটু নজর রাখবি। যেই দেখবি তার খাতায় আমার নাম উঠলো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নোটিশ পাঠাবি যাতে আমি আমার চোরাকারবারটা গুছিয়ে ছেলের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে মরতে পারি।

ঠাকুর ॥ [চেতনায় ফিরিয়া আসিয়া] ওরে বাবা লুটিশ! বলিস্ কি?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ বাবা যমকেও ফাঁকি দেবার মতলব।

মাষ্টার ॥ ফাঁকি দিল?

গিরিশ ॥ আঃ শোনই না। ভৃত্য তো মারা গেল। মহাজন নিশ্চিন্ত মনে চোরা-কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।. ভৃত্যের নোটিশ আসছে না বলে মহা আনন্দ।

ডাঃ সরকার ॥ বলো কি?

মাষ্টার ॥ তারপর?

গিরিশ ॥ মহাজন হঠাৎ অসুখে পড়লেন! পড়লেন তো পড়লেনই আর উঠলেন না।

ডাঃ সরকার ॥ হায় হায় কিছুই তবে গোছানো হোলো না!

গিরিশ ॥ না হোলো না। মহাজন যমালয়ে গিয়েই দেখেন তাঁর পরম প্রভু ভক্ত সবার আগে। মহাজন তাকে দেখেই আগুন।—ওরে শালা! তোকে না বলেছিলাম নোটিশ পাঠাবি? ভৃত্য অবাক হোয়ে বলে—সেকি হুজুর! আমি নোটিশের ওপর নোটিশ পাঠিয়েছি!

ডাঃ সরকার ॥ বটে!

গিরিশ ॥ হ্যাঁ। ভৃত্য বললে—'হুজুর আপনার দাঁত পড়েছিলো? মনিব বললেন—'হ্যাঁ পড়েছিলো। কিছুদিন পর চোখে ছানি পড়েছিলো? 'তার কিছুদিন পর শূল বেদনা শুরু হোয়েছিলো? এতো সবই নোটিশ। এতোগুলো নোটিশ হুজুর আপনি পাননি?

[উপস্থিত সকলের উচ্চ হাস্য]

মাষ্টার ॥ ওরে বাবা এসব নোটিশ তো আমরা হরদম পাচ্ছি।

ঠাকুর ॥ আমি তো পেয়েছিই। কি ডাক্তার ঠিক বলিনি? দাও না গো আমার অসুখটা ভালো করে!

ডাঃ সরকার ॥ দেখ, যে অসুখ তোমার হোয়েছে, লোকেদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।

গিরিশ ॥ একা আপনার সঙ্গে কেন? কি বাবা আমরা কি ভেসে এসেছি?

ঠাকুর ॥ না না।

ডাঃ সরকার ॥ না,না তা চলবে না। [গিরিশ ও মাষ্টারের প্রতি] তোমাদের কষ্ট হবে কিন্তু ওর কষ্টটা তোমরা ভাবছো না?

গিরিশ ॥ বটেই তো বটেই তো!

ঠাকুর ॥ দেখ তার নাম—গণনা করতে পারিনা।

ডাঃ সরকার ॥ তা কথা না বলে ধ্যান করলেই তো পারো।

ঠাকুর ॥ নরেনও তাই বলতে চায়। কিন্তু সে কি কথা! আমি এক ঘেয়ে

কেন হবো ? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে, কখনো ঝালে, অম্বলে, কখনো বা ভাজায়, আমি কখনো পূজা, কখনো জপ, কখনো বা ধ্যান, কখনো বা তাঁর নাম গুণ-গান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।

ডাঃ সরকার ॥ নাচো। আনন্দে থাকা নিয়ে কথা। ব্যারামে যখন কষ্ট পাবে তখন আমার কথা মনে পড়বে।

গিরিশ ॥ আনন্দে তো থাকতে চাই সবাই। কিন্তু আনন্দ দেয় কে ? আনন্দের আলোটা তো খুঁজে পাইনা গো।

ঠাকুর ॥ কেনে রে তোদের তো বলেছি সেই গল্প।

ডাঃ সরকার ॥ কি গল্প ? আমি শুনতে চাই।

ঠাকুর ॥ সেই যে একজন লোক তামাক খাবে, প্রতিবেশীর বাড়ীতে টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হোয়েছিলো। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলির পর একজন লোক দোর খুলতে এলো। প্রথম লোকটির সঙ্গে দেখা হোতে সে জিজ্ঞেস করলে কি গো কি মনে করে ? প্রথম জন বললে, আর কি মনে করে। তামাকের নেশা আছে জানো, তো। টিকে ধরাবো মনে করে। তখন প্রতিবেশী লোকটি বললে, 'বাঃ তুমি তো বেশ লোক ? এতো কষ্ট করে আসা আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতেইতো লণ্ঠন। ওতে আগুন নেই ?

[সকলের উচ্চহাস্য]

ডাঃ সরকার ॥ নাও হোলো তো ? আলো পেলে তো ?

গিরিশ ॥ আমার আনন্দ মদের বোতলে। তাও যেখানে সেখানে খাইনা। লোক বুঝে জায়গা বুঝে খাই। বোতলে মদও আছে এই ঠাকুরও আছে।

ঠাকুর ॥ কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ।—কারণের কারণ।

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ। চোখ বুজে বলছো বটে কিন্তু—

ঠাকুর ॥ বেহুঁশ হইনি গো।

[ডাক্তার বুঝিলেন ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে]

ডাঃ সরকার ॥ না, তুমি খুব হুঁশে আছো।

ঠাকুর ॥ [গান] সুরাপান করিনে আমি,

সুধা খাই জয়কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে,
মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে
প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা)
জ্ঞান শুঁড়িতে কুয়ায় ভাঁটি,

পান করে মোর মন মাতালে
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা,
শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা
খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

[গান শুনিয়া ডাক্তার সরকার প্রায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরেরও ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর ভাব সম্বরণ হইলে চরণ গুটাইয়া লইলেন]

ঠাকুর ॥ উহু তুমি কি কথাই বলেছো। তাঁরই কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বলবো না তো কাকে বলবো। ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবো।

[ঠাকুরের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল]

তবে তুমি খুব শুদ্ধ। তা নাহলে পা রাখতে পারিনা।—শান্ত ওহি হ্যায় যো রামরসচাখে।—বিষয় কি? ওতে আছে কি? টাকাকড়ি মান, শরীরের সুখ—ওতে আছে কি? রামকো যো কিনা নাই দিল কিনা হ্যায় সো কেয়ারে।

গিরিশ ॥ ওই রামই হোচ্ছে মদ। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রামই হোচ্ছে মদ। বোতলে লেখা থাকে আর—ইউ—এম। কিন্তু আসলে সেটা হোচ্ছে—র এ আকার ম—রাম। তুমি—শ্রীরামকৃষ্ণ।

'সকল মঙ্গলালয় পূর্ণ বিরাজিত
প্রেমের আধার।
নির্বিকার, হর্ষ-শোক বাসনা বর্জ্জিত,
জ্ঞান দীপ্ত মূর্ত্তি মহিমার!
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্ম্মল—অনিল—স্পর্শে যাঁর;
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা-ভার,
শরেণ্য-বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার।'

ঠাকুর ॥ ঠিক বলেছিস শালা। শোন্ তবে। ছেলে বলেছিলো, বাবা একটু মদ চেখে দেখ তারপর আমায় ছাড়তে বলোতো ছাড়া যাবে। বাবা খেয়ে বোললে, তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নেই কিন্তু আমি ছাড়ছিনা।

[সকলের হাস্য]

সেদিন মা দেখালেন দুটি লোককে ইনি তার ভেতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলুম—কিন্তু শুষ্ক। [ডাক্তারকে সহাস্যে] কিন্তু তুমি রোসবে।

ইতিমধ্যে অমৃত সেখানে আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়াছে]

অমৃত ॥ বাবা! খাবার তৈরী।

ডাঃ সরকার ॥ [ঠাকুরকে] অমৃত বলছে খাবার তৈরী। রামই বলো আর রহিমই বলো কিছু খেতে তো হবেই। চলো।

ঠাকুর ॥ অমৃত যখন বলছে অমৃতই খাবো। চলো চলো সবাই চলো।

ডাঃ সরকার ॥ অমৃত, তুমি যাও মাকে বলো আমরা আসছি।

[অমৃতের প্রস্থান]

চলুন সব—

[ঠাকুরকে ধরিয়া মাষ্টার ও গিরিশ অন্দরমহল অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন]

ঠাকুর ॥ তোমার ছেলেটি বেশ সরল। ছোকরাদের কেন ভালোবাসি জানো? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে। ওরা যেন নতুন হাঁড়ি—দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীর্ষ চৈতন্য হয়। তোমার ছেলের ভিতর বিষয় বুদ্ধি—কামিনী-কাঞ্চন ঢোকে নাই।

ডাঃ সরকার ॥ বাপের খাচ্ছেন তাই; নিজের করতে হোলে দেখতাম, বিষয় বুদ্ধি ঢোকে কিনা!

ঠাকুর ॥ তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয় বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে, তা নাহলে হাতের ভেতর।

[অমৃত ফিরিয়া আসিল]

অমৃত ॥ আসুন আসুন।

[অমৃত ঠাকুরকে ধরিয়া অন্দরমহল অভিমুখে অগ্রসর হয় পশ্চাতে তাঁদের অনু-
সরণ করেন মাষ্টার ও গিরিশ। সবার শেষে ডাক্তার সরকার দরজা অতি-
ক্রম করিবার পূর্ব্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সদর দরজার
পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন নরেন্দ্রনাথ। তিনি পা টিপিয়া
টিপিয়া, তড়িৎপদে যাইয়া ডাক্তারের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ
করিলেন। ডাক্তার পিছন ফিরিয়া নরেনকে সম্মুখে
দেখিয়া 'নরেন' বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করি-
বার পূর্ব্বেই নরেন ডাক্তারের মুখ চাপিয়া
ধরিয়া তাঁহাকে mid stage এ
লইয়া আসিলেন]

ডাঃ সরকার ॥ কি ব্যাপার নরেন। তোমার আসতে এতো দেরী হোলো কেন ?

নরেন ॥ সে অনেক কথা। কিন্তু সবার আগে আমি যা জানতে চাই সেটা বলুন।

ডাঃ সরকার। কি ?

নরেন। কেউ কেউ বলছেন ঠাকুরের Cancer হোয়েছে। আপনি বলে-ছিলেন আপনার বাড়ীতে ওঁকে ভালো করে দেখে আজ বলবেন আপনি কি মনে করেন।

ডাঃ সরকার ॥ বলতেই হবে।

নরেন ॥ আজ আমাকে আপনার বলার কথা ছিলো ঠাকুরের অসুখটা কি ?

ডাঃ সরকার ॥ বলতেই হবে ?

নরেন ॥ [ব্যাকুল ভাবে] বলতেই হবে। আপনি এখন কলকাতার সর্ব-শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। আপনি বলুন—অন্ধকারে আর থাকিতে পারছিনা।

ডাঃ সরকার ॥ [নতমুখে] আর আমার কোন সন্দেহ নেই গলায় Cancer।

নরেন ॥ তার মানে ? কোন আশা নেই ?

ডাঃ সরকার ॥ সে আমি জানি না, জানি না নরেন। জানেন একমাত্র ওঁর মা। চলো সবাই খেতে গেল।

নরেন ॥ পারবো না, আজ আর পারবো না। আমি—আমি যাই, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো। যান আপনি যান। আমিও চলি। আমার কথা ওখানে কিছু বলবেন না !

[ভাবাবেগে মুখ ঢাকিয়া নরেন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যান। ডাঃ সরকার
দাঁড়াইয়া তাহা দেখেন পরে উনিও নিজমুখ দুইহাতে
ঢাকিয়া শোকাচ্ছন্ন হইলেন]

[মঞ্চ অন্ধকার]

চতুর্থ অঙ্ক

১৮ বৎসর পর

[পূর্বোক্ত কক্ষ। সময় প্রাতঃকাল। শয্যায় অর্ধশয়ান মুখঢাকাবস্থায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সম্মুখে গোলটেবিলে পুঁথি পুস্তক, গ্লাস, জলাধার ইত্যাদি। পার্শ্বে সখারাম বসিয়া গান গাহিতেছে]

সখারাম ॥ জীবন ফুরায়ে এলো, তবু ভ্রম ঘুচিল না
আলো থাকতে দেখতে পেলেনা,
আঁধারে কি করবে বলনা
জ্ঞান অনেক হল, আসল জ্ঞান না জন্মিল
পাপেতে নিবৃত্তি ধর্মে প্রবৃত্তি, (ঈশ্বরে ভক্তি)
ভুলেও হল না ;
মানবজনম বৃথা গেল, একবার ভাবিলেনা
এখন আর আছে কি উপায়.
(সেই) জগৎ পিতার কৃপা বিনা,
তিনি হে কৃপাসিন্ধু, দয়াময় দীন বন্ধু ;
ডাক তাঁরে, প্রাণভরে, হয়ে তনমনা
তরে যাবে অনায়াসে মুক্তি পাবে অবশেষে
স্থির থাক সেই আশে, করোনা কোন ভাবনা ॥

[গানের মধ্যে ডাঃ সরকারের মুখ হইতে হাত নামিয়া আসে। সখারামের মনে হইল উনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তাই দেখিয়া সে খুব সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ ডাঃ সরকার যেন জাগিয়া উঠিলেন। তাকাইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে চিকাগোয় বক্তৃতারত গৈরিক বসন পাগড়ী ধারী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ ॥ আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ।

[তুমুল করধ্বনি উঠিল]

আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ আপনারা আমাদের যে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন তার উত্তরে কিছু বলতে গিয়ে আমার হৃদয় অবর্ণনীয় আনন্দে— ভরে উঠেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত ধর্মের মূল উৎসের নামে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত শ্রেণীর কোটি কোটি হিন্দুর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। যে ধর্ম পৃথিবীকে সহনশীলতা ও বিশ্বজনীনতার শিক্ষা দিয়েছে, সেই ধর্মের লোক ব'লে আজ আমি গর্ব অনুভব করছি। আমরা শুধু সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাসী নই, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে আমরা সত্য বলে গণ্য করে থাকি। যে জাতি অন্য ধর্ম এবং অন্য জাতির নির্য্যাতিত লোকদের আশ্রয় দান করেছে, সেই জাতির একজন মানুষ বলে আমি গর্বিত। বন্ধুগণ লক্ষ লক্ষ লোক যে স্তোত্র প্রতিদিন আবৃত্তি করে আমি আমার শৈশব থেকে যে স্তোত্র আবৃত্তি ক'রে আসছি, তার কয়েকটি লাইন আমি আপনাদের শোনাব। "বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন উৎস মুখ থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে গিয়ে মেশে, তেমনি হে ভগবান! বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে সাধনার যে বিভিন্নপথ অনুসরণ করে, আপাত দৃষ্টিতে সেগুলো সরল বা বক্র বা বিভিন্ন মনে হলেও শেষ পর্য্যন্ত সকলই তোমাতে গিয়ে মিলিত হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি চমৎকার কথা আছে। "যে যেভাবে আমার কাছে আসে, আমি তাকে সেইভাবেই ধরা দিই। সমস্ত মানুষের বিভিন্নধারায় সাধনা করলেও শেষ পর্য্যন্ত সকলে আমার কাছে আসছে। সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কার—আর এই দুইয়ের মিলিত সৃষ্টি ভয়াবহ ধর্মান্ধতা সুন্দর পৃথিবীকে বহুদিন ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারা হিংস্রতা এনেছে, পৃথিবীকে নরশোণিতে সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং বহুজাতির মনে এনেছে হতাশা। এই সব দৈত্যদের আবির্ভাব না ঘটলে মানব সমাজ আরোবেশী উন্নত হত। কিন্তু আজ তাদের অন্তিম ? উপস্থিত। আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি এই ধর্ম সম্মেলনের সম্মানার্থে আজ সকালে যে ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে, সেই ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত ধর্মান্ধতা, তরবারি অথবা লেখনীর সাহায্যে সমস্ত অত্যাচার এবং মানুষে মানুষে সমস্ত শত্রুভাবের মৃত্যু ঘোষণা করবে। এই ধর্মসভার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

[চতুর্দ্দিক হইতে যেন প্রচণ্ড করতালির শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে]

ডাঃ সরকার ॥ [বিবেকানন্দকে] অতো সব সাহেব মেম হাততালি দিয়ে হল ঘর যেন ফাটিয়ে দিচ্ছে।

বিবেকানন্দ ॥ হ্যাঁ তা দিয়েছিলো। ঠাকুরের ইচ্ছে ছিলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিল হয় তাই না আমাকে পাঠালেন ও দেশে। ওরা এদেশের কথা, ধর্ম্মের

কথা শুনবে আর ও দেশ থেকে ওদের সব বিদ্যে এদেশে আসবে। যাকে বলে আদান-প্রাদান। ঠাকুরের সেই কথা যত মত তত পথ এমন একজন মহামানবকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না।

ডাঃ সরকার ॥ পারলামই তো না। কাল পূর্ণ হোলে এসব লোক থাকেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞানও সেখানে ব্যর্থ।

বিবেকানন্দ ॥ ঠিকই বলেছেন। তবে উনি থাকলে আজকের এই ছিন্ন-ভিন্ন পৃথিবী একটা মহামিলনের পথ পেতো। ঠাকুরের message broad, universal। এতে সারা জগতকে আপনার করে দেয়। West এ আমি তাঁর এই message ই নিয়ে গিয়েছিলাম।

ডাঃ সরকার ॥ তোমাকে দিয়ে তাই ছড়িয়েও দিয়েছেন। বিরাট কাজ করে এসেছো তুমি। তোমার জন্যে আমার গর্ব্ব হোচ্ছে। এসো বুকে এসো—

[বিবেকানন্দ ডাঃ সরকারের শয্যার নিকটে আসিয়া হাঁটু মুড়িয়া বসিলেন]

বিবেকানন্দ ॥ আচ্ছা ডাঃ সরকার! ঠাকুর যে আপনার কোলে চরণ রেখেছিলেন আজ তো তার জন্যে কোন অভিযোগ নেই ?

[ডাক্তার ধীরে ধীরে তাঁহার বালিশের তলা হইতে ঠাকুরের ফটোখানি টানিয়া বাহির করিয়া প্রণাম করিতে মুখ ঢাকিলেন। পরে ফটো সরাইয়া দেখিলেন বিবেকানন্দ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন]

ডাঃ সরকার ॥ কই কোথায় তুমি ? কোথায় মিশে গেলে তুমি ? নরেন! বিবেকানন্দ! তুমি কোথায় মিশে গেলে ? নরেন! নরেন!

[তাঁহার চীৎকারে রাজকুমারী ও অমৃত ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন]

রাজ কুমারী ॥ কি হোয়েছে ?

অমৃত ॥ কাকে ডাকছেন ?

ডাঃ সরকার ॥ কেন নরেন! আমার সঙ্গে কথা কইছিলো। হঠাৎ গেল কোথায় ?

রাজকুমারী ॥ না না এসেছিলো সখারাম, তোমারই লেখা গান গাইছিলো।

অমৃত ॥ আর আপনি বলছেন বিবেকানন্দের কথা। তিনি তো দু-বছর আগে গত হোয়েছেন।

ডাঃ সরকার ॥ I See! Hallucination! আমার শুরু হোয়েছে। এটা একটা নতুন লক্ষণ। অমৃত, আমার ওষুধটা বদলাতে হবে। I have

Confused the Prescnt with the past. এই লক্ষণটা Cicuta Virosa তে পাবে। অন্য সব লক্ষণ যদি মেলে, দিতে পারো।

অমৃত ॥ আমি দেখছি—

ডাঃ সরকার ॥ না দাঁড়াও। বৌমার সেই শুচি বাইটা কমেছে কিনা তোমার মার কাছ থেকে ভালো করে জেনে আমায় বলবে তো। যে ওষুধ দিয়েছি তাতে কোন ফল হোয়েছে কিনা জানতে চাই।

রাজকুমারী। কমেছে! বলছো কি বেড়েছে। কাল কাজের মেয়েটি একটা পেতলের গ্লাস ছুঁয়ে ফেলে ছিলো বলে তাকে পুড়িয়ে মেজে তবে হেঁসেলে তুললো।

ডাঃ সরকার ॥ বলো কি? ডাকতো ওকে।

রাজকুমারী ॥ ডাকবো কি দরজার আড়ালে ওই তো দাঁড়িয়ে আছে। সব সময়ে তাই থাকে আর তোমাকে দূর থেকে দেখে।

[অবগুণ্ঠনাবস্থায় বিনোদিনী আসিয়া দাঁড়াইল]

ডাঃ সরকার ॥ এতো শুচিবাই থাকলে কি করে সংসার চলবে? আরে তোমার পেটেও তো মল মূত্র রয়েছে। ছুঁয়োনা তোমরা কেউ ওকে।

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

যতোবার বাথরুমে যাবে গঙ্গায় নেয়ে আসতে হবে। পারবে?

[বিনোদিনী মাথা নাড়িল]

তবে? তবেই বোঝো। শোনো বাথরুম থেকে ফিরে এসেই একবার 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলবে তাতেই শুদ্ধ হোয়ে যাবে। নারায়ণ পুজো কর, এ বিশ্বাসটা রেখো কেমন?

[মাথা নাড়াইয়া বিনোদিনী সম্মতি জানাইল].

ডাঃ সরকার ॥ লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা এখন এসো।

[বিনোদিনীর প্রস্থান]

অমৃত! তুমি ওকে যে ওষুধ দিয়েছিলে সেটা বদলাতে হবে। বদলাতে নতুন একটা লক্ষণ পেয়েছো। কি বলো তো?

অমৃত ॥ আগুনে পোড়ালে সব শুদ্ধ হয়।

ডাঃ সরকার ॥ লক্ষণটা মারাত্মক। তুমি মেটিরিয়া মেডিকা খোঁজো আমিও ভাবছি।

রাজকুমারী ॥ ভাবো, কিন্তু একটু দুধ খেয়ে ভাবো। আর নিজের কথাটাও ভালো করে ভেবে দেখ। একে তোমার সর্বক্ষণ হাঁপানী বাপ বেটায় মিলে হোমিওপ্যাথি ওষুধের তো চূড়ান্ত করে ছাড়লে। সারছে তো না-ই বরং আমার তো মনে হোচ্ছে বাড়ছে।

ডাঃ সরকার ॥ বাড়ছে, খুবই বাড়ছে।

রাজকুমারী। কাল সারারাত তো ঘুমোতেই পারোনি।

ডাঃ সরকার ॥ তার মানে বলতে চাইছো ওষুধের এমনই গুণ যে শুধু আমার নয় তোমার ঘুমও কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু একটা কথা তো মানতে হবে আমার দেয়া ওষুধে তোমার সারাদিনই যে ঘুমভাব ব্যারামটি সেরে এসেছে।

রাজকুমারী ॥ বা তা সারবে না। কলকাতার সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার তুমি সেকি শুধু বাইরে, ঘরে নয় ? কিন্তু আমার কথা হোচ্ছে তোমার নিজের বেলায় নিজের ওষুধ কাজ করছে না। তাই হয় এইজন্যেই ডাক্তারদের অসুখ হোলে তাঁদের নিজেদের চিকিৎসা নিজেরা করেন না অন্য ডাক্তার দিয়ে করান এই তো সারাজীবন শুনে আসছি তাই আমি বলছি অমৃত আর কোনো বড়ো ডাক্তার এনে দেখাক।

অমৃত ॥ মা তোমার পায়ে পড়ি ওই কথাটি বোলোনা। বাবার চেয়ে দেশে আজ কোনো বড়ো ডাক্তার নেই। তাই লাটসাহেবও ওঁকে ডাকেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ডেকেছিলেন। ওঁর ওপরে আজ আর কেউ নেই।

ডাঃ সরকার ॥ অমৃত! কাছে এসো তো বাবা।

[অমৃতের তথাকরণ। ডাঃ সরকার আদর করিয়া
তাহার মুখখানি সস্নেহে ধরিলেন]

তোমার কথাগুলো সত্যি সত্যিই অমৃত। তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ—শেষ অনুরোধও বলতে পারো।

অমৃত ॥ অনুরোধ কেন বলছেন বাবা আদেশ বলুন।

ডাঃ সরকার ॥ বেশ, আদেশই করছি। আমাকে আমার সত্য পথেই রেখো মৃত্যুর পথে গেলেও যে সত্যকে আমি আঁকড়ে ধরেছি তা থেকে সরিয়ে দিওনা ভয় পেয়ে কোন সময়েই এ্যালোপ্যাথি অন্যকোন ওষুধ আমাকে খাওয়াবে না।

অমৃত ॥ [আর্তকণ্ঠে] বাবা!

ডাঃ সরকার ॥ হ্যাঁ বাবা। জেনো তোমার মধ্যেই আমি রয়েছি। জীবনের

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তুমি আমার চিকিৎসা করবে। তাতেও যদি না বাঁচি জেনো আমার কাল পূর্ণ হোয়েছে ঠাকুরের ডাক এসেছে।

অমৃত॥ ঠিক আছে বাবা।

[অমৃত মাথা নীচু করিল। তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল]

ডাঃ সরকার॥ [রাজকুমারীকে] ওগো তুমি সব শুনলো তো? তোমাকেও আমার ওই একই কথা। একই অনুরোধ।

রাজকুমারী॥ [অশ্রুভরাকণ্ঠে] তুমি এমন নিষ্ঠুর তা আমি জানতাম না।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

অমৃত॥ বাবা!

ডাঃ সরকার॥ শুনলে তো আমি নিষ্ঠুর। আমি নিষ্ঠুর নই, নিষ্ঠুর হোচ্ছে জীবনে যা পরম সত্য; যে সত্যের ওপর সমস্ত সৃষ্টিকে দাঁড় করিয়ে সৃষ্টি কর্ত্তা ভাঙ্গাগড়া খেলছেন। নতুনকে পুরাতন করছেন। পুরাতনকে করছেন নতুন। সৃষ্টিকর্ত্তার সেই পরম লীলা। যাকগে—তোমার কিছু বলবার আছে?

অমৃত॥ আছে বাবা। আপনি এখন কেমন আছেন জানবার জন্যে দিনের পরদিন কতো জায়গা থেকে কতো যে লোক আসছেন—কতো যে চিঠি আসছে—

ডাঃ সরকার॥ কষ্ট হোচ্ছে?

অমৃত॥ না বাবা।

ডাঃ সরকার॥ আনন্দ হোচ্ছে?

[অমৃত মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল]

গর্ব্ব হোচ্ছে?

অমৃত॥ [রুদ্ধকণ্ঠে মাথা তুলিয়া] হোচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি কি লোকের ছেলে আমি।

ডাঃ সরকার॥ শান্ত হও বাবা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্ত্তব্য কোরে যেতে হবে আমাদের যতোদিন আমরা বাঁচি। সব চিঠিরই কিন্তু উত্তর দিতে হবে। সব থেকে জরুরী চিঠি যে কটা এসেছে দেখে বলো।

অমৃত॥ আপনার সেক্রেটারিয়েট অফিস থেকে কর্ম্মচারীরা এক সভা করে আপনার আরোগ্য কামনা করেছে।

অমৃত ॥ আর একটা চিঠি খুব linportant, আপনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তার কর্ম্মকর্তা আপনার আরোগ্য কামনা কোরে চিঠি দিয়েছেন।

ঠিক এমনি চিঠি এসেছে Calcutta corpoartion তারপর Museum, Asiatic Society এবং Indian Association for the Cultivaiotn of Science থেকেও।

ডাঃ সরকার ॥ যা লেখা উচিত তুমি লিখে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে উত্তর পাঠিয়ে দাও।

অমৃত ॥ বেশ তাই দিচ্ছি।

ডাঃ সরকার ॥ শোনো Indian medical Association থেকে বোধ হয় কোনো চিঠি আসেনি ?

অমৃত ॥ না আসেনি।

ডাঃ সরকার ॥ আমি জানতাম। প্রথম যখন আমি হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক সত্তা ওদের কাছে প্রকাশ করে এলোপ্যাথির অসারতা ওদের কাছে প্রমাণ করতে যাই তখন ওরা আমাকে অপমানই করেছে। জীবনে ওই অপমানই আমার প্রথম অপমান, ওই অপমানই আমার শেষ অপমান। ঠিক আছে।

অমৃত ॥ না বাবা ওঁদের কর্তৃপক্ষ আপনার সঙ্গে কোরতে এসেছিলেন। তখন আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বোলে আপনাকে জানানো হয়নি। ওঁরা এসে আমাকে সেদিন স্পষ্ট বোলে গেছেন ওঁরা খুবই অনুতপ্ত। মনে হোলো ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন।

ডাঃ সরকার ॥ আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি ওদের ভালো হোক, আমার শত্রু মিত্র সবারই ভালো হোক। জানো বাবা অমৃত, এই মনোভাবে যে আনন্দ পাচ্ছি কোনো যুদ্ধ জয়েও সে আনন্দ পাওয়া যায় না।

[হাতে একগ্লাস দুধ লইয়া অবগুণ্ঠিতা বিনোদিনীর প্রবেশ। গ্লাসটি ডাক্তারের দিকে বাড়াইয়া ধরে]

অমৃত ॥ আচ্ছা বাবা আমি তবে উঠছি, কাজগুলো সেরে ফেলি।

ডাঃ সরকার ॥ বেশ। আমি এখানে লোক পেয়ে গেছি।

[অমৃতের প্রস্থান। বিনোদিনী আরও কাছে আসিয়া গ্লাস বাড়াইয়া দিল]

[মৃদু হাসিয়া] দুধ তো বুঝছি, কি কোরতে হবে ? মাথায় ঢালতে হবে না গিলতে হবে ? না বোললে আমি কি কোরে বুঝবো ?

[বিনোদিনী ইঙ্গিতে দুধ খাইবার নির্দেশ করিল]

ডাঃ সরকার ॥ কে খাবে, তুমি না আমি ?

[বিনোদিনী ইঙ্গিতে ডাক্তারকে দেখাইল]

কি বোলছো আমি বুঝছি না।

[বিনোদিনী সভয়ে চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া ডাক্তারের কানের
নিকট তাহার মুখ লইয়া গেল]

বিনোদিনী ॥ আপনি। আপনি খাবেন।

ডাঃ সরকার ॥ এই বয়েস, তার ওপর এই অসুখ। বড়ো করে না বোললে আমি শুনতে পাচ্ছি না।

বিনোদিনী ॥ [ফিস্ ফিস্ করিয়া] কথা বোললে মা' আমাকে খেয়ে ফেলবেন।

ডাঃ সরকার ॥ কি বোললে ? কথা বোললে মা তোমাকে খেয়ে ফেলবে ?

[বিনোদিনী ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—হ্যাঁ]

ও তোমার শ্বাশুড়ী বোধহয় আজ কাল মানুষ খাচ্ছে ?

[বিনোদিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ডাঃ সরকার ॥ কি মিষ্টি এই হাসি। ওগো শুনছো—

[অন্দরের দরজাতেই রাজকুমারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন
এইবার প্রবেশ করিলেন]

রাজকুমারী ॥ শুধু শুনছি না দেখছিও।

ডাঃ সরকার ॥ বৌমার মাথাটা এমন কোরে খাচ্ছো কেন বলোতো ? শ্বশুরের সঙ্গে কথা বোললে সেটা এমন কি দোষ গো ?

রাজকুমারী ॥ কি কোরবো আমাদের সমাজে যে নিয়ম চলে এসেছে তাই চলছে।

ডাঃ সরকার ॥ তা যদি বলো তবে তুমিও একটা কথা শুনে রাখো আমি চলে গেলেই সতীদাহে তোমাকে যেতে হবে—আমাদের সমাজে এক কালে এই নিয়মও তো ছিলো। আমি তো যাচ্ছি, যাবে নাকি ভাই ?

রাজকুমারী ॥ [প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া] তুমি চলে যাচ্ছো মানে ? অমন কোরে বোলো না গো, সইতে পারি না। তোমাকে বোলছি বৌমা আমি। নিজের হাতে তোমার ঘোমটা তুলে দিচ্ছি। তুমি ও'র সঙ্গে যা খুসী কথা বলো। এতে যদি কোনো পাপ হয় সে হবে আমার।

ডাঃ সরকার ॥ কোন পাপ হবে না। এসো মা কাছে এসো। [মুখখানি

ম-৩৮৫

ধরিয়া] কি সুন্দর মুখখানা। একটি ফুটন্ত পদ্মফুল। আমার মেয়ে ছিলো না। তবু ভালো আজ এই মরতে বসে একটি মনের মতো মেয়ে পেলাম। আমার সকল সাধ পূর্ণ হোলো।

[ডাঃ সরকার বিনোদিনীর শিরশ্চুম্বন করিলেন। বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিল]

রাজকুমারী ॥ তুমি যাও বৌমা তোমার শ্বশুরের পথ্যটা আজ তুমিই তৈরী করো। দেখে দেখে শিখেছোতো? পারবে না?

[অনবগুণ্ঠিতা বিনোদিনী অন্দরমহলে যাইবার উপক্রম করিতেই আগত অমৃতের সামনে পড়িয়া গেল]

বিনোদিনী ॥ পারবো মা। যাচ্ছি।

অমৃত ॥ একি ঘোমটা?

[বিনোদিনী উত্তরে হাসিমুখে ঘোমটা আরও তুলিয়া দিল]

অমৃত ॥ মা ব্যাপার কি?

রাজকুমারী ॥ [হাস্যমুখে] তোমার বাবার হুকুম হোয়েছে ওই চাঁদমুখ আর ঢাকা থাকবে না।

অমৃত ॥ গেরোন তবে শেষ? তা মা ভালোই হোলো। বেচারী রোজই দু-একবার হোঁচট খেতো। বেঁচে গেল।

[বিনোদিনী হাসিয়া প্রস্থান করিল]

বাবা! দুটো খুব জরুরী কাজে আপনাকে বিরক্ত না কোরে পারছি না।

ডাঃ সরকার ॥ বলো বাবা, কি?

অমৃত ॥ আপনার অসুখের সংবাদ শুনে দেশের বাড়ীর শশী সরকার এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা কোরতে চায়।

রাজকুমারী ॥ না না এখন আর ওকে বিরক্ত করা চলবে না। কেন উনি তো নিজের হাতে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন ওদের যে দেশের বাড়ীতে ওনার কোনো স্বত্ত্ব রইলো না। দেশের বাড়ী জমি ওরা ভোগ কোরছে ওরাই ভোগ কোরবে।

ডাঃ সরকার ॥ চিঠিটা লিখতে আমি আরও আনন্দ পেয়েছিলাম এইজন্যে তোমার এই মা-ই বোলেছিলেন আমাদের তো অনেক আছে, ওটা ওদেরই দাও।

অমৃত ॥ মা! জানি তোমার মন খুবই বড়ো কিন্তু এতোবড়ো—

[মাকে প্রণাম করে]

বাবা, আপনার চিঠি পেয়েই ও'রা সদলবলে এসেছেন আপনাকে প্রণাম

কোরতে আর ভেট এনেছেন আপনার জন্যে ওই বাড়ীর জমিতে জন্মানো দু-ধামা পটল যা আপনি খেতে খুব ভালোবাসেন।

ডাঃ সরকার ॥ পটল এনেছে! দেখ দেখ ঠাকুরের কি ইচ্ছা। পটল তোলবার আগেই পটল পেয়ে গেলাম। ওদের বোলো আমি ভারী খুসী হোয়েছি। ওদের ভালো কোরে খাইয়ে দাইয়ে দিও। হ্যাঁ আর শোনো—

অমৃত ॥ বলুন বাবা।

ডাঃ সরকার ॥ আমার একটা বিশেষ ইচ্ছে তোমাকে জানিয়ে রাখছি।

অমৃত ॥ বলুন।

ডাঃ সরকার ॥ আমার নিজের হাতে গড়া Indian Association for the cultivation of Science—এই প্রতিষ্ঠানটি আমার বড়োই প্রিয়। তোমাকে যেমন ভালোবাসি ঠিক তেমনি ভালোবাসি Associationটিকে। বুঝেছো?

অমৃত ॥ বুঝেছি বাবা।

ডাঃ সরকার ॥ কেন ভালোবাসি তাও বোলছি। আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা নেই বোললেই হয়। আমাদের বিদেশী শাসকরাও চাননা যে আমরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে বড়ো হই। কিন্তু আমি মনে প্রাণে চাইছি দুটি জিনিস বেড়ে উঠুক—বড়ো হোক। একটি তুমি আর একটি আমার ওই Association। আর এই দুটি কাজের জন্যে যাতে টাকার অভাব না হয় সে ব্যবস্থা আমি কোরেছি। এখন থেকে ওই প্রতিষ্ঠানটা দেখা তোমার একটা বড়ো দায়িত্ব হোয়ে রইলো কিন্তু। মনে রেখো।

অমৃত। রাখবো বাবা। কিন্তু আজই বা এতো সব বিষয় নিয়ে এতো কথা কইছেন কেন বাবা বুঝছি না।

রাজকুমারী ॥ আমিও না।

ডাঃ সরকার ॥ ভাবছো আমি বুঝি মরতে বোসেছি?

যাই-ই ভাবো আসল কথা হোচ্ছে এসব কথা কেন যেন আমার খুব মনে আসছে। খুব অসুখ হোয়েছে বোলে অবসরও পাচ্ছি খুব। হয়তো তাই।

অমৃত। আচ্ছা তাহলে আমি যাচ্ছি!

ডাঃ সরকার ॥ এসো।

[অমৃতের প্রস্থান]

রাজকুমারী ॥ আমিও দেখে আসি তোমার পথ্যটা তৈরী হোলো কিনা।

[ডাক্তার রাজকুমারীর একখানি হাত হঠাৎ চাপিয়া ধরিলেন]

ডাঃ সরকার ॥ না তুমি বোসো।

[রাজকুমারী পুনরায় বসিলেন। তখনও ডাক্তার স্ত্রীর হাত ধরিয়া রহিয়াছেন]

ডাক্তারদের বউরা কখনও সুখী হয়না।

রাজকুমারী ॥ কেন বলোতো ? কে বোলেছে সুখী হয় না ? আমি সুখী নই ?

ডাঃ সরকার ॥ না আর দশজনের মতো ডাক্তাররা স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে পারে না। মানে সময় পায় না।

রাজকুমারী ॥ হ্যাঁ—না—তা—সেটা ঠিক। এক ওই রাতটুকু—

ডাঃ সরকার ॥ কিন্তু সে রাতটুকুও বেশীর ভাগ বই পড়েই কাটিয়ে দিয়েছি। এই অপরাধের জন্যে দুঃখ আমিও কিছু কম পাইনি। ঠিক কোরেছিলাম তোমাকে নিয়ে একটু পালাবো। নিৰ্জ্জন জায়গায় নিরিবিলিতে তোমাকে নিয়ে থাকবো বোলে যশিডিতে কোরেছি একখানা মনের মতো বাড়ী। আর সেটা তোমার মনের মতো কোরে সাজাতে আগেভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছি তোমারই আদরের সখিয়াকে। কেন জানো ? সেখানে তুমি আমি থাকবো। "কপোত কপোতী যথা বাঁধে নীড় উচ্চ বৃক্ষচূড়ে।" আমার প্রিয় বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেই কবিতা।

রাজকুমারী ॥ জানি। বাইরের বইয়ের মধ্যে পড়োতো শুধু তাঁর ওই মেঘনাদ বধ।

ডাঃ সরকার ॥ পড়বো না ? বইটা নিজের হাতে লিখে আমাকে Present কোরে গেছে। আর সেই দেখাই শেষ দেখা।

রাজকুমারী ॥ ওসব কথা থাক। পথ্যটা দেরী হোচ্ছে কেন দেখছি।

ডাঃ সরকার ॥ [হাত চাপিয়া ধরিয়া] না, তোমাকে এতোকাল অসুখী কোরে রাখার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আগে কোরে তবে পথ্য খাবো। বৈদ্যনাথ ধামে কোরেছি যে বাড়ী তা উৎসর্গ কোরেছি কুষ্ঠরোগীদের আশ্রয় দিতে। তোমারই নামে ওই আশ্রমের নাম রেখেছি "রাজকুমারী লেপার এসাইলাম। কতো কুষ্ঠরোগী সেখানে আশ্রয় পাচ্ছে। আজ আমার কি আনন্দ জানো ? আমি চলে গেলেও—তোমাকে, তোমার ছেলেকে, তোমার ছেলের বৌকে, তোমার গোটা পরিবারকে মনে প্রাণে আশীৰ্ব্বাদ করার মতো লোকের অভাব হবেনা। আমি নিশ্চিন্ত।

রাজকুমারী ॥ [উচ্চকণ্ঠে] আবার এসব কথা ! কোনো আশীর্ব্বাদই তোমার জীবনের চেয়ে বড়ো নয়।

ডাঃ সরকার ॥ চিরকাল কি কেউ বেঁচে থাকে গো ?

রাজকুমারী ॥ জানি থাকে না।

ডাঃ সরকার ॥ ঠিক বোলেছো। 'একদিন আমরা সবাই যাবো। কিন্তু এমন আশীর্ব্বাদ চাই যাতে যে আগে এসেছে সে আগে যাবে, যে পরে এসেছে সে পরে যাবে। কোনো অন্যায় বোলেছি ?

রাজকুমারী ॥ আমি তোমার এসব কথা সইতে পারছি না—সইতে পারছি না।

ডাঃ সরকার ॥ না না তুমি অনর্থক অমন উতলা হোচ্ছো। আমার আর একটু কাছে এসো। এখানে আর কেউ আছে কি?

রাজকুমারী ॥ না।

[ডাক্তার সস্নেহে রাজকুমারীর মুখখানি দুই হাতে নিজের নিকট টানিয়া আনিয়া শিরঃশ্চুম্বন করিলেন]

কিন্তু এই-ই বা কেন?

ডাঃ সরকার ॥ ক্ষিধে। আমার ক্ষিধে পেয়েছে। ক্ষিধে পেলে খাবোনা?

[সশংক-দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন]

রাজকুমারী ॥ ওগো এসব তুমি কি বোলছো?

ডাঃ সরকার ॥ আমায় একটু ধরে তুলে দাওতো।

রাজকুমারী ॥ আমি ওদের কাউকে ডাকি—

ডাঃ সরকার ॥ না তুমি দাও। এতোকাল পেরেছো আজ পারবে না?

[রাজকুমারী অসুস্থ স্বামীকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন]

এইবার শোনো। অসুখের মধ্যেও আমি একটা কবিতা লিখেছি। ও—না, শেষ লাইনটা মনের মতো হোচ্ছিলো না। কলমটা দাও তো। লিখে দিচ্ছি।

[রাজকুমারী তাঁহার হাতে কলম দেন]

জানালাটা খুলে দাওতো। বাইরের আলো হাওয়া আর একটু আসুক।

[রাজকুমারী আদেশ পালন করিতে যাইলেন। ডাঃ সরকার কাগজটিতে কি যেন লিখিলেন। ততক্ষণে রাজকুমারী ফিরিয়া আসিয়াছেন]

আমার লেখা পড়তে তোমার ভালো লাগে কতোদিন বোলেছো। তোমার মুখে আমার লেখা শুনতে আমার খুবই ভালো লাগে—তোমাকে কতোবার বোলেছি। আজ আমার বড়ো ইচ্ছে আমার এই প্রাণের কবিতাটি ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত পড়বে। পড়বে?

রাজকুমারী ॥ কেন পড়বো না? এতো আমার কতোবড়ো আনন্দ।

ডাঃ সরকার ॥ নাও পড়ো—ভালো না লাগলেও ধৈর্য্য ধরে শেষ কোরতে হবে কিন্তু।

রাজকুমারী ॥ দাও দাও।

[কবিতা পাঠ]

"ভয় করোনা রে মন, দেখে শমন আগমন,
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু তারে কর আলিঙ্গন।
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়, লয়ে যাইতে তোমায়,
করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছো ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়া শৃঙ্খলে,
এসেছে সে কাটিতে ঐ দারুণ বন্ধন।
দেহ পিঞ্জরের দ্বার, করিয়ে উন্মোচন,
দিতে তোমার সুখময় অনন্ত জীবন।"

[আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে ডাঃ সরকার কম্পিত হস্তে পার্শ্বে পুঁথিপত্রের উপরে রাখা একটি কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে কি যেন লিখিতে চেষ্টা করিতে করিতে ঢলিয়া পড়িলেন। রাজকুমারী আর্তনাদ করিয়া উঠেন]

রাজকুমারী ॥ একি! তুমি কিছু বোলছো নাতো! একি! কোনো কথা বোলছো না যে—শোনো—শোনো খোকা ছুটে আয়—বৌমা! কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়—

ওরে অজ্ঞান হোয়ে গেছে!

অমৃত ॥ সেকি! বলো কি?

[নাড়ী দেখিতে থাকে]

না! এ অবস্থায় এলোপ্যাথরা কোরামিন দেয়। দোবো?

রাজকুমারী ॥ না। ও'র প্রতিজ্ঞা—ও'র সেই আদেশ মনে নেই?

[সকালের রোদ এক বিশাল ব্যক্তিত্বের শেষ শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন আলোর রথে করিয়া অনন্ত যাত্রার এক প্রস্তুতি লগ্ন! যবনিকা নামিয়া আসিল]

এদেশে লেনিন্

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা শতদল ঘোষ
শ্রীকরকমলেষু,

হ্যাঁ,
এ আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

প্রীতিধন্য বিনীত
মন্মথ রায়

॥ ধন্যবাদ ॥

পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায় "এদেশে লেনিন" নাটকে সত্যকে অবিকৃত রেখে এক বিস্মৃত ইতিহাসকে জন সমক্ষে তুলে ধরেছেন এবং আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিনীতা—
শতদল ঘোষ

"এদেশে লেনিন"

ভূমিকা

আমার পরম স্নেহাস্পদা "সতীর্থ-সঙ্গম" এর প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা শেফালী ঘোষের কাছে শুনে চমকে উঠি যে তার পিতৃদেব ৺ ফণিভূষণ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক বাংলায় রচিত লেনিনের একটি জীবনীগ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগার ও রামমোহন লাইব্রেরীতে আছে। তখনই আমার মনে হয় যে ওটা দেখা উচিত। দেখে, পড়ে এবং সবিশেষ অনুসন্ধান করে আমি চমকে উঠি যে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণের এই গ্রন্থটিই ভারতীয় ভাষায় রচিত লেনিনের প্রথম জীবনী গ্রন্থ। ইংরাজী ভাষায় অবশ্য এর পূর্বে ভারতে প্রচারিত ছিল মাত্র দুই ভারতীয় লেখকের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও ও শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে রচিত লেনিন জীবনী। আর অন্য কোন ভাষাতে নয়। লেনিনের জীবনী ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করেছেন একজন বাঙ্গালী লেখক আমি এই সন্ধান পেয়ে বাঙ্গালী হিসেবে বেশ গর্ব অনুভব করি এবং ১৯৭০ সালে প্রকাশিত যুগান্তরেও আমার এই মন্তব্য সমর্থিত দেখলাম।

শ্রদ্ধেয় ফণিভূষণের সহধর্মিনী শ্রীমতী শতদল ঘোষ এখন ও সৌভাগ্যক্রমে জীবিত থাকায় তাঁর স্বামীর এই গ্রন্থটির প্রকাশকালে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশে বাধা বিঘ্ন ঘটিয়েছে আমার এই অনুমানও সত্য বলে নিঃসন্দেহ হই। সব জিনিষটাই আমার কাছে কেমন যেন নাটকীয় হয়ে ওঠে। তারই ফলশ্রুতি এই নাটক "এদেশে লেনিন"।

না বললে অন্যায় হবে তাই একথাটাও সবাইকে জানাতে চাই ৺ফণিভূষণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান সুব্রত ঘোষ এই নাটকের অনুলিখনে আমাকে সাহায্য না করলে ৮৮ বছর বয়স্ক ছানি রোগে আক্রান্ত এই বৃদ্ধের পক্ষে ৩রা ডিসেম্বর ৮৬ থেকে ১২ই ডিসেম্বর ৮৬-এর মধ্যে এই নাটক রচনা সম্ভব হত না এবং এই নাটকটি প্রযোজনার জন্য শ্রীমতী শেফালী ঘোষের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টা ছিল বলেই গত ২৯শে এপ্রিল গোর্কি সদনে এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন মুখার্জীর সভাপতিত্বে পরম সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে।

অলমিতি

বিনীত—

মন্মথ রায়

ঃ চরিত্রলিপি ও কলা-কুশিলা বৃন্দ ঃ

বিশ্ববন্দিত মহান নেতা কমঃ লেনিনের ১১৭ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে—"ইস্‌কাস" আয়োজিত শ্রদ্ধাবাসরে "সতীর্থসঙ্গম" কর্তৃক গোর্কিসদনে অভিনীত "এদেশে লেনিন" নাটকের—১ম অভিনয় রজনীর শিল্পীও কলাকুশলী বৃন্দ ঃ—

ফণিভূষণ ঘোষ ঃ—অমিত্‌ রায়
বেণীমাধব দাস ঃ—সুব্রত ঘোষ
ধীরেন বসু ঃ—তৃপ্তি কুমার মিত্র
নরেন দাস ঃ—দিলীপ চক্রবর্তী
মিঃ হালদার ঃ—নারায়ণ কর্মকার
কনষ্টেবল ঃ—প্রসেনজিৎ ভড়
শতদল মজুমদার ঃ—স্নিগ্ধা রায়

নাট্য পরিচালনায়—**তৃপ্তি কুমার মিত্র**

প্রধান উপদেষ্টা ঃ—**ধূর্জ্জটী দত্ত ও শ্রীমতী কল্যাণী রায়**

স্মারক ঃ—**অজিত ভট্টাচার্য্য ও সুস্মিতা ব্যানার্জী।**

মঞ্চ ও আলোয় ঃ—**সীতানাথ ব্যানার্জী।**

সমগ্র-অনুষ্ঠান পরিচালনায় ঃ—**শ্রীমতী শেফালী ঘোষ**
(প্রতিষ্ঠাত্রী অধ্যক্ষা)

এদেশে লেনিন

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[কলিকাতা। ১৯২১ সনের মাঝামাঝি কোন সময়। অপরাহ্ন, গোয়াবাগান অঞ্চলের একটি মেসবাড়ীর পথের ধারের একটি কক্ষ। কক্ষের সামনে এক টুকরো বারান্দা। একটি জানালা হইতে রাজপথটি দেখা যায়। বারান্দার সামনে ছোট একটি গলি অর্থাৎ গলি এবং রাজপথের সংযোগস্থলে এই মেসটি অবস্থিত। স্কুল শিক্ষক ফণিভূষণ ঘোষ মেসের এই কক্ষের বাসিন্দা। তিনি বারান্দায় বসিয়া একটি খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কক্ষের মধ্যে একটি তক্তা-পোষ, তাহাতে বিছানা। ঘরে বাক্স প্যাঁটরা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম। পুঁথি পুস্তকের ছড়াছড়ি, রাজপথ দিয়া 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়, বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি ধ্বনি তুলিয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা যাইতেছিল। ফণিভূষণ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগি-লেন "খুকু, খুকু শোভাযাত্রা দেখবে ত ওঠ। খুকু কক্ষের ভিতর হইতে ছুটিয়াআসিয়া ফণিভূষণের সামনে দাঁড়াইল। তাহার বয়স ষোলো]

খুকু ॥ (হাস্যমুখে) আমাকে ডাকছেন ?

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ, তোমাকে।

খুকু ॥ কিন্তু আমি কি খুকু। খুকু ত নই।

ফণিভূষণ ॥ আঃ তোমার নামটা আমার মনে থাকে না।

খুকু ॥ শতদল।

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ শতদল। ওটা ত পোষাকী নাম। আর একটা কি নাম ? তোমার দাদা যে নামে ডাকেন।

শতদল ॥ বুড়ী কিন্তু সে নামে আপনি ডাকবেন না।

ফণিভূষণ ॥ কেন ?

শতদল ॥ আমি কি বুড়ী নাকি ? আপনি ডাকবেন শতদল।

ফণিভূষণ ॥ আচ্ছা বেশ তাইই ডাকব অতবড় শোভাযাত্রা গেল। তুমি ত ঘরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে।

শতদল ॥ জানালা দিয়ে তো শোভাযাত্রাই দেখছিলাম। ইস কত বড় শোভাযাত্রা আর সে কী চীৎকার। মহাত্মা গান্ধী কি জয়, বন্দে মাতরম।

ফণিভূষণ ॥ ও তবে দেখেছ তো। যাক, তোমাদের গ্রামে এমনি সব শোভাযাত্রা আজকাল বের হচ্ছে না ?

শতদল ॥ কোন কোনদিন হয় কিন্তু লোক তাতে বড় জোর দশ বিশ জন। মিটিংও হয়।

ফণিভূষণ ॥ যাও ?

শতদল ॥ না। আমাদের বাড়ী থেকে যেতে দেয়না। কিন্তু কলকাতার এই শোভাযাত্রায় দেখলাম কত মেয়ে। আমাদের বয়সী বা কত। এইসব শোভাযাত্রায় আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু বাবা বলেন ' এখন নয়। আর একটু বড় হও। যখন সব বুঝবে তখন।"

ফণিভূষণ ॥ তুমি তো বুড়ী হয়েই আছ। তবু না ?

শতদল ॥ হ্যাঁ, অথচ বাবা ইন্দুভূষণ মজুমদারই ওখানকার বড় নেতা। উনি শোভাযাত্রা চালান।

ফণিভূষণ ॥ মা যান ?

শতদল ॥ না। মেয়েরা এখনও ওখানে ঘরের বের হয় না। দেশে কি যে সব হচ্ছে আমরা বুঝতেও পারি না। ইংরেজদের সঙ্গে নাকি আমাদের যুদ্ধ হবে ?

ফণিভূষণ ॥ অনেকটা তাই কিন্তু এই যুদ্ধে নতুনত্ব আছে। বুঝলে বুড়ী ?

শতদল ॥ বুড়ী নয় শতদল। নতুনত্বটা কী বলুন না।

ফণিভূষণ ॥ ইংল্যান্ড নামে ছোট্ট একটা দেশ। তার অধিবাসী ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে এতবড় বিশাল দেশ ভারতবর্ষকে জয় করে আমাদের মালিক হয়ে বসেছে। আমাদের স্বাধীনতা নেই। ওই ইংরেজ আমাদের রাজা হয়ে শাসনের নামে আমাদের শোষণ আর পীড়ন করছে।

শতদল ॥ বাবার কথাবার্তায় এসব শুনি। আর এও শুনি মহাত্মা গান্ধী বলে কে একজন আছেন উনি ইংরেজদের তাড়িয়ে এদেশ নাকি স্বাধীন করবেন। মা কি বলেন জানেন ?

ফণিভূষণ ॥ কি ?

শতদল ॥ আমাদের ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নেই একটি বন্দুক কি

কামান। যত সব নিধিরাম সর্দার। তারা তাড়াবেন ঐ সব সাহেবদের যারা বন্দুক কামান ছাড়া কোন কথাই বলে না।

ফণিভূষণ ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ, গান্ধীজী এই অদ্ভুত যুদ্ধেরই ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের তেত্রিশ কোটি লোক যদি অহিংস বিদ্রোহও করে তবে ক্ষুদে একটা দ্বীপের ঐ কিছু লোক উড়ে যাবে। দেশ হবে স্বাধীন। তিনি বলেছেন এ বছরই মানে এই ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক কোটি সভ্য আর এক কোটি চাঁদা টাকা আমাকে দাও, আমি বলছি এই বৎসরই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা স্বরাজ মানে স্বাধীনতা পাবই পাব। দেশে এখন সেই চেষ্টাই চলছে।

শতদল ॥ এটাও আমি শুনেছি কিন্তু মা তা বিশ্বাস করেন না। আপনি বিশ্বাস করেন ?

ফণিভূষণ ॥ শুধু আমিই বিশ্বাস করিনা। আমাদের চেয়ে ঢের ঢের বিজ্ঞলোক পণ্ডিত লোক এটা বিশ্বাসই করেন না আজ গোটা দেশে তারা গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের তেরঙ্গা পতাকা হাতে নিয়ে এই অহিংস লড়াই এ নেমে পড়েছেন। এই বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতা কে জানো ? সি আর দাশ মানে চিত্তরঞ্জন দাশ যিনি আইন ব্যবসায়ে মাসে প্রায় লাখ টাকা রোজগার করতেন সে রোজগার ছেড়ে দিয়ে। তাঁর সহযোগী নেতা হচ্ছেন সুভাষ বোস যিনি আই সি এস পাশ করেও জজ ম্যাজিষ্ট্রেট না হয়ে এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন। দেশের সব বড় বড় মাথা আজ গান্ধীজীর দলে। জয় আমাদের হবেই।

শতদল ॥ ও তবে বাবাই একা নয় আপনিও এই দলে। আপনার বন্ধু মানে আমার যে দাদার সঙ্গে এখানে এসেছি আপনার সেই প্রাণের বন্ধু ধীরেনবাবুও ত সব সময় গান্ধী গান্ধী জপ করেন।

ফণি ॥ প্রাণের বন্ধু মানে ?

শতদল—(অপ্রস্তুত হইয়া) প্রাণের বন্ধু মানে খুব ভাব ত আপনাদের দুজনের মধ্যে।

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ তা ত আছেই। দুজনে একই সঙ্গে একই স্কুলে কাজ করি।

শতদল ॥ বলছেন বটে কিন্তু আমি যা শুনেছি—

ফণিভূষণ ॥ কি শুনেছ ?

শতদল ॥ বললে রাগ করবেন না ?

ফণিভূষণ ॥ না না—বলই না।

শতদল ॥ আপনাদের দুজনকে যাঁরা জানেন তাঁরা আপনাদের যা বলেন।

ফণিভূষণ ॥ কি বলেন ?

শতদল ॥ (খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) মানিকজোড়।

ফণিভূষণ ॥ ভারী দুষ্টু মেয়ে। হ্যাঁ, সবাই গান্ধীর নাম জপ করেন। ধীরেনদাও করেন। শুধু তোমরাই বাদ রয়েছ।

শতদল ॥ আপনাকে চুপি চুপি বলছি মাও মনে মনে এই গান্ধীর দলে, আমিও।

ফণিভূষণ ॥ চুপি চুপি বললে তো হবে না। এখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামতে হবে।

শতদল ॥ (চুপিচুপি) আমাদেরও তাই হচ্ছে। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) কিন্তু আপনি নামছেন না কেন?

ফণিভূষণ ॥ আমিও নামব তবে একা নয়। আমার স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে।

শতদল ॥ ও হ্যাঁ। আপনি ত অতবড় একটা স্কুলের মাষ্টার মশাই।

ফণিভূষণ ॥ তুমি পড়াশুনা করছ না।

শতদল ॥ করেছি যতটা বাড়ীতে করা সম্ভব। জানেন বঙ্কিমবাবু রবীন্দ্রনাথ এঁদের বইও আমি নাড়াচাড়া করি। আজ আপনার এখানে দাদার সঙ্গে এসে ঘণ্টা দুই রয়েছি এর মধ্যে বালিশের তলে একটি বই পেয়ে ছোট্ট বইটি এরই মধ্যে আমি পড়ে ফেলেছি।

ফণিভূষণ ॥ সে কি? তুমি পড়ে ফেলেছ?

শতদল ॥ সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন?

ফণিভূষণ ॥ কি?

শতদল ॥ ছাপার অক্ষরে আপনার নাম পড়লাম।

ছোটদের নীলদর্পন ॥ ফণিভূষণ ঘোষ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা কি জানেন?

ফণিভূষণ ॥ কি?

শতদল ॥ কাউকে বলবেন না।

ফণিভূষণ ॥ আচ্ছা বলব না।

শতদল ॥ কথা দিচ্ছেন?

ফণিভূষণ ॥ আচ্ছা দিচ্ছি।

শতদল ॥ বইটির লেখক জলজ্যান্ত আপনাকে দেখলাম, স্বচক্ষে দেখলাম। আর শুধু তাই নয়।

ফণিভূষণ ॥ বটে আর কি?

শতদল ॥ আর অতবড় লোক আপনি আমি আপনার ঘরে বসে আছি, বিছানায় একটু ঘুমিয়েও নিয়েছি।

বলুন এ গর্ব কজন করতে পারে?

ফণিভূষণ ॥ না, না তুমি গাঁয়ের মেয়ে তাই এত অবাক হচ্ছ। বই তো কত শত লোক লেখে।

শতদল ॥ লিখুক। তার একজনকে তো আমি পেয়েছি। দেখুন ভাবছি আর আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে কিন্তু দেখুন আপনার পায়ে পড়ছি ধীরেদা বা আর কাউকে একথা বলতে পারবেন না। বুঝলেন আর শুনুন এ বইত কিনতে পাওয়া যায়। না?

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ তা যায় কিন্তু তুমি কিনবে কেন? ওই বইটাই তুমি নাও।

শতদল ॥ আমাকে দিলেন?

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ···দিচ্ছি।

[ঘরে যাওয়ার জন্য উঠলেন]

শতদল ॥ না না এই আমার এখানে (ব্লাউজের মধ্যে)

ফণিভূষণ ॥ সে কি?

শতদল ॥ হ্যাঁ। আপনি দেখলে রাগ করতে পারেন তাই ভয়ে লুকিয়ে রেখেছি। ধীরেদাকে কিন্তু এইসব কথা বলতে পারবেন না। বলুন বলবেন না।

ফণিভূষণ ॥ আচ্ছা বলব না।

শতদল ॥ আপনার এই বইটার কথা ধীরেদার মুখেও শুনেছি। এই বইটা লেখার জন্য পুলিশ নাকি আপনাকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? কেন নিয়ে গিয়েছিল আজ যেটুকু পড়েছি তাতেই বুঝেছি। নীলকর সাহেবরা নীলকর চাষীদের উপর খুব জোর জুলুম করত, মারধর করে টাকা আদায় করত। বইটাতে এই সব আছে। সাহেবদের এত নিন্দা আপনারা করবেন আর পুলিশ ছাড়বে কেন? তাই ভাবছিলাম ছাড়া পেলেন কি করে?

ফণিভূষণ ॥ ছাড়া পেলাম—'নীলদর্পণ' বইটাত আর আমার লেখা নয়, লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র। আমি সেই বই সাজিয়ে গুছিয়ে ছেলেদের থিয়েটারের উপযোগী করে দিয়েছি এই যা। আমাকে খুব শাসিয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছে।

শতদল ॥ আগুন নিয়ে খেলেন আপনি।

ফণিভূষণ ॥ এতেই তুমি চমকে উঠছ? আমি নিজে এবার যে বইটা লিখেছি সেটা বেরুলে যে কি হবে ভেবে পাচ্ছি না।

শতদল ॥ কি সেটা?

ফণিভূষণ ॥ আগুন নিয়ে কথাটা বললে না? সেটা সত্যি আগুন। লেনিনের জীবনী। নাম দিয়েছি 'লেনিন'।।

শতদল ॥ ছাপা হয়েছে?

ফণিভূষণ ॥ না হবে।

শতদল ॥ লেনিন? সে আবার কে?

ফণিভূষণ ॥ রাশিয়া নামে খুব বিরাট একটা দেশ আছে। সে দেশের রাজাকে বলে জার। ওরাও ইংরেজদের মত সাহেব। কিন্তু ওখানে ভারী মজা। ঐ সাহেব রাজা ওই সাহেব প্রজাদের উপরই সাংঘাতিক অত্যাচার করে। আর সাহেব রাজার মোসোহেবরা-মোসাহেব মানে এই যেমন জমিদার মহাজন তারাও দীন দরিদ্রের রক্ত শুষে খায়। সাত বছর আগে ১৯১৪ সালে এই পৃথিবীতে ঐ সব দেশ মানে যাকে বলে ইউরোপ সেখানে নিদারুণ একটা যুদ্ধ বেধে যায় যাকে বলা হয় প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ। তাতে রাশিয়া হেরে যায় এই ইংরেজদের কাছে। সুযোগ বুঝে রাশিয়ার গরীব লোকদের নিয়ে বিরাট একটা দল তৈরী করে রাশিয়া শাসনের সব ক্ষমতা হাত করেন সর্বপ্রধান হিসাবে লেনিন আর তাঁরই চেষ্টাতে ঐ দেশে রাজা টাজা সব উঠে গিয়ে যে শাসন চালু হয় তারই নাম হয় সমাজতন্ত্র মানে দেশের শাসন, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুর মালিকানা দেশের লোকেরই হাতে থাকবে—সবকিছু চলবে দেশেরই সব লোকের ভোট নিয়ে। ভোট বোঝ তো?

শতদল ॥ হ্যাঁ, খুব বুঝি। ভোটের কথা আমাদের দেশেও শুনি আমি ওকে কি বলি জানেন?

ফণিভূষণ ॥ কি?

শতদল ॥ ভেট। আমরা সব ভেট দেই না?

ফণিভূষণ ॥ (হাসিয়া) তা অনেকটা ঠিক বলেছ তুমি। তা ঐ ভোটই বল আর ভেটই বল সেটাই হচ্ছে দেশের মত। আর দেশের সব লোকের মতেই চলে ঐ রাশিয়ার যা কিছু সব। তার মানে বড়লোক ছোটলোক বলে ছোট বড় কোন ক্লাস নেই। সব একই ক্লাস।

শতদল ॥ বুঝেছি। মুড়ি মিছরির সব একদর ওখানে এমন দেশও তবে আছে?

ফণিভূষণ ॥ আছে ঐ রাশিয়া আর তারই নেতা হচ্ছেন ঐ লেনিন্। আর এই নেতাও হয়েছেন তিনি গোটা দেশের লোকেরই ভোটে।

শতদল ॥ ও বাবা! আর সেই লেনিনের জীবনী নিয়ে বই লিখেছেন আপনি?

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ লিখেছি।

শতদল ॥ কিন্তু এ বই লেখাতে এদেশের ইংরেজরা রাগবে কেন? লিখেছেন আপনি রাশিয়ার কথা এদেশের কথা ত নয়।

ফণিভূষণ ॥ রাগবে না? গান্ধীজী দেশকে স্বাধীন করতে চাচ্ছেন। সেইটাই ইংরেজরা সইতে পারছেনা। রাশিয়ার মত এদেশে সমাজতন্ত্র আসার

কথা বললে শুধু ইংরেজরা কেন এদেশের জমিদার আর মহাজনদের মত বড়-লোকেরাও সবাই যাবে আরও ক্ষেপে। যাক্ সে পরের কথা পরে হবে। আগে আমাদের দেশ স্বাধীন হোক ত।

শতদল ॥ (চিন্তিত) হ্যাঁ তা বলছেন বটে কিন্তু মা যে বলেন রাম না হতেই রামায়ণ আপনি দেখছি তাই।

পুলিশ আপনাকে কক্ষণো ছাড়বে না। আপনার কপালে নির্ঘাত জেল।

ফণিভূষণ ॥ আমার কপালে যাই থাক তোমার কপালে একটা টিপ দেখছি না কেন?

শতদল ॥ টিপ আমি পরি না। আচ্ছা আপনার এই লেনিন বইটা আপনার হাতে লেখা? ছাপা হয়নি?

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ, ছাপা হয়নি।

শতদল ॥ ছাপার আগে আপনার হাতে লেখা বইটা দেখতে আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু।

ঘরে আপনার বই টই সবই নেড়ে চেড়ে দেখেছি। দেখলাম নাতো কোনখানে।

ফণিভূষণ ॥ দেখনি তো? দেখবার কোন উপায়ও তো রাখিনি। পুলিশ আমার এই ঘর যখন তখন সার্চ করতে আসতে পারে।

শতদল ॥ কোথায় রেখেছেন? জামার আড়ালে রেখেছেন? একটি বার দেখান না।

ফণিভূষণ ॥ রেখেছি কোথায় শুনলে তুমি হাসবে। মাথার বালিশের বুকে পুরে রেখেছি।

শতদল ॥ ও বাবা তা হলে তো আর দেখা হবে না ধীরেদা আসছেন না কেন?

ফণিভূষণ ॥ ধীরেদা তোমাকে এখানে রেখে গেছেন আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টারের বাড়ীতে দেখা করতে বিশেষ কাজে। তা আসবার সময় হয়েছে বৈকি। বরং একটু দেরীই হচ্ছে দেখছি। তোমার বুঝি ভারী বিশ্রী লাগছে বুড়ী?

শতদল ॥ আবার বুড়ী? আপনাকে যদি আমি বুড়ো বলে ডাকি ভাল লাগবে আপনার? আর আসছেন না তাতে ক্ষতিটা কী হয়েছে। দুপুরে এক প্লেট মাংস, এক থালা বোম্বাই রসগোল্লা রাজভোগ খেয়ে আপনার লেখা নীল দর্পণ, আপনার এই মুখ দেখে তারপর কত সব দেশ বিদেশের এত সব কথা শুনছি। তাতে ক্ষতি যদি কারও হয়ে থাকে তবে আপনারই হয়েছে আমার নয়।

ফণিভূষণ ॥ ওরে বাবা কথায় তোমার সাথে আমি হেরে যাচ্ছি মনে হচ্ছে।

শতদল ॥ কে যেন আসছে। দাদা নয় তো।

ফণিভূষণ ॥ দাদাই ত।

[ধীরেন বসুর প্রবেশ]

ফিরতে এত দেরী হল যে? এত দেরী কেন?

ধীরেন ॥ আরে সে আর বলো না। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপার। তাও একার নয় পাঁচ সাত জন মিলে। সেও আবার এ আসে ত সে আসে না। যদিও বা ধীরে সুস্থে বাবুরা এলেন তাও কারো সঙ্গে, কারও মতের মিল হয় না।

ফণিভূষণ ॥ তার মানে কিছুই হ'ল না।

ধীরেন ॥ তা তুমি ঠিকই বলেছ, কিছুই হ'ল না। আমরা চেয়েছিলাম গান্ধীজীর কল্যাণে দেশে স্বদেশী ভাব এসেছে! স্বদেশী জিনিষের চল বাড়াতে এ সময় একটা ছোটখাটো ব্যবসা ট্যাবসা গড়ে তুললে দেশেরও কাজ হবে আমাদেরও অল্প স্বল্প টাকায় কিছু একটা সুরাহা হবে। নরেন দাস ত বই এর ব্যবসা করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

ফণিভূষণ ॥ ব্যবসা বাণিজ্য বাঙ্গালীর হবে না। কবিতা লিখতে বলুন, গান লিখতে বলুন, ছবি আঁকতে বলুন সে সব খুব হবে!

শতদল ॥ হবেই ত। এ কাজ গুলোই বা কম কী। এ সব কাজ ওঁরা পারবেন যাঁরা ব্যবসা, বাণিজ্য করেন।

ধীরেন ॥ খুব পাকা পাকা কথা বলছিস যে (ফণিভূষণকে) খুব জ্বালিয়েছে বুঝি তোমাকে। এমনি সব পাকা পাকা কথা বলে বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে বুড়ী। বলেনি বুঝি সে নামটা।

ফণিভূষণ ॥ (হাসিয়া) নামটা কাজেই প্রকাশ পেয়ে থাকে ও আর বলতে হয় না। তা বুড়ী ঘরে ষ্টোভ আছে; চায়ের সাজ-সরঞ্জাম আছে। তোমার দাদাকে একটু চা করে দাও আর যদি নিজে খাও ত খাও। টিনে বিস্কুটও আছে।

শতদল ॥ দাদা বলছিলেন এটা নাকি মেস। আমিত· দেখছি এটা ওঁর ঘরবাড়ী—জমিদারী।

ফণিভূষণ ॥ মেসের ম্যানেজার বলেই আলাদা গোটা একটা ঘরে থাকার সুবিধা সবচেয়ে বড় সুবিধা রান্নাবান্না করতে হয় না একটা মেস চালাবার অতশত ঝামেলা তাই হাসিমুখে সহ্য করে যাচ্ছি এতদিন।

শতদল ॥ দাদা আপনি আমাকে এই বারান্দায় দিয়ে চলে গেলেন। ঘরের ভিতরটা দেখেননি ত। কি সাজানো গোছানো। বিয়ে করে বউ আনলে এই ঘরেই তুলবেন এমনি সব আয়োজন।

ধীরেন ॥ তার জন্য ত তোমার মাথা ব্যথার কোন দরকার নেই। তোমাকে চা করতে বলা হয়েছে তাই কর।

শতদল ॥ (হাসিয়া) আমি যাচ্ছি।

[শতদল ঘরের মধ্যে গমন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নরেন দাসের প্রবেশ]

ফণিভূষণ ॥ কি ব্যাপার নরেন? তুমি এত হন্তদন্ত এমন অসময়—

নরেন ॥ আসতেই হল। নমস্কার ধীরেন দা। অনেকদিন পর দেখা হল। আগে ত আমার ওখানে মাঝে মাঝে যেতেন এখন ত আর যানই না।

ধীরেন ॥ সময় পাইনা ভাই। নইলে তোমার ওখানে চা আর সিঙ্গাড়া খেতে খেতে দেশোদ্ধার করার পলিটিক্সের আড্ডাটির লোভ এখনও মন টানে।

নরেন ॥ ঐ পলিটিক্সের ছোঁয়াতেই আজ আমার এই বিপদ যে জন্য ছুটে এসেছি। বুঝলে ফণীদা তোমার 'লেনিন' বই আমার প্রেসে ছাপতে পারবনা আর এ কথাও না বলে পারছিনা পরশু দিন তোমার লেনিনের পাণ্ডুলিপি শেষ বারের মত দেখে শুনে দিতে ফেরৎ নিয়ে এসেছিলে বলে বরাত জোরে ওটা খুব রক্ষা পেয়ে গেছে পুলিশ আজ আমার দোকান আর প্রেস সার্চ্চ করতে এসেছিল দুপুরে! যতদূর মনে হল তোমারই ঐ লেনিনের খোঁজে। ওই পাণ্ডুলিপি তুমি কোন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দাও। আমার মনে হচ্ছে তোমার এখানেও সার্চ্চ হবে হয়ত এখনই হবে। আমি পালাই।

ফণিভূষণ ॥ বলো কি?

নরেন ॥ আর বলব কি? গান্ধীজী যত জিতছেন শাসক গোষ্ঠী তত মরিয়া হয়ে উঠছে। রাজনীতির গন্ধ পেলেই সার্চ্চ এবং অ্যারেষ্ট। আর তোমার বই ত হল গিয়ে বাবা লেনিন্। গান্ধীজীরও এক কাঠি ওপরে।

ধীরেন ॥ তা ঠিকই বলেছ। গান্ধীজীর আন্দোলন শুধু বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আর লেনিনের আন্দোলন হচ্ছে শুধু স্বৈরতন্ত্রী শাসকের বিরুদ্ধে নয় তার শাখা উপশাখা জমিদার মহাজনেরও বিরুদ্ধে। লেনিনের শত্রু আরও অনেক বেশী। তা চললে এক পেয়ালা চা খেয়ে গেলে না।

নরেন ॥ চা আর আমায় খেতে হবে না, মাথার উপরেই টগবগ করে ফুটছে চায়ের কেটলির গরম জল।

ধীরেন ॥ তোমার বই এখন ছাপা হল না পরে হবে। আসল কথা এখন বইটাকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করা—পুলিশের হাতে যাতে না পড়ে তাই দেখা।

ফণিভূষণ ॥ ঠিকই বলেছেন দাদা।

ধীরেন ॥ আরও বিপদ কি জান। তুমি ঐ বইটা লিখতে গিয়ে আমার সঙ্গে অনেক কিছু পরামর্শও করেছ। ওর নাড়ী নক্ষত্র আমি জানি। পড়তাম আর মাঝে মাঝে আমারই রক্ত গরম হয়ে উঠত। তুমি বইটার মুখবন্ধে এক-জায়গায় লিখেছ না 'বলশেভিক আন্দোলনে বুঝিবার ও জানিবার অনেক জিনিষ আছে।'

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ, লিখেছি। হ্যাঁ একথাও লিখেছি 'বলশেভিজম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অনেক সংগৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বলশেভিক ভীতিবশতঃ সে সকল তথ্য সম্বলিত পুস্তকাদি এদেশে যাহাতে প্রচারিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক'।

ধীরেন ॥ তবেই বুঝতে পারছ। এখন দেখ তোমার স্কুলের চাকরী থাকে কিনা।

ফণিভূষণ ॥ থাকুক আর না থাকুক ও বই ছাপবই ছাপব। তাতে যদি আমার সব কিছু যায় যাক।

শতদল ॥ পুলিশ যদি এখানে আসে—সে বই আপনি রেখেছেন কোথায়! বাক্স প্যাঁটরা তো ভেঙ্গে দেখবে।

ফণিভূষণ ॥ মিথ্যে বল নি। আগেই তো বলেছি, রেখেছি বালিশের মধ্যে লুকিয়ে। তবে কি ওখান থেকে সরাব?

ধীরেন ॥ আর সরিয়েছ। ঐ দেখ।

[পুলিশ আসিতেছে। শতদল ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। একজন পুলিশ অফিসার মিঃ হালদার এবং একজন কনস্টেবল আসিয়া দাঁড়াইল]

মিঃ হালদার ॥ এই যে ফণীবাবু। আজ স্কুলে না গিয়ে একেবারে সোজা আপনার বাড়ীতে এসে পড়েছি। আমাকেও স্কুলে বার দুই দেখেছেন। কি বলব মশাই পুলিশের চাকরী মানেই গুরুভার। আমার উপর ভার পড়েছে গুরুমশাই স্কুলে কিসব গুরুতর কাজ টাজ করছেন এইসব দেখা।

তা পড়াচ্ছেন পড়ান। লেখাপড়া শেখার খুবই একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু দাঁড়ান মশাই। আপনি ধীরেন বোস না? আপনিও তো ঐ একই স্কুলে কাজ করেন। কেমন ধরেছি ঠিক কিনা।

ধীরেন ॥ সেটা ঠিকই ধরেছেন কিন্তু এখন না ধরলেই বাঁচি। ব্যাপার কি স্যার?

হালদার ॥ ব্যাপার ইনি (ফণিভূষণকে দেখাইয়া)। গুরুগিরি করেন মানে গরুদের মানুষ করেন ভাল কথা। বই লিখতে চান, লিখুন। বঙ্কিম-বাবু লিখেছেন, রবি ঠাকুর না কে একজন আছেন তিনিও বই লিখছেন। পড়িছি তো কিছু কিছু। সবই দেশের কথা কিন্তু দেশ ছেড়ে আমাদের এই ফণীবাবু একেবারে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে লিখে ফেলেছেন লেনিন। লে হালুয়া। গোল বেধেছে সেইখানে। তাই বইয়ের কপিটা দরকার। সরকার পড়ে দেখতে চায়। কারণও আছে খবরের কাগজ পড়ে এটা আজ আর কে না জানে যে লেনিন মানেই অরাজকতা মানে রাজা থাকবে না কেউ। তার মানেই গোটা দেশ জুড়ে মারামারি আর কাটাকাটি।

ফণিভূষণ ॥ না, না তা কেন ?

হালদার ॥ তা বেশ তো। তা যদি না হয় তো কপিটা আমার হাতে দিয়ে দিন। আমি রসিদ দিয়ে যাচ্ছি।

ফণিভূষণ ॥ কপি আমার হাতে থাকলে তো দেব ?

হালদার ॥ গেল কোথায় ? পাখা গজিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ?

ফণিভূষণ ॥ না না তা কেন। এটুকু বলতে পারি আপাততঃ আমার হাতে নেই।

হালদার ॥ বেশ হাতে যখন নেই ঘরে দেখছি। (কনস্টেবলকে) এস হে ঘরটা দেখি।

[দুজনে ঘরে ঢুকিল]

হালদার ॥ ওমা স্টোভ ধরিয়েছেন চা করছেন কে ইনি ?

ধীরেন ॥ আমার বোন। ফণীবাবু তো আমার সহকর্মী। বোনকে নিয়ে চা খাবার নেমন্তন্ন ছিল এইখানে। চাই হচ্ছে, আপনিও এক কাপ খেয়ে যান আমাদের সঙ্গে।

হালদার ॥ হ্যাঁ, তা খাব এখন, কলা খেতে তো আসিনি, জিনিষ পত্র তো বিশেষ কিছু দেখছি না। একটা মোটে তো ট্রাঙ্ক আর তো দেখছি সব স্কুল পাঠ্য পুস্তক। একটা বিছানা, আরে মশাই দিন না বের করে।

ফণিভূষণ ॥ থাকলে তো দেব। আপনি দেখছেন ভালো করে দেখুন।

হালদার ॥ বাক্সটা আপনি এসে খুলুন, ও ত দেখছি খোলাই আছে। খান কতক কাপড়-চোপড়। বিছানার তলাটা দেখত (পুলিশ কিছুই পাইল না)। রামকৃষ্ণদেবের বাঁধান ছবি দেখছি, পুজোটুজো করেন বোধ হয়।

ফণিভূষণ ॥ এখানেই আমার একটা দুর্বলতা আছে।

হালদার ॥ আপনারা সব ঘর থেকে একটু বের হবেন। ঐ মূর্তি দেখলে আমি একা একটু প্রণামটনাম করে কিছু প্রার্থনা করে থাকি ; চিরকালের দুর্বলতা। অন্যের সামনে একটু লজ্জা হয়।

ধীরেন ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। বুড়ী, বেরিয়ে আয়।

[কনস্টেবল সহ সবাই বাহিরে গেলেন। দরজা বন্ধ হইল। বাহিরের বারান্দায় কথোপকথন চলিল]

মানুষও যে দেবতা হয়ে যায় দেখছিস্ ত। রামকৃষ্ণদেবকে আমার ঠাকুর্দাই স্বচক্ষে দেখেছেন আজ তাঁর মূর্তির ঘরে ঘরে পুজো হচ্ছে।

শতদল ॥ বারে, আমাদের বাড়ীতে আমি যে ঘরে শুই সেই ঘরেও ত এই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি। আমি ধূপধুনো দিই।

ধীরেন ॥ আমরাও এমন দু-একজনকে দেখেছি বা দেখছি! ঘরে ঘরে তাঁদের ছবিও প্রণাম পায় যেমন গান্ধীজী

ফণিভূষণ ॥ ওদেশে লেনিনও এ আসন পেয়েছেন।

[হালদার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। খুব হাসিখুশী ভাব]

হালদার ॥ নানা আসন টাসন আমার লাগে না। আমি দাঁড়িয়েই পুজো সারি। আচ্ছা তবে চলি।

ধীরেন ॥ একটু চা-জল ত গরম হয়েই রয়েছে।

হালদার ॥ না না মশাই। চা টা আজ নয়। একটা কথা বিশ্বাস করবেন?

ধীরেন ॥ কি?

হালদার ॥ আজ এই ঘরটিতে ঢুকে এমন একটি আনন্দ পেয়ে গেলাম যা খুব কমই পাই। আচ্ছা নমস্কার।

ফণিভূষণ ॥ ঠিক বোঝা গেল না কি আনন্দ উনি পেয়ে গেলেন।

[ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসিলেন]

ফণিভূষণ ॥ সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে! বেটা ভণ্ড পুজো না ছাই। করেছে কি জান? ঐ বালিশটা আমার ছিঁড়ে ফেলেছে। আমার পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে গেছে (প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে) ছুটব? ওকে গিয়ে ধরব?

ধীরেন ॥ ধরেই বা লাভ কি। ঐ পাণ্ডুলিপি সিজ করতেই সরকারী আদেশে এসেছে। ভেবেছ ওটা কি ফেরৎ দেবে?

ফণিভূষণ ॥ আমি ওর পায়ে পড়ব, পায়ে ধরব।

শতদল ॥ আপনি কী ছেলেমানুষ বলুন ত। পুলিশের পায়ে পড়বেন। এই নিন আপনার পাণ্ডুলিপি। আমি আপনাদের কথাবার্তায় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আগেভাগেই চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি (শেমিজের তলা হইতে)।

ফণিভূষণ ॥ বুড়ী (আনন্দাশ্রু চোখে লইয়া) তুমি, তুমি।

শতদল ॥ বলেছি আমাকে বুড়ী বলবেন না আর যা বলতে হয় বলুন। দেখুন ত দাদা আমি কি বুড়ী ?

ফণিভূষণ ॥ না তুমি শতদল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শতদলেই তুমি ফুটে ওঠ।

ধীরেন ॥ তা বেশ কিন্তু একটা কথা এ পাণ্ডুলিপি তুমি আর কলকাতায় রেখ না। রাখলে পুলিশ ওটা ধরবেই। বুড়ী ওটা বুকে রেখেছিল বুকের ধন করেই ওটা দেশের বাড়ী নিয়ে যাক্। পুলিশ হন্যে হয়ে এখানে খুঁজুক। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাক।

ফণিভূষণ ॥ খুব ঠিক বলেছেন দাদা আপনি। তাই হোক। তাই হবে। বুড়ী, না না শতদল আমার বুকের ধন তোমার বুকের ধন হয়েই থাক। যদি দিন আসে তবে দেখা যাবে কি হয়।

[বুড়ী ধীরে ধীরে প্রণাম করিলেন]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[পূর্বোক্ত দৃশ্য অর্থাৎ একটি মেসবাড়ীর ম্যানেজারের নিজস্ব স্বতন্ত্র কক্ষ ও তার বারান্দা ! তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯২১ সময় অপরাহ্ন। বারান্দায় একটি ছোটখাট বেঞ্চ ও একটি হাতল ভাঙ্গা চেয়ার। দৃশ্য উন্মোচিত হইলে দেখা গেল কক্ষস্বামী ফণিভূষণ ঘোষ অভ্যর্থনা জানাইতেছেন রানী ভবানী স্কুলের হেডমাষ্টার বেণীমাধব দাস মহাশয়কে]

ফণিভূষণ ॥ আমি ভাবতে পারিনি স্যার আপনি দয়া করে আমার ঘরে কখনও পায়ের ধুলো দেবেন।

বেণীমাধব ॥ না না এ কি কথা বলছ। আগেতো এইসব কর্তব্যই মনে হোত। শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলে এখন এইসব ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠিনা।

ফণিভূষণ ॥ তা যাই হোক আমার স্কুলের হেডমাষ্টার আপনি। স্কুলের আদব কায়দায় আপনার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারিনি। আজ

যখন সুযোগ পেয়েছি আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে আমাকে বাধা দেবেন না।

[বাধা দিলেনও না হেডমাষ্টার বেণীমাধব দাস। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফণিভূষণ চেয়ারটিতে বসাইলেন]

ফণিভূষণ ॥ এই ভাঙ্গা চেয়ারে আপনার মত লোককে বসাতে হল।

বেণীমাধব ॥ বুঝলে ফণী, আমরা কোনদিনই সাজ সরঞ্জামকে বড় করে দেখিনি। আমরা দেখেছি মানুষটাকে দেখেছি তার মনটাকে। সুভাষ মানে তোমাদের সুভাষ বোস যখন কটকে স্কুলে পড়ত তখন আমারই ছাত্র ছিল সে। সুভাষ বিলেত থেকে আই সি এস পাশ করে ভারতে ফিরে এল। ফিরে এসে আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসে। ওকে দেখে আমি অবাক। পায়ে চটি, গায়ে একটি খদ্দরের জামা। আই সি এস পাশ করে এসেছে কিন্তু।

ফণিভূষণ ॥ সে কথা জানি। চাকরি তো নিলেন না। আর তাই না আজ তাঁর মত এত বড় নেতাটি আমরা পেয়েছি এবং আজ আপনার মুখে শুনে আরও আনন্দ হচ্ছে তিনি আপনারই ছাত্র ছিলেন। আর তাঁর ছাত্র জীবনের শিক্ষকটি হচ্ছেন আমাদেরই স্কুলের হেডমাষ্টার। এটা কি আমাদের কম গর্ব।

বেণীমাধব ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) শোন, এই স্কুল সম্বন্ধে আজ তোমাকে গুরুতর কিছু বলার জন্যে আজ আমি এসেছি। তুমি আমাকে বলেছিলে বহু চেষ্টায় নানা তথ্য সংগ্রহ করে রাশিয়ার সমাজ ধন্য নেতা লেনিনের একটি জীবনী গ্রন্থ লিখছ। শুনে আমি খুশীই হয়েছিলাম।

ফণিভূষণ ॥ আপনি আমাকে বলেছিলেন কোন জীবনীগ্রন্থ যদি সমসাময়িককালে লেখা হয় তবে তাতে কল্পনার কোন অবকাশ থাকে না আর তাই নির্ভুলও হয়। তাতেই আমি লেনিনের ঐ জীবনী লিখতে আরও বেশী উৎসাহ পেয়েছিলাম স্যার।

বেণীমাধব ॥ কিন্তু তোমার এই লেনিনের জীবনী লেখার ঘটনাটা তোমার এক ভীষণ বিপদ সৃষ্টি করেছে। গান্ধীজির এই অহিংস আন্দোলনেই বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী হিমসিম খাচ্ছে। তার উপর যদি আবার লেনিনের সশস্ত্র বিপ্লবের কাহিনী এদেশে এখন ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সরকার এখন সেই আতংকে আতংকিত। ফলে পুলিশ মহল অত্যন্ত সজাগ আর সতর্ক হয়ে ঐ বই যাতে লোকের হাতে না পড়ে সে বিষয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছে। পুলিশের এক বড় সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি বলি ফণিভূষণের লেখা এ বই আমি দেখিনি। প্রকাশিত হয়েছে বলেও আমার মনে হয় না কারণ তবে এক কপি বই নিশ্চয়ই উপহার দিত। পুলিশ সাহেবটি চলে গেলেন বটে কিন্তু আমার কথাটা

ঠিক বিশ্বাস করে গেলেন বলে মনে হোল না কাজেই তোমার ম্যানাস্ক্রিপটা রক্ষা করতে যদি কিছু করবার থাকে তো কর। হ্যাঁ আর একটা কথা। তুমি স্কুলের মাষ্টার হয়ে এসব রাজনীতি করছ এ নিয়ে বেশ একটু তীব্র কটাক্ষ করে গেছে পুলিশ সাহেবটি। আমি অবশ্য বলেছি পাঠ্যবিষয় না পড়িয়ে রাজনীতি পড়াবার স্কুল আমার নয়। সে বিষয়ে আমার তীক্ষ্ম দৃষ্টি আছে এবং একথাও তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে তাতেও স্কুল আজ গান্ধী আন্দোলনে উঠে যাবার উপক্রম। আচ্ছা তাহলে আমি আজ চলি। সাবধানেই থেকো। সুভাষের সাথে আর তোমার দেখা হয়েছে?

ফণিভূষণ ॥ হ্যাঁ স্যার, উনি মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণও করেন। 'লেনিন' লিখছি তাও শুনেছেন। বলেছেন লেখ, যখন সময় হবে দেখব।

বেণীমাধব ॥ তার মানে বুঝলে তো সময় এখনও হয় নি।

ফণিভূষণ ঃ কিন্তু চৌরিচোরায় স্বরাজ আন্দোলনের বিপর্যয় দেখে বিকল্প আন্দোলনের কথা কি হতে পারে সুভাষ বোস, সি আর দাশ নিশ্চয়ই নতুন কিছু ভাবছেন আর তাতেই লেনিনের কথাও উঠবেই আর তাই জনসাধারণের কাছে লেনিনের পরিচিতি প্রকাশটা আমি কর্তব্য মনে করছি।

বেণীমাধব ॥ (হাসিয়া) তুমি অনেকটা এগিয়ে গেছ। বইটা প্রকাশ করছ না কেন?

ফণিভূষণ ॥ এই তো সবে শেষ করেছি। তা ছাড়া প্রেস ঠিক করা, টাকা পয়সা জোগাড় করা—আশীর্বাদ করবেন যেন তাড়াতাড়ি তা করতে পারি।

বেণীমাধব ॥ জয়স্তু।

[যাবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় প্রথম দৃশ্যের যে কনস্টেবলটিকে দেখা গিয়েছিল সে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল]

ফণিভূষণ ॥ ও তুমি এসেছ।

কনস্টেবল ॥ হ্যাঁ স্যার।

ফণিভূষণ ॥ আচ্ছা তুমি পাঁচ মিনিট পরে এস।

কনস্টেবল ॥ আচ্ছা স্যার।

[কনস্টেবল চলিয়া গেল]

ফণিভূষণ ॥ স্যার, এই কনস্টেবলটি আমার ঐ লেনিনের পাণ্ডুলিপি হাত করতে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এই ঘরে এসে সার্চ করেছিল। বইটা অদ্ভুতভাবে সেদিন এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। কিন্তু আপনি চমকে

উঠবেন শুনে যে এই কনষ্টেবলটি শুধুমাত্র একটা ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং বলে যায় সে চাকরীতে কনস্টেবল হলেও মনে মনে গান্ধীভক্ত। সে চায় না আমার ঐ বই পুলিশের হাতে যায়। আমাকে বলে গেল আবার এইরূপ চেষ্টা হবে জানলেই আমাকে জানিয়ে যাবে।

বেণীমাধব ॥ আমি কিন্তু খুব আশ্চর্য হলাম না। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গান্ধীভক্তের সংখ্যা আর নগণ্য নয়। আচ্ছা, শুনে সুখীই হলাম। (ফণিভূষণের চোখে চোখ রেখে) সাবধান। আচ্ছা চলি ও হ্যাঁ তোমার লেনিন প্রকাশ করার ব্যবস্থা দেখছ কি ?

ফণিভূষণ ॥ সে আর বলবেন না, ভাবি এক, হয় এক। বহু কষ্টে ছাপাবার খরচ শ দুয়েক টাকা কোন মতে জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সে টাকাটাও গেছে।

বেণীমাধব ॥ সে কি ?

ফণিভূষণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। যাক আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন আমি যেন বইটা প্রকাশ করতে পারি !

বেণীমাধব ॥ আমি জানি তুমি সত্য পথের পথিক। বাধা বিঘ্ন যতই আসুক সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পারে না। প্রকাশ তা হবেই !

জয়স্তু

[ফণিভূষণ পায়ের ধুলো লইলেন, চিন্তান্বিত বেণীমাধবকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছেন এমন সময়ে ধীরেন বসু এবং শতদলের প্রবেশ]

বেণীমাধব ॥ এ কি ধীরেন তুমি ?

(উভয়েই প্রণাম করিলেন)

ধীরেন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি।

বেণীমাধব ॥ আর এটি ?

ধীরেন ॥ এই সেই শতদল যে ওদের বাড়ীর আম আমাদের বাড়ীতে আনে আর সেইদিনই আপনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনি আম খেয়ে ওকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

বেণীমাধব ॥ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। আশীর্বাদ করেছিলাম এই আমের মতন অম্লমধুর হও। তাইত ?

শতদল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছিলেন টক আর মিষ্টি মিশিয়েই সত্যিকার জীবন। আমি ভুলিনি।

বেনীমাধব ॥ বা, বা, বা,। লক্ষ্মী মেয়ে, চমৎকার মেয়ে সুখী হও মা।

শতদল ঃ এবারও আম এনে আপনাকে খাওয়াব।

বেণীমাধব ॥ বা, বা, বা,। তার আগেভাগেই আশীর্বাদ করি মনের মতন একটি অম্লমধুর বর হোক। হাঃ হাঃ হাঃ। আচ্ছা চলি। (বেণীবাবুকে লইয়া বাহিরে গেলেন ফণিভূষণ)

ধীরেন ॥ ব্যাপার কি ? স্বয়ং হেড মাষ্টার এখানে। ফণীকেও বেশ গম্ভীর মনে হোল। ব্যাপারটা কি হয়েছে ঠিক বুঝছি না।

শতদল ॥ যাই হোক কিছু খারাপ না দাদা। খারাপ হলে হেডমাষ্টার মশাই অমন হো হো করে হেসে যেতেন না।

[ফণিভূষণের প্রবেশ]

ধীরেন ॥ এই যে ফণী, ব্যাপার কি ? স্বয়ং হেডমাষ্টার।

ফণিভূষণ ॥ সব কিছুর আগে আপনার সঙ্গে আমার একটু ব্যাপার আছে। আমার বন্ধু খুলনার গিরিশ রায় আমার কাছে ২০০ টাকা ধার নিয়েছিল।

ধীরেন ॥ ও হ্যাঁ সে টাকাটা আমি নিয়েছি।

ফণিভূষণ ॥ কিন্তু আমাকে তা বলেন নি।

ধীরেন ॥ হ্যাঁ, বলব ভেবেছিলমে !

ফণিভূষণ ॥ কিন্তু বলেন নি। ফলে কি হয়েছে জানেন। ঐ টাকার জন্য তাগাদা দিয়ে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তরে তিনি লিখেছেন (পকেট হইতে চট করিয়া চিঠি বাহির করিয়া)

'দুইশত টাকা ফেরৎ দিতে আপনার স্কুলে গিয়াছিলাম। সেদিন আপনি অনুপস্থিত থাকায় টাকাটা আপনার সহকর্মী বন্ধু ধীরেন বসু মহাশয়ের হাতে দিয়ে সেইদিনই খুলনা চলে আসতে হয়।

দেখা করার আর সুযোগ হয়নি। টাকার তাগিদে আপনি আমায় চিঠি লেখায় সত্যিই আমি অবাক হয়েছি। লোকটা টাকাটা দিয়ে গেল অথচ আমি তাকে একটা কড়া তাগিদপত্র লিখে বসলাম।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। যাক্ আমার পাণ্ডুলিপি ? সেটা আছে না সেটাও গেছে ?

[নিদারুণ গম্ভীরতা। শতদল তাহার ব্লাউজের ভিতর হইতে পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে ফণিভূষণের হাতে দিল]

ফণিভূষণ ॥ একি ! এত আমার লেখা না।

শতদল ॥ আমি নকল করে এনেছি নিজ হাতে।

ফণিভূষণ ॥ কেন ?

ধীরেন ॥ পুলিশ হন্যে হয়ে এই ম্যানাস্ক্রিপ্টটীর জন্য এখানে ওখানে এমনকি কয়েকটা প্রেসেও খানা-তল্লাসী করেছে। আমি তাই শতদলকে ঐ পরামর্শই দিয়েছিলাম। আসলটা ওদের বাড়ীতে রাখতে আর নকলটা তোমার হাতে দিতে যাতে পুলিশ এটা পেয়ে কিছুকাল দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকে। সেই অবসরে—

শতদল ॥ চুপ ! ঐ সেই দারোগা আসছে।

[নিস্তব্ধতা। পুলিশ অফিসার এবং পূর্বোক্ত কনষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত। সশঙ্কচিত্ত ফণিভূষণ পাণ্ডুলিপিটি কোথায় রাখিবেন বুঝিয়া উঠিতে পরিতেছিলেন না]

হালদার ॥ না না ওটা আর সরাবেন না। ওটা আমি দেখে ফেলেছি। ওটার জন্যই আমি এসেছি। দয়া করে ওটা আমার হাতে দিন। বুঝুন আমি লোকটি কে এবং কি।

[হালদার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিশ্চল ফণিভূষণের হস্ত হইতে পাণ্ডুলিপিটি তুলিয়া লইয়া প্রথম পত্রটি পাঠ করিলেন]

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ। (দু-একটা উল্টাইলেন) নিজেরা প্রস্তুত হইয়াছ কিনা, নিজেদের শক্তি আছে কিনা একশবার নিজেকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিয়া লও; কাজে হাত দিবার পূর্বে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ।'

ওরে বাবা, এত আগুন। আমার হাত পুড়ে না যায়। পকেটে পুরি। কাজ শেষ। আপনি ত সেই ধীরেনবাবু। এখানে একটা সই করুন। এখানে যে এটা পেলাম তার সাক্ষী থাকুন। ভাবছেন কি। (চটিয়া)—সই করুন। [ধীরেন বসু সই করিতে বাধ্য হইলেন]

হালদার ॥ ব্যাস, আমার কাজ শেষ। জয় দুর্গা, জয় দুর্গা।

শতদল ॥ রামকৃষ্ণ ঘরের—

হালদার ॥ আজ এখান থেকেই [জোড়হাতে নমস্কার করিলেন এবং সগর্বে কনস্টেবল সহ প্রস্থান]

ফণিভূষণ ॥ (একটু উত্তেজিতভাবে) আমার আসল পাণ্ডুলিপি কোথায় ?

ধীরেন ॥ যে বুকে করে নিয়ে গিয়েছিল তার কাছেই জিজ্ঞাসা কর।

শতদল ॥ বারে সেটাও আপনি নিয়ে গেছেন দাদা।

ফণিভূষণ ॥ (প্রায় চীৎকার করিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে) কোথায় ?

ধীরেন ॥ সে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ।

ফণিভূষণ ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে) এসব কি আমি শুনছি ? আমি পাগল হয়ে যাব নাকি ?

ধীরেন ॥ সে পাণ্ডুলিপির যে দশা হয়েছে তাতে তোমার পাগল হবারই কথা।

ফণিভূষণ ॥ [হঠাৎ সক্রন্দনে ধীরেনের সামনে নতজানু হইয়া তাহার পায়ে হাত রাখিয়া।]

বলুন, বলুন দাদা আমার সেই আসল পাণ্ডুলিপির কি হল।

ধীরেন ॥ সে বলুক বুড়ী।

ফণিভূষণ ॥ (হঠাৎ উঠিয়া শতদলের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে সকরুণ কণ্ঠে) বল, বল বুড়ী সে পাণ্ডুলিপির কি হয়েছে ? কোথায় ?

শতদল ॥ আমাকে বুড়ী বললে বলব না।

ফণিভূষণ ॥ আঃ আঃ কি যেন নাম।

শতদল ॥ শতদল।

ফণিভূষণ ॥ বল শতদল বল।

শতদল ॥ হাত ছাড়ুন।

ফণিভূষণ ॥ ছাড়ছি তুমি বল, আমাকে বাঁচাও।

[শতদল চট করিয়া ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে একটি মুদ্রিত লেনিন গ্রন্থ বাহির করিয়া ধীরে ধীরে]

এই নিন আপনার সেই পাণ্ডুলিপি [বইটি হাতে পাইয়া তাহা একবার দেখিয়া চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না বাঁহাতে নিজ চক্ষু মুছিয়া লইয়া বইখানি আবার দেখিয়া উচ্চারণ করিয়া পড়িলেন]

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা মূল্য চার আনা বিশ্বাস হচ্ছে না, চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি কি আমার বই ?

ধীরেন ॥ (চট করিয়া বইটি কাড়িয়া লইয়া) এখনও তোমার নয়। ও বই এর মালিক প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাবের পক্ষে আমি। দুশ টাকা দিতে হয়েছে আমাকে এ বই ছাপতে কিন্তু দু'শ টাকা ওর মূল্য নয়। ওই বই তোমাকে পেতে হলে আমাকে তোমার যে মূল্য দিতে হবে তা হচ্ছে (হঠাৎ

শতদলের হাতখানি ধরিয়া) আমার এই বোনের পাণিগ্রহণ করতে হবে তোমাকে।

ফণিভূষণ ॥ (মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল) বটে ?

ধীরেন ॥ হ্যাঁ, বই ছাপার খরচ আমি পেয়ে গেছি। গিরিশের সেই দু'শ টাকা আমাদের বুক ক্লাবকেই দিতে হয়েছে এটা ছাপতে। এই তার ভাউচার (পকেট হইতে বাহির করিয়া ভাউচার ফণিভূষণের সামনে ফেলিয়া দিলেন)। কিন্তু বই এর স্বত্ব স্বামীত্ব তোমার হবে আমার এই ভগ্নীর স্বামীত্ব গ্রহণ করলে।

ফণিভূষণ ॥ বটে ?

ধীরেন ॥ হ্যাঁ।

ফণিভূষণ ॥ কিন্তু আপনি তো জানেন দাদা আমার পণ ছিল এবং এখনও সেই পণ আমি বিনা পণে বিয়ে করব।

ধীরেন ॥ কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলছে যে পণ তোমাকে নিতেই হবে ? কেউ না। বরং আমরা, কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন কন্যা পক্ষ, তোমার এই আদর্শ চালু হলে উপকৃতই হব তাদের আশীর্বাদই ঝরে পড়বে তোমার মাথায়। বল তুমি ওর পাণিগ্রহণ করবে কিনা।

ফণিভূষণ ॥ করব।

ধীরেন ॥ তোমার এই সম্মতির কথা আমি মাসীমা অর্থাৎ বুড়ীর মাকে জানাব। বুড়ীর মামাদের অর্থাৎ চৌগাছার ঘোষেদেরও কথাটা আমি কয়েক-দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেব।

কাছে টেনে নাও ওকে। দেখো ও লজ্জায় কাঁপছে। টেনে নাও।

ফণিভূষণ ॥ নিচ্ছি। (কাছে টেনে নিলেন কিন্তু শতদল বাধা দিল না) দাদা, আপনি আর এই বুড়ী এই দুজনে আমার জীবনে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ। আজ মনে হচ্ছে আমি সত্য সত্যই শতদলে প্রস্ফুটিত হয়েছি কারণ—আমার লেনিনগ্রন্থটি আপনারা দুজনে প্রকাশিত করে চৌরিচোরায় মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ আন্দোলনের ঐ বিপর্য্যয়ের আশ্বাস বানীরূপে লেনিনের ঘোষণাই প্রচার করার সুযোগ দিয়েছেন যে ঘোষণায় তিনি বলেছেন (পুস্তকপাঠ)।

'বিপ্লব আবার আসিবে'—সোভিয়েটের পুনর্জন্ম ঘটবেই। দ্বিতীয় বার বিপ্লব আর ইহার বিনাশ নাই। কারণ চৌরিচোরায় স্বরাজ আন্দোলনের বিপর্য্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের এই ঘোষণাই প্রচারিত হতে পারবে। আমি বলছি, আমি বলছি মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ আন্দোলনেরও বিনাশ নাই।

আসুন আমরা বলি 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়, লেনিন কি জয়।'

লাঙল

উৎসর্গ

বাঙলার চাষী-ভাইদের হাতে

গান্ধীজন্মজয়ন্তী দিবস
২রা অক্টোবর ১৯৫৫

মন্মথ রায়

॥ ইতিহাসের একটি পাতা ॥

"পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। মধ্যস্বত্ব বা জমিদারী বিলোপ এই রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে যার উপযুক্ত আখ্যা হ'ল শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। আজ থেকে প্রায় ১৬২ বছর আগে তৎকালীন ইংরেজ-শাসক লর্ড কর্নওআলিশ প্রবর্তন করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—পল্লীপ্রাণ বাঙলাদেশের ভূমিব্যবস্থা এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিদেশী শাসকের পছন্দমত ছাঁচে গ'ড়ে তুলতে। পরাধীনতার এই শেষ নিদর্শন আজ অবলুপ্ত হবে নূতন যুগধর্মের বিবর্তনে। বাঙলার চাষী ফিরে পাবে তার স্বাধিকার। মাটি ও মানুষের মিলনে গড়ে উঠবে এক নূতন সমাজ, সূচিত হবে কৃষি উন্নতির এক নূতন অধ্যায়।.... ....

জমিদারী বিলোপ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। পশ্চিম বাঙলার মৃতপ্রায় পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং কৃষিউন্নয়নসূচীকে ফলপ্রসূ করতে রাজ্যসরকার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে কোন মধ্যবর্তী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এইজন্যই জমির মালিক, মধ্যস্বত্বভোগী, নিম্ন মধ্যস্বত্বভোগী এবং অন্যান্য স্বত্বভোগীদের অধিকার বিলোপ ক'রে আমরা আজ প্রকৃত চাষীকেই করছি জমির মালিক। আজ থেকে 'লাঙল যার, জমি তার'।"

॥ ভূমিকা ॥

বঙ্গদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপের ইতিহাসটি দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রামের এক অশ্রু বিধৌত জাতীয় বিপ্লব। তারই একটি আংশিক পরিচয় বিধৃত করেছি আমার কাল্পনিক উপাখ্যান ভিত্তিক 'লাঙল' নাটকে—লিখেছি ঠিক সেই মেজাজে যে মেজাজে প্রাতঃস্মরণীয় পরমপূজ্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণ' নাটক লিখে বৃটিশ শাসনে নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসে বিধৃত রেখে গেছেন।

বাংলার চাষীদের সুখ শান্তির জন্য জাতীয় সংগ্রাম বহু বিস্তৃত। আমার কল্পিত এই কাহিনীটি তারই একটি প্রাথমিক চিত্ররূপে গৃহীত হোক এই আমার বাসনা ও প্রার্থনা। আমার এই 'লাঙল' নাটকটির রচনাকাল ২৫শে মে থেকে ৩১শে মে, ১৯৫৫।

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে পরবর্তী কৃষক সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন দেশজ্যোতি শ্রীজ্যোতি বসু। ভারতের সংবিধান নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে তিনি কৃষক জীবন সমস্যা সমাধানে সার্থক হবেন —এ আশা অসঙ্গত নয়।

বিনীত—
মন্মথ রায়

॥ প্রবেশানুক্রমিক চরিত্রলিপি ॥

১। মাণিক
২। শশী
৩। গোপাল
৪। রামাবতার সিং
৫। মহাদেব
৬। আলোক
৭। নরহরি পাকড়াশী
৮। যুবক প্রজাবৃন্দ
৯। সিন্‌হা
১০। মহীপাল রায়
১১। শালিবাহন
১২। ভূতনাথ
১৩। চন্দনা
১৪। চরণদাস
১৫। অন্নদা
১৬। সুদাম
১৭। নায়েব প্রাণকৃষ্ণ
১৮। ভূপতি
১৯। বরুণ
২০। জগত্তারিণী
২১। ক্ষমা
২২। হাসি
২৩। রাখাল
২৪। জয়দেব

লাঙল

[নাটক]

প্রথম দৃশ্য

[কলকাতা। জমিদার মহীপাল রায়ের বহির্বাটির প্রাঙ্গণ। পেটা-ঘড়িতে বিকাল পাঁচটার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠল।]

বহির্বাটির বারান্দা মঞ্চের পিছনে লম্বমান দেখা যাচ্ছে, ঠিক মাঝখানে নেমে এসেছে সিঁড়ি। পশ্চাৎপটরূপে কালো পর্দা শোভমান থাকায় মনে হচ্ছে, শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদার-অট্টালিকার শুভ্র সিঁড়ি যেন কোন হিংস্র পশুর ব্যাদিত দন্তপংক্তি।

সিঁড়ির নিচে মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে, ইতস্তত ব'সে আছে জমিদারের সাক্ষাতের প্রতীক্ষারত একদল অভিযোগক্ষুব্ধ উত্তেজিত প্রজা। বৃদ্ধ স্থবির মহাদেব মণ্ডলই তাদের নেতৃত্ব করছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে মহাদেবের বড় ছেলে চাষী-যুবক—গোপাল। সঙ্গে আরও দু'জন চাষী রয়েছে—তাদের নাম, মানিক আর শশী। এদের মধ্যে থেকেও বিশিষ্ট চেহারা ও চালচলনে যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেও বয়সে তরুণ, নাম—আলোক। বুদ্ধিদৃপ্ত চেহারা, একটা ব্যক্তিত্ব আছে। স্বল্প হাসি এবং তাকে দেখে মনে হয় সে যেন একদিকে মহাপ্রাণতা ও হৃদয়বত্তা এবং অন্যদিকে শাণিত বুদ্ধি দিয়ে জগৎকে পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছে।]

মানিক ॥ এই হা পিত্যেশ ক'রে আমরা কতক্ষণ ব'সে থাকবো ?

শশী ॥ বেলা একটায় এসেছি, পাঁচটা বেজে গেল ; জমিদারবাবুর ঘুমই ভাঙলো না !

গোপাল ॥ কি ক'রে দিনের বেলায় এতো ঘুমোয়, বলতে পারো ?

মানিক ॥ রাতে ঘুমোয় না ব'লে। এ কি বাবা আমরা, যে রাতে

ম-৪১৭

ঘুমোব ? আরে বাবা, জমিদারের কাজই তো হ'ল গিয়ে রাতে ! যত সব —নিশাচর ...রাক্ষস।

[দালানে দারোয়ান রামাবতার সিং লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল।]

রামাবতার ॥ আরে, চিল্লাতে কাহে ? সব উল্লু বন্ গিয়া ক্যেয়া ? আবভি সব নিকাল যাও।

মহাদেব ॥ না—না—দারোয়ানজী, গাঁ থেকে বেরিয়েছি সেই ভোরে, দুপুরে দানাপানি পেটে পড়ে নি—তাই ছেলেগুলো ক্ষিদের চোটে কাঁইকুঁই করছে। [ছেলেদের প্রতি] না বাপু, তোমরা সব থামো, রাজাবাবু উপরে ঘুমুচ্ছেন কিনা— [দারোয়ানকে] আচ্ছা দারোয়ানজী, রাজাবাবুর এ ঘুম কি আর ভাঙবে না ?

রামাবতার ॥ ওভি রাজাবাবুকা মর্জি হ্যায়। লেকিন চিল্লাও মৎ।

[প্রস্থানোদ্যত]

আলোক ॥ এই শোনো, আমিও তো অনেকক্ষণ ব'সে আছি। খবর দিয়েছো যে, আলোকবাবু এসেছেন ?

রামাবতার ॥ আঃ, লাটসাহেবকা নাতি আয়া হ্যায়।

[যে দেউড়ি দিয়ে এসেছিলো তার বিপরীত দেউড়িতে চলে গেল।]

মানিক ॥ তা বুঝলেন তো বাবু, জমিদার বাড়িতে মুড়ি-মিছরির এক দর ! [সবাই হেসে উঠল]

আলোক ॥ আমি তো এবারচ'লেই যাবো ভাবছি। তোমরাই বা আর কতক্ষণ থাকবে ?

মহাদেব ॥ থাকতেই হবে বাবু। নায়েবের অত্যাচারে গাঁয়ে আর তিষ্ঠোবার উপায় নেই। তাই প্রজাদের পক্ষ থেকে আজ আমরা এখানে এসে ধর্না দিয়েছি। শেষ চেষ্টা !

আলোক ॥ জমিদারবাবু বুঝি কখনো গাঁয়ে যান না ?

মহাদেব ॥ কই আর যান ! আমার বয়স যখন এক কুড়ি, তখন বুড়ো কর্তা গ্রাম ছেড়ে চ'লে আসেন আজব শহর এই কলকাতায়,—তারপর দেড় কুড়ি বছর এই পেরিয়ে গেলো। আর কোন কর্তা গ্রামমুখোই হন নি। এই রাজা বাবুকে আমরা দেখিই নি। এঁরা যান না ব'লেই নায়েব-গোমস্তার এত দৌরাত্মি।

শশী ॥ শালারা আমাদের রক্ত শুষে খেলো।

মানিক ॥ একদিকে নায়েব-গোমস্তা, আর একদিকে মহাজন,—এই দুই যাঁতাকলে পিষে মরছি আমরা !

গোপাল ॥ গ্রাম তো দেখেন নি বাবু, একেবারে শ্মশান! যতসব শকুনের দল আমাদের হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে!

[নরহরি পাকড়াশীর প্রবেশ]

মহাদেব ॥ তা ঠিক—তা ঠিক। ভেবেছিলাম খোদ কর্তার কাছে একটা শেষ আর্জি জানাবো। ওরে, বুড়োকর্তার আমলটাও দেখেছি কিনা। তাঁর দয়ামায়া ছিল! গাঁয়ের উন্নতির জন্য—প্রজাদের ভালোর জন্য—পথঘাট, পুকুর পাঠশালা—সবই তো গাঁয়ে করেছিলেন,—তাঁরই তো ছেলে! উপকার না হয় নাই করলেন, অপকারটা, অত্যাচারটা—বন্ধ করুন—এই কথাটাই বলতে চেয়ে ছিলাম সামনাসামনি—মুখোমুখি! কিন্তু তা হ'ল না!

নরহরি ॥ আ মোলো, এখনো তোমরা ভাগো নি!

মানিক ॥ মেরে না তাড়ালে তো ভাগবো না স্যার। জমিদারবাবুর সঙ্গে আজ দেখা আমরা করবোই।

নরহরি ॥ আমি তো বললাম, দেখা করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু নজর কই? ভুলো না, এটা মহারাজবাহাদুরের খাসমহল। কতবার বলবো, এখানে নজর দিতে হবে মাথাপিছু পাঁচ পাঁচটি টাকা। ফেলো কড়ি, মাখো তেল!

মহাদেব ॥ দয়া করুন বাবু।

নরহরি ॥ বাবু-বাবু ক'র না, আমি নরহরি পাকড়াশী—রাজাবাবুর খাস মুন্সী! ব্যাটারা কথা বলতে জানে না, সদরে এসেছে দেখা করতে! স'রে পড়্—সব সরে পড়্।

আলোক ॥ আমি অনেকক্ষণ খবর পাঠিয়েছি।

নরহরি ॥ তুমি আবার কে?

আলোক ॥ পরিচয় অবশ্য আমার একটা ছিলো, কিন্তু যা দেখছি তাতে পরিচয় দেবার স্পৃহা আর নেই!

নরহরি ॥ ওঃ! খুব বড়ো-বড়ো কথা বলছে যে! বি-এ, টি-এ একটা পাস দিয়েছো বুঝি! পদ্য-টদ্য লেখা-টেখাও চলে তো! দেখো ভাই, এ বড়ো কঠিন ঠাঁই! শুধু কথায় এখানে চিঁড়ে ভেজে না! সরে পড়ো—সব সরে পড়ো!

যুবক প্রজাবৃন্দ ॥ [সমস্বরে] যাবো না—আমরা যাবো না।

[সব উঠে দাঁড়িয়েছে।]

নরহরি ॥ রামাবতার সিং।

[রামাবতারের প্রবেশ]

রামাবতার ॥ জী হুজুর।

নরহরি ॥ ইডিয়ট্! দেখছো না, এরা একটা রায়েট্ বাধাবে! হনুমান সিংকো বোলাও। ফেকু সিং—জম্বর সিং—সবকো বোলাও।

রামাবতার ॥ জী হুজুর! [রামাবতারের প্রস্থান]

নরহরি ॥ আমি তোমাদের নামে রিপোর্ট করছি— রিপোর্ট করছি।

[বললেন বটে, কিন্তু যেভাবে ভিতরে চলে গেলেন, তাকে পলায়ন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।]

মহাদেব ॥ না হে বাপু, মানে মানে ফিরে চলো। গতিক ভালো বুঝছি না, মারধোর দিতে পারে।

মানিক ॥ শিক্ষাটা তোমারই হ'ল মোড়ল, আমাদের নয়। আমরা এখানে আসতে চাই নি, তুমিই আমাদের ধরে এনেছিলে।

মহাদেব ॥ ধ'রে এনেছিলাম, সে কী সাধ ক'রে গাঁয়ে যে নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারে প্রাণ যায়-যায়! ভেবেছিলাম যদি বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে ওর কোনো প্রতিকার……

মানিক ॥ দেখ, দেখা আমি করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কোনো ফল হবে না।

মহাদেব ॥ না-না বাপু. জোর জবরদস্তি ক'রে অন্দরে ঢোকা কোন কাজের কথা নয়। ওসব মতলব ছেড়ে দে।

মানিক ॥ অন্দরে নয়, সদরেই আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এ সদরে নয়। জেনে গেছে, যে আমরা এখানে আছি। তাই আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ নামছে না! যেই আমরা চ'লে যাবো, তখনই সুড়-সুড় ক'রে বেরুবে। যাবে দমদম মতিঝিলের বাগানবাড়ি। দেখা যদি করতে চাও, চলো সেই সদরে—

মহাদেব ॥ রাম-রাম! সে আমি যাবো না। এখানে আমি মাথা হেঁট করতে রাজী আছি—সেখানে নয়।

[মানিক প্রভৃতি যুবক প্রজারা হেসে উঠল]

মহাদেব ॥ তোরা হাসছিস্? হাসবার কথা নয়, লজ্জার কথা। আমি মহাদেব মণ্ডল, আমারই গাঁয়ের মেয়ে—বলতে গেলে আমারই ভাগ্নেবউ—সেই মতিঝিলের বাড়িতে—এই জমিদারের—

শশী ॥ দুয়ো-রাণী হয়ে রাজত্ব করছে! তা মামাশ্বশুরকে পেলে খাতির-যত্ন করবে বই কি!

[সকলে আবার হেসে উঠল।]

শশী ॥ জমিদার-বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছে শুনলাম কিনা—নায়েব বল, গোমস্তা বল, ম্যানেজার বল, কেউ কিছু নয়,—তোমার ভাগ্নে-বউ—চন্দনা দাসীই নাকি এখন সর্বেসর্বা! তোমার আর্জিটা সেখানে পেশ করতে দোষ কি?

মহাদেব ॥ থাম্—হারামজাদা!

শশী ॥ তোমার ভাগ্নে-বউ বেরিয়ে এসে জমিদারের মেয়েমানুষ হ'ল—আর আমি হ'লাম হারামজাদা?

মহাদেব ॥ দেখ্ শশী, আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

[রুখে উঠল]

[ম্যানেজার মিস্টার সিন্‌হার প্রবেশ। তার পশ্চাতে নরহরি।]

মিঃ সিন্‌হা ॥ আরে-আরে, একী! What's that?

[মহাদেব প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ ওদের দেখে চট্ ক'রে সংযত ও সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল]

মিঃ সিন্‌হা ॥ কী হচ্ছিল? মানে, What's going on?

মানিক ॥ কিছু না স্যার, কিছু না।

সিন্‌হা ॥ ঘুষি বাগিয়ে কিছু না? What do you mean to say?

মানিক ॥ মুখ্যুসুখ্যু চাষী-লোক, আমাদের কথাবার্তা বলার ধরনই এই স্যার।

সিনহা ॥ ওরে বাবা—Oh my God! তা তোমরা আর মিছিমিছি অপেক্ষা করছো কেন? রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে না।' তাঁর সময় নেই—মরবার সময় নেই! No time to die. Do you understand, my good fellows?

মহাদেব ॥ আমরা অনেকদূর থেকে এসেছি ম্যানেজার সাহেব, সারাটা দিন ব'সে আছি! একটিবার দেখা হ'লেই দশ-পনেরো মিনিটে যা বলবার, হুজুরে নিবেদন করতাম।

সিন্‌হা ॥ হবে না। বরং যা বলবার আমাকে বলতে পারো। আমি ব'লে দেবো।

[এর মধ্যে রামাবতার সিংহ এসে দাঁড়িয়েছে।]

রামাবতার ॥ হুজুর, বরকন্দাজ লোগ্ সব তৈয়ার।

সিন্‌হা ॥ বাহার ঠারনে বোলো।

রামাবতার ॥ জী। [চ'লে গেল]

সিন্‌হা ॥ কী বলবার আছে বলো। Speak out,

মহাদেব ॥ [মানিককে] এই, বল্ না।

মানিক ॥ [শশীকে] তুই বল্ না।

শশী ॥ [গোপালকে] বল্ না।

গোপাল ॥ আমার মনে পড়ছে না!

আলোক ॥ ওরা ঘাবড়ে গেছে। ওদের কী অভিযোগ, আমি শুনেছি —আমি বলছি।

সিনহো ॥ এ আবার কে? কী? Their Pleader? A briefless Barrister?

নরহরি ॥ ওঁর নাকি জবর কী একটা পরিচয় আছে, তবে আমাদের কাছে ওটা দিতে—কী যেন বললেন—'স্পৃহা' নেই স্যার, স্পৃহা নেই।

আলোক ॥ সত্যিই নেই। বরং জেনে রাখুন, আমি ওদেরই একজন। শুনুন, জমিদারবাবুর এক দূর সম্পর্কের শালা মারা গেছে, তার জন্যে নায়েব ওদের কাছ থেকে খাজনার প্রতি টাকায় দু আনা হিসাবে হাড়-জ্বালানি ট্যাক্সো আদায় করছেন! যে দিচ্ছে না, তার খাজনা নিচ্ছেন না। তাদের নামে বাকি খাজনার নালিশ রুজু করছেন। একই খাস জমি একাধিক লোককে পত্তন দিচ্ছেন। আর দখল কাউকেই দিচ্ছেন না।

সিন্‌হা ॥ তা এইসব শুনে কি হবে? What good?

নরহরি ॥ প্রাণকেষ্ট নায়েবকে তো জানেন স্যার, অতি ধার্মিক লোক,— পরম বৈষ্ণব! ওসব কথা মিথ্যা।

সিন্‌হা ॥ আর যদি সত্যিই হয় তো আদালতে যাও। Go to Court. কিন্তু তার চেয়েও ভালো কথা হচ্ছে,—বাড়ি যাও, Go home. রবিঠাকুর না কে বলেছেন—Home, sweet home; there's no place like home! রামাবতার সিং।

[রামাবতারের প্রবেশ]

রামাবতার ॥ হুজুর।

সিন্‌হা ॥ এঁরা যাবেন, এঁদের বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দাও।

রামাবতার ॥ চলিয়ে।

[সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, আলোক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল]

আলোক ॥ না গেলে এর পর অর্ধচন্দ্র। [ম্যানেজারকে] বেনারস থেকে কর্তাকে আমি একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আজ আসবো। আমি এসেছিলাম, দেখা পেলাম না, চ'লে গেলাম।········

[প্রস্থান। পশ্চাতে পশ্চাতে প্রজারা সব চ'লে গেল।]

সিন্‌হা ॥ একটা ভ্যাগাবণ্ড!

রামাবতার ॥ বাৎসে মালুম হোতা হ্যায় কি, একদম লাটসোহেবকা নাতি!

সিন্‌হা ॥ [নরহরিকে] যা বলেছে!···ওহে, ওদিকে তো আবার হুজুরের যাবার সময় হোয়ে এলো। রামাবতার সিং।

রামাবতার ॥ হুজুর।

সিন্‌হা ॥ গাড়ি বাহার করনে বোলো।

রামাবতার ॥ জী হুজুর। [প্রস্থান]

সিন্‌হা ॥ নরহরি।

নরহরি ॥ ইয়েস্ স্যার।

সিন্‌হা ॥ আজ তিন দিন পর হুজুর মাথা তুলে একটু চাইলেন। জরুরী কাগজপত্রগুলো সই করতে বললাম, তা বললেন কিনা—no time.

নরহরি ॥ কিন্তু চেক গুলো সই না করিয়ে নিতে পারলে কাল থেকে তো বাগানবাড়ির খরচাও চলবে না!

সিন্‌হা ॥ Ready করো—ready করো, ঐ বোধহয় আসছেন। শুনছ না, ঐ footfall.

[নরহরি ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল। এমন সময় ঈষৎ টলতে টলতে জমিদারের প্রবেশ, সঙ্গে মোসাহেব শালিবাহন।]

মহীপাল ॥ [নামতে নামতে শালিবাহনকে] শালিবাহন!

শালিবাহন ॥ হুজুর!

মহীপাল ॥ কারা এসেছিল বললে?

শালিবাহন ॥ আজ্ঞে, একদল প্রজা।

মহীপাল ॥ তা আমার কাছে কেন? আমাদের দিন তো ফুরিয়ে গেলো।

শালিবাহন ॥ ষাট্-ষাট্—একথা বলবেন না হুজুর!

মহীপাল ॥ বলব না মানে ? জমিদারি তো সব গভর্নমেণ্ট নিয়ে নিচ্ছে। যারা নিচ্ছে, যাক্ তাদের কাছে। ওহে শালিবাহন, তোমার সেই ছোট শালীটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে ? ...[নরহরিকে] এ আবার কী ? চেক ? ...সই করতে হবে ? ...[কলম নিয়ে] ওহে সিন্‌হা। সেদিন সার্কাসে একটা সিংঘী দেখে এলাম... আচ্ছা তোমার মিসেস্ কী সেটার চেয়েও lovely। ...তিন হাজার সাত শো পঞ্চাশ টাকা তেরো আনা ছ পাই...নরহরির হিসেবে ভুল হবে না। ...ভালো, ভালো। কিন্তু শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর—দু' চার পয়সা আমার জন্য রেখো, বাবা ! ...যা খাবে, আমায় দিয়ে থুয়ে খেয়ো। ... শালিবাহন, তোমার মোট ক'টি শালি যেন ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ন'টি। খুব জোর বরাত তোমার। আমার একটা বউ, তাও কপালে টিকলো না। বাগানবাড়ির মেয়েটা তাও কেমন উড়ু-উড়ু ভাব। দুনিয়ায় সব পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না শুধু মন।

[হঠাৎ নরহরির হাত থেকে এক তাড়া চিঠি নিয়ে একখানা
চিঠির ঠিকানা পড়তে লাগলেন।]

'প্রবলপ্রতাপ জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত মহীপাল রায়'। তার মানে—কিছু দিতে হবে। দিও। কিছু-কিছু দিও। দিও কিঞ্চিৎ, না ক'র বঞ্চিত।

[না প'ড়েই ফেলে দিল। নরহরি চট ক'রে সেটা তুলে নিল।]

[আরেকখানা নিয়ে] ইনি আবার কে ? 'সত্যমেব জয়তে'! ...ওরে বাবা ! এ তিন সিংহের ব্যাপার, ওসব তুমিই দেখো সিংহ।

[চিঠিটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে তৃতীয় চিঠি হাতে নিল।]

ইনি আবার কে ? লেখাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

[পত্রখানা তুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে সকল বাচালতা
স্তব্ধ হয়ে গেল]

[সিন্‌হার প্রতি] আজ কত তারিখ ? ১৮ই জুন ? [সিন্‌হা হাত নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ'।] তবে তো আজই। খোকা এসেছে ?

সিন্‌হা ॥ [আশ্চর্য হয়ে] খোকা !

মহীপাল ॥ খোকা—মানে আমার ছেলে। আমার একমাত্র ছেলে—
—আলোক। এসেছে ? আজ এসেছে ?

সিন্‌হা ॥ কই, না তো !

মহীপাল ॥ 'না তো'! বেনারস থেকে এই যে লিখ্‌ছে—"এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হইয়া এম-এ পাস করিয়াছি। দাদামহাশয় বলিতেছেন, এখানকার শিক্ষা এখানেই শেষ হইল, এইবার বাপের কাছে যাইয়া শিক্ষা নাও। স্মরণাতীত বাল্যকাল হইতেই দাদামশায়-দিদিমার কাছেই মানুষ হইয়াছি। শুনিয়াছি, আমাকে পৃথিবীতে আনিয়াই আমার মা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাবা আছেন, ইহা শুনিয়াছি মাত্র, দেখি নাই। দাদামশায় ও দিদিমা অতি-বার্ধক্যে অচল। একাই অজ্ঞাত দেবদর্শনে চলিলাম। ১৮ই জুন সকালে আপনার শ্রীচরণে পেঁছিব।" তবে তোমরা কি বলতে চাও সে আসে নি ?

সিন্‌হা ॥ [নরহরির মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে তাকে সাবধান করল] না। এলে তো এতক্ষণ নহবৎ বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে আমরা তাকে অভ্যর্থনা করতাম, স্যার।

মহীপাল ॥ আসে নি! তবে কি কলকাতায় হারিয়ে গেলো! না-না, ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট, এম-এ পাস ছেলে—হারাবার ছেলে সে নয়! তার পথ সে ঠিক খুঁজে বার করবে। ····আচ্ছা, আমি চলি। ·· হয়তো ট্রেন ফেল করেছে, হয়তো কাল আসবে। তা ঠিকই বলেছো—এলে নহবৎ বাজাবে, বাজি পোড়াবে। তখন যদি আমি বাগানবাড়িতে থাকি—বোলো আমি হাওয়া খেতে বেরিয়েছি ·· মোটকথা বাগানবাড়ির খবরটা যেন না পায়! ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট —ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট!

[বলতে বলতে চ'লে গেলেন। সবার অনুগমন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দমদম মতিঝিলে মহীপাল রায়ের বাগানবাড়ির একটি নিভৃত কক্ষ। বাগান বাড়ির বর্তমান অধিশ্বরীর নাম চন্দনা দাসী। বয়সে যুবতী, রূপসীও বটে। কিন্তু তার সম্বন্ধে যেটা বড় কথা, সেটা তার ব্যক্তিত্ব এবং এ ব্যক্তিত্ব বিচিত্র সন্দেহ নেই। যখন চোখে কটাক্ষ জাগে, তখন তুলনা মেলে না লাস্যময় সে আকর্ষণের,—কিন্তু যখন সেই চোখে জলে ওঠে বঞ্চনার জ্বালা, তখন তার রূপই বদলে যায়। মনে হয়, তার চোখের তারায় কাঁপছে একটা তীব্র প্রতি হিংসার অগ্নিশিখা,—সে আগুনে যেন কারুরই নিস্তার নেই।… …অথচ তার মনের অতি কোমল স্নেহময় একটা বুভুক্ষু দিকও আছে—সেটা সম্ভবত অনাস্বাদিত মাতৃত্বের দিক ত্রিবিধভাবে মরা বাগানবাড়ির এই মেয়েটি সবার কাছে এইভাবেই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে, স্বয়ং মহীপাল রায়ও তার অন্ত না পেয়ে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান। চন্দনা আপন মনে নিচের এই গানটি গাইতে গাইতে প্রসাধন প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় ভৃত্য ভূতনাথ এসে দাঁড়াল।]

আমারে সাজালে প্রভু এ কী বেশে তুমি হায়!
নিজেরে চিনিতে মোর অবশেষে প্রাণ যায়!
দিলে আলো আঁখিতীরে,
পতঙ্গেরে দহে ঘিরে,—
বাহু হলো মৃণালিনী প্রেম-পদ্মা-কামনায়!
এ দেহ-দেউল গড়ি' আছো তুমি মনোমাঝে,—
তোমারে চিনিবে বলি' পূজারী কি আসিয়াছে?
তবে মনে এ কী দোল,—
বলে, মাগো, দ্বার খোল:
ডাক শুনে আসে লাজ, সাজ মোর সাজ পায়!

—উমা দেবী

ভূতনাথ ॥ দিদিমণি।

চন্দনা ॥ এসেছে?

চন্দনা ॥ [হাত-ঘড়ি দেখে] আচ্ছা, এখনো, কিছুটা সময় আছে, এইখানেই নিয়ে আয়…। না, দাঁড়া। [এগিয়ে গিয়ে নগ্ন নারীমূর্তির ছবিটি ঢেকে দিল] যা। নিয়ে আয়।

[ভূতোর প্রস্থান। চন্দনা পানপাত্র প্রভৃতি সরিয়ে রাখল•]

[আলোককে নিয়ে ভূতোর প্রবেশ]

ভূতো ॥ দিদিমণি! উনি এসেছেন।

আলোক ॥ আমাকে তুমি …আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন?

চন্দনা ॥ জানলা দিয়ে দেখছিলাম, আপনি আমার গেটের সামনে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।

আলোক ॥ কিন্তু তোমার…আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়।

চন্দনা ॥ কিন্তু আপনি অতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, এটা আমার ভালো লাগছিল না—আর তার কারণও একটা আছে। ঐ মুখখানি আমার বড়ো চেনা মনে হচ্ছিল।

আলোক ॥ মানে?

চন্দনা ॥ আমার এখানে যিনি আসেন—মানে, এ বাড়ির যিনি মালিক —তার মুখের সঙ্গে এ মুখের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

আলোক ॥ এ বাড়ির যিনি মালিক তাঁর নাম মহীপাল রায়।

চন্দনা ॥ হ্যাঁ।

আলোক ॥ বলতে আজ লজ্জা হচ্ছে—আমি তাঁরই ছেলে।

চন্দনা ॥ ও, তুমিই সেই আলোক—না?

আলোক ॥ হ্যাঁ।

চন্দনা ॥ বেনারস থেকে তুমি কবে এসেছ, আলোক?

আলোক ॥ আজ। আমাকে আপনি জানেন দেখছি?

চন্দনা ॥ জানি বৈকি। কিন্তু আজ কলকাতায় এসে এই বাড়ির দুয়ারেই যে তুমি কেন এলে—এ তো জানি না, আলোক। তোমার বাবা যত নির্লজ্জই হ'ন, এখানে তোমাকে আসতে বলেছেন,—এ কথা তো ভাবতে পারছি না আমি।

আলোক ॥ বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি আমাকে তাঁর লোকেরা।

চন্দনা ॥ সে কী?

আলোক ॥ হ্যাঁ। কানাঘুষোয় শুনলাম, সন্ধ্যাবেলা আসেন তিনি এখানে। তাই এইখানেই এলাম।

চন্দনা ॥ কিন্তু এখানেও তো আমি তাঁর সঙ্গে তোমায় দেখা করতে দিতে পারি না আলোক।

আলোক ॥ ও।

চন্দনা ॥ হ্যাঁ। বাপের সঙ্গে ছেলের দেখা হওয়ার জায়গা এটা নয়। যত কম বয়সই হ'ক এটা বোঝবার বয়স তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে আলোক।

[আলোক নিরুত্তরে নীরবে চলে যাচ্ছিল]

চন্দনা ॥ আলোক। [চন্দনা হাত-ঘড়ি দেখিয়া] তাঁর আসবার সময় এখনো হয় নি। তুমি ব'স····আমার কাছে আর-একটু ব'স।

আলোক ॥ না।

চন্দনা ॥ না বাবা, আমার কথা রাখো, একটু ব'স। এসেই যখন পড়েছ, শুধুমুখে তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না।

আলোক ॥ না। এটা নরক। আমার মা ম'রেও নিস্তার পান নি, তাঁকেই চাবুক মারা হচ্ছে এখানে! আমার দম আটকে আসছে। গেটের বাইরে আমি ছিলাম, গেটের বাইরেই আমি যাচ্ছি।

চন্দনা ॥ এসো। তোমার মাকে আমি জন্মে দেখি নি। একটা সোনার সংসার ভেঙে দিয়ে যে আমাকে এখানে ধ'রে এনে তোমার মাকে ভুলল, তোমার মার অপমান সে করে নি? তার কোন দোষ নেই? অপমান করেছি আমি? দোষ আমার—? এই তোমাদের বিচার!

আলোক ॥ [ফিরে দাঁড়িয়ে, পরে কাছে এলো] আমি বুঝি নি, আমাকে তুমি মাপ করো।

চন্দনা ॥ না-না, সে কি? যে ছেলে মা বলতে অজ্ঞান, তাকে আমি দেবতা বলি। তুমি যে সেই ছেলে আলোক! তুমি কোন দোষ কর নি।

[ভুতো এই সময় একটা প্লেটে ক'রে সন্দেশ আর গ্লাসে ক'রে সরবত নিয়ে এল]

চন্দনা ॥ কিন্তু, দোষ হবে এখন [নিজে প্লেট এগিয়ে দিল], যদি না খেয়ে যাও আলোক। ····[আলোক প্লেট হাতে নিল] ব'স।

আলোক চেয়ারে বসল, সম্মুখস্থ টিপয়ে প্লেটটি রেখে দিল। দিয়ে খেতে শুরু করল। ভুতো চ'লে গেছে, চন্দনা পাখাটা তুলে নিয়ে ওকে বাতাস করা শুরু করল]

চন্দনা। তুমি কি এখন কলকাতাতেই থাকবে আলোক ?

আলোক ॥ না, সে ইচ্ছা নেই। আমি বিলেত যেতে চাই, আরও লেখাপড়া শিখতে। আর তাই এসেছিলাম বাবার সঙ্গে দেখা করতে—খরচের ব্যবস্থা করতে।

চন্দনা ॥ বাড়ি গিয়ে থাকো, আমি সকাল সকাল পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু আলোক, আমার মনে হয় না, তোমাকে তিনি যেতে দেবেন বিদেশে। তোমাকে বড় একটা দেখেন নি, কিন্তু তবু দেখেছি 'তুমি' বলতে অজ্ঞান। যেতে তিনি তোমাকে দেবেন না।

আলোক ॥ ধরতেও তিনি আর আমায় পারবেন না! একদিনেই তাঁর যে পরিচয় আমি পেয়ে গেলাম, তাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আর প্রবৃত্তি নেই।

চন্দনা ॥ কিন্তু বিলেত যাবার খরচ ?·······

আলোক ॥ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যোগাড় করব নিজে।

চন্দনা ॥ কিন্তু কেন ? [গায়ের গয়না দেখিয়ে] এ সবই তো তোমার বাবার টাকা। নেবে তুমি ? জানবেন না তিনি।

[আলোক উঠে দাঁড়াল।]

আলোক ॥ ও পাপের টাকা। তোমাকে তিনি দিয়েছেন ব'লে নয়, ছলে, বলে, প্রজার রক্ত শুষে নিয়েছেন ব'লে।

চন্দনা ॥ [অবাক হয়ে] আলোক!

আলোক ॥ হ্যাঁ।

চন্দনা ॥ আমার আশীর্বাদের যদি এতটুকুও দাম থাকে তো তোমায় আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার জয় হ'ক।

[মোটরের হর্ন শোনা গেল]

চন্দনা ॥ এইবার তোমাকে যেতে হবে আলোক।

আলোক ॥ তোমাকে আমি যতটুকু চিনলাম, তাতে তোমার এখানে, আমার শয়তানের সঙ্গে দেখা করতেও এতটুকু লজ্জা—এতটুকু সংকোচ হবে না।

চন্দনা ॥ কিন্তু আমার হবে আলোক! আলোক, তুমি যাও—তুমি যাও। ভুতো—ভুতো ? ··· [ভুতো ছুটে এল] এই বাবুকে খিড়কির দোর দিয়ে এখুনি বের ক'রে দে।

আলোক ॥ তুমি কারুর মা নও, তাই তুমি আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দিতে পারলে! [ভুতোর সঙ্গে প্রস্থান]

[চন্দনা আর্তনাদ করে উঠল এবং টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়ে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মহীপাল ও শালি-
বাহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

মহীপাল ॥ শালিবাহন, আজ যে বড়ো নীরব মনে হচ্ছে।

শালিবাহন ॥ আপনি এসে পড়েছেন, এখুনি সব সরব হয়ে উঠবে !

[তক্ষক্ষণে চন্দনা নিজেকে সামলে নিয়েছে। উঠে চোখ মুছে সে যখন ঘুরে
দাঁড়াল, তখন তার অন্য রূপ। সে চট্ করে স'রে গিয়ে নারীমূর্তির
ছবির ওপরকার আবরণটি সরিয়ে দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে
দাঁড়িয়ে প্রবেশমান মহীপাল ও শালিবাহনকে অভ্যর্থনা
করল। মহীপাল ও শালিবাহনের সঙ্গে সারেঙ্গী
এবং তবলচীও ছিল। শুরু হ'ল গানের
আসর। ভূতনাথ এসে মদ বিতরণ
করতে লাগল]

গানের মাঝারে যদি চোখে আসে জল !
জেনো তবে আছে মোর এই-ই সম্বল ॥
ক্ষমা কোরো যদি মনে ক্লান্তি নামে,—
সুরে মিলাইতে সুর কখনো থামে,
কখনো ব্যথায় কাঁপে হৃদয়-কমল !
গানের মাঝারে যদি চোখে আসে জল ॥
সুখ-সোনা-পিঞ্জরে আছে ভোলা পাখি,
মেলিতে যে চায় ডানা সেও থাকি-থাকি।
ভালবাসা বাসা দিয়ে ঘিরিছ কারে ?
বেলা গেলে বাসা রবে, পাবে কি তারে !
তোমারি সে ভালবাসা ভাঙিবে শিকল !
গানের মাঝারে যদি চোখে আসে জল ॥

—উমা দেবী

[গান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ মহীপালের নজর পড়ল টেবিলের ওপরে রাখা একটি রুমালের ওপরে। সরবত খেয়ে তার মুখ মুছবার সময় ভুলক্রমে আলোক রুমালটি টেবিলের ওপরে রেখেই চলে গিয়েছিল। .... হাত বাড়িয়ে সেই রুমালটি টেনে নিয়ে মদ্যপানের পর মুখ মুছতে গেছেন মহীপাল এমন সময় একটু অপ্রকৃতিস্থের মতই ছুটে এসে চন্দনা রুমালটি কেড়ে নিল।]

মহীপাল ॥ মানে !

চন্দনা ॥ না—না, এ রুমালটা আমি নষ্ট করতে দেব না !

মহীপাল ॥ মানে। এটা কার রুমাল ?

চন্দনা ॥ যারই হ'ক। আমি তোমাকে আর-একটা রুমাল এনে দিচ্ছি।

[মহীপাল চট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে চন্দনার হাত চেপে ধরল]

মহীপাল ॥ দেখি।

চন্দনা ॥ না—না।

মহীপাল ॥ বটে !

[মহীপাল চন্দনার হাত মুচড়ে দিল, তীব্র বেদনায়, আর্তনাদ ক'রে উঠল চন্দনা। রুমালটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল, মহীপাল সেটা নিজের হাতে তুলে নিল। ইতিমধ্যে ব্যাপার গুরুতর বুঝে শালিবাহনের ইঙ্গিতে সারেঙ্গী ও তবলচী চলে গেছে।]

মহীপাল ॥ লেখা দেখছি "আ", কে এসেছিল এ ঘরে ?

চন্দনা ॥ আমি বলব না।

মহীপাল ॥ শালিবাহন !

শালিবাহন ॥ হুজুর।

মহীপাল ॥ তুমি যেন কাকে সন্দেহ করতে ?

শালিবাহন ॥ সে তো সুদাম, ওর আগেকার····স্যার। শিকল কেটে তার সঙ্গে পালাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা প'ড়ে শেষে তো সব ন্যাজে গোবরে হ'ল। সে ব্যাটা এখন শুনি বিবাগী বৈরাগী। রুমালটা তো গেরুয়া নয় ! লেখাটাও "সু" নয় "আ"।

মহীপাল ॥ "আ"। হঠাৎ কী মনে পড়ল। ও, মানে আমার। [হেসে] মানে, তোমার। তা এই সোজা কথাটা বাঁকা ক'রে বলিয়ে নিলে কেন, প্রেয়সী। জানি তো, তোমার রুমালে কখনো মদ ছোঁয়াবার উপায় নেই। ঐ তো আমার

দুঃখ রয়ে গেল চন্দনা—মদ নিজে খেলে না, রুমালটাকে পর্যন্ত খেতে দিলে না! ····শালিবাহন! উঃ কী ফাঁড়াটাই না আজ গেল! গুলি করতে যাচ্ছিলাম আর কী! সেই যে সেবার ·· একটা খরগোশ গুলি ক'রে মারলাম ····মেরে শেষে তে-রাত্রি ঘুমোতে পারি নি। [চন্দনাকে] তোমাকে আজ মেরে ফেললে সা—রা জীবন আর ঘুমোতে পারতাম না!

চন্দনা ॥ সে সুদিন আমার জীবনে আসবে না রাজাবাবু!

মহীপাল ॥ সুদিন! ভেবেছিলাম আমার জীবনেও সুদিন আসবে না চন্দনা। এই যে সব জমিদারি গভর্নমেণ্ট নিয়ে নিচ্ছে, দুদিন বাদে তো আমাকে পথে বসতে হ'ত—জমিদারি হাতে পেয়ে অমানুষই হয়েছি, একটি পয়সা নিজে খেটে উপায় করবার মুরোদ নেই আমার। এই শালিবাহন, ওর তবু সাত-সাতটা শালী আছে, আমার কে আছে বলো! ভাবছিলাম—আরে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, সাতরাজার ধন এক মানিক আছে আমার। আজ আমার কাছে আসছে আমার সেই সবে ধন নীলমণি—ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট—এম-এ পাস—আ-লো-ক! [হঠাৎ কী মনে পড়ল] "আ"! তবে কী [চিৎকার ক'রে উঠল] রুমালটা—রুমালটা কই! [রুদ্রমূর্তিতে উঠে দাঁড়াল]

চন্দনা ॥ আছে।

মহীপাল ॥ আমি দেখবো।

চন্দনা ॥ না।

মহীপাল ॥ আমি দেখবো!

[রুমালটা চন্দনার বুকে ছিল, জোর ক'রে জামা ছিঁড়ে রুমালটা কেড়ে নিল। দুই হাতে বুক চেপে রইল চন্দনা।]

মহীপাল ॥ [রুমালটা দেখতে দেখতে] 'আ', আলোক। আজ তার আসবার কথা। বাড়ি যায় নি। তবে এইখানেই এসেছিল! [চন্দনার দিকে তাকিয়ে] তাই যদি হয়, তবে আমি কী করব জানি না····হয়তো মরব····সব একসঙ্গেই মরব। [চিৎকার ক'রে] শালিবাহন! মদ!····না—না, চন্দনা তোমার আমি পায়ে পড়ছি, তুমি আমায় শুধু বলো –এ আমার আলোক নয়, এ আমার আলোক নয়! [কাঁদতে লাগল]

[শালিবাহন ঘর থেকে ততক্ষণ চ'লে গেছে।]

চন্দনা ॥ বলছি, আমি বলছি, গোবিন্দের নাম নিয়ে বলছি, তোমার মাথায় হাত রেখে বলছি, যে এসেছিল আমি তার মা,—কিন্তু নাম আমি বলব না—বলব না!

[চন্দনা কাঁদিতে লাগিল]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[জমিদারের কাছারি বাড়ি। মানিক, শশী, গোপাল, মহাদেব কাছারিতে হাজির হয়েছে নায়েবের ডাকে। "পুণ্যাহ" উপলক্ষে একটা তরজা-দলও বায়না নেবার আশায় এসেছে; এ দলের মূল গায়েন হচ্ছে অন্নদা নামের একটি লোক, তার দোহাররা হচ্ছে—অমূল্য, দিলীপ প্রভৃতি। জয়দেব ঢুলিও আছে। এদের মধ্যে আধপাগলা বৈষ্ণব কবিয়াল সুদামও এসেছে, তার দোহার হচ্ছে—বেচারাম। তার মামা বুড়ো মহাদেব বিমর্ষ মুখে একদিকে তার বড় ছেলে গোপালকে নিয়ে ব'সে আছে। কিন্তু শশী আর মানিক তরজার ব্যাপারে বেশ মজা পাচ্ছে মনে হচ্ছে। দৃশ্য উন্মোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখছি, অন্নদার দোহার অমূল্য ঢোলের তালে তালে ভঙ্গীভরে তরজা বা কবির প্রারম্ভসূচক "বাণীবন্দনা" করছে। তার "বাণী-বন্দনা" শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে প্রবেশ করল নায়েবের মুহুরী চরণ দাস]

চরণ দাস ॥ কী ব্যাপার—কাছারির কাজের সময় সব একেবারে গাওনা ধ'রে দিলে যে হে, অ্যাঁ! তোমাদের আবার তলব করলে কে?

অন্নদা ॥ [বিনীতভঙ্গীতে] আজ্ঞে হুজুর—আমরা পেটের তলবে এসে হাজির হয়েচি। শুভ পুণ্যাহ সামনে—আমরা তরজার দল, গানের বায়না না নিয়ে যাব না মশাই।

চরণ দাস ॥ তা বেশ! নায়েববাবু এসে পড়লে ভালো করে বায়না হবে খন। কী হে মহাদেব, দেখচ কী? নেচে-গেয়েই যদি দিন চলে যায়, তো তোমরা লাঙল ঠেলে মরো কেন? তোমরাও লেগে যাও না।

মহাদেব ॥ না মশাই, আমাদের নায়েববাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।* তাই ব'সে আছি।

সুদাম ॥ [হঠাৎ উঠে] মুহুরীবাবু শুনুন? আমার মামা ঐ মহাদেব মণ্ডল। উনি গান না গাইলে কি হবে? আমি ওর ভাগ্নে সুদাম—আমি ওর হয়ে গানের বায়না নিয়ে যাব। আজ্ঞে, আমিও কবিয়াল তো বটে! সঙ্গে দোহারও আমার আছে হুজুর, এই যে।

[এ কথায় অন্নদার দল যেন ক্ষেপে গেল। সে তেড়ে এসে একেবারে ধ'রে দিল তরজার ছড়া, তার ভাবার্থ হচ্ছে : ও শালা আবার গাইবে কি ? লজ্জায় তো মাটিতে মুখ থুবড়ে থাকার কথা। যার মাথায় হ'ল সর্পাঘাত, সে শিরে বাঁধবে তাগা ? ওর কপালে আগুন মশাই, কপালে আগুন। ওর ঘরের কেচ্ছা যদি বলি তো ও বেটা এখান থেকে পালাবে! যার বোষ্টমী বেরিয়ে গিয়ে··· ···ওঃ! উনি হলেন কবিয়াল। দোহাররা ধুয়া ধরলো : ওর বোষ্টমী বেরিয়ে গেল, উনি হলেন কবিয়াল।

এর উত্তর দিল সুদাম আর তার দোহার বেচারাম—দুজনে মিলে। ভাবার্থ আমি হলাম রামচন্দ্র। আমার বৌ চাষীর মেয়ে। হলের মুখে বেরিয়েছিলেন সেই কন্যার নাম জান কী ? বলি দোহারগণ, তার নাম বলতে পার ? তিনি হচ্ছেন সীতা।

আমার সেই সীতাকে ধরে নিয়ে গেছে কে ? দোহারগণ, তার নাম —রাবণরাজা। রেখেছে কোথায় ? অশোকবনের বাগানবাড়ি।

শুধু কি আমার সীতাই নিয়েছে। তোদের সীতাও নিয়েছে। বলি দোহারগণ, সে সীতার অর্থ কি তা জানো ? সে হ'ল চাষের জমি! এখন নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ—আমিও যে, তোমরাও তাই! এর কি প্রতিবিধান, বলি দোহারগণ, এর কি প্রতিবিধান !

অন্নদা ছুটে এসে ছড়া ধরলো : ত্রেতাযুগে প্রতিবিধান হ'ল আর কলিযুগে হবে না! তবে তোকে কলিযুগের রামায়ণটাও বলতে হয় :

ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মানুষের হাতেই সব জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন, কারো কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু লোভ এলো। লোভের বশে জোর যার মাটি তার হয়ে দাঁড়াল। এমনি ক'রে বাদশারা মাটির মালিকানা কেড়ে নিল, তাদের কাছ থেকে সেই মালিকানা পেল কোম্পানি, তাদের কাছ থেকে তা আবার পেল জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। কিন্তু ভাই, দুনিয়ায় চিরস্থায়ী কিছুই নয়। অতো বড় যে রাবণরাজা তারও পতন হ'ল—অতি দর্পে হত লঙ্কা!

কোটি কোটি মানুষের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন ঘুমিয়ে, শেষে তাঁরও ঘুম ভেঙেছে।
সীতার উদ্ধার হবেই হবে। ভাবছ কি, দিন আসছে, লোভে প'ড়ে যে যা
গ্রাস করেছ সব উগরে দিতে হবে—কোটি কোটি লোকের ক্ষুধা
মেটাতে! দিন আসছে।]

[গান শেষ হবার একটু আগেই নায়েব প্রাণকৃষ্ণ নীরবে এসে দাঁড়িয়েছেন।]

চরণ দাস ॥ আরে থাম ব্যাটারা, থাম।

[ইঙ্গিতে নায়েবকে দেখালো, নায়েবকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে
একযোগে চুপ করে দাঁড়াল।]

নায়েব প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরিবোল - হরিবোল! হরি গুরু—গুরু হরি। মনকৃষ্ণ—প্রাণকৃষ্ণ! জ্ঞানকৃষ্ণ—ধ্যানকৃষ্ণ। বোধকৃষ্ণ—বুদ্ধিকৃষ্ণ; আমি যন্ত্র —তুমি যন্ত্রী। প্রাণকৃষ্ণ—প্রাণকৃষ্ণ!·· তা বেশ জমিয়েছ দেখচি! কিন্তু বাবা, একেবারে তত্ত্বকথায় চ'লে এসো। এক কথায় ব'লে ফেলো মতলবটা কি!

অন্নদা ॥ হুজুর, সামনেই পুণ্যাহ, তাই গান-বাজনার বায়নাটা নিতে আসা, এই যা।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরি—হরি! কথাটা সামান্য কিন্তু ব্যাপারটা বৃহৎ! তোমরা তো নেচে গেয়েই খালাস, কিন্তু ম্যাও ধররে কে? দক্ষিণাটা কে দেবে?

অন্নদা ॥ কেন, আপনি হুজুর। হুজুর ছাড়া তো আমরা কাউকে জানি না। ব্রহ্মা বলুন, বিষ্ণু বলুন, মহেশ্বর বলুন—আমাদের এক প্রাণকেষ্ট, সে আপনি:

"বল ভাই ধন্য হরি
রাখেন হরি মারেন হরি।"

[দোহারগণ ধুয়া ধরল।]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হবে, হবে, তোদের হবে। গীতায় আমার সেই প্রাণকেষ্টই যে বলেছেন—'মামেকং স্মরণং ব্রজ!' আহা কি কথা! ব্রজধামে আমাকেই স্মরণ করো। যা ব্যাটা যা, তোদের হয়ে গেল! পুণ্যাহতে এসে খাবি-দাবি, নাচবি-গাইবি, ষোল আনা পাওনা বুঝে নিবি। আমার পাওনাটাও বুঝিয়ে দিবি। দিবি তো [অন্নদারা ইঙ্গিতে জানালো, দেবে]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ দিবি? তা যখন দিবি, তখন আমিও আছি, তোরাও আছিস। চলে যা—তোদের কাজ হ'য়ে গেল।

অন্নদা ॥ চলো হে—চলো। জয় হরি—জয় হরি!

[অন্নদা ও সুদামের দল চ'লে গেল। জয়দেব একবার ঢোলকও বাজিয়ে গেল।]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ আঃ! কেমন গেল! একেবারে ডঙ্কা বাজিয়ে গেল। আর বাপু, তোমরাও তো গেলে কলির সেই বৈকুণ্ঠে—কলকাতায়! দেখা মিললো! ধন্য হয়ে ফিরেছে সব! ট্যাঁকের পয়সা খরচা ক'রে!

মহাদেব ॥ কই আর দেখা হলো হুজুর! যাওয়া-আসাই সার।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ তাই তো বলি বাবা, হাঁটি-হাঁটি পা-পা! লাফিও না—লাফিও না! সিদ্ধিদাতা গণেশ এখানে—সব দেবতার আগে এর পূজো চাই—তবে তো সিদ্ধি! আর কতবার বলবো বাবা, সিদ্ধির প্রথম দরজাটাই হ'ল, গিয়ে ত্যাগের দরজা। ত্যাগ চাই রে ভাই, ত্যাগ চাই। বাকি বকেয়াগুলো অনেকদিন ঘরে জমিয়ে রেখেছো, এই দুয়ারে এখন সব ঝেড়ে ফেলে দাও তো! ত্যাগ করো! ত্যাগ করো! এই যে বাবা মানুকে, কতটা ত্যাগ করবে বাবা?

মানিক ॥ পেটের ভাত জোটে না—মলমূত্র ছাড়া আর কি ত্যাগ করতে পারি হুজুর?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরি হরি! রক্ষে করো বাবা! তা বাবা, তোমরা কি সবাই ঐ কি যে বলে—তাই ত্যাগ করার দলে?

শশী ॥ গরিব লোক—তা ছাড়া আর কি ত্যাগ করবো হুজুর?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ চরণ দাস!

চরণ দাস ॥ বলুন স্যার!

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরির কি ইচ্ছে, বুঝলে তো?

চরণ দাস ॥ বুঝলাম। এদের বাকি বকেয়ার হিসাব সদরের উকিল-সেরেস্তায় পাঠাতে হবে বাকি খাজনার মামলার জন্য।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ না, তোকে আর ধ'রে রাখা গেল না চরণ দাস হরির ইচ্ছাটা তুই এমনি রপ্ত করেছিস, ভালবেসে কোন্ দিন অকালেই তোকে পায়ে টেনে নেন্।

মহাদেব ॥ দোহাই হুজুর, নালিশ করবেন না, ধনেপ্রাণে মারা যাব।

বাকি প্রজাবৃন্দ ॥ ভিটেমাটি উচ্ছন্ন যাবে।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরির যে তাই ইচ্ছা রে! আমি কি করব বল? তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,—যেমন বাজাচ্ছেন, তেমনি বাজছি!

মহাদেব ॥ আমি খাজনা দেব হুজুর—মরণকালে ভিটে ছাড়তে পারব না! দে বাবা গোপাল, খাজনা দিয়ে দে। কত দিতে হবে হুজুর?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ চরণ দাস!

চরণ দাস ॥ [খাতা খুলে] এই যে। মহাদেব মণ্ডল—জমা ২ টাকা, বাকি তিন সন হ'ল গিয়ে ছ' টাকা। সেস বার আনা, ছাপা খরচ হ'ল গিয়ে টাকায় এক আনা—আদায় খরচ হ'ল গিয়ে টাকায় দু' আনা—চুনি খরচা হ'ল

গিয়ে টাকায় দু' পয়সা—পরবি, টাকায় দু' পয়সা—মাঙ্গন টাকায় চার আনা—খোকাবাবুর বিয়ের খরচা—হ'ক না হ'ক সেটাও ধরতে হবে তো ?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হবে না ? খোকা যখন হয়েছে, হবে না ? তবে কটা হবে সেটা হরিই জানেন। না-না, ও না ধরলে যে হরিই রুষ্ট হবেন।

চরণ দাস ॥ ধরছি স্যার। টাকায় আট আনা ধরছি।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরির আবার কি ইচ্ছা দেখ। রাজাবাবুর কোন্ শালা অকালে চ'লে গেলেন গোলকধামে—বুঝলে না বাবা। হাড় জ্বালাবার খরচ, সেও আদায় করতে হবে তোদের এই প্রাণকেষ্টকেই! হরির যে কি ইচ্ছে তিনিই জানেন। ধরো—বেশি নয়, টাকায় দু'আনা। হরির ইচ্ছায় তা হ'লে সেটা গিয়ে কততে দাঁড়ালো চরণ দাস ?

চরণ দাস ॥ ষাট টাকা ছ' পয়সা।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরির ইচ্ছা ছ পয়সা থাক—তুমি বাপু ঐ ষাট টাকাই দিয়ে ফারক নিয়ে হাসতে হাসতে ডঙ্কা বাজিয়ে ঘরে যাও—গিয়ে দুধ-ভাত খাও!

[মহাদেব গোপালের হাত ধ'রে নীরবে চ'লে যাচ্ছিল।]

এ কি চ'লে যাচ্ছ যে! কি হ'ল ?

[ওরা একটু দাঁড়াল, গোপাল আর মানিক অগ্নিদৃষ্টিতে একবার নায়েবের দিকে তাকালো। গোপাল বাপের হাত ধ'রে টান দিল।]

শোনো—শোনো।

[মানিক আর শশী রুখে দাঁড়াল। গোপালও এগিয়ে এল।]

গোপাল ॥ হরির ইচ্ছা, জমিদার আর খাজনা পাবে না।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ বটে!

মহাদেব ॥ নয়তো কি ? দু' টাকা জমা, তিন বছরবাকি—তোমাদের হিসেবে হবে দাঁড়িয়েছে ষাট—দেবো কোত্থেকে ?

শশী ॥ দেবার উপায় যদিই বা থাকে, আবওয়াব কেন দেবো ?

মানিক ॥ দু' বৎসর অজন্মা হ'ল, একটি পয়সা খাজনা মকুব হ'ল না! দু' মুঠো ভিক্ষে দিলেন না ওরা কাউকে। কেন দেবো খাজনা ? ভাত দেবার কেউ না, কিল মারবার গোঁসাই!

মহাদেব ॥ জমিদার! জমিদার! হ্যাঁ ছিলো বটে একদিন বাপ-মা। ছোটবেলায় দেখেছি, জমিদার-বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণ! আমাদের সুখদুঃখই রাজাবাবুর সুখদুঃখ! বাড়ি বাড়ি ঘুরে সব দেখতেন। যেমন ছিল দয়া তেমনি ছিল শাসন! প্রজার জন্য পথঘাট করেছেন, ইস্কুল করেছেন,

ডাক্তারখানা বসিয়েছেন' বলেছেন—একা পারি না হে, তোমরাও কিছু দাও। তা দিয়েছি, যে যতটুকু পেরেছি খুশিমনে দিয়েছি। আজ কোথায় সেই জমিদার কাকে দেবো খাজনা ?

গোপাল ॥ বাবা, তুমি কাকে এসব কথা বলছ ! কে শুনছে ? চল।

মহাদেব ॥ যাচ্ছি। একটা গল্প ব'লে যাচ্ছি : একজনের ছিল একটা হাঁস। রোজ একটা ক'রে সোনার ডিম পাড়তো। লোকটার লোভ যায় বেড়ে। ভাবে, পেটে না জানি কতো সোনার ডিমই আছে! মেরে ফেলে হাঁসটাকে! দেখে, ডিম সেই একটিই আছে। জমিদারই বলো আর রাজ্যসরকারই বলো—আমরা হলুম গিয়ে সেই সোনার হাঁস। আমাদের মেরো না—আমাদের মারলে নিজেরাই মরবে। হ্যাঁ।

[মহাদেব চ'লে গেল সদলবলে, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ থেকে চোরের মতো বেরিয়ে এলো শীর্ণকায় মহাজন ভূপতি তালুকদার। সর্বগ্রাসী এক উদগ্র ক্ষুধা তার চোখে-মুখে-ভঙ্গীতে। লোভের যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বার্ধক্যের শৈথিল্যও সে লোলুপতাকে মুখশ্রী থেকে মুছে ফেলতে পারে নি]

ভূপতি ॥ [পাশবিক হাসি হাসিতে হাসিতে] হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

প্রাণকৃষ্ণ ॥ এই যে শকুনি-দা যে! ঘরের ভিতরে লুকিয়ে ছিলে তো ? হরির ইচ্ছায় তা হ'লে সব দেখেওছো, শুনেওছো।

ভূপতি ॥ ভিটেয় বাস করবে, খাজনা দেবে না। হাঃ—হাঃ—হাঃ !

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, দেবে না। যা চাইছিলে, হরির ইচ্ছায় তাই হ'ল।

ভূপতি ॥ [নায়েবের হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে] দক্ষিণা ভায়া, দক্ষিণা রইলো। তা হ'লে নালিশ হচ্ছে! ভিটেটা নিলেমে উঠছে!

প্রাণকৃষ্ণ ॥ [প্রণামীটা দেখিয়ে] হরির তো তাই ইচ্ছে মনে হচ্ছে, শকুনি-দা! ওদের চাষের জমিটা তো নিলেমে কিনেছ। এইবার বাঁশগাড়ি ক'রে জমিটা দখল নাও। তারপর মনের আনন্দে বাস্তুঘুঘুটি হয়ে চ'রে বেড়াও দাদা, চ'রে বেড়াও। ভিটেটা নিলেমে উঠলে ওটাও ডেকে নিও।

ভূপতি ॥ [সাগ্রহে] আহা, এমন দিন কি হবে তারা !

প্রাণকৃষ্ণ ॥ কিন্তু একটা কথা। ছেলে নেই, পিলে নই,—একা লোক তুমি। গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে পাকেচক্রে হাজার বিঘেরও বেশি জমি তুমি গিলেছ। হরির কি ইচ্ছা বলো তো ? কি করবে এতো জমি নিয়ে ?

ভূপতি ॥ হ্যাঁ, হাজার বিঘে আবার জমি নাকি! লাখ লাখ বিঘে জমি পেলেও আমার মন উঠবে না—পেট ভরবে না।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ নাম তোমার ভূপতি। তা হরির ইচ্ছায় নাম আর কাম এক হয়ে গেছে। তা আমি বলি কি—একটা পুষ্যি নাও। আমার ঐ ছোট ছেলেটা, দেখেছো তো—নাম রেখেছি নৃপতি। মিলবে ভালো, কি বলো!

ভূপতি ॥ না—না, পুষ্যি-টুষ্যি নয়। কি আমার আছে যে পুষ্যি নেবো। ওসব লোভ ক'র না প্রাণকেষ্ট। তবে—হ্যাঁ, জমি দাও—তোমার দক্ষিণা আমি দিয়ে যাব। চলি, জমিগুলো দেখে আসি। [প্রস্থান]

চরণ দাস ॥ ষাট্—ষাট্। ছেলে দেওয়া কেন, স্যার। ঐ দক্ষিণাই ভালো। তা আমি চরণ দাস। ছিটেফোঁটা দিয়ে আমাকে চরণে রাখবেন স্যার।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হবে, হবে—তোরও হবে। হরি হে, তুমিই সত্য!

[উদ্দেশে প্রণাম, পশ্চাতে চরণদাস প্রণাম জানালো এমন ভঙ্গীতে যেন দেখে মনে হ'ল তার লক্ষ্য হচ্ছেন—আর কেউ নন, স্বয়ং প্রাণকৃষ্ণ নায়েব। প্রবেশ করলেন জমিদারদের ছোট তরফের ভূতপূর্ব জমিদার বরুণবাবু। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। গৌরবর্ণ চেহারা। সুপুরুষ বলা যেতে পারে। জমিদারি আর না থাকলেও রূপের আভিজাত্য আছে। চরিত্রে অমায়িক ও নমনীয় এবং মনে আদর্শবাদী হ'লেও এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা অস্বীকার করা কঠিন।]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ এ কি—এ কি! হরির আবার এ কি ইচ্ছা! ছোট তরফের ভূতপূর্ব হুজুর স্বয়ং শ্রীল শ্রীযুক্ত বরুণকুমার চৌধুরী। এ কি সৌভাগ্য! ব'সতে আজ্ঞা হ'ক!

বরুণ ॥ ভণিতা রাখো নায়েব। জমিদারি ছেড়ে দিয়ে ঠিকেদারি নেবার পর তোমাদের কাছে আমার জাত গেছে। আমার যা বলবার তা আমি দাঁড়িয়েই ব'লে যাচ্ছি। দু'বার অনাবৃষ্টিতে গাঁয়ের জমিতে ফসল হয় নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা ডেকে আমরা ঠিক করেছি অঞ্জনা নদী থেকে একটা সেচ-খাল কেটে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে হরিণডাঙ্গার বিলে মিশিয়ে দেবো। তুমি জানো নায়েব, জমিদারি এখন আমার নামে কিছু নেই। যেটুকু আছে, মার নামে আছে। মার ত্রিশ বিঘা জমির ওপর দিয়ে এই সেচ-খাল যাচ্ছে। এই ত্রিশ বিঘায় প্রজাদের উপকার হবে জেনে আমার মা সানন্দে ছেড়ে দিয়েছেন—এও তুমি জানো।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ জানি। হরির ইচ্ছায় জানি বৈকি। হাড়ে হাড়ে জানি। তিনি দিয়েছেন ব'লেই না, গ্রাম পঞ্চায়েতের এখন দাবি—আমাদের বড়ো তরফের চল্লিশ বিঘা খাস জমি এই কাজে ছেড়ে দিতে হবে। সদরে এইসব রিপোর্ট আমি পাঠিয়েছি। কিন্তু হরির কি ইচ্ছা, কেই বা তা শুনছে, কেই বা তা দেখছে !

বরুণ ॥ সদরে তুমি নিজে যাবে নায়েব। আজ থেকে দশ দিনের ভেতর আমরা বড় তরফের মতলবটা জানতে চাই। দশ দিন বাদে সভা আবার হবে। সেই সভায় যা করবার আমরা করব।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ তাই করুন। জানেন তো, সদরে গিয়ে সেই গোলোকবিহারী হরির দেখা পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। তাই তো বলি—হরি হে তুমি আছ এই মনে। মনে মনেই তার বাসনাটা বুঝি এবং বুঝেই বলছি, ও জমি দেওয়া যাবে না।·····এ কি, আবার তোমরা যে ?

[গোপাল, মানিক ও শশী সমেত আলোকের প্রবেশ।]

গোপাল ॥ এই নিন। আপনার ষাট টাকা ছ' পয়সা। [চরণ দাসকে] লিখুন রসিদ, দিন ফারক।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ মানে। ব্যাপার কি ? হরির আবার এ কি ইচ্ছা হে ?

গোপাল ॥ [আলোককে দেখিয়ে] এই যে ইনি, এই বাবুটি মানুষ নন, দেবতা।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরির ইচ্ছায় দেবতা তো বাবা তেত্রিশ কোটি। তা, ইনি কোন্ দেবতা ?

আলোক ॥ দেবতা-টেবতা নই। কলকাতায় সেদিন জমিদার বাড়িতে আপনাদের জমিদারবাবুর দেখা পাবার জন্য এদের সঙ্গেই ধর্না দিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা তো হ'লই না, মধ্যে থেকে এদের সঙ্গেই খেলুম অর্ধচন্দ্র। লাভ হ'ল শুধু এই—এতকাল যাদের কথা অর্থশাস্ত্রের পাতাতেই প'ড়েছিলাম, স্বকর্ণে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনবার সুযোগ হ'ল। অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবারও ইচ্ছা হয়েছিল সেদিন। তাই আজ আগে এসে পৌঁছেছি এই গ্রামে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথম বাড়ি দেখলাম—এই গোপালদের বাড়ি। আমাকে দেখেই হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। গিয়ে দেখি, এর বাপ মহাদেব মণ্ডল খাজনা দিতে না পারায় মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। কোন রকমে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ছুটে এলাম আমরা টাকা নিয়ে। টাকাটা নিন। সাত পুরুষের ভিটেমাটি—তা থেকে ঐ অসহায় বৃদ্ধকে উৎখাত করবেন না, নায়েব মশাই !

প্রাণকৃষ্ণ ॥ তা বলুব, খুব দয়া আপনার। কিন্তু জানেন তো, রাখে হরি মারে কে—মারে হরি রাখে কে। ও তো মরেছে। নালিশের হুকুম চ'লে গেছে। জানেন তো, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। কি করব দয়াময়!

আলোক ॥ [গোপালকে] তুমি ভেবো না ভাই। হ'ক না নালিশ। আদালতে টাকা দাখিল ক'রে দিলেই চলবে। চল ভাই, শিগ্‌গির তোমার বাবাকে গিয়ে দেখি।

বরুণ ॥ দয়া ক'রে একটু দাঁড়ান। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?

আলোক ॥ বাপ-মায়ের দেওয়া পরিচয় একটা অবশ্য ছিলো। কিন্তু সেটা দিতে স্পৃহা নেই। মানুষের সত্যিকার পরিচয় তার কাজে—নামে নয়। এখানকার চাষীদের মধ্যে থেকে এখানকার চাষীদের—এখানকার প্রজাদের দুঃখ দূর করতে যদি এতটুকু পারি, আমার পরিচয় পাবেন সেদিন, আজ নয়।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরির কৃপায় পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যক আমার নেই। শ্রীকৃষ্ণের শত নাম, দয়াময়ের কি একটা নামও নেই?

আলোক ॥ যদি বলি আমার নাম আলোক রায়, আপনি খুশি হবেন?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ আমাদের খোকা-হুজুরের নাম নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে। আচ্ছা, দেখি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই এ গাঁয়ে কোথায় মেলে?

বরুণ ॥ আসুন ভাই, আমার বাড়ি আসুন।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ উঁহু। তা চলবে না, ছোটবাবু। হরির ইচ্ছা তা নয়। আমাদের খোকা হুজুরের সঙ্গে আপনার ভগ্নীর বিয়ে, অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। আপনি নিজে জমিদারি চালানো ছেড়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনার মাকে তো আমরা জানি। হরির ইচ্ছায় তিনি এখনো সেই রায়বাঘিনীই আছেন। "আলোক রায়" নাম নিয়ে তাঁর হবু জামাই সাজবার শখটা কেমন ক'রে তিনি মিটিয়ে দেবেন, সে জানেন শ্রীহরি; আর তাঁর কৃপায় জানে এই প্রাণকেষ্ট।

বরুণ ॥ তুমি এসো তো ভাই, আমার সঙ্গে। আমার মাকে আমি চিনি না, চেনেন উনি। এসো।

আলোক ॥ যাব দাদা, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তার আগে আমি যাদের চিনি তাদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

বরুণ ॥ বেশ তো, চলো ভাই, আমিও যাবো। তুমি আমাকে অবাক করেছ, তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

[গোপাল প্রভৃতিদের সঙ্গে আলোক ও বরুণের প্রস্থান। প্রাণকৃষ্ণ ও চরণদাস যুগপৎ বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[ছোট তরফ চৌধুরীর গৃহ। বরুণ চৌধুরীর মা জগত্তারিণী দেবীর "সাক্ষাৎকার কক্ষ"—ঠাকুর-দেবতার ছবি ও জমিদারের পূর্ব পুরুষদের তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে। আসবাবের মধ্যে কতকগুলি সুদৃশ্য মোড়া সাজানো। একদিকে চন্দনকাঠের সুখাসন তার ওপর মৃগচর্মের আসন পাতা। সামনে একটা ঘণ্টা। সাজানোর দিক থেকে শুধু আভিজাত্য নয়, সুরুচির পরিচয়ও মেলে। জলানাপদি পরিবেশনের জন্য কয়েকটি চতুষ্কিও আছে মোড়াগুলির সামনে। ধূপের গন্ধে কক্ষটি সর্বক্ষণ আমোদিত। বরুণ ও আলোক ঘরে দাঁড়িয়ে কথোপকথনে রত। এমন সময়ে দৃশ্য উন্মোচিত হ'ল]

বরুণ ॥ এই হ'ল গিয়ে আমার মার দরবার-কক্ষ মানে, বুঝলে কিনা' যাদের তিনি তলব করেন বা দেখা দিতে চান, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ—কথাবার্তা হয় এই ঘরে।

আলোক ॥ ঘরটি তো বেশ। কিন্তু একে জমিদার-গৃহিণী, তাতে আবার নায়েব বলছিল রায়বাঘিনী, আমার ভয় করছে দাদা।

বরুণ ॥ কিছু না—কিছু না। মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। এই চণ্ডীতে পড়ো নি—"চিত্তে কৃপা সমরে নিষ্ঠুরতা"—। মা যেন সেই চণ্ডী।

আলোক ॥ ও রে বাবা!

বরুণ ॥ না না, তোমার কিছু ভয় নেই। তোমার জন্য তোমাকে শুধু দু'টি টিপ্ দিয়ে রাখছি। প্রথমটা হ'ল এই—তোমার ঐ আলোক নাম এখানে বলবে না। শুনলেই চটবে। কারণটা তো নায়েবের মুখে শুনলে! বড় তরফের খোকা-রাজার সঙ্গে ক্ষমার বিয়ে অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। মানে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ আর কি! বিপদ হয়েছে এই সেই খোকা-রাজার নাম হ'ল গিয়ে ঐ আলোক রায়। তোমার কি আর কোন নাম-টাম নেই, ভাই?

আলোক ॥ তা অবশ্য আছে! দাদু আমাকে ঢোলক ব'লে ডাকেন।

বরুণ ॥ ঢোলক! ঢোলক আবার একটা নাম নাকি? না না, ভাই; ও ঢোলক-টোলক নয়, তুমি বরং একেবারে পুলক হয়ে যাও। কেমন! পুলক —মানে তোমাকে দেখলেই কেমন একটা পুলক হয় কিনা! তাই। [ভিতরে আট ঘটিকার ঘণ্টা বাজল] এই যা, ঐ আটটা বাজল, মা এবার পুজো ছেড়ে উঠলেন। এসে পড়লেন ব'লে। দ্বিতীয় টিপটা তোমাকে বুঝি আর বলা হল না। শোনো, দু' কথায় ব'লে দিচ্ছি! প্রণাম করবে, না-না নমস্কার নয়— একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে। হ্যাঁ, আর মোক্ষম কথা হ'ল গিয়ে তোমার মন যেটা চাইবে না মুখে সেটাই চাইবে। ব্যস্, তবেই হয়ে গেল। বুঝছ না! এই ধরো, তুমি যদি এখানে থাকতে চাও, তো বলবে—থাকবো না! আর এক-বার যদি বল থাকবো না, তখন ওঁর জিদ যাবে চেপে। তুমি যাবে কোথায় তোমাকে বেঁধে রাখবেন……এই যে, এসে গেছে, মা এসে গেছে।

[প্রৌঢ়া বিধবা জগত্তারিণীর প্রবেশ। চেহারা দেখলে চণ্ডীতে উক্ত দুর্গাদেবীর কথাই মনে পড়ে। পশ্চাতে ছিল ও'র অনূঢ়া যুবতী কন্যা "ক্ষমা"। জগত্তারিণী তার উপস্থিতি অনুভব ক'রে তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে সে (ক্ষমা) পর্দার আড়ালে স'রে গেল।]

বরুণ ॥ মা সেই ছেলেটি।

[আলোক অভ্যাসবশতই করজোড়ে নমস্কার জানাতে যাচ্ছিল—বরুণ কৃত্রিম কাশি এনে আলোককে ইঙ্গিতে সচেতন ক'রে দেওয়ায় সে তাড়াতাড়ি ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো।]

বরুণ ॥ এ কালের ছেলে হয়েও কি রকম সহবৎ দেখেছ মা! "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি"=ছেলেটি যে বিদ্বান, এম-এ পাস।

জগত্তারিণী ॥ বেঁচে থাকো বাবা, সুখী হও। [বরুণের দিকে তাকিয়ে] তা আমার হবু জামাইও এম-এ পাস দিয়েছে শুনেছি। তা তোমার নাম কি, বাবা?

আলোক ॥ নাম? হ্যাঁ, নাম……

[ব'লেই বরুণের দিকে তাকালো] তার বিহ্বলভাব লক্ষ্য ক'রে সহজেই বুঝা যায় সে বরুণের দ্বিতীয় "টিপ্" অর্থাৎ নামের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।]

[বরুণকে] বলুন না আপনি?

বরুণ ॥ না, না। নিজের নাম বলতে লজ্জা কি? এতটা বিনয় ভাল নয়। আর তোমার নাম তো বেশ ভালো নাম, শুনলেই লোকের আনন্দ হয়।

আলোক ॥ হ্যাঁ, আমার নাম আনন্দ। … আনন্দ রায়।

জগত্তারিণী ॥ আনন্দ ! তা আমার হবু জামাইয়ের নামটাও বেশ… আলোক। বরুণের ইচ্ছা আমার মেয়েকে তুমি একটু ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাও। পরপুরুষের কাছে মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, এটা আবার আমার ইচ্ছা নয়। আমি বলছিলাম, বিয়েটা হয়ে যাক্। লেখাপড়া যদি শেখাতেই হয়, সে আমার 'আলোক'ই শিখিয়ে নেবে !

আলোক ॥ মা, সেটাই হওয়া উচিত।

জগত্তারিণী ॥ [চ'টে] সেটাই হওয়া উচিত! কী উচিত, কী না উচিত তা তোমার মতো বালকের কাছে আমি শিখব না, আনন্দ। বিয়ের রাতেই এম-এ পাস জামাই যখন দেখবে, মেয়েটি আমার লেখাপড়ায় একেবারে কাঠ… জামাইয়ের মন তখন ভেঙ্গে যাবে না তাই ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করেছি, আমার মেয়েকে এখন তৈরি ক'রে রাখাই ভালো। বরুণের কাছে আমি তোমার সব কথাই শুনেছি আজ থেকে এই বাড়িতে তোমাকে থাকতে হবে। আমার মেয়েকে পড়াতে হবে।

বরুণ ॥ [আলোককে] কেমন !

আলোক ॥ [তৎক্ষণাৎ] হ্যাঁ !

জগত্তারিণী ॥ [চ'টে] হ্যাঁ, মানে ?

আলো ॥ হ্যাঁ মানে—না। আমি থাকবো না—থাকতে পারব না।

জগত্তারিণী ॥ বরুণ, আমি খুশি হয়েছি। [আলোককে] সত্যই আমি খুশি হয়েছি।

বরুণ ॥ কিন্তু মা, আমার কথাটাও তুমি একবার ভেবে দেখ। এম-এ পাস বরের উপযুক্ত ক'রে তুলতে গেলে এম-এ পাস মাস্টারই ওর চাই। তুমি খুশি হ'লে তো চলবে না মা !

জগত্তারিণী ॥ খুশি হব না ! ছেলেটির এই সৎচরিত্র দেখে আমি খুশি হব না ! মাস্টার রাখতে হ'লে সৎচরিত্র ভদ্র মাস্টার চাই।

বরুণ ॥ তাই বলো মা। কিন্তু ওর স্পর্ধা দেখেছো ! তোমার মুখের উপর সটান ব'লে দিলো কিনা—থাকবো না—পড়াবো না !

জগত্তারিণী ॥ [হেসে, আনন্দকে] তুমি এ গাঁয়ে নতুন এসেছ বাবা, তাই আমাকে জানো না। আজ অবশ্যি ঐ হতচ্ছাড়া ছেলে ওর বাপের জমিদারি বেচে দিয়ে ন্যাংটা হয়ে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিখ মেগে খাচ্ছে !

বরুণ ॥ না না, এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি। আমি ঠিকেদারি ক'রে খাচ্ছি— ভিক্ষে ক'রে নয়।

জগত্তারিণী ॥ [চ'টে গিয়ে] ভিক্ষে ক'রে খায় দুনিয়ার সবাই—খায় না শুধু জমিদার বুঝলে বাবা, আমি সেই জমিদারণী। বছর দশেক আগেও

আমার হুকুমে কত অবাধ্য লোক যে গুমখুন হয়েছে, কত লাশ যে পাচার হয়েছে—এ গাঁয়ের লোকেরা এখনো তা চুপি চুপি ব'লে থাকে, বাবা। তা হ'লে তুমি থাকছ বাবা ? পড়াচ্ছ ?

[আলোক বরুণের মুখের দিকে তাকাল, বরুণ চোখ-টিপে বারণ করল।]

আলোক ॥ [উচ্চকণ্ঠে] না, আমি পারবো না।

জগত্তারিণী ॥ বটে। ক্ষমা—!

[ক্ষমা ছুটে এল]

ক্ষমা ॥ মা।

জগত্তারিণী ॥ তোর সেলেট-পেনসিল, দোয়াত-কলম, বই-খাতা !

ক্ষমা ॥ আনছি মা ! [ছুটে চ'লে গেল]

জগত্তারিণী ॥ থাকবো না—পড়াবো না। সেই ভীমে ডাকাত—এতদূর সাহস—আমার পালকিতে হানা দিয়েছিল। পালকির ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বললাম—পালাও। সেও পালাবে না—যাবে না। ফল কী হয়েছিল, বল না হতচ্ছাড়া !

বরুণ ॥ খাঁড়া নিয়ে মা পালকি থেকে লাফিয়ে নেমেছিলেন। [আলোককে] তারপর বুঝেছ তো, একেবারে কচুকাটা। সেই থেকেই তো মা'র খেতাব হ'ল রায়বাঘিনী।

জগত্তারিণী ॥ থাকবো না—পড়াবো না।

[গাদাপ্রমাণ পুঁথিপত্র, বই প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে ক্ষমার প্রবেশ।]

জগত্তারিণী ॥ ওখানে রাখ। [একটি চতুষ্কির ওপর সব রাখল] তোর গুরু—প্রণাম কর। [ক্ষমা আলোককে প্রণাম করিল।] বোস্। [বসিল] আমরা যাচ্ছি ! যদি না পড়ায়, হ'ক না কেন তোর নাম ক্ষমা—ক্ষমা করবি না ওকে। [ঘণ্টা দেখিয়ে] ঘণ্টা বাজাবি।

ক্ষমা ॥ বাজাবো।

জগত্তারিণী ॥ আয় বরুণ। আমার বাঘাকে ওরা হয়তো এখন খেতে দেবে। আমি গিয়ে খাওয়াটা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। বাঘা আজ ভোজ খাবে, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে খাবে মানুষের মাংস—যদি একবার এই ঘণ্টা আজ বাজে। আয়—

[জগত্তারিণীর রাগতভাবে প্রস্থান। বরুণও পিছন পিছন গেল]

আলোক ॥ আপনার নাম ক্ষমা, এটাই যা ভরসা।

ক্ষমা ॥ আমি ক্ষমা ব'লেই যে ক্ষমা করবো, তার কোন মানে নেই! আপনার নাম তো আনন্দ, কিন্তু কোন আনন্দ তো আপনার দেখছি না!

আলোক ॥ বাঃ, আপনি তো বেশ কথা বলতে পারেন। পড়াশুনা কতদূর করেছেন?

ক্ষমা ॥ রবিঠাকুরের কবিতা আর গল্প, আর শরৎবাবুর নভেল—লুকিয়ে চুরিয়ে যতদূর প'ড়ে নেওয়া যায়, তা পড়েছি। কিন্তু আমি আপাতত আপনার কাছে পড়তে চাই ভূগোল।

আলোক ॥ ভূগোল!

ক্ষমা ॥ ঠিক ভূগোলও নয়, তবে যেটা জানতে চাই, সেটা ভূগোলের মধ্যে গিয়েই পড়ে। এই ধরুন, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কোন্‌টি?

আলোক ॥ কাশী। তার আরেক নাম—বারাণসী। ইংরেজ আমলে বলত বেনারস—স্বাধীন আমলে দাঁড়িয়েছে বানারস।

ক্ষমা ॥ জানেন দেখছি। ধরুন, এই বানারসে যদি আমি এখন যেতে চাই, তা হ'লে সবচেয়ে কম সময়ে যাওয়া যায় কোন পথে?

আলোক ॥ আমি ভুলে যাচ্ছি, আমি মাস্টার না ছাত্র।

ক্ষমা ॥ ও হ্যাঁ তাও তো বটে! কিন্তু ধ'রে নিন না, আপনিই এ প্রশ্ন করছেন, আমি তার উত্তর দিচ্ছি। ভুল হ'লে আমাকে বলবেন।

আলোক ॥ ভুল হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। এখন আমি ভুল ক'রে না বসি, সেইটে ভয়।

ক্ষমা ॥ আপনার এত ভয় কেন?

আলোক ॥ ঐ ঘণ্টাটা আপনার পাশেই রয়েছে কিনা। আচ্ছা, কুকুর সম্বন্ধে আগে একটু পড়াটড়া হ'ক না? কুকুর গৃহপালিত প্রভুভক্ত জন্তু—এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু কুকুর মানুষকে কতটা ঘায়েল করতে পারে? মেরে ফেলতে পারে? এই বাঘা জাতীয় কুকুরের কথা বলছি ধরুন!

ক্ষমা ॥ বাঘা-জাতীয় কুকুর একটা মানুষকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। দেখতে চান।

আলোক ॥ না, না। আপনি বলছেন এতেই আমি মানসচক্ষে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি। থাক্, কুকুর প্রসঙ্গ এখানেই থাক্—বরং আপনি ঐ যে কি বলছিলেন—আপনার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ—সেই বানারসের কথা বলুন। হ্যাঁ, তা—আপনি বানারসে যেতে চান, সব চেয়ে কম সময়ে কোন পথে! প্রথমেই যেতে হবে কলকাতা, তার পর হাওড়া।

ক্ষমা ॥ মাপ করবেন, এই আপনার বিদ্যার বহর! হাওড়া না দমদম। ট্রেন না প্লেন!

আলোক ॥ ও, তাও তো বটে! তা দেখুন, সেটা অবশ্য মনের ব্যগ্রতার ওপর নির্ভর করে। আপনার মনের ব্যাকুলতার পরিমাপটা তো আমার জানা নেই, ক্ষমা দেবী। ৯৮ ডিগ্রি হ'লে গরুর গাড়ি। ১০৫ ডিগ্রি হ'লে প্লেন। তার ওপরে উঠলে মনে মনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

ক্ষমা ॥ সে কী!

আলোক ॥ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়েন নি, তাই জানেন না।

কাঞ্চিপুর—বর্ধমান ছ' মাসের পথ।
একদিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥

ক্ষমা ॥ আপনি না পড়িয়ে রসিকতা করছেন!

আলোক ॥ [চট্ ক'রে ঘণ্টাটি টেনে এনে নিজের কাছে রেখে] আমাকে ক্ষমা করুন।

ক্ষমা ॥ কিন্তু সেটা জেনে আমার রাগ হচ্ছে না। যে-কোন ভাবে যে কোন পথে বানারসে যাবার কথা উঠলেই আমার ভাল লাগে। কত তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে পারি, তাই রাতদিন ভাবি। কেন জানেন? আমি আমার বিশ্বেশ্বর দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। তিনি ভোলানাথ কিনা, আমায় ভুলে আছেন। কিন্তু আমি তো ভুলে থাকতে পারি না। এই পাষাণপুরীতে বন্দী থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমাকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন সেখানে?

আলোক ॥ শক্ত প্রশ্ন। আমাকে সব কিছু ভেবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, ক্ষমা দেবী। আমার অন্তহীন ভাবনার মধ্যে এই ঘণ্টাটাও একটা মস্ত স্থান জুড়ে আছে কিনা।

[জগত্তারিণী দেবীর প্রবেশ। তাঁর হাতে জলখাবার। আসন ও জল নিয়ে একটি
তরুণী এল। তরুণীটি গ্রামেরই এক তরুণ চাষার বউ। গাঁয়ের মহাদেব
মণ্ডলের সে পুত্রবধূ—গোপালের স্ত্রী। অল্প বয়েস, হাসি
হাসি মুখখানাতে লক্ষ্মী-শ্রী ফুটে আছে।]

জগত্তারিণী ॥ কিন্তু ঘণ্টা তো বাজল না একবারও! তা হ'লে মাস্টার পড়াচ্ছে·· ভালই পড়াচ্ছে!

ক্ষমা ॥ হ্যাঁ মা।

জগত্তারিণী ॥ হ্যাঁ মা! তবেই তো গোলমাল। তোমাকে তো আমি জানি। যে মাস্টার পড়ায় না, সেই তোমার কাছে ভালো। নাঃ, আমায় বসতে

হ'ল। তা মাস্টার, তুমি একটু জল খাবে এসো! হাঁ ক'রে দেখছিস কি হাসি, আসনটা পেতে দে!

[হাসি আসন পেতে দিল, জগত্তারিণী জলখাবারের প্লেটটা সাজিয়ে দিলেন]

[আলোককে] এসো। [ক্ষমাকে] তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চট্‌ ক'রে তোমার জলখাবার খেয়ে এসো!

ক্ষমা ॥ আমার খিদে নেই মা।

জগত্তারিণী ॥ [রোষকষায়িত নেত্রে তাকিয়ে] হাসি।

ক্ষমা ॥ মানে এত খিদে পেয়েছিল যে, খিদেটা ম'রে গিয়েছিল। যাচ্ছি মা।

[ছুটে চ'লে গেল, আলোকও সভয়ে এসে আসনে বসল।]

আলোক ॥ কিন্ত এত কি ক'রে খাব আমি।

জগত্তারিণী ॥ খেতেই হবে বাবা, নইলে শরীর টিক্‌বে কেন?

আলোক ॥ তা আপনি যখন বলছেন, আমি সব খাব। কিছু ফেলব না।

জগত্তারিণী ॥ না—না। সব তোমাকে খেতে হবে না, যেটুকু পারবে সেটুকু খাবে।

[বিনা বাক্যব্যয়ে আলোক খাওয়া শুরু করিল। হাসি পাখা নিয়ে বাতাস করছে]

জানো, আমার এই ক্ষমার বিয়ে ছোটবেলা থেকে ঠিক হয়ে আছে। ঐ যে বলেছিলাম, সেই আলোক রায়ের সঙ্গে। এই গাঁয়েরই বড় তরফের জমিদার মহীপাল রায়ের একমাত্র ছেলে। ছেলের মা ছিল আমার একমাত্র 'গঙ্গাজল'। কিন্তু কপাল দেখ, ছেলে হ'তে না হ'তেই সূতিকায় মারা গেল। ছেলে এখন মানুষ হচ্ছে দাদামশায় ও দিদিমার কাছে কাশীতে। শুনেছি, এম-এ পাস দিয়েছে—হীরের টুকরো ছেলে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ—এমনটি আর দেখা যায় না।

হাসি ॥ তা মা, এই দাদাবাবুই বা কম কি? আমাদের বাড়িতে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন, তখন যেন পূর্ণিমার চাঁদ হেসে উঠল!

জগত্তারিণী ॥ হাসি!

[হাসি পাখা ফেলে পালিয়ে গেল। আলোকও উঠে দাঁড়িয়েছে]

খেতে খেতে উঠে দাঁড়ানোর মানে? তুমি ঐ ছোটলোকের বাড়ি গিয়েছিলে?

[আলোক টপ ক'রে ব'সে পড়ল]

আলোক ॥ গিয়েছিলাম। ওর শ্বশুর মহাদেব মণ্ডল—তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় আপনাদের ঐ বড় তরফের জমিদারের কলকাতার ঐ কাছারি-বাড়িতে। কিন্তু আপনাদের জমিদারবাবু এমন,—ধর্না দিয়ে ব'সে থেকেও আমরা দেখা পেলাম না। বিতাড়িত হয়েই এলাম।

জগত্তারিণী ॥ এই পাপেই তো জমিদারি যেতে বসেছে। প্রজার সঙ্গে যোগাযোগ এখনকার জমিদাররা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রজার সুখ দুঃখের দিকে এতটুকু দৃষ্টি নেই। আমি তো জানি, মহাদেবের কী দুঃখ। এত মেহনত করে তবু ভাত জোটে না। তাই ওর ছেলের বউ—ঐ হাসিকে আমি আমার বাড়িতে কাজকর্মের জন্য রেখে খাওয়া পরা, বেতন সবই দিচ্ছি। কিন্তু ওকে আর আমি রাখব না। ওর এত বড় সাহস—আমার মুখের ওপর ব'লে গেল, আমার আলোক কিছুই নয় আর তুমি হ'লে পূর্ণিমার চাঁদ!

আলোক ॥ [কৃত্রিম বিরক্তিতে] ওকে রাখবেন না। বড় চঞ্চল স্বভাব, শুধু ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। আমি ওকে দেখতে পারি না। আপনি আজই ওকে ছাড়িয়ে দিন।

জগত্তারিণী ॥ ছাড়িয়ে দেবো কি দেবো না, সেটা আমি ভাবব। তোমার বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে নাকি আমাকে? এই দরদ নিয়ে মহাদেব মণ্ডলের হয়ে ওকালতি করতে গিয়েছিলে জমিদারবাড়ি। তোমাদের চেনা দায়! আমি ওকে ছাড়িয়ে দিলে ওরা না খেয়ে মরবে, তা জানো! কিন্তু তোমাকে আমি খেতে বলেছি, হাঁ ক'রে গল্প শুনতে নয়।

[আলোক চট্-পট্ খেতে লাগল। ব্যস্তসমস্তভাবে অন্দরের পথে
বরুণ ও তৎপশ্চাৎ ক্ষমার প্রবেশ]

বরুণ ॥ মা, কাশীর চিঠি এসেছে। তোমার হবু জামাই নাকি কাশী থেকে উধাও।

জগত্তারিণী ॥ বলিস কি বরুণ!

বরুণ ॥ হ্যাঁ, এই যে চিঠি। তার দাদামশাই লিখেছেন আমাকে। আর ওদের নায়েবের কাছেও চিঠি এসেছে। কোথায় সে গেছে, কেউ বল্‌তে পারছে না—কেউ খোঁজও দিতে পাচ্ছে না।

জগত্তারিণী ॥ সর্বনাশ! ওরে, আমি যে তাঁরই মুখ চেয়ে দিন গুনছি। মেয়েটা যে তার পথ চেয়ে ব'সে আছে।

বরুণ ॥ দেখ মা, এই ছেলেটি কিন্তু প্রথমে নাম বলেছিল আলোক রায়। এখন মনে হচ্ছে, আলোক যে উধাও, কোনরকমে কলকাতায় এ খবর পেয়ে আলোক নাম নিয়ে এখানে এসেছে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার লোভে।

জগত্তারিণী ॥ ওর নাম আলোক—এ কথা বলেছিল ?

বরুণ ॥ হ্যাঁ, মা। তখন আমার কোন সন্দেহ হয় নি।

জগত্তারিণী ॥ [আলোককে] বলেছিলে ?

আলোক ॥ বলেছিলাম।

জগত্তারিণী ॥ ঐ ছিরি আর ঐ হালচাল নিয়ে তুমি আলোক রায় ? বরুণ, এ একটা জোচ্চর।

বরুণ ॥ এখন কিন্তু মা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। পুলিসে দেবো ?

জগত্তারিণী ॥ কি, আমি বেঁচে থাকতে পুলিসে ? এখনো আমার বাঘা কুকুর আছে।

আলোক ॥ তাতে আমি ভয় পাই না। ছাড়ুন কুকুর, আনুন খাঁড়া। টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলুন আমাকে—আজই, এখনই। আমার শুধু এই আনন্দ, জীবনে কখনো কারুর কাছে হার মানেন নি আপনি—সেই হার মানতে হবে আপনাদের সেদিন—যেদিন বুঝবেন, আমিই আপনাদের আলোক রায়। হ্যাঁ, চোখের জলে পৃথিবী ভাসিয়েও সেদিন পথ পাবেন না আপনারা। [চিৎকার করিয়া] কই সঙের মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন কেন সব ? কুকুর আনুন, খাঁড়া আনুন।

বরুণ ॥ মা। কী হবে মা ?

জগত্তারিণী ॥ ওকে আর কিছু ব'লে দরকার নেই। ও যেমন ছিল তেমনি থাকবে আমার এখানে। [চিৎকার ক'রে আলোকের প্রতি] শুনলে ? আমার মেয়েকে যেমন পড়াচ্ছিলে, তেমনি পড়াবে। ঠিক ততদিন, যতদিন না আলোকের খোঁজ পাচ্ছি। যেদিন তাকে এখানে ধ'রে আনতে পারবো, সে দিন হবে তোমার শাস্তি। বছর দশেক আগে একটা চোর আমার ঘরে ঢুকে প'ড়ে ধরা পড়ে। তাকে আমি কি শাস্তি দিয়েছিলাম, বরুণ ?

বরুণ ॥ বাগানে আধমানুষ গর্ত করা হ'ল। চোরটাকে সেই গর্তে নামিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হ'ল। বাঘাকে রাখা হয়েছিল সারাদিন অনাহারে।

আলোক ॥ পরের টুকু আর না বললেও চলবে। তা হ'লে কি আবার আমি এখন পড়াবো ?

জগত্তারিণী ॥ ক্ষমা, পড়তে ব'স।

ক্ষমা ॥ কিন্তু মা, আমার মনে হচ্ছে উনি পালাবেন।

জগত্তারিণী ॥ যে ছেলে আমার বাঘাকে ভয় করে না, যে আমার খাঁড়ার ভয় রাখে না, রায়বাঘিনী জগত্তারিণী দেবীর মুখের সামনে যে মুখ উঁচু ক'রে কথা কয়—সে পালাবার ছেলে নয়। আমি জানি। এসো বরুণ, আলোকের খোঁজে লোক পাঠাতে হবে, কলকাতায়, এখনি।

বিরাম

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[ছ' মাস পরের ঘটনা······ইহাদের মণ্ডলের গৃহের মন্দিরের প্রাঙ্গণ উঠোনের এক পাশে তুলসীর মঞ্চ, দাওয়ার কাছে একটি খাটিয়া পাতা। গোপাল শুয়ে আছে। হাসি এল ভিতর থেকে। কাঁখে কলসি, হাতে শূন্য বরণডালা। সে সকৌতুকে স্বামীর পাশে ব'সে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে লাগল।]

হাসি ॥ এই, ওঠো না। বেলা যে গড়িয়ে গেল।

গোপাল ॥ [শুয়ে শুয়ে] যাক না। আমাকেও গড়াতে দে।

হাসি ॥ আচ্ছা, দিনে এত ঘুমোচ্ছ কেন বলো তো ?

গোপাল ॥ রাতে চুরি করব ব'লে !

হাসি ॥ কী চুরি করবে ?

গোপাল ॥ চুরি করবার ধন একটিই আছে !

হাসি ॥ কী ?

গোপাল ॥ কেন, তোর মন !

হাসি ॥ যাও। [গোপাল হাসল] না—না, ওঠো বলছি। কত কাজ এখনো বাকি রয়েছে।

গোপাল ॥ কী আবার কাজ বাকি রয়েছে ?

হাসি ॥ সন্ধ্যামণির ব্রতে যা যা লাগবে, সে সব যোগাড় করতে হবে না ? এই ধরো, সন্ধ্যামণির ফল—পাঁচটা। দুব্বো—পাঁচটা। আর নিজের জমির ধানের শীষ—পাঁচটা।

গোপাল ॥ ও, এই! আমি ভাবছিলাম, না জানি কী হাতি-ঘোড়া। তা, যা না—নিয়ে আয় না। সেজন্য আমাকে খোঁচাচ্ছিস্ কেন?

হাসি ॥ আর সব তো আমিই আনব। কিন্তু নিজের জমি থেকে পাকা ধানের পাঁচটি শীষ কেটে আনবে তুমি—আকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটবার আগে। সেই শীষ এনে তুমি নিজের হাতে পরিয়ে দেবে আমার খোঁপায়। তবে তো আমি ব্রতে বসতে পারবো।

গোপাল ॥ এ তো ভারী মজার নিয়ম! তা এ ব্রত তুই শিখলি কার কাছে।

হাসি ॥ ছোট তরফের মা-ঠাকরুণ। ওঁরাও করেন কি না। তাই তো ওঁদের এত জমিজমা—এত টাকাকড়ি। লক্ষ্মীঠাকরুণ যেন ওঁদের ভাঁড়ারঘরে ব'সে আছেন।

গোপাল ॥ ও, ছোট তরফে চাকরি নিয়ে অনেক কিছুই শিখেছিস দেখছি। তা এ ব্রতে পুরুত লাগে না?

হাসি ॥ পুরুত হবে তো তুমি গো, ঐ ধানের শীষ আমার খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে।

গোপাল ॥ আর, মন্তর?

হাসি ॥ সে পড়ব আমি। শুনবে?

[সন্ধ্যামণির ব্রতের ছড়াগান হাসি গাইতে লাগল]

সন্ধ্যামণি—সন্ধ্যামণি—মাথায় সিঁদুর দিয়া—
কার ঘরে দীপ জ্বালো তুমি অস্তাচলে গিয়া?
ক্ষণেক থামো সন্ধ্যামণি—তোমায় প্রণাম করি—
পরাণভরা অনুরাগের বরণ ডালা ধরি'।
যাবার পথে যাও গো প্রাণের ভক্তিটুকু নিয়া,
সন্ধ্যামণি—সন্ধ্যামণি—মাথায় সিঁদুর দিয়া!
কোথায় আছো সন্ধ্যাতারা একটুকু দাঁড়াও—
মাথায় পরি ধানের শীষ, পরে দেখা দাও!
ধানের শীষে আশিস্ আছে লক্ষ্মীদেবীর জানি—
অচল থাকুক আমার ঘরে তাঁরই আসনখানি।
যাবার পথে যাও গো জীবন আলোকে ভরিয়া—
সন্ধ্যামণি—সন্ধ্যামণি—মাথায় সিঁদুর দিয়া!

—উমা দেবী

গোপাল ॥ নাঃ, তোর মন্তরের জোর আছে! উঠতেই হ'ল। যাচ্ছি জমিতে।

হাসি ॥ সে এখন কি গো? তুমি বরং মাঠ থেকে গরুগুলো একটু সকাল-সকাল নিয়ে এসো। ওদের কপালেও আজ সি'দুর দিতে হয় কিনা!

গোপাল ॥ তবে তোর কপালেও দিতে হবে আমাকে।

হাসি ॥ সে তো দিয়েছ গো, আবার কবার দেবে?

গোপাল ॥ নিত্যি-নতুন দিতে সাধ যায় কিনা, তাই [হেসে প্রস্থান]

[ঘরের ভিতর থেকে মহাদেবের প্রবেশ]

মহাদেব ॥ গান গাইছিল কে রে বৌমা, তুই?

হাসি ॥ গান নয় বাবা, আজকে যে সন্ধ্যামণির ব্রত সাঙ্গ করব, তারই মন্তর।

মহাদেব ॥ তা এ ব্রত তোর শাশুড়ীও করত, কিন্তু কী হ'ল? জোতজমি কী থাকল? থাকল না তো। পঞ্চাশ বিঘে থেকে পাঁচ বিঘেতে এসে দাঁড়িয়েছে! মিছিমিছি উপোস ক'রে আছিস।

হাসি ॥ ঐ তো বাবা, তোমাদের বিশ্বাস নেই ব'লেই তো ফল হয় না। আমি তো শুনেছি, আমার শাশুড়ীকে তুমি মানতেই না। তোমার ছেলেরও সেই দোষ, আমাকে মানতেই চায় না।

মহাদেব ॥ বটে।

হাসি ॥ হ্যাঁ, বাবা। ঘরের বউকে মানতে হয়। ঘরের বউ তো লক্ষ্মী, না বাবা?

মহাদেব ॥ বটেই তো—বটেই তো। আচ্ছা ওকে আমি সমঝে দেবো। তা, হ্যাঁ রে—সেই বাউণ্ডুলেটাও নাকি আজ কলকাতা থেকে আসছে? গোপাল বলছিল।

হাসি ॥ তুমি কার কথা বলছ বাবা?

মহাদেব ॥ তোমার গুণধর দেওর—রাখাল, আর কে?

হাসি ॥ না বাবা, তুমি তাকে বড্ড বেশি বকো।

মহাদেব ॥ বকবো না? খেত-খামারের কাজ ছেড়ে দিয়ে কাঁচা টাকার লোভে পালিয়ে গেল কলকাতায়। লাভ তো হ'ল এইঃ কারখানায় কোন্ মিস্ত্রীর সাকরেদি করে আর বাডসাই ফুঁকে বেড়ায়। বাড়িতে একটা পয়সা দেবার নাম নেই। তা ভালই হয়েছে। নিজেরটা নিজে ক'রে খাচ্ছে, এই রক্ষে।

[অন্তরাল থেকে প্রাণকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মহাদেব বাড়ি আছো"।]

মহাদেব ॥ ও বাবা, এ যে নায়েবের গলা পালা, তুই শিগ্গির পালা।

হাসি ॥ পালাবো কেন বাবা ? এ আমার নিজের বাড়ি না ! ভয়টা কিসের ?

মহাদেব ॥ ভয় কিসের সে আমি জানি মা, আর জানে সুদাম। ঘর ভাঙতেই ওরা জন্মেছে, গড়তে নয়।

[ইঙ্গিতে তাকে সত্বর ঘরের মধ্যে চ'লে যেতে আদেশ ক'রে
প্রাণকৃষ্ণকে আহ্বান জানাল।]

মহাদেব ॥ আসুন, নায়েব মশাই, আসুন।

[হাসি ঘোমটা টেনে ঘরের ভিতর ছুটে পালাল—প্রবেশ করল প্রাণকৃষ্ণ]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরি গুরু—গুরু হরি। মনকৃষ্ণ—প্রাণকৃষ্ণ। জ্ঞানকৃষ্ণ—ধ্যানকৃষ্ণ। বোধকৃষ্ণ—বুদ্ধিকৃষ্ণ। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন বাজাবেন, আমি তেমনি বাজব। আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু কী হয় রে বাবা ? তোমাতেও তিনি। তাই বলছিলাম কী, আমায় একটু দয়া কর।

মহাদেব ॥ বলেন কী নায়েব মশাই, আমি দয়া করব আপনাকে ? ..... আপনার কথা শুনে আমার তো বড়ো ভয় হচ্ছে। আবার কী ফ্যাসাদে ফেলতে চান আমায় ?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরি—হরি। একটা সোজা কথা বলছি, অমন বাঁকা ক'রে দেখছ কেন ? মহাদেব, আমি তোমায় শুধু একবার কলকাতায় যেতে বলছি। সেই যে গিয়েছিলে ছ' মাস আগে। আরেকটিবার তেমনি যাবে কলকাতায়। না—না, খরচ-টরচও আমি দেবো। সেবার গিয়ে কিন্তু রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি, শুধু হাতেই ফিরে এলে। এবার গিয়ে দেখা করবে একেবারে খোদ পাটরাণীর সঙ্গে। আরে, তোমার ভাগ্নে-বউ চন্দনা গো। তিনিই তো এখন মহাশক্তি। তোমারও কাজ গুছিয়ে নাও, আমারও কাজ গুছিয়ে দাও।

মহাদেব ॥ আমাদের কুলে এ কালি মাখিয়েছ তুমি। আড়কাঠি হয়ে কলকাতায় সেই বউটাকে চালান দিয়েছিলে তুমি। আমরা কিছু জানতে পারি নি, মনে করেছও ! ওকথা আর তুলো না। তুললে ভালো হবে না, বলে রাখছি নায়েব।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ বেশ, তুলব না। পতিতা হয়েছে—পতিতপাবনই দেখবেন। আজ পতিত আমিও। পতিতপাবন সেই দয়াময় হরির দোহাই দিয়েই তোমাকে বলছি, আমায় দয়া করো। সদরের ঐ ম্যানেজার-শালা আমায় সদরে তলব ক'রে বলে কিনা—গভর্নমেণ্ট সব জমিদারি নিয়ে নেবে। কাগজপত্রের "বুঝারৎ"

দাও। হুকুম দিয়েছে, কাগজপত্র গাড়ি বোঝাই ক'রে নিয়ে যেতে হবে সদরে— থাকতে হবে সেখানে ছ' মাস। নিকেশ দিতে হ'লেই আমি নিকেশ। তুমি বাবা মহাদেব, ঐ পতিতাটাকে দিয়েই আমার পতিতপাবন হও। রাজাবাহাদুরকে ধরিয়ে ম্যানেজার-শালার ঐ হুকুমটা নাকচ করিয়ে দাও। আর এটা যদি দ্যাও, তোমার ঐ ভিটামাটির ডিক্রিও আমি সঙ্গে সঙ্গে নাকচ ক'রে দেবো।

মহাদেব ॥ অ্যাঁ!

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ।

[আলোকের প্রবেশ]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ এই দেখ ; হরির কী ইচ্ছা—মেঘ না চাইতেই জল। আসুন—আসুন আনন্দবাবু, আপনাকে দেখলেই আমার যেন কেন সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির শ্রীমুখখানি মনে পড়ে। মহাদেব, দেখছ কী—প্রভু এসেছেন তোমার বাড়িতে, একেবারে অঘ্রাণের সংক্রান্তিতিথিতে।

আলোক ॥ শুধু তো আমি নই মহাদেব। তোমার গোপাল আর গোপালের বউ আমাদের অনেককেই আজ এখানে ডেকেছে, সন্ধ্যামণির প্রসাদ পেতে।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ সন্ধ্যামণির ব্রত! জয় গুরু—জয় গুরু। এসব ধর্মকর্ম তো দেশ থেকে উঠেই যাচ্ছিল। তা মহাদেব, হুজুররা যখন আসছেন, ভালো ক'রে বসবার-টসবার ব্যবস্থা করো। সেই ফাঁকে আমরা দু'টো কাজের কথা বলি।

[মহাদেবের প্রস্থান]

আলোক ॥ শুনতে রাজী আছি, যদি হরির নামটা মুখে না নেন।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ বেশ, হরি আমার মাথায় থাকুন। আপনি শুনুন। এই ছ' মাস তো মশাই আমাদের যুবরাজের খোঁজ পাওয়া গেল না হিংদ হয়েছে, ছেলেটা ছোট থেকে মানুষ হয়েছিল কাশীতে, বাঙলা মুলুকে কেউ তাকে দেখে নি। চেনেও না। এখন সব অনুমান হচ্ছে। কেউ বলছে, পালিয়ে গেছে বিলেতে—কেউ বলছে, খুন হয়েছে—কেউ বলছে, বিষ খেয়েছে! আমার দুঃখ কী জানেন আনন্দবাবু? মস্ত বড় একটা দাঁও আমার ফসকে গেল।

আলোক ॥ বলেন কী? আপনার তো মশাই বজ্র-আঁটুনি।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ বুঝি সেইজন্যই ফস্কা গেরো হয়ে গেল। কপাল মশাই—কপাল। ভেবেছিলাম, জমিদারি তো যেতে বসেছে—তা জমিদারির এই শেষ রাতে ওস্তাদের মারটা মেরে যাবো। কিন্তু তা হ'ল না। হয়, যদি আপনি আমার সঙ্গে কয়েকটি দিনের জন্য হাত মেলান মশাই!

আলোক ॥ আমি?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, আপনি। আপনার যুবরাজ চেহারাটা রয়েছে কিনা। এ গাঁয়ে এসে নামটাও নিতে গিয়েছিলেন—আলোক রায়। কলকাতায় খবরটা পেয়ে গাঁয়ে আসার মতলবটাও বোধ হয় তাই ছিলো। কিন্তু ঐ জগত্তারিণী দেবীর রক্তচক্ষু দেখেই বোধ হয় ঘাবড়ে গেছেন মশাই। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা বাগাতে গিয়ে অর্ধপথে হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন।

আলোক ॥ মস্তিষ্ক আপনার উর্বর, আমি স্বীকার করছি নায়েব মশাই।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ তা হ'লে হরির ইচ্ছায়····

আলোক ॥ আবার হরি?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ আচ্ছা—আচ্ছা, তিনি মাথায় থাকুন। আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমি রটিয়ে দি—এই যে ইনিই তিনি, আমাদের হারামণি। সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজ্যাভিষেক লাগিয়ে দি। তাতেও দু'পয়সা আসবে—আর আসবে কিছু খাস জমি। আর পুকুর-পুষ্করিণী পত্তন করে····আমার বুদ্ধি, আপনার দস্তখত! বখরা আধা-আধি। ও দু' মাসেই দু লাখ কামিয়ে নেওয়া যাবে।

আলোক ॥ তারপর?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ তারপর বে-গতিক দেখলেই আপনি কেটে পড়বেন।

আলোক ॥ আর, আপনি?

প্রাণকৃষ্ণ ॥ আমি? আমি বলব—জোচ্চরটা পালালো, ধরো—ধরো। না-না, আপনি ভাবছেন কেন, আপনি যদি যান ডাইনে, আমি দেখিয়ে দেবো বাঁয়ে।

[মহাদেব প্রবেশ ক'রে মাদুর পেতে দিল এবং
কাছে এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল]

প্রাণকৃষ্ণ ॥ তা হ'লে আনন্দবাবু, রাজী তো?

আলোক ॥ দাঁড়ান মশাই, এ কী ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে? আমি এ গাঁয়ে এসেছি একটা গবেষণা করতে। জমিদারের অধীনে প্রজাদের অবস্থা—চাষীদের অবস্থা—এসব দেখতে, বুঝতে। এসব আমায় দেখতে দিন, বুঝতে দিন—সব দেখেশুনে তবে তো!

প্রাণকৃষ্ণ ॥ ও, তার মানে বাজিয়ে নিতে চান?

আলোক ॥ তা একটু চাই বৈকি।

প্রাণকৃষ্ণ ॥ বেশ, আসুন। কাগজপত্র—সে তো আমার মুখে মুখে।

আলোক ॥ মুখোমুখিই হ'তে চাই যে, চলুন। [মহাদেবকে] আমি একটু ঘুরে আসছি মহাদেব।

[সুদামের প্রবেশ]

সুদাম ॥ বারে, তোমাদের গান শোনাতে এলাম, আর তোমরাই চ'লে যাচ্ছ ?

আলোক ॥ যাচ্ছি না, লোকজন ডেকে আনছি।

সুদাম ॥ আজ গাইব কৃষ্ণকালীর পালা। সেই যে রাধার মান রাখতে কৃষ্ণ সাজলেন কালী, আমি আয়ান ঘোষ, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম—সেই পালা গো !

প্রাণকৃষ্ণ ॥ হরিবোল—হরিবোল। ব্যাটা বৌয়ের শোকে একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

[আলোক ও প্রাণকৃষ্ণের প্রস্থান—শুরু করল সুদাম তার গান।]

ওগো, রাধা কি হয় কলঙ্কিনী।

প্রেমের কালি যতই লাগুক, রাধা কি হয় কলঙ্কিনী !

জটিল পথে ঘোরে মন কুটিল গতি অনুক্ষণ

তারাই করে প্রেমের হাটে ফাঁকি দিয়ে বিকিকিনি ॥

(তারা প্রেম বোঝা না, তন বোঝে না, মন বোঝে না, প্রেম বোঝে না !

অগ্নিসম রাধা-শক্তি শিখাময়ী শুদ্ধাভক্তি

হরণ তারে করবে কেবা, নিজেই পুড়ে হবে ছাই।

পরপ্রেম সহজ নয় পরকে আপন করা হয়

পরকীয়ায় ডুবে দেখ নিজের সত্তা কিছু নাই !

(সব লোপ পাবে গো, আপন চেতন, আপন সাধন, সব লোপ পাবে গো !)

রাখতে পরপ্রেমের মান করে প্রেমিক নিজস্ব দান—

নিজে কালা হলেন কালী কলঙ্ক কালিমা জিনি'।

নিত্য প্রেম-পারাবারে কেবা কোথা হারায় কারে

যে যারে পেয়েছে প্রেমে, কাছে রয় সে চিরদিনই ॥

—উমা দেবী

[গান শুনতে শুনতে খাটিয়ায় যেন শ্রান্তিবশেই শুয়ে পড়ল মহাদেব]

সুদাম ॥ এ কী মামা, ঘুমিয়ে পড়লে যে !

মহাদেব ॥ ঘুমিয়ে পড়লে তো দুঃখ নেই বাবা, জেগে উঠলেই দুঃখ। হ্যাঁ রে, এমন বিবাগী হয়ে আর কতকাল কাটাবি ? তোর বউ তোর কপালে লাথি

মেরে চ'লে গেল, তার কপালে তুই ঝাঁটা মেরে আরেকটা বিয়ে কর। মরবার আগে তোকে আবার ঘরসংসারী দেখে যাই।

সুদাম ॥ না মামা, বিয়ে আর করব না।

মহাদেব ॥ কেন রে, সুদাম ? তোর তো জোয়ান বয়েস, বিয়ে করবি না কেন ?

সুদাম ॥ না মামা। জোয়ান বয়েস মিছে, গায়ে অসুরের মতো শক্তি—তা-ও মিছে। তা যদি না হয়, তবে বউকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে পারি নি—এই কথাটাই সত্য হয় কেন ? সকাল থেকে সন্ধ্যে নিজের জমিতে হাল বলদ নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করেছি, যেন একটা দৈত্য। কিন্তু তাতে তো স্বামী-স্ত্রী—এই দু'টি প্রাণীর পেট ভরে নি। এমন লক্ষ্মী প্রতিমে বউ ছিল, বড় শখ ছিল হাতে এক জোড়া বালা পরে। আর শখ ছিল নীলাম্বরী শাড়ির। ভাত জোটে না, দেবো কোত্থেকে ? সে চ'লে গেছে—বেশ করেছে। আমি তার দোষ দিই না, কিন্তু নিজের দোষও তো খুঁজে পাই নে, মামা !

মহাদেব ॥ তুই ঠিক বলেছিস, সুদাম। দোষ যে আমাদের কোথায়, তা খুঁজে পাই না। এইতো দেখ আমি। আমার বড় ছেলে গোপাল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমরাও তো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছি। আমাদের ভাত জোটে না, দেনার পর দেনা হয়, জোতজমি নিলামে ওঠে এ কার দোষে ? কোন পাপে ?

সুদাম ॥ অদেষ্ট। জনে-জনে শুধিয়েছি মামা,—সবাই বলে, অদেষ্ট ! আমি ভাবি কী জানো মামা ? তাই যদি হয়, অদেষ্টই যদি হয়—তবে সৃষ্টিকর্তা ভগবান এই দুই হাতে এত শক্তি দিয়েছিলেন কেন ? মন ভ'রে এত আশা, চোখ ভ'রে এত স্বপ্ন বুক ভ'রে এত সাহস—কেন দিয়েছিলেন ? ফিরিয়ে নিক, —ফিরিয়ে নিক, স—ব ফিরিয়ে নিক।

[উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রস্থান। নদীতে স্নান সেরে হাসি প্রবেশ করল, হাতে পুজোর ডালা। ডালায় সব উপকরণ রয়েছে]

হাসি ॥ এ কী, ভাসুর-ঠাকুর চ'লে গেলেন বাবা ?

মহাদেব ॥ ওকে ধ'রে রাখবার লোক নেই মা।

হাসি ॥ কিন্তু আজ যে আমার সন্ধ্যামণির ব্রত। প্রসাদ না নিয়ে চ'লে গেলেন—যদি অকল্যাণ হয় বাবা।

মহাদেব ॥ ও পাগল হয়ে গেছে—ওর কথা ধরিস নে মা। আচ্ছা বউমা, মাঝে মাঝে মনে হয় আমিও যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আবোল-তাবোল বকি, না ?

হাসি ॥ তা তুমি বকো বাবা। কখন জানো? দুপুররাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তুমি এই তুলসীতলায় এসে চিৎকার ক'রে কাদের সঙ্গে কথা বলো। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াই! তখন আমাকেও তুমি চিনতে পারো না। কাদের সঙ্গে তুমি কথা বল বাবা?

মহাদেব ॥ আমার বাপ। [উঠে গিয়ে তুলসীতলায় একটা জায়গা দেখিয়ে] ঐ জায়গায় তার শেষ-নিঃশ্বাস পড়েছিল! আর মা—তার পড়েছে এইখানে [অন্য একটা জায়গা দেখালো]। আমার ঠাকুর্দা—তার জায়গা ঐটা। ঠাকুমা গেছে—ঐখানে। এ আমাদের সাতপুরুষের ভিটে। হও না কেন তুমি নায়েব, হও না কেন তুমি মহাজন, এতদূর সাহস তোমার—আমার এই স্বর্গ তুমি কেড়ে নেবে। আমি তোমাকে··[হাসির গলা টিপে ধরতে গেছে]

হাসি ॥ বাবা—আমি। আমি তোমার হাসি। [মহাদেবের যেন চমক ভাঙ্গল]

মহাদেব ॥ হ্যাঁ, মা। তুমি আমার হাসি। আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো! আসিস্ না—আর আমার কাছে আসিস্ না। মাঝে মাঝে আমার মাথা কেমন বিগড়ে যায়!· যা মা, তুই তোর কাজে যা··কর গিয়ে তোর সন্ধ্যামণির ব্রত··· ····তাতে যদি রক্ষা হয়।

হাসি ॥ হবে বাবা, নিশ্চয় হবে। আমি আমার তুলসী-নারায়ণের কাছে কিছু চাইছি না,···চাইছি শুধু মাথার ওপর কুঁড়ে ঘর, বিঘে দশেক জমি আর হাল-বলদ, পরণে খানদুই কাপড়, খানকতক বাসন, দু' বেলা পেট ভ'রে খাবার জন্য চারটি ডা'ল-ভাত। আর চাইছি মনের একটু আনন্দ মুখের একটু হাসি। তুমিই বল বাবা, এ কী আমরা খুব বেশি চেয়েছি তার কাছে। তুমি ভেবো না বাবা, কত লোক কত কিছু পায়, এটুকু আমরা পাব না?

[মহাদেব ততক্ষণে খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ বহির্দিক থেকে রাখালের প্রবেশ। ২১-২২ বছর বয়েস। পরনে খাকীর হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট—পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট]

হাসি ॥ একী, ডুমুরের ফুল ফুটল যে! বাবা, কলকাতা থেকে আমাদের সাহেব এসে গেছে।

মহাদেব ॥ কে ওটা?

হাসি ॥ ঠাকুরপো। আমাদের ব্রজের রাখাল। ব'স ঠাকুরপো। আমি পুজোর ডালাটা রেখে আসছি। [রাখালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে] আঃ, কী করছ?

[ব'লে নিজেই রাখালের মুখ থেকে সিগারেটটা টেনে ফেলে দিল]

রাখাল ॥ এঃ, আমার "চারমিনার"।

[হাসি যেতে যেতে একথা শুনে ফিরে ইঙ্গিতে একটা চল তুলল।]

রাখাল ॥ আঃ।

[হাসি হাসিমুখে ঘরে চ'লে গেল। রাখাল বাপের কাছে এসে দাঁড়াল।]

মহাদেব ॥ এসো বাবা, এসো। তা কলকাতার কারখানায় চাকরি নিয়ে খুব উন্নতি হয়েছে তো! তুই কোন্ এক মিস্ত্রীর সাকরেদ না? তা সেই তোর মিস্ত্রী বুঝি শিখিয়ে দিয়েছে গুরুজনকে পেন্নাম-টেন্নাম করতে নেই!

রাখাল ॥ বলছ, করছি। [ব'লে চট ক'রে প্রণামটা সেরে] কিন্তু কারখানার কায়দা কানুন সব আলাদা—ওখানে পেন্নাম-টেন্নামের বালাই নেই। আর সাকরেদ টাকরেদেরও আমি আর নই।

মহাদেব ॥ তবে তুই কী?

রাখাল ॥ আমি বাইসম্যান।

মহাদেব ॥ বাইসম্যান না হনুমান।

রাখাল ॥ ঠাট্টা নয় বাবা—বাইসম্যানের কাজ যা-তা নয়। আমার কাজ উকো ঘসা, ভোঁতা জিনিস চোখা করা। এমনি ক'রে রাম-দুই ···ব্যস্, তারপর ঘস্ ঘস্—ঘস্।

মহাদেব ॥ ব্যাটা উকো ঘসছে। এদিকে সাতপুরুষের চালচুলো যে ভোঁতা হয়ে গেল, সেখানে উকো কে ঘসবে বাবা?

রাখাল ॥ সেখানে উকো ঘসবার মতো বাইসম্যান এখনো জন্মায় নি। চাষীর চালচুলো—ও যাবেই। বয়লট্ চালিয়েও ও আর চালু করা যাবে না। ও ভেবে আর লাভ নেই। নাও বাবা, একটা "চারমিনার" খাও।

মহাদেব ॥ সিগরেট্—সিগরেট্ খাব আমি?

রাখাল ॥ শহরে সবাই খায় বাবা, আমাকেও খেতে হয়। আমার সুপুরি-ভাজা বলাই সিঙ্গী বলে—চা আর সিগারেট্ হ'ল মাইরি মজদুরদের বয়লট্ এ খেয়ে স্টীম না করলে না আসে তাগদ্··· না খোলে বুদ্ধি। তোমাদের চাষীদের যে কিছু হ'ল না, সে শুধু ঐ তামাক খেয়ে। বাবা ওটা ধরাও, টানো। আচ্ছা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

মহাদেব ॥ থাক্··· থাক্। কোলের ছেলে ব'লে বেঁচে গেলি।

রাখাল ॥ কেন? আমাদের সুপুরি-ভাজা ব'লে দিয়েছে··· তা বাপের সামনেও খেতে পারিস, হাতের আড়ালটা রাখিস। এই যে বাবা··· এমনি ক'রে।

[ব'লে সিগারেট ধরিয়ে হাতের আড়াল ক'রে টানতে লাগল]

মহাদেব ॥ তুই এখান থেকে যা দেখি রাখাল। আমার দম কেমন আটকে আসছে।

রাখাল ॥ তা গাঁয়ে ব'সে থাকলে দম আটকাবে বৈকি। চলো শহরে—কলের জল, বিজলী বাতি, পিচের রাস্তা—সব ঝক্‌ঝক্‌, তক্‌তক্‌। বিকেলে গড়ের মাঠ, আর রাতের বেলা টকী। এত ক'রে বলছি, চলো—তা যাবে না। মরো এখানে।

মহাদেব ॥ [সক্রোধে] তোকে মেরে আমি মরব। হারামজাদা—[উঠে দাঁড়িয়েছে]

রাখাল ॥ ওঃ বাবা! এ যে ফায়ার একেবারে। তা ফার্নেস গরম হ'লে কী করতে হয় আমার জানা আছে। এই নাও বাবা, পাঁচখানা দশ টাকার নোট।

মহাদেব ॥ [অবাক হয়ে] অ্যাঁ! প-ঞ্চা-শ টা-কা!

রাখাল ॥ এই, একেবারে কুল্‌-ডাউন।

মহাদেব ॥ তোর রোজগার—তোর নিজের রোজগার?

রাখাল ॥ তা—ও তো মাইনে নয়, সব ওপরটাইম। তাইতো বলছিলাম চ'লে এসো বাবা শহরে শহরে টাকা উড়ছে।—হাত বাড়িয়ে ধ'রে নিলেই হ'ল। এর পরের মাসে যখন আসব তখন আবার আমার অন্য চেহারা দেখবে। কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে একেবারে মোটরগাড়ির ড্রেরাইভার। ছ' কুড়ি টাকা মাইনে। ভাবতে পারো? কখনো একসঙ্গে দেখেছ? কিন্তু আমি হচ্ছি। কে ক'রে দিচ্ছে জানো? আমার চন্দনা-বৌদি। কার গাড়ি জানো? জমিদারবাবুর। যাই, মাঠ থেকে দাদাকে ধ'রে আনি।

মহাদেব ॥ এই শোন।

রাখাল ॥ আসছি বাবা, এখুনি আসছি।

মহাদেব ॥ না—না, তুই শুনে যা।

রাখাল ॥ বলো।

মহাদেব ॥ কাছে আয়। চন্দনা-বউমার ওখানে তুই যাস?

রাখাল ॥ যাই বৈকি।

মহাদেব ॥ জমিদারবাবুর ওপর তার খুব হাত?

রাখাল ॥ আলবৎ।

মহাদেব ॥ আচ্ছা, চন্দনা-বউমা যদি জমিদারকে ধরে, তা হ'লে একটা কাজ হ'তে পারে?

রাখাল ॥ কি কাজ?

মহাদেব ॥ আমাদের এই ভিটেমাটি, জোতজমি—

রাখাল ॥ হ্যাঁ, ভিটেমাটি, জোতজমি—কী ?

মহাদেব ॥ না—না, কিছু না।

রাখাল ॥ না—না, বলো না।

মহাদেব ॥ না—না—না।

রাখাল ॥ চন্দনা-বৌদি যা বলবে জমিদার তা-ই করবে। কী করতে হবে বলো না ?

মহাদেব ॥ না—না, ওসব পাপ—ও চিন্তাও পাপ। তুই বলিস, সে আমাদের মাথা হে'ট করেছে—তাকে আমার কোনো দরকার নেই। কিন্তু বাবা তোর হাত ধ'রে বলছি, নায়েব আর মহাজন দু'জনে মিলে আমাদের ছিটোফে'টা যা আছে সব গ্রাস করবার চক্রান্ত করেছে। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি মরব, শেষ নিঃশ্বাস এই মাটিতেই আমি ফেলব। তুই আমার ছেলে, যেটুকু পারিস—যতটুকু পারিস বুড়ো বাপের এই শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করিস !

রাখাল ॥ তুমি ভেবো না বাবা। আজ পঞ্চাশ টাকা দিলাম, আরও বেশি ওপরটাইম আমি খাটবো। "চারমিনার" আমি ছেড়ে দেবো চা খাওয়া বন্ধ রাখব, টকী দেখব না—মাসে মাসে দশ-বিশ যা পারি তোমার হাতে তুলে দেবো। যদিও আমি জানি এত ক'রেও চাষীর চালচুলো থাকবে না, চাষীকে বাঁচতে হ'লে তার জন্য নতুন আইন চাই—আমাদের মজদুরদের জন্য যেমন সব হচ্ছে।

[হঠাৎ ঢোলের বাজনা শোনা গেল। মানিক, শশী প্রভৃতি কয়েকজন
গ্রামবাসী ঢোলবাদককে নিয়ে প্রবেশ করল।]

মানিক ॥ এই যে রে রাখালে, এসে গেছিস। একেবারে সাহেব ব'নে গেছিস যে !

রাখাল ॥ কারখানার কাজ দাদা, নেংটি প'রে চলে না।

মানিক ॥ বেশ—বেশ, কিন্তু গোপাল কোথায় ?

মহাদেব ॥ মাঠে গেছে। তা এত বাদ্যভাণ্ড যে ?

শশী ॥ গোপালের বউয়ের আজ কী এক ব্রত, প্রসাদ নিতে গোপাল আসতে বলেছিল। গাঁ থেকে আমোদ-আহ্লাদ তো উঠেই যাচ্ছে তাই আমরা চাঁদা তুলে জয়দেব ঢুলিকে নিয়ে এলাম—

মানিক ॥ হ্যাঁ, আজ আমরা তোমার বাড়িতে একটু গানবাজনা করব মোড়ল। ব'স ভাই—সব বসে যাও।

[হাসির প্রবেশ।]

মানিক ॥ গোপাল কোথায় বৌঠান ?

হাসি ॥ আমাদের ক্ষেত থেকে ধানের শীষ আনতে গেছে। নিজের ক্ষেতের ধানের শীষ খোঁপায় প'রে তবে আমি ব্রত করতে বসব। তা, সে এলো ব'লে। তোমরা গানবাজনা লাগিয়ে দাও না, ঠাকুরপো! ভারী মজা হবে! লোকটা এসে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। না—না ঠাকুরপো, তুমি এমন হাত-গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। এদের একটু দেখাশুনা করো।

রাখাল ॥ বসুন—বসুন।

[পকেট থেকে "চারমিনার" বের ক'রে বিলোতে লাগল।]

[জয়দেব ঢোল বাজাতে শুরু করল। এদের মধ্যে দু'একজন আমাদের চোটে নাচই শুরু ক'রে দিল। হাসি ভিতর থেকে সবাইকে পান-তামাক দিতে শুরু করল। তার খুশি যেন উপচে পড়ছে। এমনকি মহাদেবের মুখে হাসি ফুটল। ওদের দলে অন্নদা ছিল, সে মজাদার ছড়াগান শুরু করেছে।]

"কে যায় রে কে যায় রে ডালিমতলা দিয়ে।
বাড়ি যাচ্ছেন সন্ধ্যামণি মাথায় গামছা দিয়ে ॥
একবার তাঁকে দাঁড়াতে বল—
রেকে মেপে ধান দেবো,
পোয়ে মেপে চাল দেবো,
গুয়া পান সুপারি দেবো,
আর প্রাণভরা ভক্তি দেবো,
হোক্ লক্ষ্মী আমার ঘরে,
সন্ধ্যামণি তোমার বরে ॥"

[এর মধ্যে হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। আদালতের পেয়াদা সহ মহাজন ভূপতি এই আসরে এসে দাঁড়াল। বাদ্য ও নৃত্যগীত মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল।]

ভূপতি ॥ এই ব্যাটা জয়দেব ঢুলি, এদিকে আয়। বাঁশগাড়ি করতে যেতে হবে এই আদালতের পেয়াদার সঙ্গে। এখনি চল বাবা, চল।

জয়দেব ॥ কার জমিতে আবার বাঁশগাড়ি।

ভূপতি ॥ [চারদিকে তাকিয়ে] সে বলব 'খন···দেখবি তখন। আয়, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

শশী প্রভৃতি ॥ কিন্তু কার জমিতে বাঁশগাড়ি? আমরা জানতে চাই মহাজন।

মানিক ॥ আচ্ছা মহাজন, তুমি যে এত জমি জমি করো, তোমার তো ছেলে নেই পিলে নেই—তিন কুলে কেউ নেই। যেদিন চোখ বুজবে, সেদিন তোমার এই হাজার বিঘে জমি কোন কাজে লাগবে? লাগবে—সাড়ে-তিন-হাত জমি দাহ করতে। তারই জন্য এত লোককে বাঁশ দিচ্ছো বাবা।

[ভূপতি রুষ্ট হয়ে তাদের প্রশ্নে কর্ণপাত না ক'রে জয়দেবের প্রতি।]

ভূপতি ॥ [জয়দেবের দিকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিল] আরও দেবো চল।

[জয়দেব চারদিক তাকিয়ে নোটখানা কুড়িয়ে নিল ও মহাজনের অনুগামী হ'ল। অন্যান্য লোকজনেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে বিস্ময়ে এবং বেদনাপ্লুত অন্তরে মহাজন যে দিকে গেল, সেই দিকে নীরবে চ'লে গেল। ঢোলের বাজনা ক্রমে দূরে গেল মিলিয়ে। এই প্রাঙ্গণে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল মহাদেব এবং পাষাণীর মতো স্তব্ধ হয়ে রইল হাসি। ধীরে ধীরে নতমুখে গোপালের প্রবেশ। কয়েক মুহূর্ত সে কথাই বলতে পারল না।]

হাসি ॥ আমার ধানের শীষ?

গোপাল ॥ আনতে পারলাম না, হাসি।

মহাদেব ॥ কেন?

গোপল ॥ কী হবে এনে? ও জমি আর আমাদের নয়।

হাসি ॥ কেঁদে ওঠে—আর্তনাদ ক'রে] নয়?

গোপাল ॥ না। ও জমিতে বাঁশগাড়ি হয়ে গেল।

[মূর্চ্ছিত হয়ে হাসি প'ড়ে গেল।]

গোপাল ॥ হাসি! হাসি!

মহাদেব ॥ হায় ভগবান! আমার লাঙল। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শরীরের রক্ত জল ক'রে জমি চাষ করলাম আমি—ফসল ফলালাম আমি—দেশের

লোকের মুখের ভাত যোগালাম আমি। তবু আমার জমিটুকু আমার রইল না। দেনার দায়ে চ'লে গেল। কেন এই দেনা? মোটা ভাত, মোটা কাপড় জোটাতে —আর বাপ-পিতামহর দেনা শুধতে। কিন্তু ভগবান - আর কত জন্ম আমরা এ দেনা শুধব? কত জন্ম? আর কত জন্ম?

ষষ্ঠ দৃশ্য

[চতুর্থ দৃশ্যে বর্ণিত জগত্তারিণী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎকার-কক্ষ। আলোক যথারীতি ক্ষমাকে পড়াচ্ছে]

আলোক ॥ এই যে সমাজ-ব্যবস্থা—এই যে ভূমি-ব্যবস্থা—যা আমাদের দেশে আজ দেড়শো বছর ধ'রে চলেছে, তার চরম পরিণতি যে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখলাম ক্ষমা। এই ধরো না; মহাদেব মণ্ডল—যার পাঁচ বিঘে জমিতে খাওয়া-পরাও চলছিল না—তার জমি গ্রাস করলো মহাজন ভূপতি তালুকদার—যার হাজার বিঘের ওপরেও রয়েছে চাষের জমি অথচ, নিজে সে লাঙল ধরে না হাতে—চাষ করে না মাটি। আধিয়ার, বর্গাদার—যারা তার জমিতে ফসল ফলায়—শরীরের রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ষোল আনা চাষ করে—তারা পায় আট আনা ফসল! সত্যিকার চাষী যে, আজ তার কোনও জমি নেই। বাঁচার দায়ে করেছে দেনা—দেনার দায়ে গেছে জমি। আমি তো দেখলাম ক্ষমা, বাংলার চাষী দেনা ঘাড়ে নিয়েই জন্মায়, যে কদিন বাঁচে, দেনা ক'রেই বাঁচে, আর যখন মরে, দেনা রেখেই মরে।

ক্ষমা ॥ কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

আলোক ॥ সেইটেই আজ তোমার পড়ার বিষয়। প্রায় দেড়শো বছর আগে লর্ড কর্ণওয়ালিস নামে এক ইংরেজ শাসক এদেশে প্রবর্তন করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—পল্লীপ্রাণ বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, আর তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিজেদের পছন্দমত ছাঁচে গ'ড়ে তুলতে। কিন্তু বাংলার চাষীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, কত বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা। জমিদার থাকেন শহরে সুখবিলাসে ডুবে, আর গ্রামে নায়েব-গোমস্তা আর তাদের প্রসাদ-

পুষ্ট মহাজনরা প্রজাদের রক্ত শুষে শুষে গোটা দেশটাকেই ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে।

ক্ষমা ॥ এর থেকে বাঁচবার উপায় ?

আলোক ॥ বাঁচবার উপায় নিয়ে আজ বহুকাল বহু গবেষণা চলেছে। দেশের কল্যাণকামীরা ভেবেচিন্তে দেখেছেন—একমাত্র উপায় জমিদারি বিলোপ—জমি থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ—আইন ক'রে দেওয়া "লাঙল যার, জমি তার।" এতদিন পর আজকের কাগজে দেখছি—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জমিদারি গ্রহণ বিলের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই তিপান্নো সালের ২৫এ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন : "দেশের বর্তমান পটভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এবং এর সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত, তাদের আর স্থান নেই। তাই' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বাতিল ক'রে দেবার এই উপযুক্ত সময়। আমাদের কর্মপন্থা হবে—

(১) যাঁরা খাজনা আদায় ক'রে থাকেন তাদের সে অধিকার বিলোপ করা এবং যাঁদের জমি নেই, তাঁদের জমি দেওয়া,

(২) খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করতে হবে, যাতে ক'রে ছোট ছোট জমির মালিকও লাভজনকভাবে চাষবাস ক'রে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন ;

(৩) একটা আইন ক'রে নিতে হবে যাতে জমিকে আর খণ্ড খণ্ড করার সুবিধা না হয় ; এবং

(৪) আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে আমাদের উদ্বৃত্ত টাকা শিল্পে নিয়োগ করা হয়।"

[বরুণের প্রবেশ]

বরুণ ॥ তার মানে তো হ'ল গিয়ে এই মাস্টার, আজ যদি স্বেচ্ছায় শিল্পকে আমাদের উপজীবিকা হিসাবে বেছে নেই, তা হ'লেই দেশের কৃষি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। একথা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম ব'লে জমিদারি বেচে দিয়ে সেই টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে শিল্পের কাজ করছি। জমিদারি করছেন এ'রা—মায়ে আর বেটিতে।

ক্ষমা ॥ দেখ দাদা, মিছিমিছি খোঁটা দিও না। আমি আবার জমিদারি কি করলাম ?

বরুণ ॥ জমিদারের ছেলের বউ হবে ব'লে তপস্যা করছে কে ?

[জগত্তারিণী খাবারের প্লেট নিয়ে যথারীতি প্রবেশ করলেন, পিছনে আসন ও গ্লাস নিয়ে হাসি]

জগত্তারিণী ॥ হ্যাঁ করছে আমার মেয়ে, তাতে দোষটা কী হয়েছে ?

বরুণ ॥ আমি দোষের কথা বলছি না মা, বিপদের কথা ভাবছি। আর দু' বছরের মধ্যেই সরকার সব জমিদারি বাতিল ক রে দেবে, মানে মুড়ি-মিছরির এক দর হবে আর কি। এই দু' বছরের মধ্যে যদি শ্রীমান আলোক রায়কে ধ'রে এনে আমার ভগ্নীকে তার হাতে সম্প্রদান করা না যায়, তা হ'লে দু' বছর পরে আর কোনো জমিদার নন্দনই যে মিলবে না মা।

জগত্তারিণী ॥ জমিদারি যেতে পারে, কিন্তু জমিদারের রক্ত তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। [আলোককে] তুমি এসো বাবা, জল-খাবার খেয়ে নাও। তোরা ভেতরে যা -- তোদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

বরুণ ॥ আচ্ছা মা, আমাদের বুঝি একসঙ্গে ব'সে খাওয়া চলে না, না ?

জগত্তারিণী ॥ না, চলে না।

বরুণ ॥ ও। আচ্ছা মা, যাচ্ছি।

[বরুণ ও ক্ষমা চ'লে যাচ্ছিল, যেতে যেতে বরুণ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল]

জমিদার-রক্তের এই তো সম্মান ! তারা খাবে দাসদাসীর হাতে। এই রক্তটা গায়ে না থাকলে মায়ের হাতেই খাওয়াটা হ'ত।

জগত্তারিণী ॥ [হেসে] আচ্ছা যা, কাল থেকে তোরা সব একসঙ্গেই খাবি। [বরুণ ও ক্ষমার প্রস্থান]

জগত্তারিণী ॥ খাওয়া কিন্তু তোমার জমিদারের ছেলের মতই আনন্দ। কিছুই যেন মুখে রোচে না।

আলোক ॥ জমিদারের ছেলেও তো আমি হ'তে পারি মা।

জগত্তারিণী ॥ তোমার আর-সব কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তুমি জমিদারের ছেলে—এটা আমি কখনো বিশ্বাস করব না।

আলোক ॥ জমিদারের ছেলেদের গায়ে কী তা লেখা থাকে মা ?

জগত্তারিণী ॥ না, থাকে না। কিন্তু তাদের কথাবার্তা আর আচরণে সেটা ধরা যায়। এ গ্রামে এসে তুমি জমিদারদের বিরুদ্ধেই কেবল বলছ, ভেবো না আমি কানে তুলো দিয়ে আছি। পড়াতে গিয়ে, না পড়িয়ে ক্ষমাকেও এই সবই তুমি শেখাচ্ছ। এমন উত্তেজিত হয়ে সব বলছিলে, আমার কানেও তা পেঁাছেছে।

[খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল]

আলোক ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] আমি কোন অন্যায় কথা বলি নি মা।

জগত্তারিণী ॥ [ঠিক তাদৃশ দৃঢ়তায়] না, তা তুমি বলো নি। আর বলো নি ব'লেই তোমার রক্ষা।

আলোক ॥ [আনন্দে] আপনি তা হ'লে আমার সঙ্গে একমত।

জগত্তারিণী ॥ মত এক, কিন্তু পথ এক নয়। মত বদলাতে পারি, কিন্তু শরীরের রক্ত বদলাতে পারব না। [প্রস্থানোদ্যত]

আলোক ॥ দাঁড়ান মা, একটা কথা।

জগত্তারিণী ॥ বলো।

আলোক ॥ আলোক রায়ের সন্ধান কী আপনার শেষ হয় নি, মা ? আমি আর কতকাল নজরবন্দী থাকব ?

জগত্তারিণী ॥ আমি পরিহাস ভালবাসি না, আনন্দ। আমি জানি তুমি আলোক নও, কিন্তু আলোক সাজবার সাধ ছিল তোমার। তোমার এই পাপ যে মুহূর্তে তুমি স্বীকার করবে' সেই মুহূর্তেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো।

আলোক ॥ তবে আমাকে থাকতেই হ ল।

জগত্তারিণী ॥ তুমি থাকো। আমি সেইটাই চাই বাবা। কিন্তু কেন যে চাই তা তো বুঝি না। এক-এক সময় অবশ্য মনে হয়, যদি তুমি আমার আলোক হ'তে, মন্দ হ'ত না। [প্রস্থান—হাসিও চ'লে যাচ্ছিল]

আলোক ॥ হাসি, শোনো।

[হাসি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল]

আলোক ॥ তোমরা সব কেমন আছ ?

হাসি ॥ জমি গেছে, এইবার ভিটেটা যাবে।

আলোক ॥ জমিদারিও যাবে। জমিদারি গেলে আবার তোমাদের জমি হবে, ভিটে হবে। "লাঙল যার, মাটি তার"—এতবড় সত্যটা মিথ্যা ক'রে দিয়েছিল মধ্যস্বত্বভোগীরা। রাজা আর প্রজার মাঝখানে এত পরগাছা জন্মেছিল যে, তারাই শুষে নিচ্ছিল জমির প্রাণ' মাটির রস। পরগাছা সব নতুন আইনে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। আবার দিন আসছে যেদিন আমরা দেখব "লাঙল যার, জমি তার"।

হাসি ॥ [উত্তেজিতকণ্ঠে] লাঙল আমাদের। জমিও তবে হবে আমাদের! কবে দাদাবাবু? কবে?

আলোক ॥ তের শ' বাষট্টি সালের পয়লা বৈশাখ।

হাসি ॥ তের শ' বাষট্টি সালের পয়লা বৈশাখ?

আলোক ॥ হ্যাঁ, তের শ' বাষট্টি সালের পয়লা বৈশাখ।

[ক্ষমার প্রবেশ]

ক্ষমা ॥ হাসিকে ইতিহাস শেখাচ্ছেন, হয়তো এ কথাই আপনি বলবেন, না?

আলোক ॥ হ্যাঁ, ক্ষমা।

ক্ষমা ॥ [হাসির প্রতি] এখান থেকে চ'লে যা তুই।

[হাসি চ'লে গেল]

ক্ষমা ॥ বাষট্টি সালের পয়লা বৈশাখ, হাসিকে নিয়ে কি স্বর্গে যাওয়া হবে?

আলোক ॥ শুধু হাসি কেন—ক্ষমা, আনন্দ, আলোক—সব নিয়েই প'ড়ে উঠবে সেই নতুন দিনের স্বর্গ। এই অভিশপ্ত বিষাক্ত জমিদারী প্রথা সেইদিন হবে ধ্বংস।

ক্ষমা ॥ [কাছে এসে] হবে! আমিও সেই দিনটিরই প্রতীক্ষা করছি! সেইদিন হবে আমার মুক্তি। জমিদারির এই নাগপাশে বাঁধা প'ড়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। চারদিকে আমার পাষাণ-প্রাচীর। আমি যেন রূপকথার

সেই বন্দিনী রাজকন্যা ; কিন্তু কোথায় আমার সেই রাজপুত্র—যে এই পাষাণ দেউল ভেঙে··[হঠাৎ থেমে গিয়ে তার পরে বলল] কে আপনি, বলুন। আপনি কে ? আমি যার পথ চেয়ে এতদিন ব'সে আছি' সে কী আপনি ?

আলোক ॥ তা আমি জানি না। তবে আমি এইটুকু জানি ক্ষমা, আমি তোমাকে চাই।

[হাত ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছিয়ে এল
ক্ষমা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে]

ক্ষমা ॥ না—না, তুমি আমাকে অমন ক'রে চেও না। তুমি কি জানো না, আমি অন্যের বাগদত্তা ?

[আলোক এসে আবার ওর হাত ধরল]

আলোক ॥ আমি জানি—আমি জানি! আমি ভুল ক'রে তোমায় চাই নি!

ক্ষমা ॥ [হাত ছাড়িয়ে নিয়ে] না—না। তুমি···আপনি চলে যান! এখ্‌খুনি চ'লে যান। [প্রস্থানোদ্যত]

আলোক ॥ [আগ্রহে] শোন—শোন।

ক্ষমা ॥ আপনি বেরিয়ে যান বলছি! আশ্চর্য এত অপমানেও লজ্জা নেই ? আপনি আর কখনো এখানে আসবেন না।

আলোক ॥ কিন্তু তমি তাড়িয়ে দিলেও আমার যাবার উপায় নেই, ক্ষমা।

ক্ষমা ॥ বটে! আমি মাকে ডাকছি।

[ঘণ্টা ধরতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে]

তুমি যাও—তুমি যাও। তোমাকে দেখলে আমি সব ভুলে যাই। এ পাপ থেকে তুমি—তুমিই আমাকে রক্ষা করো।

আলোক ॥ তোমাকে-আমাকে, দু'জনকেই যিনি রক্ষা করতে পারেন, আমাদের সেই জগত্তারিণী মাকে আমি ডাকছি।

[নিজেই ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল। ঘণ্টার শব্দে বাড়ির লোকজন সব ছুটে আসতে লাগল। জগত্তারিণী এবং হাসিও এসেছে।]

জগত্তারিণী ॥ কী হ'ল—কী হয়েছে—কী ব্যাপার ?

[অন্যদিকে বরুণের প্রবেশ]

বরুণ ॥ তবে তোমরাও শুনেছ, আমাদের আলোকের বাবা, জমিদার মহীপাল রায় হঠাৎ ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মারা গেছেন।

আলোক ॥ [আর্তনাদ ক'রে] বাবা নেই ? বাবা মারা গেছেন ?

[বসে পড়ল। ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

জগত্তারিণী ॥ বরুণ, তাঁকে আমরা হারালাম—কিন্তু তাঁর ছেলেকে আমরা আজকে পেলাম। [কাছে গিয়ে] আলোক, বাবা—

যবনিকা